নারী নির্যাতন
নারী আন্দোলন

সম্পাদনা

ড. চিত্ত মণ্ডল

নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

নারী নির্যাতন
নারী আন্দোলন



প্রথম প্রকাশ : ২৫ জানুয়ারি ২০০৬ কলকাতা বইমেলা
১৫

স্বত্ব : প্রতীক মণ্ডল

প্রকাশক : বুলবুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলকাতা-৭০০ ০০৭

অক্ষরবিন্যাস : আশা এন্টারপ্রাইজ
হাওড়া

মুদ্রণ : শুভেন্দু রায়
ঊষা প্রেস
৩২/এ. শ্যামপুকুর স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ : শ্যামল জানা

মূল্য : ০ টাকা

Nari Nirjatan Nari Andolan (a collection of articles on atrocities on women and their movements against all kind of discriminations and oppressions composed by the intelectuals of West Bengal and Bangladesh alongwith some important documents), Edited by **Dr. Chita Mandal** by **Nabajatak Prakashan, A-64, College Street Market, Kolkata-7, Price : 150.00.**

প্রথমাকে

পিতৃতন্ত্রের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা

সম্পাদকের প্রকাশিত গ্রন্থ

কাব্য : জতুগৃহে স্বপ্নরথী; লোকসাহিত্য : ফোকলোরের স্বরূপ; চলচ্চিত্র : লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র আন্দোলন; রাজনৈতিক সংস্কৃতি : নেলসন মানডেলার সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া; সম্পাদনা : সম্প্রতিকালের সমাজ রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ; মুজফ্‌ফর আহমদের সাহিত্য ও সমাজ রাজনীতি; মহান একুশে; বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত; সমৃদ্ধি সাহার কৈশোরের ছেঁড়াপাতা।

ভূমিকা

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাই নারীমুক্তির একমাত্র পথ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী গৃহচারী, সেবাদাসী, পরজীবী এবং সন্তানউৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ। নারীর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিকতা তাঁকে শোষণের নাগপাশে বন্দী করে ফেলেছে। রাজনীতির ভাষায় পুরুষ যদি বুর্জোয়া হয়, নারী তবে প্রলেতারিয়েত। নারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্যই পিতৃতান্ত্রিকতা 'নারী' নামক একটি শ্রেণিকে ষড়যন্ত্র করে কোণঠাসা করে রেখেছেন। একসময় মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। মেঘালয়ের আদিবাসীদের মধ্যে এখনও এই সমাজ বর্তমান। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারী তাঁর সমস্ত অধিকার ও অর্জন হারিয়ে ফেলেছেন। নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এখনও নিছক ভোগ্যপণ্য হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সমাজের শতকরা ৯৮ শতাংশ মেয়েকেই জন্মের পর থেকেই গৃহবধূ বানিয়ে তোলার চেষ্টা চলে। তবে আনন্দের কথা যে, সম্প্রতি নারীদের মধ্যে সচেতনতার মাত্রাটা ক্রমবর্ধমান গতিতে প্রসারিত হচ্ছে। নারীসমাজে শিক্ষার আলো দীপ্রতা ছড়াচ্ছে। নারী তাঁর হৃতগৌরব এবং অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন। কিন্তু এখনও তাঁরা মুক্তির আনন্দে বিহঙ্গ-আকাশ ধরতে পারেননি। এখনও অনেক শিক্ষিত নারী পরজীবী হয়ে বাস করাকেও গৌরব বলেই মনে করেন। এখনও নারীর শত্রু নারী নিজেই। পুরুষেরাও তাঁদের জায়গা সহজে ছেড়ে দিতে চাইছেন না। তবু নারীসমাজ শিক্ষাকে হাতিয়ার করে অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ তাঁদের কব্জায় নিয়ে যেতে নিয়ত চেষ্টা করে চলেছেন। এটাই আশার কথা।

কিছু নারীবাদী এবং মার্কসবাদী নেত্রী নারীদের মুক্তির জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। ফলে নারীরা সমাজে অনেক অধিকার ফিরে পেয়েছেন। সংবিধানে তাঁদের জন্য আইনী অধিকারের বহু দুয়ার খুলে দেয়া হয়েছে। তবু এখনও নারীর ভাগ্য নারী নিজেরা তৈরি করতে পারেননি। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন একদল রাজনীতিক, সমাজনীতিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পুরোধানেতৃত্ব নারীর মুক্তির জন্য আন্দোলন সংগঠিত করছেন। নারীদের নিয়ে রচিত হয়েছে ভুরি ভুরি গ্রন্থ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ। নারীদের কিভাবে দেখে সমাজ, পুরুষ নারীদের ওপর এখনও কিভাবে চালায় অত্যাচারের রোলার এবং কিভাবেই বা তাঁদের মুক্তির দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে, এমনি ধরনের বেশ কিছু প্রবন্ধ নিয়ে চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়েছে এই গ্রন্থ। নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও নারীমুক্তির পুরোধাপুরুষ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য এবং অনিলা দেবী, বিমলা

রণদিভের লেখা না পেলে এই ধরনের একটি সংকলনের পরিকল্পনা করা যেতো না। বেশ কিছু তরুণ লেখক ও গবেষক বহু পরিশ্রম করে এই সংকলনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেশকিছু প্রবন্ধ লিখে দিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য রদ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ যে সনদ নির্মাণ করেছেন, তারও বাংলা অনুবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে নারীরা তাঁদের মুখচ্ছবির প্রতিবিম্ব দেখে নিজেদের শৃঙ্খলের শিকল নিজেরাই যাতে ছিঁড়তে পারেন, তার জন্যই এই গ্রন্থ।

আমার স্ত্রী ড. প্রথমা রায়মণ্ডলের কাছে এই সংকলনের জন্য কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক বুলবুলকে, যার নিরলস উদ্যোগ না পাওয়া গেলে গ্রন্থটি প্রকাশের আলো দেখতে পেতো না।

মুদ্রণপ্রমাদের জন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করি। বইটি নারীমুক্তি আন্দোলনে এবং সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিছুমাত্র সহায়তা করতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

ড. চিন্ত মণ্ডল

সূচি

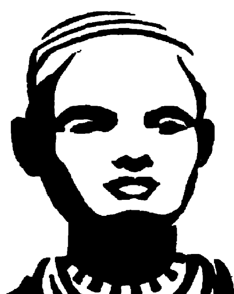
নারীভাবনা

নারী নির্যাতন

নারী আন্দোলন

নারীভাবনা

নারীভাবনার ইতিহাস ● বঙ্গদেশে নারীভাবনা : উনিশ শতকের দর্পণ ● ধর্ম ও নারী ● নারী ও প্রতিবিপ্লব ● নারী ও সংস্কৃতি



'পুরুষের সাথে নারীর পার্থক্য মাত্র একটি ক্রোমোসোমের, এবং একটি ক্রোমোসোমের জন্যে একজন প্রভু ও আরেকজন পরিচারিকা হয়ে উঠতে পারে না।'



'সব ধরনের মৌলবাদেরই লক্ষ্য নারীকে অবরোধে ঢুকিয়ে পুরুষের ভোগ্যবস্তু ও দাসী করে তোলা।'

নারীভাবনার ইতিহাস

রাশিদ আসকারী

নারী : পুরুষ-প্রণীত পুরাণ

'নারী কী'—এই প্রশ্নের জবাবে একজন বলেন : 'নারী একটি জরায়ু'[১]। পূর্ণাঙ্গ একজন নারীকে প্রত্যক্ষ-বিশেষ ভাববার এই মানসিকতা সুপ্রাচীন। বুক অব জেনেসিসও পুরুষের একটি অতিরিক্ত হাড় থেকে নারীসৃষ্টির ধারণাটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বোসেটের ভাষ্যমতে : আদি নারী ইভ আদি নর অ্যাডামের একটি সংখ্যাতিরিক্ত হাড় থেকে উদ্ভূত বলে আদি পুস্তকে চিত্রিত হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, নারী কেবলি 'উত্তরভাবনা' নয়, বরং এক ধরনের রম্যতা বা সুখকরতা অর্থাৎ আদি মানবের সুখসম্ভোগের জন্যেই আদি মানবীর সৃষ্টি হয়েছিল তার অনুকৃতি হিসেবে। তাও আবার খুব ভালো অনুকৃতি নয়। আদি মানবী ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টিগুলোর একটি নয়।[২] সন্ত টমাস অ্যাকুইনাস নারীকে 'অসম্পূর্ণ মানুষ' এবং 'আনুষঙ্গিক সত্তা' ঘোষণা করেছেন এবং নারীপ্রকৃতিকে প্রাকৃতিক বিচ্যুতিক্লিষ্ট হিসেবে গ্রাহ্য করার উপদেশ দিয়েছেন।[৩] 'কতিপয় গুণের ঘাটতির কারণে নারী হয়েছে নারী'—জানিয়েছেন অ্যারিস্টটল।[৪] প্লেটো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁকে নারী হিসেবে সৃষ্টি না করার জন্যে।[৫] সন্ত অগাস্টিন আবার নারীকে অনিশ্চায়ক এবং অস্থির সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬] ঐতিহাসিক রোমান আইনে স্ত্রীলোকের জড়বুদ্ধি ও অস্থিতিশীলতার উল্লেখ করে নারীর অধিকার সীমিত রাখা হয়েছে। করিনিথিয়ানদের উদ্দেশে লেখা বক্তব্যে জন পল বলেছেন : 'প্রত্যেক পুরুষের প্রভু খৃস্ট আর প্রত্যেক নারীর প্রভু হলো পুরুষ।' বাৎস্যায়নের *কামসূত্রে* নারীকে ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্মশাস্ত্রের অন্যতম *শতপথ ব্রাহ্মণে* 'নারী, শূদ্র, কুকুর ও কালো পাখিকে সমার্থক, অসত্য, পাপ ও অন্ধকার বলে আখ্যায়িত করে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বারণ করা হয়েছে।' *মৈত্রীয়না সংহিতায়* নারীকে অসত্য, দুর্ভাগ্য, সুরা ও জুয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* বলা হয়েছে নারী জন্মসূত্রেই হীন।[৭] খ্রিস্টধর্মমতে নারী অপবিত্র, পুরুষ-প্রলুব্ধকারী, পৃথিবীতে পাপ-আনয়নকারী এবং পুরুষের পতন-সৃষ্টিকারী। খ্রিস্টধর্মের নানা ধর্মপ্রচারকই নানাভাবে নানাসময়ে এ-মত প্রচার করেছেন। এঁদেরই অন্যতম টারটুলিয়ান নারীকে 'নরকের দ্বার' ঘোষণা করে সর্বদা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে অনুশোচনায় কাঁদতে কাঁদতে শোক প্রকাশ করে চলার পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে মানুষ ভুলতে পারে যে, সে-ই মানবজাতির ধ্বংসের কারণ। ইসলাম ধর্মেও নারীকে পুরুষ-কেন্দ্রিক থাকবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও কাব্যে—যেমন, *বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত* প্রভৃতিতে নারী-অধস্তনতার উৎকট চিত্র পাওয়া যায়।

হিন্দুশাস্ত্রে নারীকে পাপী ও শূদ্রের সঙ্গে এক করে দেখানোই ছিল সাধারণ রীতি। মহাভারতে ভীষ্ম বলেছেন : ....স্ত্রীলোককে কুমারিকা অবস্থায় পিতা, যৌবনাবস্থায় ভর্তা ও

বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিবে। উহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা বিধেয় নহে। তিনি আরো বলেন : ইহলোকে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নাই। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ময়দানের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু, এ সমুদয়ের সহিত তাহাদের তুলনা করা যায়।[৮] মৃত্যুপথযাত্রী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন : নারীর চেয়ে অশুচি আর কিছু নেই। পূর্বজন্মের পাপের ফলে নারীজন্ম হয়। সাপের মতো নারীকেও কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। নারীর কাছে মিথ্যা বললে পাপ হয় না। ছ'টি বস্তুকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে না রাখলে সেগুলো নষ্ট হয় : গাভী, সেনা, কৃষি, স্ত্রী, বিদ্যা এবং শূদ্র-সংসর্গ।[৯] *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* নারীকে ক্ষমতাহীন উত্তরাধিকারহীন এবং পাপী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[১০] *মহাভারতের* আদিপর্বে রাজা যযাতির পুত্র দ্রুহ্য নারীকে ভোগ্যবস্তুরূপে চিহ্নিত করেছেন।[১১] শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারীকে 'পাপযোনি' আখ্যা দিতে দ্বিধা করেননি।[১২] *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে : পুত্র হলো সর্বোচ্চ স্বর্গের প্রদীপ আর কন্যা দুঃখের কারণ।[১৩] স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা মনু নারীকে মিথ্যার মতোই অপবিত্র বলেছেন এবং তাদের বেদপাঠের অধিকার হরণ করেছেন। নারীনিন্দার ব্যাপারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও কম ছিলেন না। তিনি নারীকে সর্বপাপের দ্বার বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় : গাভী যেমন নতুন নতুন তৃণ ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রূপ নারীরাও নিত্যনতুন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে। ভীষ্মের ভাষায় : উহাদের মতো কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। কাষ্ঠরাশির দ্বারা যেমন অন্তকের তৃপ্তি হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি হয় না।[১৪] *পঞ্চতন্ত্রে* বলা হয়েছে : মেয়েরা কখন সতী হয় জানো? যখন নিভৃত নেই সুযোগ নেই আর প্রার্থী পুরুষ নেই।[১৫] স্মৃতিশাস্ত্রে বিধৃত সমাজাদর্শের মূল কথা হলো পুরুষের প্রভুত্ব আর নারীর দাসত্ব। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে যৌন শুচিতার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় এই শাস্ত্রে। অসতী স্ত্রী বিনাশর্তে, বিনাবিচারে পরিত্যাজ্য, পক্ষান্তরে ব্যভিচারী স্বামীর প্রায়শ্চিত্তে নিষ্কৃতি। সতীত্ব সর্বদা নারীরই পালনীয়। অন্যদিকে একমাত্র অজাচার কিংবা অগম্য গমন ব্যতীত পুরুষের যে-কোনো স্খলন বা ব্যভিচারের বিধান প্রায়শ্চিত্ত। পরনারী, রজঃস্বলা ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনসংসর্গ করলে কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া অন্য কোনো শাস্তির প্রয়োজন নেই।[১৬] উপনিষদের প্রখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নারীকে নিজের দেহের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছেন। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* তিনি বলেন : সম্ভোগে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি কথা বলতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে তাকে কিনে ফেলার চেষ্টা করতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে তাকে প্রহার করতে হবে।[১৭]

শাস্তির প্রশ্নে নারী-পুরুষ-বৈষম্যের বিষয়টি প্রাচীন ভারতেও লক্ষণীয়।[১৮] ভীষ্মের অনুশাসন বলে : ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে স্বামীগৃহের মধ্যে বন্ধ করে শুধু গ্রাসাচ্ছাদন দিয়ে রাখবে। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীকে পরিত্যাগ করে নিকৃষ্ট জাতির সঙ্গে সংসর্গ করে, তবে শাস্ত্রের বিধান-অনুযায়ী রাজার উচিত সেই স্ত্রীকে প্রকাশ্যে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো। বিপরীতে পুরুষ শ্রোত্রীয় পত্নীতে গমন করলে অথবা অন্য স্ত্রী সংসর্গ করলে, দুই-তিন বছর ব্রহ্মচর্য পালন করার পর দুই-তিন দিন স্বল্পাহার করে দিবসের শেষে অগ্নিতে আহুতি দিলেই সব পাপ মোচন হয়ে যাবে।[১৯]

অন্যান্য ধর্মেও নারীকে গৌণ সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে নারীজন্ম অভিশাপের ফল এবং পুরুষজন্ম পূর্বজন্মের পুণ্যের পুরস্কার। বস্তুত, সহস্র বছর ধরেই ধর্মগ্রন্থগুলো নারীর অধীনস্থতার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করছে। কবিগুরু তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন : 'স্ত্রীলোককে সাধ্বী রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামাজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে— তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনো জবাবদিহি নাই—ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধে পুরুষ সম্পূর্ণ কাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' বস্তুত *বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, গীতা*-সহ সকল ধর্মশাস্ত্র ও *রামায়ণ, মহাভারতের* মতো প্রাচীন গ্রন্থে নারীর অধস্তনতার রাশি রাশি তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যাবে। এর কারণ এগুলোতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক সমাজচিত্রই ফুটে উঠেছে, যেখানে প্রধান নিয়ামক শক্তি ছিল পুরুষ। পুরুষ প্রণয়ন করেছে নারীর এই অধীনস্থতা।

কবি-দার্শনিকদের কাছে আবার ফিরে যাই। রুশো বলেছেন : নারী দরকারি অশুভ (Necessary evil); শেক্সপিয়রের মতে দুর্বলতার নামই নারী (Frailty, thy name is woman); রবীন্দ্রনাথ নারীকে করে তুলেছেন দুর্জ্ঞেয় ('অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা')। ফ্রয়েড বানিয়েছেন দেহসর্বস্ব (Her anatomy is her destiny); তবে নারী-বিষোদ্গারে নীৎশের জুড়ি মেলা ভার। *Thus Spake Zarathustra* গ্রন্থে তিনি তো রীতিমতো খিস্তি করেছেন : 'নারীরা বন্ধুর উপযুক্ত নয়। তারা এখনও বিড়াল কিংবা পাখি কিংবা বড়জোর গাভী। পুরুষ নেবে যুদ্ধের প্রস্তুতি, আর নারী হবে যোদ্ধাদের প্রমোদসামগ্রী।' এখানেই ক্ষান্ত হননি নীৎশে। তাঁর প্রবল নারীবিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সতর্কবাণীতে : যদি মেয়েদের কাছে যাও, তবে চাবুক নিতে ভুলো না। অবসাদগ্রস্ত বোদলেয়ার পাশ ফিরে প্রেয়সীকে চুমো দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন ওটি একটি পুঁজভর্তি আঠালো চামড়ার থলে। সুন্দর কাব্য করে তিনি বলেছেন : When she had sucked the marrow from my bones/ And languorously I turned to her with a kiss,/ Beside me suddenly I saw nothing more/ Than a gluey-sided leather bag of pus.[২০] একটি প্রাচীন লোকগীতিতে বলা হয়েছে : 'I called my donkey a horse gone wonky.' অর্থাৎ আমার গাধাটিকে আমি বিকৃত ঘোড়া বলি। লিঙ্গপ্রভেদ নিয়ে রচিত অধিকাংশ সাহিত্যে নারীকে সেই লোকগীতির মতো বিকৃত হয়ে যাওয়া পুরুষ (a man gone wonky) হিসেবে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ আদি নীল নকশা অনুসারে পুরুষের বিকৃত সংস্করণ হলো নারী। তারা (পুরুষ) আদর্শ (norm), আর নারীরা তা থেকে বিচ্যুত।[২১]

এটি একটি প্রচলিত পুং বিশ্বাস যে, নারী জগতের সকল সৌন্দর্যের আধার। এই ধরাধামে যা কিছু সুন্দর, সকলই তার অধিকারভুক্ত। যা কিছু অস্তিত্বশীল তা তাকেই সুন্দরী করবার জন্যে। সূর্য কিরণ দেয় কেবলি তার ত্বক ও চুল উজ্জ্বল করার জন্যে; বায়ু বয় তার কপোলের রং রক্তিমাভ করার জন্যে; সমুদ্র কল্লোল করে তাকে স্নান করাবার জন্যে; ফুলেরা সানন্দে মৃত্যুবরণ করে তার ত্বককে পরমানন্দ দেবার জন্যে; সে সৃষ্টির মুকুট, শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্ম। সমুদ্রগভীরে তন্ন তন্ন করে মুক্তো ও প্রবাল খোঁজা হয় তাকে সাজাবার জন্যে; ভূগর্ভ সর্বদাই উন্মুক্ত রাখা হয় তাকে ইচ্ছেমতো সোনা, নীলমনি, হীরে, মুক্তা পরাবার জন্যে। সীলশাবক

চূর্ণ করা হয়, অজাত মেষ মাতৃজরায়ু থেকে হিঁচড়ে বের করা হয়, লোমশ ছুঁচো, গন্ধমুষিক, কাঠবিড়ালী, নকুল, শেয়াল, বনবিড়ালের মতো ছোট্ট সুন্দর প্রাণীরা অকালমৃত্যু বরণ করে তাকে পশম দেবার জন্যে; সারস, উটপাখি এবং ময়ূর, প্রজাপতি এবং গুবরে পোকা তাকে তাদের পালক দেয়; জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুরুষরা চিতাবাঘ শিকার করে তার কোট বানাবার জন্যে এবং কুমির শিকার করে তার হাতব্যাগ আর জুতো বানাবার জন্যে।[২২] এই শৈল্পিক স্তাবকতা রোমান্টিক পুরুষের কল্পনায় নারীর অবস্থানের সাক্ষ্য দেয়। এই স্তব কল্পনানির্ভর, খেয়ালি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। চিত্রকর্মের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিক ও রোমকদের মধ্যে নারীচিত্রের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতের নমুনা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু রেনেসাঁস-পর্ব থেকে চিত্রকর্মে নারীচিত্র কর্তৃত্বময় হয়ে ওঠে। শিল্পীরা নিজেদের স্ত্রী ও প্রেয়সীদের কামুক সৌন্দর্য হিসেবে বস্ত্র খুলে কিন্তু অলঙ্কারাদি না খুলেই ছবি আঁকা শুরু করে।

প্রেয়সীর চিত্রকর্মে নারীর অবস্থার পুনরাবৃত্তি কবিতাতেও লক্ষণীয়। চুল তার স্বর্ণ, ভ্রূ গজদন্ত, ঠোঁট চুনি, দাঁত মুক্তোর দুয়ার, স্তন নীলকান্তমনি শিরাযুক্ত, আলাবাস্টার চোখ জেটসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ।[২৩] একটি কবিতায় দেখি :

I thought my mistress' hair were gold,
And in her locks my heart I fold,
Her amber tresses were the sight,
That wrapped me in vain delight.
Her ivory front, her pretty chin,
Were stales that drew me on to sin:
Her starry looks; her crystal eyes
Brighter than the sun's arise,

[Robert Greene, Francesco's Fortunes]

আরেকটি কবিতায় বলা হচ্ছে :

Her cheeks like apples which the sun has rudded,
Her lips like cherries charming men to bite,
Her breasts like a bowl of cream uncrudded. ...

[Edmund Spenser, Epithalamion][২৪]

নারী-স্তাবকতার অসংখ্য কামগন্ধী বর্ণনা পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় ও সাহিত্যিক উপাদানগুলোতে। ঋগ্বেদে প্রভাতদেবী উষার বিবরণ লক্ষণীয় : Handsome maiden, proud of her form / ... you, a young lady full of sweet smiles / shining brilliantly, you expose your breasts to the full view of the world. (Kunnan C. Raza. *The Quintessence of the Rig Veda*)। চতুর্থ শতকের মহাকবি কালিদাস তাঁর *কুমারসম্ভব* কাব্যগ্রন্থে রমণীয় যুগল ভরাট স্তন এবং গাঢ় চুচুকের সূক্ষ্ম ও শৈল্পিক বর্ণনা দিয়েছেন অসাধারণ উপমাসহযোগে মূলত নারী-স্তাবকতার শিল্পায়ন হিসেবেই : The pair of beautiful breasts, with their dark nipples in the centre, so close together, rubbing against each other, that even a fibre of a lotus flower cannot pass between tham. (Alka Pande, *Indian Erotica*)। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রাবণের সীতাস্তুতির বিবরণ পাওয়া যায়। পীতাভ কৌশিক বস্ত্রে শোভিতা, তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা সীতাকে দেখে কামান্ধ ছদ্মবেশী

রাবণ তার রূপপ্রশস্তিতে মেতে ওঠে : 'ত্রিভুবনে তোমার তুল্য সুন্দরী আর নেই। স্বকীয় অঙ্গদ্যুতিতে তুমি লক্ষ্মীর মতো শোভা পাচ্ছ। তুমি মূর্তিমতি লজ্জা, সৌন্দর্য, যশ, শ্রী, অপ্সরা, অনিমা-মহিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্যে ঋদ্ধ কিংবা তুমিই তো রতি। সুন্দরী! তোমার দন্তরাজি সমান, সুগঠিত, স্নিগ্ধ ও পাণ্ডুর। আয়ত তোমার চোখ দুটি, অপাঙ্গ রক্তাভ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ। স্থূল তোমার জঘনদেশ আর হাতিশুঁড়ের মতো তোমার সুপুষ্ট উরুদুটি। মনিময় আভরণ ভূষিত, পীনোন্নত, দৃঢ় তোমার স্তনযুগল তালের মতো বর্তুল এবং স্নিগ্ধ। সুস্মিতা মনোহারিণী, অপরূপ তোমার রূপলাবণ্য।'[২৫] মহাকবি কালিদাস তাঁর *কুমারসম্ভব* কাব্যের প্রথম সর্গে যৌবনবতী উমার রূপ বর্ণনা করেছেন এভাবে : যৌবনের আগমনে সৌষ্ঠবসম্পন্ন হলো উমার অঙ্গতট। বুকে পদ্মের মত ফুটে উঠল পীনোদ্ধত স্তনযুগল, নব তনিমায় বিকশিত হলো নয়নলোভন নিতম্ব, কটিতট হলো ক্ষীণ। তিনি যেন তুলির টানে আঁকা নিখুঁত ছবি। সূর্যকিরণে সদ্য ফোটা পদ্মের রমণীয়তায় উদ্ভাসিত তাঁর মায়াশরীর।[২৬] কালিদাস *শৃঙ্গারতিলকমে* নারীকে স্নিগ্ধ সরোবরের সঙ্গে তুলনা করেছেন : প্রেয়সীর বাহুলতা সুচারু সেই সরোবরের মৃণাল, তার শোভন মুখ যেন প্রস্ফুটিত পদ্ম, তার কান্তি যেন জল, তার সুদৃশ্য নিতম্ব যেন অবতরণের সুচিত্রিত সোপান, চঞ্চল নেত্রতারকা যেন চটুল পুঁটিমাছ, তার নিকষকালো কেশ-কলাপ যেন শৈবাল আর পীনোদ্ধত স্তনদুটি যেন চক্রবাক মিথুন।[২৭]

বাংলা কাব্যসাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার জুড়ে রয়েছে রাশি রাশি রমণীমোহন কবিতা। বাংলা কাব্যের প্রবাদপুরুষ রবীন্দ্রনাথও স্তাবকতার আতিশয্যে রক্তমাংসের রমণীকে স্বর্গের অপ্সরা বানিয়ে ছেড়েছেন। নজরুল তো তাঁর প্রেয়সীকে সাজাবার জন্যে সমগ্র মহাবিশ্ব থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল কালের সাহিত্যকর্মে কমবেশি নারীস্তুতি রয়েছে। আপাতত এর মধ্যে একধরনের সাহিত্যিক সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া গেলেও তা বস্তুত রেটোরিক। নারীর অপরিহার্য পরিচিতি এবং সামাজিক অবস্থান-নির্ণয়ে ধর্ম ও সমাজের মতো সাহিত্যও মূলত নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

ঐতিহ্যবাহী পুরুষ-বিশ্বাসমতে নারী-যৌনাঙ্গ রহস্যাবৃত। বিভিন্ন সময়ে ও সমাজে নারী-যৌনাঙ্গ নিয়ে গড়ে উঠেছে বহু 'জনপ্রিয়' পুরাণ, রচিত হয়েছে অনেক মুখরোচক গল্প। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, নারীর অধিকাংশ যৌন-অঙ্গ অভ্যন্তরীণ এবং গুপ্ত এবং যেগুলো বাহ্যিক তাও আবার তুলনামূলকভাবে ছায়াবৃত। নারীর রাগমোচনের (orgasm) বিষয়টি ক্রমাগত একটি রহস্যে পরিণত হচ্ছে। এখনো অনেক লোক নারীর বীর্যপাতের ধারণাটি বর্জন করতে অস্বীকার করে, যা আসলে সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বস্তুত নারী-জননেন্দ্রীয় সম্পর্কে বিনয়ের আংশিক নির্গত হয় প্রকৃত অরুচি থেকে। যে-নিকৃষ্টতম নামে কাউকে ডাকা যেতে পারে তা হলো 'কান্ট' (cunt)। কান্টের উৎকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্য হলো এর ক্ষুদ্রত্ব ও অপ্রগলভত্ব। প্রাচীন গাইনোকলজি পুরোপুরি ছিল পুরুষের হাতে, যাদের মধ্যে স্যামুয়েল কলিন্স যোনিকে এত আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন, যে-নারী একবার তা পড়েছে সে উৎফুল্ল হয়েছে। যোনিকে তিনি বলেছেন, ভেনাসের মন্দির (Temple of Venus) এবং ভেনাসের গদি (Venus's cushion)। কলিন্সের বিবরণ খুবই সক্রিয় : যোনি কথা বলে, নিক্ষেপ করে এবং তা আঁটসাট ও তেজস্বী।[২৮] ক্রিয়াশীল অবস্থায় নারী-যৌনাঙ্গের কোষগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁরা যে-

সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন তা অবৈজ্ঞানিক হলেও সুবিন্যস্ত এবং তথ্যবহুল। প্রসারিত অবস্থায় যোনিকে পূর্ণপ্রস্ফুটিত গোলাপের পাপড়ির মতো মনে হয়। যোনিকে একটি স্পর্শকাতর যৌনাঙ্গ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য ভগাঙ্কুর সম্পর্কে কলিঙ্গের ধারণা যথার্থ ছিল। রতিক্রিয়ায় পরমানন্দদানে ভগাঙ্কুরের ভূমিকার কথা তিনি নিশ্চিত জানতেন। অথচ, এই চরম স্পর্শকাতর ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গটি নিয়ে রচিত হয়েছে কতোই না রহস্য। সৃষ্টি হয়েছে নানান ট্যাবু। প্রাচীন মিশরীয়রা ভগাঙ্কুরকে অমাঙ্গলিক বিবেচনা করত। প্রসবকালে সন্তানের মাথার সঙ্গে এর ঘর্ষণ হলে সন্তানের অমঙ্গল হবে বিবেচনায় প্রাক্‌বিবাহকালেই মেয়েদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলত। বর্তমান মিশরে এই চরম অমানবিক প্রথা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ হলেও অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর প্রচলন আছে। শুধু প্রাচীন বা প্রাচীনপন্থীরাই নয়, আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডও ভগাঙ্কুরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। নারীবাদী দৃষ্টিতে পাঁড় প্রতিক্রিয়াশীল এই মনোবিজ্ঞানী ভগাঙ্কুরকে বিকৃতলিঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু তাই নয়, নারী-পুরুষ যৌন-সংস্কার নিয়ে ফ্রয়েডের ধারণা : দৃশ্যত কদাকার, অন্তর্মুখী ও গুপ্ত জননেন্দ্রিয় নিয়ে মেয়েরা মারাত্মক হীনমন্যতায় ভোগে এবং পুরুষেরা বর্হির্মুখী, সুদৃশ্য, প্রকাশ্য ও উত্থিত লিঙ্গকে ঈর্ষা করে। একে তিনি বলেছেন পেনিস-এনভি অর্থাৎ লিঙ্গ-ঈর্ষা বা শিশ্নাসূয়া। সুস্থ, স্বাভাবিক জননেন্দ্রিয় নিয়ে মেয়েদের দুশ্চিন্তায় ঈর্ষাকাতর হওয়ার যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ফ্রয়েড দিয়েছেন, তা বস্তুত লিঙ্গগর্বী এক দাম্ভিক পুরুষের স্বকপোলকল্পনা। জননেন্দ্রিয় তার অধিকারীর কাছে কতটুকু আকর্ষণীয় তার চেয়ে বহুগুণ বড় কথা হলো বিপরীত লিঙ্গের জাতকের কাছে তা কতটুকু আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। অধিকন্তু স্বীয় জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে পুরুষদের মনোবেদনাও কম নয়। অতএব, নারী-পুরুষের যৌনাঙ্গসমূহের কথিত উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা নিয়ে প্রকৃতিকে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট সাব্যস্ত করা মূর্খতা, কারণ প্রকৃতিগতভাবেই যৌনাঙ্গবিশেষের স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। কাজেই ফ্রয়েডীয় শিশ্নাসূয়ার ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক বিবেচনায় বাতিলযোগ্য।

এভাবে আদিকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত নারী-যৌনাঙ্গ নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য গল্প-কাহিনী ও তত্ত্ব, যার অধিকাংশই রহস্যাবৃত, অবৈজ্ঞানিক ও মনগড়া। এদিকে মানবজাতি বলতে মূলত পুরুষকে বোঝানো হয়েছে এবং নারীকে পুরুষ নারীর নিজের মতো করে ব্যাখ্যা না করে পুরুষনির্ভর করে ব্যাখ্যা করতে সততই তৎপর থেকেছে। নারী কোনো স্বয়ংক্রিয় সত্তা নয়, বরং পুরুষনির্ভর সাপেক্ষ সত্তা, এই বিশ্বাস পুরুষতন্ত্রের মজ্জাগত। মিশেল লিখেছেন : সাপেক্ষ সত্তা, নারী (woman, the relative being...) এবং বেন্দা তাঁর *Repport d' Uriel*-এ বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন : পুরুষের শরীর নারীর শরীরের সাহায্য ছাড়া আপনা থেকেই অর্থপূর্ণ, পক্ষান্তরে নারীশরীর নিজ থেকে গুরুত্বহীন। ...নারী ছাড়াই নিজেকে ভাবতে পারে পুরুষ, কিন্তু পুরুষ ছাড়া নারী নিজেকে ভাবতে পারে না। নারী হল : যা পুরুষ রায় দেয়, এভাবে নারী হয় লিঙ্গ (sex); অর্থাৎ পুরুষের কাছে নারী অপরিহার্যত একটি লৈঙ্গিক সত্তা, সম্পূর্ণ লিঙ্গ, তার কম কিছু নয়। পুরুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত নারী এক পরসত্তা, যা সংজ্ঞায়িত, ব্যাখ্যাত, আলোচিত, পৃথকীকৃত হয় পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র করেই, নিজেকে নয়। নারী হয় আনুষঙ্গিক, অনপরিহার্য; অপরিহার্যের (পুরুষ) বিপরীতে। পুরুষ হয় পরম কর্তা,

নারী 'অন্য' (Other)।[২৯] পুরুষ নিজেদেরকে 'আমরা' বলে আর নারীদের বলে 'নারীরা'। এদিকে নারীরাও আবার নিজেদেরকে 'আমরা' না বলে বলে 'নারীরা'। এভাবে একদিকে পুরুষদের প্রবল জাত্যাভিমান ও আত্মসচেতনতা, অন্যদিকে নারীদের অচেতন আনুগত্য 'আমরা-ওরা'র রাজনীতিকে বেগবান করে তুলছে। নারীরা পুরুষদের মতো আত্মগত ভূমিকা নেবার সাহস পাচ্ছে না। প্রলেতারিয়েত এবং নিগ্রোদের একই অবস্থা ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিবর্তনে তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন এনেছে। এখন তারা বুর্জোয়াদের ও সাদাদের 'অন্য' বলতে দ্বিধা করছে না। প্রলেতারিয়েতরা রাশিয়ায় বিপ্লব সাধন করেছে; নিগ্রোরা করেছে হাইতিতে; কিন্তু নারীদের প্রচেষ্টা একটি প্রতীকী-আন্দোলনের বেশি কিছু হয়ে উঠেনি। তারা কেবলমাত্র ততটুকুই পেয়েছে, যতটুকু পুরুষরা তাদের দিতে চেয়েছে। বস্তুত, তারা কিছুই অর্জন করেনি। কেবলমাত্র গ্রহণ করেছে।[৩০]

এর কারণ হিসেবে দেখানো যায় যে, নারীরা তাদের অবস্থানের ব্যাপারে সজাগ হয়নি, কিংবা অধিকারের প্রশ্নে সচেতন হয়নি, কিংবা তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েত কিংবা নিগ্রোদের মতো সংগঠিত হতে পারেনি। নারীদের নিজেদের কোনো অতীত নেই; কোনো ইতিহাস নেই; নেই কোনো ধর্ম। সকল ইতিহাস, সকল ধর্ম, সকল রাজনীতি পুরুষ-পুরুষানুক্রমে প্রবর্তিত ও বিবর্তিত। তাই সেখানে নারীর স্থান পরোক্ষ, গৌণ, অধস্তন, 'অন্য'। সুশৃঙ্খল বা বিশৃঙ্খল কোনোভাবেই নারী সংগঠিত হতে পারেনি। ছত্রভঙ্গ হয়ে থেকেছে পুরুষের ভেতরে। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন স্তরে পিতা কিংবা স্বামীর মতো কতিপয় পুরুষের ছত্রছায়ায় পরগাছা-জীবনযাপন করছে। বোভুয়া তাঁর *দ্বিতীয় লিঙ্গে* বড়োই আক্ষেপ করে বলেছেন : প্রলেতারিয়েতরা শোষকশ্রেণি নিধনের ঘোষণা দিতে পারে; যথেষ্ট উগ্রবাদী ইহুদি কিংবা নিগ্রোরা আণবিক বোমা হস্তগত করবার কিংবা সমগ্র মানবজাতিকে ইহুদিকরণ কিংবা কৃষ্ণাঙ্গীকরণ করবার স্বপ্ন দেখতে পারে; কিন্তু নারীরা পুরুষনিধনের স্বপ্নটুকু পর্যন্ত দেখতে পারে না। বস্তুত যে-শৃঙ্খলে নারীরা শৃঙ্খলিত, তার কোনো তুলনা নেই। লিঙ্গ-বিভাজন একটি জীববৈজ্ঞানিক ব্যাপার, অথচ অঙ্গব্যবচ্ছেদগত ও শারীরবৃত্তীয় তারতম্যের কারণেই নারীরা নারী থেকেছে; সমস্ত ইতিহাস ধরে পুরুষের অধীন থেকেছে। পরস্পরের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে একটি আদিম পৌরাণিক বৈষম্যের শৃঙ্খলের ভেতরে, যা নারীরা ভাঙতে পারেনি। লিঙ্গ-বিভাজন সমগ্র ইতিহাস ধরে নারী-পুরুষের মধ্যে যে-মানস-বিভাজনের জন্ম দিয়েছে, তা মর্মান্তিকভাবে নারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর। কিন্তু এই বিভাজন কি স্বাভাবিক, না সংগত?

অম্ফেল, মিডিয়া এবং সেবাইন রমণীদের উপাখ্যানে এবং অ্যারিস্টফেনিসের *লাইসিসট্রাটায়* নারীরোষ ও নারীদ্রোহের যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে নারীমুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। বাস্তবের নারী পুরুষের যৌনসঙ্গী, অঙ্কশায়িনী, প্রমোদসামগ্রী, জীবন্ত পুতুল কিংবা সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। বাস্তবে পুরুষ প্রভু, নারী দাসী। প্রভুর মনোরঞ্জনই দাসীর কর্তব্য। নারী-পুরুষের এই অবস্থান বরাবরই নারীকে নির্ভরশীল রেখেছে। এমনকি আজও নারী নানাভাবে মানসপ্রতিবন্ধী। যদিও হালে নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তিত হওয়া শুরু করেছে, তবু প্রায় কোথাও নারীর আইনগত অধিকার পুরুষের সমান নয়। কোথাও কখনো নারীর আইনগত

অধিকার স্বীকৃত হলে পুরানো প্রথা এসে তা বাস্তবায়নে বাদ সাধে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তো নারীকে প্রায় জাতিভেদের শিকার বলা যেতে পারে। অন্যান্য বিষয় সমান হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ উন্নততর চাকুরি পায়, অধিক পারিশ্রমিক পায় এবং বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পায়। শিল্প ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও পুরুষ একচেটিয়া আধিপত্য ভোগ করে। উপরন্তু সামাজিক অবস্থানের কারণে পুরুষরা একধরনের ঐতিহ্যিক সম্মান উপভোগ করে। বর্তমান সময়ে যখন নারীরা প্রায় সকল বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে, তখনো সার্বিক কর্তৃত্ব পুরুষের হাতেই ন্যস্ত থাকছে। 'অন্য' হতে অস্বীকার করলে নারীদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধায় ঘাটতি পড়তে পারে। সার্বভৌম পুরুষ অধীন নারীর বাস্তব তত্ত্বাবধায়ন করে থাকে এবং তাদের নৈতিক বিচারের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। তাই কোনোভাবেই আর নারীদের 'অন্য'ত্ব ঘোচে না। ১৮৮৮ সালে বাহাত্তর বছর বয়সে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদানকালে এলিজাবেথ ক্যাডিস্ট্যান্টন আক্ষেপে বলেছেন : অদ্যাবধি নারীরা পুরুষের প্রতিধ্বনি মাত্র। আমাদের আইন ও সংবিধান, আমাদের মতবিশ্বাস ও নীতিমালা এবং সামাজিক জীবনের রীতিনীতি, সবকিছুই পুংউৎসজাত। যথার্থ নারী আজও একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন।[৩১] আর বাস্তবের নারী পুরুষপ্রণীত পুরাণ।

২. রহস্যোন্মোচন ও মোহমুক্তি : নারীবাদের অভ্যুদয়

কিন্তু কেন এবং কীভাবে এই নারী অধস্তনতার সূচনা হয়েছিল? কেবলি কি এ-কারণে যে প্রকৃতিগতভাবে নারী দুর্বলতর; তার পেশিশক্তি কম; কম লোহিত কণিকা; ফুসফুসের ক্ষমতা কম; সে অপেক্ষাকৃত ধীরে দৌড়ায়; অপেক্ষাকৃত কম ভার বইতে পারে; কদাচিৎ পুরুষের সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে; কোনো যুদ্ধে সে পুরুষের সঙ্গে দাঁড়াতে পারে না। এই সকল দুর্বলতার যোগফলই কি তার নতজানু নিয়তির মূলকথা; তার নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণ? এজন্যেই কি নারী চিরবন্দিত্ব ভোগ করছে? অবশ্যই এই সকল বিষয়কে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কিন্তু বিষয়গুলোর নিজেদের ভেতরে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ পুরো বিষয়টিকে আমরা মানবিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতে চাই। শরীরকে ব্যাখ্যা করতে চাই অস্তিত্বের মূলভিত্তি হিসেবে। এক্ষেত্রে জীববিদ্যা একটি বিমূর্ত বিজ্ঞানে পরিণত হয়।[৩২] তাছাড়া পুরুষদের নিজেদের ভেতরেও তো পৈশিক সামর্থ্যের তারতম্য আছে। তাই বলে তা তো তাদের মধ্যেকার অবস্থান নির্ণয়ের নিয়ামক হচ্ছে না। তাছাড়া শরীরের নিয়ন্ত্রক যে-মস্তিষ্ক, তার উৎকর্ষে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো তারতম্য আছে বলে তো কোনো বৈজ্ঞানিক সনদ পাওয়া যায়নি। সর্বোপরি আধুনিক মানবাধিকারের যুগে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের শারীরিক সামর্থ্যহীনতাকে তার সম-অধিকারলাভের অন্তরায় মনে করা সম্পূর্ণ অমানবিক। তাই নারী অধস্তনতার কারণ খুঁজতে হবে সমাজব্যবস্থার অসম বিকাশের মাঝে। একথা সহজবোধ্য যে, লিঙ্গদ্বয়ের দ্বৈততা, যে-কোনো দ্বৈততার মতোই, দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল। আর সে-দ্বন্দ্বে সন্দেহাতীতভাবে বিজয়ীরাই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। কিন্তু কেন পুরুষ শুরু থেকেই বিজয়ী হয়েছিল? নারীও তো বিজয়ী হতে পারত; কিংবা দ্বন্দ্বের ফলাফল সর্বদাই অমীমাংসিত থাকতে পারত। এটি কী করে সম্ভব যে, এই বিশ্ব সর্বদাই পুরুষের অধিকারে থেকেছে! এর কি কোনো ব্যত্যয় হবে না? নারীর অবস্থানের কি কোনোই পরিবর্তন হয়নি?

হলে, সেই পরিবর্তন কি শুভ ইঙ্গিতবাহী? কিংবা তা কি বিশ্ব-অংশীদারিত্বে নর-নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করবে?

এই সকল জিজ্ঞাসা নতুন কিছু নয়, এবং এগুলোর জবাবও দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে। এই প্রশ্নোত্তরের বিবর্তনের ভেতর দিয়েই নারীবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে। নারীভাবনা নতুন মোড় নিয়েছে, নতুন মাত্রা পেয়েছে এবং পাচ্ছে। নারীর 'অন্যত্ব তত্ত্ব' (Woman is the other) এ-যাবৎ নারী-বিষয়ে পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট সকল বিচারের সকল রায়ের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে। প্রশ্ন তুলেছে পুরুষের চিরায়ত আধিপত্যের বিষয়ে। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে নরনারীর মনোদৈহিক সামর্থ্যের প্রশ্নে। সে-কারণে নতুন করে তদন্ত হয়েছে, অনুসন্ধান হয়েছে নারীবিষয়ক অজস্র রচনার, রাশি রাশি ভাবনার। নতুন ভাববস্তু ও আঙ্গিকে বিন্যস্ত হয়েছে, বিকশিত হয়েছে নারীবাদী ভাবনা। নারীদের নিয়ে লিখতে গিয়ে ইতোমধ্যে বহু কালি খরচ হয়েছে। তবু আজও বিদগ্ধজনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে : নারী পথ হারাচ্ছে, নারী হারিয়ে গেছে।[৩৩] শুধু তাই নয়, নারীকে নিয়ে ভাববারও নাকি কেউ নেই। বেগম রোকেয়ার হাহাকার শুনি : 'আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, আমি ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে জীব ভারতের নারী। এই জীবগুলির জন্য কাহারও কখনও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন...। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে। তাই যত্রতত্র পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই, কিন্তু আমাদের অবরোধ বন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূ-ভারতে নাই।'

অবশ্য এইসকল হতাশা অমূলক নয়। গ্রহের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা যেখানে নারী, সেখানে নর-নারীর সাম্যের প্রশ্ন এখনো নিরুত্তর। মার্কিন ঐতিহাসিক মেরি রিটার বেয়ার্ড (১৮৭৬-১৯৫৮) ১৯৩১ সালে প্রকাশিত *On Understanding Woman* গ্রন্থে বলেছেন : মানবিক বিষয়াবলি-সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে লিখিত ইতিহাস মানববিশ্বের অধিকাংশকে অবজ্ঞা করেছে। *The Decline of the West* গ্রন্থের লেখক অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার (১৮৮০-১৯৩৬) নারীকে ইতিহাস এবং পুরুষকে সেই ইতিহাসের নির্মাতা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মার্লো পন্টি বলেছেন : পুরুষ কোনো প্রাকৃতিক প্রজাতি নয়, পুরুষ একটি ঐতিহাসিক ধারণা। নারী কোনো পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতা নয়, বরং সংঘটন-শীল।[৩৪] সে-কারণে নারী-বিষয়ে পুরুষের সকল রচনা, সকল নির্মাণ পক্ষপাতপূলক হতে বাধ্য, হতে বাধ্য সন্দেহজনক। সতেরো শতকের স্বল্পখ্যাত নারীবাদী পোলেইন দ্য লা বেরি বিষয়টি এভাবে দেখেছেন : নারীদের নিয়ে পুরুষদের লেখা সব কিছুকেই সন্দেহ করা উচিত। কারণ, পুরুষরা যুগপৎ বিচারক ও মামলার পক্ষ।[৩৫] তিনি আরো বলেছেন যে, পুরুষ হিসেবে তারা আইন-প্রণয়নে নিজ লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছে এবং জুরিরা সকল আইনে বা নীতিতে পুরুষদের মহিমান্বিত করেছে। সর্বত্র এবং সর্বদা পুরুষরা এই ভেবে খুশি থেকেছে যে, তারা 'সৃষ্টির প্রভু'।[৩৬]

প্রাত্যহিক প্রাতঃপ্রার্থনায় ইহুদিরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাদের নারী হিসেবে সৃষ্টি না

করার জন্যে। অথচ তাদের স্ত্রীরা স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তাঁর ইচ্ছেমতো সৃষ্টি হয়েছে বলে। আইন-প্রণয়নকারী পাদরি, দার্শনিক, লেখক, কবি, বিজ্ঞানী সকলেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে নারীর অধস্তনতা স্বর্গে কাঙ্ক্ষিত এবং মর্ত্যে সুবিধাজনক। নারী-অবদমনে ধর্ম পুরুষতন্ত্রের ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ইভ ও প্যান্ডোরার উপাখ্যানে পুরুষকে নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে দেখা গেছে। পুরুষরা দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে নারীপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে দীর্ঘকাল। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যঙ্গনবিশ ও নীতিজ্ঞরা নারীদের দুর্বলতা-প্রদর্শনে আমোদ পেয়েছেন। সমস্ত ফরাসি সাহিত্যজুড়ে, অভিযোগ তুলেছেন সিমোন দ্য বোভুয়া, দেখা যায় নারীদের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত আদিম অভিযোগের ছড়াছড়ি। মঁতেঁ বলেছেন : একটি লিঙ্গকে অভিযুক্ত করা অন্যটিকে ক্ষমা করার চেয়ে সহজ। তিনি সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন যে, নারীর নির্ধারিত ভাগ্যের ধারণা কত বেশি খেয়ালি ও অসংগত ছিল। একজন যথার্থ নারীবাদীর মতো তাঁর যুক্তিতে স্বীকার করা হয় যে, নারীর জন্যে নির্ধারিত আইন মেনে চলতে যখন তারা অস্বীকার করে, তখন কোনোভাবেই তারা ভুল করে না। কারণ তাদের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই পুরুষরা ওইসকল আইন প্রণয়ন করেছে।

আঠারো শতকে খাঁটি গণতন্ত্রীরা নারীবিষয়ক প্রপঞ্চগুলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করা শুরু করেন। অন্যান্যের মধ্যে দিদেরো পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার কথা বলেন। পরে জন স্টুয়ার্ট মিলও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। বস্তুত তিনিই প্রথম পুরুষ যিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন নরনারীর সম-অধিকারের সমর্থনে *(The Subjection of Women)*। নারীদের মধ্যে প্রথম অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে আসেন অসীম সাহসিকতা আর ক্ষুরধার লেখনী নিয়ে ঐতিহাসিক মহীয়সী নারী মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট (১৭৫৯-১৭৯৭)। *A Vindication of the Rights of Woman* (১৭৯২) নারীবাদের প্রথম মহা ইশতিহার। এই অমর গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সফলভাবে নারী-অধিকারের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। এভাবে আঠারো শতকে নারীবাদী ভাবনার উন্মেষের পর উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবের পরিণতিস্বরূপ নারীরাও যখন উৎপাদন ও শ্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, নারীবাদী ভাবনা তখন আবারো বাধাগ্রস্ত হয়। উৎপাদনসম্পৃক্ত নারীরা পুরুষদের জন্যে যথার্থ ভীতি হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে তাদেরকে বলপূর্বক ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এমনকি শ্রমিকশ্রেণির ভেতরেও নারীরা মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে বলে তাদের মুক্তির উদ্যোগকে সংহত রাখার জোর চেষ্টা চালানো হয়, আরো এ-কারণে যে, নারী শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে শ্রম বেচতে অভ্যস্ত।

বিশ-শতকে নারীবাদ নতুন মাত্রায় উপস্থাপিত হয়। শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটেনে সাফরাজেটরা নারীর ভোটাধিকারের জন্যে যে-আন্দোলন শুরু করে, পরবর্তীকালে তা সামগ্রিক নারীবাদী আন্দোলনের ধারাকে প্রভাবান্বিত করে। এরই সূত্র ধরে কেতাদুরস্ত মধ্যবিত্ত নারীরা সংস্কারের জন্যে হইচই শুরু করে। ওদিকে আবার সাধারণ মধ্যবিত্ত মহিলারা বিপ্লবের ডাক দেয়। সাফরাজেটদের অনুসরণে অনেক নারীবাদী সংঘ-সংস্থা গড়ে ওঠে। বেটি ফ্রাইডানের National Organization for Women এইক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। মহিলা রাজনীতিবিদরা নারীস্বার্থের কথা বলে। কিন্তু তারা প্রায়শই সহজ ডিভোর্স এবং সকল প্রকার

ক্যাসানোভা সনদ (Casanova's Charters) —প্রতিরোধে পুরুষের অধীন নারীর স্বার্থের কথা বলে। মিসেস হানকিন্স হ্যালিনানের ছয় দফা গ্রুপ একটি শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক সত্তা। নারী-অধিকার-সংরক্ষণের প্রশ্নে জাগ্রত সংখ্যাগুলো দ্রুত প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন করে। প্রচার-মাধ্যমগুলো সপ্তাহে এমনকি প্রতিদিন নারী-স্বাধীনতার প্রচার ও প্রসারে তৎপর হয়। হঠাৎ করে সবাই যেন নারী-বিষয়ে আগ্রহী হয় যদিও তাদের অনেকেই আন্দোলনের পক্ষে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণীরা এসব আন্দোলনকে সমর্থন করে। শোষিত নারী শ্রমিকরা সরকারকে আটক করে মুক্তিপণ দাবি করার মতো সিদ্ধান্ত নিলেও আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, বরং আশ্চর্যের বিষয় এই ছিল, যে-সকল নারীর কোনো অভিযোগ আছে বলে মনে হয়নি, তাদেরকেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুঞ্জরণ করতে দেখা গেছে। সর্বোচ্চ মৌলিক ধারণাগুলো সানন্দে গৃহীত হয়েছে এবং সর্বাধিক কার্যকর সমালোচনা ও তীক্ষ্ণতর প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। এমনকি সাফরাজেটরাও তৃণমূল পর্যায়ের সমর্থন তেমনভাবে আদায় করতে পারেনি, যেমনটি দিনে দিনে আদায় করেছে নয়া নারীবাদী ভাবনা।

ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠ ভাবনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হলো এবং নারীরা বুঝতে শিখল যে, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির অজুহাতে দীর্ঘকাল ধরে যে তাদের মানস-প্রতিবন্ধী করে রাখা হয়েছে, তা অসংগত। বিভিন্ন গবেষণায় আবিষ্কৃত হলো যে, নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো মনো-দৈহিক তারতম্য নেই। নারী অধস্তনতার যে-যুক্তি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে তা মূলত গ্র্যান্ড ন্যারেটিভের আচ্ছাদনে মোড়া। সেই মোড়ক খুললেই রহস্য উন্মোচিত হলো এবং মোহমুক্ত হলো মানুষ নারী-পুরুষের আন্তঃসম্পর্কের ওপর রচিত সকল পুরাণ থেকে। দেখা গেল, নারী কখনোই কোনোকালেই নিকৃষ্ট ছিল না।

১৭৯৩ সালে প্যারিসিয়ান সোসাইটি অব রেভলিউশনারি রিপাবলিকান উইমেনে লা ফেমি মোনিক নাম্নী একজন দোকানদার-প্রদত্ত ভাষণ থেকে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত টানা যেতে পারে : মোজেসের যশুয়ার উত্তরাধিকারী সেই বিখ্যাত ডিবোরা থেকে শুরু করে যারা আমাদের প্রজাতন্ত্রের আর্মিতে চরম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল. ফ্রেই ভগ্নিদ্বয়, পর্যন্ত একটি শতাব্দীও পার হয়নি যা একজন নারীযোদ্ধা সৃষ্টি করেনি। দেখ, কীভাবে সিথিয়াঙ্গের রানি টমিরিস যুদ্ধ করে বৃহৎ সাইরাস জয় করে; ম্যারুলাস বালিকা স্টাইলিমিন থেকে তুর্কিদের ধাওয়া করে; জোয়ান অফ আর্ক কী করে ইংরেজদের তাঁর সামনে থেকে পালাতে বাধ্য করে এবং কী করে লজ্জার ভয় দেখিয়ে অর্লিয়েন্সের অবরোধ তুলিয়ে নেয় ... তোমার জন্যে ওইসকল সাহসিকা নারীর নামোল্লেখ ছাড়াও আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবো পৌরুষদীপ্ত যোদ্ধার মতো তেজোময় আমাজানের সেই কলোনির কথা, যার অস্তিত্ব মানুষের নারী-ঈর্ষার কারণে সংশয়ে নিপতিত হয়েছিল... এই সকল উদাহরণ কী প্রমাণ করে? যদি এটি না প্রমাণ করে যে, নারীরাও সেনাদল গঠন করতে পারে, তাদের নির্দেশ দিতে পারে, যুদ্ধের ঘোষণা দিতে পারে, মানুষকে জয়ও করতে পারে; যদি কোনো সংশয় অবশিষ্ট থাকে তবে আমি উল্লেখ করবো পান্তি, ইনগন্ডেড, ক্লটিল্ড, ইসাবেলা, মার্গারিট প্রমুখের নাম। কিন্তু আমি এখানেই থামবো না। আমি সেইসব লোককে বলবো যারা নিজেদের আমাদের প্রভু মনে করে : হলোফার্নদের জুলুম থেকে কে জুডা এবং সিরিয়াকে মুক্ত করেছিল? জুডিথ। রোম

তার স্বাধীনতা এবং প্রজাতন্ত্রের জন্যে কার কাছে ঋণী? দুজন নারীর কাছে। কারা তারা যারা স্পার্টানদের সাহসের সঙ্গে চূড়ান্ত শিক্ষা দিয়েছিল? মায়েরা এবং স্ত্রীরা... নারীরা যদি যুদ্ধের উপযুক্ত হয় তাহলে তারা সরকারের জন্যেও উপযুক্ত। তাদের মধ্যে কতজন যশের সঙ্গে শাসন করেছে? আমার একমাত্র সমস্যা হলো দৃষ্টান্ত-নির্বাচন নিয়ে। লম্বার্ডির রানি থিওডেলিন্ডা অগিলুল্‌ফকে হত করেছিলেন এবং ধর্মযুদ্ধগুলোর অবসান ঘটিয়েছিলেন, যেগুলো তার রাজত্বে জ্বলছিল। সবাই জানে যে, সেমিরামিস ক্যাবিনেটে ছিল একটি পায়রা এবং মাঠে ইগল। স্পেনের ইসাবেলা সাফল্যের সঙ্গে শাসন করেছে। এখানে আবারো একজন নারী যে এই নয়া পৃথিবীর আবিষ্কারকে সমর্থন করল। আমাদের সময়েও রাশিয়ার ক্যাথরিন তাই অর্জন করেছিল, পিটার কেবলমাত্র যার রূপরেখা দিয়েছিল...।[৩৭] রহস্য-উন্মোচন এবং মোহমুক্তির জন্যে এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

অবশ্য কেউ যে কখনো বিষয়গুলো বুঝতে পারেনি তা নয়। অনেকেই বুঝতে পেরেছে যে, নারী আসলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পুরুষের কল্পনার বিষয়মাত্র। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর *পরিবার ব্যক্তি-মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি* গ্রন্থে বলেছেন : আধুনিক পরিবার স্ত্রীর গোপন এবং প্রকাশ্য দাসত্বের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ... পরিবারের মধ্যে স্বামী বুর্জোয়া এবং স্ত্রী প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিত্ব করে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন : মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষের অর্জিত জ্ঞান জঘন্যভাবে অসম্পূর্ণ, অগভীর এবং এরকম হতেই থাকবে যতদিন না নারীরা নিজেরাই তাদের যা বলার তা বলতে পেরেছে।[৩৮] দ্য ল্যাক্লস *On the Education of Women* (১৭৮৩) গ্রন্থে আক্ষেপ করে নারীদের বলেছেন : ... একবার তোমাদের আগ্রহ দরকারি বিষয়ের দিকে ফেরাও এবং সেইসব সুযোগ-সুবিধার কথা ভাবো যা প্রকৃতি তোমাদেরকে দিয়েছে, কিন্তু সমাজ ছিনিয়ে নিয়েছে। এসো এবং শেখো কীভাবে তোমরা মানুষের সঙ্গী হিসেবে জন্মেছ এবং তার দাসী হয়েছ; ...কোনো উপায় নেই; অশুভরাই রীতি বনে গেছে।[৩৯] এলড্রিজ ক্লিভার তাঁর *The Allegory of the Black Eunuchs* গ্রন্থে বলেন : ...শ্বেতাঙ্গ পুরুষ শ্বেতাঙ্গ নারীকে দুর্বলচিত্ত, দুর্বলদেহী, মনোরম, চপলা বানিয়েছে, যৌনপাত্র বানিয়েছে, এবং তাকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে; সে আবার কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে শক্তিশালী আত্মনির্ভর আমাজনে পরিণত করেছে এবং তাকে রান্নাঘরে বসিয়েছে। ...শ্বেতাঙ্গ নিজেকে সর্বশক্তিমান শাসকে পরিণত করেছে এবং সামনের অফিসে বসিয়েছে।[৪০] ক্রিস্টিন বিলসনের *You Can Touch Me* গ্রন্থে নারী হিসেবে তার আহাজারি মর্মস্পর্শী : আমি প্রশংসিত কারণ আমি সব কাজ করি। রান্না করি, সেলাই করি, পোশাক বুনি, গল্প করি, কাজ করি এবং ভালোবাসি। তাই আমি একটি মূল্যবান বস্তু। আমাকে ছাড়া সে কষ্ট পাবে। তার সঙ্গে আমি একাকী বোধ করি। আমি অনন্তের মতো নিঃসঙ্গ এবং কখনো কখনো জমাটবদ্ধ মাখনের মতো নির্বোধ। হাঃ হাঃ হাঃ! চিন্তা করো না। কাজ করে যাও।[৪১]

সময় এসেছে এবার নারী-পুরুষের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়গুলো নতুন আঙ্গিকে ভেবে দেখবার। চলছেও সে-তৎপরতা, বিশ্বব্যাপী। মানবাধিকারের প্রভাবে জাগরণ এসেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। আর চিন্তক-ভাবুকরা করছেন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। উত্তরাধুনিক, উত্তর-কাঠামোবাদী ও বিনির্মাণবাদী সমালোচনার আঘাতে ভেঙে ফেলা হচ্ছে নারীর বিরুদ্ধে রচিত সকল

তথাকথিত মহান আখ্যান।[৪২] নারী-পুরুষের সম-অধিকারের স্লোগান এখন এক যুগনন্দিত স্লোগান। অ্যানা আনাস্তাসি যথার্থই বলেছেন : ...এটা সুস্পষ্ট যে, নারী-পুরুষের ব্যাপারে 'নিকৃষ্টতা' কিংবা 'উৎকৃষ্টতা' বলতে কিছু নেই, কেবলমাত্র তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্য ছাড়া। এই পার্থক্যগুলো আবার প্রধানত সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতানির্ভর উপাদানের ফসল। ...দলমতের ভেতরে না ফেলে আমাদের উচিত নারী ও পুরুষকে প্রাতিস্বিক হিসেবে বিবেচনা করা।[৪৩] অতএব, চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্যে, পরামর্শ দিয়েছেন বোভুয়া, প্রাকৃতিক পৃথকত্বের দ্বারা এবং তার মাধ্যমেই নারী-পুরুষরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করবে তাদের ভ্রাতৃত্ব।[৪৪] 'brotherhood' কিংবা 'sisterhood' শব্দ দুটি লিঙ্গান্তরবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে।

উল্লেখপঞ্জি

১. Beauvoir, Simone de. *The Second Sex.* Translated and edited by H. M. Parshley. London : Picador, 1988, পৃ ১৩।
২. Morgan, Elaine, *The Descent of Woman,* The Classical Study of Evolution. London : Souvenir Press Ltd., 1972, পৃ ৭।
৩. Beauvior, পৃ ১৬।
৪. প্রগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।
৭. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদনা), *ভারত ইতিহাসে নারী, কলিকাতা :* পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৮৯, পৃ ১৪।
৮. বেদব্যাস, *মহাভারত,* কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা ১৯৮৫।
৯. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী, পৃ ১৯।
১০. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্ম ও নারী, সেকাল ও একাল,* কলকাতা : এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ ১৬।
১১. বেদব্যাস, পৃ ১৭।
১২. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৭।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।
১৪. বেদব্যাস।
১৫. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ১৪৫।
১৬. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী, পৃ ২৯।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ১২।
১৮. প্রাগুক্ত।
১৯. বেদব্যাস, পৃ ১৪৮।
২০. Greer, Germain, *The Female Eunuch,* পৃ ২৫১।
২১. Morgan, Elaine, পৃ ৭।
২২. Greer, পৃ ৫৫।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩৭।

২৫. সুকান্ত সেনগুপ্ত (সম্পাদনা), *সংস্কৃত আদিরসের কাহিনী*, কলকাতা : গ্রন্থনা, ১৯৯৫, পৃ ১০।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৩০।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৪৩।

২৮. Greer, পৃ ৪০।

২৯. Beauvoir, পৃ ১৬।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫।

৩১. Schneir, Miriam (ed.), *The Vintage Book of Historical Feminism*, USA, Vintage, 1972, পৃ ২৮।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ ৬৬।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৩৮. Greer, পৃ ১৩।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ ১৬।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৯।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৪।

৪২. Wallach Scott, Joan (Ed.), *History of Feminism*, Oxford University Press, 1996, পৃ ২।

৪৩. Greer, পৃ ১০২।

৪৪. Beauvoir, পৃ ৭৪।

বঙ্গদেশে নারীভাবনা : উনিশ শতকের দর্পণ

আনিসুজ্জামান

১

পুরোনো বাংলা সাহিত্যের শেষ যোগ্য প্রতিনিধি মনে করা হয় ভারতচন্দ্র রায়কে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি অন্নদামঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন। তার মধ্যে তিনি কৌশলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যান। বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ধারা প্রচলিত হয়েছিল সংস্কৃত *চৌরপঞ্চাশিকা*-অবলম্বনে এবং বিদ্যার সঙ্গে সৌন্দর্যের সংযোগে যে পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে, তাই নাকি ছিল মূলের মর্মবাণী। আমাদের কবিরা এই রূপকতার ধার তেমন ধারেন নি। নরনারীর, বিশেষ করে বিবাহসম্পর্কের বাইরে, তাদের শারীরিক মিলনের বিস্তৃত বর্ণনাদানেই কবিরা আগ্রহী ছিলেন বেশি। এই আদিরসে কড়া পাক দিয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। তাই তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিল্পগুণের চেয়ে একরকম বাংলা কামসূত্ররূপেই *অন্নদামঙ্গল* আদৃত হয়েছিল। সংস্কৃত-অবলম্বনে ভারতচন্দ্র আরেকটি কাব্য লিখেছিলেন *রসমঞ্জরী* নামে। ইন্দ্রিয়বিলাসের রূপ ও রীতির ভিত্তিতে তাতে নরনারীর লক্ষণভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। প্রথার অনুসরণ করে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে বিদুষী ও সাধারণ নারীর কামভাব তো বর্ণিত হয়েছেই, ওই কাব্যের যে-অংশটি ভারতচন্দ্রের নিজের রচনা তাতেও গুরুত্ব পেয়েছে এই দিকটাই। আজকাল যেমন চাকরির আশায় বিদেশে গিয়ে অনেকে বিপদে পড়ে, ভারতচন্দ্রের দাসু-বাসু তেমনি প্রভু ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে দিল্লী গিয়ে রাজরোষে কারারুদ্ধ হয়েছিল। তখন দুঃখ করে দাসু করেছিল তাত্ত্বিক উক্তি :

নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তার বড় কেবা আছে দুখী।

আর বাসুর কথা ছিল একান্তই বাস্তবধর্মী :

মরি তাহে দুখ নাই নারী রৈল কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল একি ফাঁদে॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।

অবশ্য মুক্তিলাভের পরে সবার আগে ফিরে বাসু নিজের বাসনা পূর্ণ করেছিল। একটু হাঙ্গামায় পড়েছিলেন ভবানন্দ মজুমদার—তাঁর ছিল দুই স্ত্রী। তিনি বাড়ি ফিরতেই তাঁকে নিয়ে দুই সতীনে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, তাদের দাসীরাও এ প্রতিযোগিতায় যাঁর যার কর্ত্রীর পক্ষে যোগ দিল। ভারতচন্দ্র কৌতুক ও আক্ষেপ মিশ্রিত করে বলছেন :

এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥

এই কাব্যের অন্যত্র ভবানন্দ মজুমদারের কাছে সম্রাট জাহাঙ্গীর যেসব কারণে হিন্দুর নিন্দা

করেছেন, তার একটি হলো পরদার পাপজ্ঞান করে তারা বাঁদি রাখে না, আরেকটি হলো হিন্দু বিধবার বিয়ে দেয় না। ভারতচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, ভিন্ন অর্থে, মুসলমান মেয়েরা বহুবিবাহ করতে সমর্থ হয়—পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই তাঁর ঘেসেড়ানি এগারোবার স্বামী বদলে ফেলেছিল। ভবানন্দ মজুমদার অবশ্য এ-ধরণের আচরণকে—স্বামী ত্যাগ করে আরেকজনকে বিয়ে করা কিংবা বিধবার বিবাহ—নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্পষ্ট করে না বললেও, ভারতচন্দ্র যা আদর্শ বলে বিবেচনা করেছিলেন, তার পরিচয় আমরা পাই ভবানন্দের মৃত্যুতে তাঁর দুই পত্নীর সহমরণের বিবরণে। তবে সকলে সহমৃতা হতো না, হলে বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন উঠতো না।

এই নীতিবোধ ও নারীসম্পর্কিত ধারণা উনিশ শতকেও অনেকখানি বজায় ছিল। তার প্রমাণ সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহের অপ্রচলন এবং নারীকে ভোগ্যবস্তুরূপে দেখা। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর বিবরণ এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নববাবুবিলাস* (১৮২৫) থেকে দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) পর্যন্ত গ্রন্থের চিত্র বারাঙ্গনা-আসক্তির যে-সাক্ষ্য দেয়, তা ইংরেজ আমলের দান বলে চিহ্নিত হলেও এর অন্তর্নিহিত ভোগপিপাসা ভারতচন্দ্রের কালের চেয়ে পৃথক নয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে উর্দু *তম্বিয়াতুন্নেসা*-অবলম্বনে গরিবুল্লা লিখেছিলেন *ঈমানদার নেকবিবির কেচ্ছা*। তাতে তিনি সংযোজন করেছিলেন 'কলিকালের আওরতের বয়ান'। তাঁর ধারণা, একালের মেয়েরা কেবল পতিনিন্দা করে আর পেটে কথা রাখতে পারে না, তাই তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়!

আবার এইসব প্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল উনিশ শতকেই। তার মধ্যে ছিল সরাসরি ইংরেজদের মনোভাব, ছিল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রভাবিত বাঙালির চেতনা, আবার একথাও সত্যি যে, প্রতিবাদের অনেকখানি এসেছিল নিতান্তই প্রাচীন প্রাচ্যশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

২

ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল*-রচনার কুড়ি বছরের মাথায় আলেকজাণ্ডার ডাউ লিখেছিলেন *The History of Hindostan* (১৭৭২)। তাতে তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সহমরণের মতো অমানবিক প্রথা কিছুতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে শতাধিক বিবাহিত এক ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁর ৩৭ জন বিধবা সহমৃতা হন এবং কার্যসমাধা হতে তিন দিন ধরে চিতা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। উইলিয়ম কেরী ১৮০২ সালে এ প্রথাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে আখ্যা দেন এবং তাঁর মিশনের সদস্যেরা ১৮০৩ ও ১৮০৪ সালে কলকাতার আশেপাশে সংঘটিত সতীদাহের তথ্য সংগ্রহ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দিয়ে সতীদাহ্-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান-সংকলন করিয়ে কেরী তা নীলকর উডনির মারফত লর্ড ওয়েলেসলিকে পাঠিয়ে দেন। পণ্ডিতেরা কী বলেছিলেন, তা জানা যায় না। ১৮০৫ সালে নিজামত আদালতের অধ্যক্ষের কাছে ওয়েলেসলি জানতে চান, সহমরণ সম্পর্কে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান কী। সে মত জ্ঞাপনের ভার পড়ে বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্র এবং ওই আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মার ওপরে। তিনি শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন। শাস্ত্র-অনুযায়ী কখন সহমৃতা

হওয়া যায়, কখন হওয়া যায় না, সহমৃতা হবার সংকল্পের পরও যদি কেউ মত বদলায় তবে তার কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, এইসব। অনেকে বলেন, সহমরণে যে ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রের নিষেধ আছে, সেকথা হুগলির এই পণ্ডিতই প্রথম সর্বসমক্ষে উত্থাপন করেন। ১৮১৭ সালে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সহমরণ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় মতের সংকলন ও ব্যাখ্যা করেন। সংস্কৃতভাষায় রচিত তাঁর প্রতিবেদনের যে ইংরেজি সার পাওয়া যায়, তার মর্মার্থ এই যে, চিতারোহণ অপরিহার্য নয়, ইচ্ছাধীন; সহমরণ ও শুদ্ধ জীবনযাপন দুই শাস্ত্রসিদ্ধ, তবে শেষেরটিই শ্রেয়। 'Hence I regard a woman's burning herself as an unworthy act and a life of abstinence and chastity as highly excellent. ...In the Shastras appear many prohibitions of a woman's dying with her husband, but against a life of abstinence and chastity there is no prohibition.'

১৮১৮ সালে প্রকাশিত *সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ* পুস্তিকায় রামমোহন রায়, মনে হয়, মৃত্যুঞ্জয়ের অনেক যুক্তিপ্রমাণ গ্রহণ করেছিলেন। এর উত্তরে প্রসিদ্ধ ধনী ও দাতা গুরুপ্রসাদ বসুর পুত্র কালাচাঁদ বসু কাশীনাথ কর্তবাগীশকে দিয়ে লেখান *বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ* (১৮১৯)। একই বছরে রামমোহন প্রকাশ করেন *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ*। কাশীনাথের উদ্ধৃত কোনো কোনো শাস্ত্রবচন রামমোহন প্রথম পুস্তকেই প্রবর্ত্তকের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন। যেমন, সহমরণে গেলে মানুষের শরীরে যত লোম আছে তত বছর, অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি বছর, সতীর স্বর্গবাস হয় এবং সাপুড়ে যেমন নিজের শক্তিতে গর্ত থেকে সাপ বের করে আনে, তেমনি সতী নিজের বলে স্বামীকে উদ্ধার করে তার সঙ্গে সুখভোগ করে। তাছাড়া কিছু লৌকিক বিবেচনা, যেমন, বিধবার ব্যভিচারের সম্ভাবনা অধিক, এসব কথাও তিনি প্রবর্ত্তককে দিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন। শাস্ত্রীয় বিতর্কের বাইরে, অর্থাৎ লৌকিক বিবেচনার ক্ষেত্রে, রামমোহনের কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য : ভাবি আশঙ্কা দূর করার জন্য এমন ব্যবস্থা অমানবিক; ব্যভিচারের আশঙ্কা পতিবর্তমানেও থাকে, বিশেষ করে যার পতি প্রবাসী তার ক্ষেত্রে; বাংলাদেশের বাইরে বন্ধনাদি দ্বারা সতীদাহ কোথাও প্রচলিত নয়, বাল্যকালাবধি পশুহত্যা দেখার ফলে তাদের মরণকালীন কাতরতা যেমন শাক্তদের চিত্ত স্পর্শ করে না, তেমনি দেখতে অভ্যস্ত হওয়ার সতীর মৃত্যুকালীন আর্তনাদ আমাদের দয়ার উদ্রেক করে না। স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্মজ্ঞানশূন্য হয়, এই অভিযোগের উত্তরে রামমোহন দ্বিতীয় পুস্তকে বলেন :

> প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?....
>
> দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক

অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিতে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিত হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না।...

চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক ২ পুরুষের প্রায় দুই তিন শত বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য তাহার অনুষ্ঠান করে।

পঞ্চম তাহারদের ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা, দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।... বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন ২ নিয়মিত কালে করে, ...ঐ রন্ধনে ও পরিবেষনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি ২ তিরস্কার না করেন; ... স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্র মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; ... দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।

রামমোহনের প্রতিপক্ষেরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, প্রচলিত দেশাচার, সতীর ইচ্ছা, পারলৌকিক লাভ এবং বিধবাবস্থায় ব্যভিচারের আশঙ্কার ওপরেই জোর দিয়েছিলেন বেশি। তাঁদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা সে-শিক্ষার অনুরাগীও ছিলেন। তবু প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা সরে আসতে পারেন নি। *রামারঞ্জিকায়* (১৮৬০), সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়ে যাবার অতকাল পরে, প্যারীচাঁদ মিত্র সহমরণের বিষয়ে যে গৌরব প্রকাশ করেছেন তা তারই পরিচয় বহন করে।

৩

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক স্ত্রীই স্বেচ্ছায় সতী হতে চাইতেন। আত্মীয়দের প্ররোচনা ও বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত যেমন আছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বয়স হবার আগেই সতী হবার উদাহরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সহমৃতা হবার নিদর্শন কিছু কম ছিল না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, শাস্ত্রানুযায়ী অসতীদের সহমরণের অধিকার ছিল না; সহমৃতা হতে চাইবার এও ছিল এক কারণ। সহমরণের সিদ্ধান্তগ্রহণের পশ্চাতে কেউ দেখেছেন নারীমনের দুর্জ্ঞেয় জটিলতা, কেউ দেখেছেন পারলৌকিক পুরস্কারলাভের অনিবার্য আগ্রহ; তবে একথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হিন্দুবিধবার জীবন ছিল দুঃসহ। যে-শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা তার জন্যে অপেক্ষিত ছিল, তা সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুই অনেকে শ্রেয় বিবেচনা করতেন।

সতীদাহ প্রথা ১৯২৯ সালে আইনগত নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় বিধবাদের—কিংবা বলা যায়, বিধবাবিবাহের—প্রশ্নটা সামনে চলে এলো। তার মানে এই নয় যে, এ বিষয়ে আগে চিন্তা হয় নি। আঠারো শতকের শেষ দিকে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ সেন নিজের মেয়ের বৈধব্যযন্ত্রণা দেখে বিচলিত হয়ে বিধবাবিবাহ-প্রচলনের অভিপ্রায় নিয়ে পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্রীয় বিধান চেয়েছিলেন। তিনি নানা অঞ্চলের পণ্ডিতের অনুকূল মত লাভ করলেও নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কূটকৌশলের ফলে সেখানকার পণ্ডিতেরা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকার করেও আচারবিরুদ্ধ বলে এর প্রচলনে মত দেন নি। উনিশ শতকে আবার নবদ্বীপেরই আরেক রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় যখন বিধবাবিবাহ-প্রচলনে ইচ্ছুক হন, তখনো ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। অন্যদিকে রামমোহনের আত্মীয়-সভার সদস্যেরা বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য নিয়ে আলোচনা এবং ইয়ং বেঙ্গলের তরুণেরা বিধবাবিবাহ নিয়ে রীতিমতো লেখালেখি শুরু করে দেন। ১৮৩৭ সালে ভারতীয় ল কমিশন বিধবাবিবাহের অনুকূলে আইনপাশের বিষয়ে কলকাতা, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের সদর দেওয়ানি আদালতের বিচাবকদের পরামর্শ চান। মানবিক কারণে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিধবাবিবাহের আইন করার উদ্‌যোগ নিলে হিন্দু সমাজকে আঘাত দেওয়া হবে। ১৮৪২ সালে ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র *বেঙ্গল স্পেক্টেটর* বিধবাবিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করার পর এ-বিষয়ে আইন প্রণয়নের এবং স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবকদের কর্তব্যকর্মে সাহসের দ্বারা তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। এ নিয়ে *সংবাদ প্রভাকরের* সঙ্গে তাঁদের তর্কযুদ্ধ লেগে যায়। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সহমরণের পক্ষে থাকলেও ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে বিধবাবিবাহের পক্ষে মত দিয়েছিলেন; অন্যদিকে ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে রামজয় শর্মার *বিধবাবিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা* পুস্তিকায় তিনি এবং আরো এগারোজন পণ্ডিত পুনর্বিবাহে স্ত্রীলোক বধার্হা হয়, এমন বিধান দিয়েছিলেন। এই পটভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-আন্দোলন গড়ে তোলেন ১৮৫৫ সালে।

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যেমন শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া হতো, তেমনি দেশাচারের দৃঢ়ভিত্তি ও পারিবারিক মর্যাদার বিষয় বারংবার উল্লিখিত হতো। তাছাড়া অনেকেই মনে করতেন যে, বৈধব্য পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল। সুতরাং যে একবার বিধবা হয়, পূর্বজন্মকৃত সেই পাপের

ফলে, তার আবারও বিধবা হওয়ার কথা। এ ক্ষেত্রে এক মেয়ের কতবার বিয়ে হবে? প্রথমবার বিয়ের সময়ে একবার তাকে দান করা হয়ে গেছে, পুনর্বিবাহের সময়ে তাকে দান করার অধিকার কার? হিন্দুনারীর বিবাহ যেহেতু ইহকাল ও পরকালের বন্ধনস্বরূপ, হিন্দুবিধবার আবার বিয়ে হলে পরলোকে তার দুই স্বামী যখন তার দু হাত ধরে টানবে, সে যাবে কার সঙ্গে? তাছাড়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত হলে স্ত্রীরা স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করবে না এবং অপছন্দের স্বামীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করতে উদ্‌যোগী হবে। বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ও বিরোধী উভয় পক্ষই দাবি করতেন যে, পুরুষের তুলনায় মেয়েদের রিপু প্রবল—*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* বিচারে পুরুষের চেয়ে আটগুণ বেশি— এবং এই স্বতঃসিদ্ধটি উভয় পক্ষই নিজের নিজের বক্তব্যের পক্ষে ব্যবহার করেছেন। আরো একটি কথা। বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীদের মধ্যে অনেকে কেবল বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহ প্রশ্নে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শাস্ত্রবিচার করেছিলেন। যে-পরাশরবচনের ভিত্তিতে তিনি বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে দাবি করেছিলেন, কেউ কেউ বলেন, তা তিনিই প্রথম খুঁজে বার করেন নি। এ কথা কতদূর সত্য, বলা মুশকিল। তবে এটা সুস্পষ্টই দেখা যায় যে, ওই বচন উদ্ধৃত করার পরও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের অসামান্য কীর্তি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ইহজাগতিকতা। কেন তিনি শাস্ত্রাশ্রয়ী যুক্তি দিচ্ছেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবে* (১৮৫৫) বলেছেন :

> অতএব, বিধবাবিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি না, অগ্রে ইহার মীমাংসা করা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহাকে কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই তাঁহারা কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এ দেশে শাস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

যে মূঢ় দেশে যুক্তির চেয়ে শাস্ত্র বড়, প্রেরণার চাইতে আদেশ বড়, সেখানে শাস্ত্রবিচার না করে উপায় নেই। উপরিউক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তকে (১৮৫৫) বিদ্যাসাগর সেইসঙ্গে যোগ করেছেন যে, এ দেশে দেশাচার শাস্ত্রের চেয়েও বড়, তারই প্রভাবে অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলে মান্য হয়। তাই আক্ষেপ করে বলেছেন, 'হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার: কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ হয়, তা তুমিই জান!' তারপর তিনি পুরুষদের তিরস্কার করেছেন আর মেয়েদের জন্যে করেছেন আক্ষেপ :

> তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে! ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে সংসারতরুর

> কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ! হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্ম গ্রহণ না করে!
>
> হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!

বিদ্যাসাগর শুধু লিখে ক্ষান্ত হন নি, তিনি আন্দোলন করেছেন, সরকারকে দিয়ে আইন পাশ করিয়েছেন, এজন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন এবং বিধবাবিবাহ দিয়ে পাত্রপাত্রীর ভরণ-পোষণের ভার নিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। পরে দুঃখ করে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন : 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।' তাঁর দুঃখবোধের এক কারণ ছিল এই যে, বিধবাবিবাহের জন্যে মাসিক ও এককালীন অর্থসাহায্য করবেন বলে যাঁরা প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই পরে কথা রাখেন নি। তাছাড়া বিদ্যাসাগর আবিষ্কার করেন যে, কেউ কেউ বিধবাবিবাহের নামে বহুবিবাহ করে বসছেন। কখনো কখনো বিধবাবিবাহের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর কোনো পাঠক পত্রিকায় পত্র প্রেরণ করে পাত্রের প্রথম স্ত্রীর নামধাম প্রকাশ করে দিতেন। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর স্ট্যাম্পের কাগজে এক চুক্তিপত্র তৈরি করে তাতে পাত্রের স্বাক্ষর গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্তন করেন; এতে পত্নীর ভরণপোষণ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারদানের অঙ্গীকারের পাশাপাশি অন্য স্ত্রীগ্রহণের জন্যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল।

একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও, উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ সহজে ও সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয় নি। পৌত্র বলেন্দ্রনাথের কিশোরী বিধবা সাহানা দেবীর পুনর্বিবাহের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে পিতৃগৃহ থেকে নিজের কাছে আনিয়ে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পুত্রের বিয়ে দিয়েছিলেন বিধবার সঙ্গে, কিন্তু সে মহর্ষির মৃত্যুর পরে। সমাজ-সংস্কারের ঝোঁক যাঁদের ছিল, বিশেষ করে, ব্রাহ্ম সমাজের তরুণেরা, এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮৮০র দশকের শেষেও দেখা যাচ্ছে যে, বাড়ির কড়াকড়ি সহ্য করতে না পেরে বিধবা কন্যা আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ায় পিতা তার নামে অলংকার-চুরির মামলা করেছেন; একই সময়ে দেখা যায়, বিবাহে ইচ্ছুক বিধবা ক্ষতযোনি না অক্ষতযোনি, তার বিচার চলছে।

উনিশ শতকের শেষদিকে মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ *বিধবাগঞ্জনা* নামে একটি বই লিখেছিলেন, খুব সম্ভব আলতাফ হোসেন হালীর *মুনাজাত-ই-বেওয়া* নামে উর্দু কাব্যের প্রেরণায়। তাতে যে হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহের সুপারিশ করা হয়েছে, তার কারণ এই পটভূমিতে বোধগম্য হয়। মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহের অপ্রচলনের নিন্দাও তিনি করেছিলেন। বস্তুত সৈয়দ আহমদ বেরিলভী যে সমাজ সংস্কার-আন্দোলন শুধু করেছিলেন—তারিকা-ই-মুহম্মদীয়া বা ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলন নামে তা পরিচিত—তাতে প্রথম থেকেই বিধবাবিবাহের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সৈয়দ আহমদ বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে নিজেই বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর মতবাদ ব্যাখ্যা করে লেখা শাহ ইসমাইল-সংকলিত *সিরাত-উল-মুস্তাকীমে* বিধবার পুনর্বিবাহ

প্রায় বাধ্যতামূলক করে তোলার বিধান আছে। শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তা কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল, সে-বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

তবে সামাজিক সম্মান লাভ করতে বিধবাদের অনেক সময় লেগেছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় তো বিধবামাত্রকে ভ্রষ্টা মনে করা হতো। তাই রাঁড় শব্দ মূলে বিধবা বোঝালেও তা একই সঙ্গে বেশ্যা অর্থেও প্রচলিত হয়েছিল। বিধবাবিবাহের সমর্থকদেরও একটা বড় যুক্তি ছিল যে, এতে বিধবার ব্যভিচারপরায়ণতা দূর হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষে* (১৮৭৩) লম্পট দেবেন্দ্র যে ছদ্মবেশে বিধবা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সে ওই আশায় যে কুন্দ যখন বিধবা তখন সে ধরা দেবে। *কৃষ্ণকান্তের উইলেও* (১৮৭৮) হরলাল বিয়ের লোভ দেখিয়ে রোহিণীকে উইল চুরি করতে বলছিল; সেও এ ভরসায় যে বিধবার পক্ষে এমন লোভনীয় প্রস্তাব ত্যাগ করা সহজ হবে না। এমন কি, শতাব্দীর শেষে মীর মশাররফ হোসেন *গাজী মিয়াঁর বস্তানী* (১৮৯৯) লিখলেন বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা চৌধুরীকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে; বইয়ে বেগম পয়জারুন্নেসা বিধবা বলেই চরিত্রহীনা হবার সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। ওই বইয়ের আরেক লম্পট-চরিত্র সবলোট আলীকে ভেড়ুয়া খাঁ শয্যাসঙ্গিনী সরবরাহ করতো। একদিন যখন সে শূন্যহাতে ফিরে এলো, জমিদার তখন ভেড়ুয়া খাঁর খালার কথা জিজ্ঞাসা করে জানলো যে, দুই ছেলে নিয়ে খালার জামাতা এসে পড়ায় তার পক্ষে ঘরের বার হওয়া দুষ্কর। সবলোট আলী রাগ করে হুকুম দিলেন, 'যা বেটা, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আন।'

৪

বিধবাবিবাহ-প্রসঙ্গে বারবার করে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কথা উঠেছে। বাল্যবিবাহ পুরোনো প্রথা, বেশ ভালোভাবেই চলছিল। অষ্টম বর্ষে গৌরীদান, নবম বর্ষে পৃথ্বীদান ও দশম বর্ষে পবিত্রলোকপ্রাপ্তি—এতরকম পুণ্যসঞ্চয়ের সুযোগ কম জনেই হাতছাড়া করতে চাইতেন। অন্যপক্ষে পিতৃগৃহে অনূঢ়া কন্যা বয়স্ক অবস্থায় উপনীত হলে তা পাপ বলে গণ্য হতো এবং তার পিতামাতার নরকবাস নিশ্চিত বলে বিবেচনা করা হতো। রামমোহন রায়ের যখন আট বছর বয়স, তখন তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তারপর এক বছরের মধ্যে তাঁর পিতা তাঁর আরো দুই বিয়ে দিয়ে দেন। বিদ্যাসাগর চোদ্দ বছর বয়সে আট বছরের মেয়ে বিয়ে করেন। বিয়ের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ছিল দশ, পাত্রীর পাঁচ; এই স্ত্রীর মৃত্যুতে ২২ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র আবার বিয়ে করেছিলেন, এবারে কনের বয়স বারো। ততদিনে অবশ্য বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। মুসলমান সমাজের একটি উদাহরণ পাওয়া যায় এস. ওয়াজেদ আলির জীবনে : তিনি সাত বছর বয়সে আড়াই বছর বয়সের চাচাতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন।

বিধবাদের সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল, বাল্যবিবাহ বৈধব্যের পথ সুগম করছে। ইয়ং বেঙ্গল দল বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে কাগজপত্রে লেখালেখি শুরু করেন। তাঁদের *সর্ব্বশুভকরী পত্রিকায়* ১৮৫০ সালে 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন বিদ্যাসাগর। তাতে তিনি বলেন, 'মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল'। কথাটা বাঙালি

পাঠকের কাছে নিশ্চয় নতুন শুনিয়েছিল, কেননা প্রণয় বলতে আমরা চিরকাল শরীরের ঐক্য বুঝেছি। ওই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর দেখিয়েছিলেন যে, শারীরতত্ত্বের দিক দিয়েও বাল্যবিবাহ অসংগত। শিক্ষিত সমাজেও অবশ্য বাল্যবিবাহ্ সম্পর্কে তর্ক ছিল, কিন্তু এর বিরুদ্ধপক্ষই ছিলেন প্রবল। তাই আইন করে মেয়েদের জন্যে সহবাস-সম্মতির বয়স ১৮৬০ সালে দশ বছর ও ১৮৯১ বারো বছর বলে স্থির করা হয়। ১৮৯১-এর আইন করার সময়ে সরকার বিদ্যাসাগরের মত জানতে চাইলে তিনি লিখেছিলেন, 'I should like the measure to be so framed as to give something like an adequate protection to child-wives without in any way conflicting with any religious usage.'

আইন করে সমাজ-সংস্কারে তাঁর উৎসাহ ততদিনে কমে এসেছিল। বিধবাবিবাহ-প্রচলনের ক্ষেত্রে তাঁর মনের দুঃখের কথা আগে বলেছি; বহুবিবাহ রহিত করে আইন প্রণয়নের আন্দোলনের ব্যর্থতাও হয়তো তাঁকে হতোদ্যম করেছিল। কিন্তু মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে ধর্মীয় প্রচলনকে আঘাত না করার এই মনোভাব কেন তাঁর মধ্যে জেগেছিল, তা বলা কঠিন। কেননা সামাজিক প্রথাই কালক্রমে ধর্মীয় প্রচলনের রূপ নিতে চায়। কৌলীন্য প্রথার সামাজিক ভিত্তি বহুবিবাহ টিকিয়ে রেখেছিল। কুলীনরা স্পষ্টই বলতেন যে, কুলীনের বহুবিবাহ শাস্ত্রে আছে, সুতরাং এটা কেবল সামাজিক নয়, ধর্মীয় ব্যবস্থা। শাস্ত্রানুযায়ী কুলীনকে স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে হয় না, যে সামর্থ্য তার কখনোই হবার কথা নয়, বরঞ্চ শ্বশুরবাড়ি থেকে যা পাওয়া যায়, তা দিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। স্ত্রীর ভরণপোষণের সামর্থ্য কুলীনের হবেই বা কী করে, তাঁর স্ত্রী তো একটা নয়। রামমোহন ঢালাওভাবে বলেছিলেন, কোনো কোনো পুরুষ দু-তিন শর অধিক বিয়ে করে থাকেন; যাঁরা গুণে দেখেছিলেন, তাঁদের মতে, ৩৬০টির বেশি বিয়ে করেছেন, এমন পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সুতরাং কুলীনের স্ত্রীরা পিতাভ্রাতার গলগ্রহ হয়ে থাকতো, দাসীবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতো, কখনো কখনো পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতেও বাধ্য হতো।

ব্যভিচারের কথা কুলীনের স্ত্রী সম্পর্কেও খুব প্রচলিত ছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকে* (১৮৫৪) কুলীন অধর্ম্মবণিক তার পিতা বিবাহবণিককে এসে অধোমুখে খবর দিচ্ছে যে, তার কোনো এক শ্বশুরবাড়ি থেকে তার কন্যা জন্মগ্রহণের সংবাদ এবং সেই কন্যার অন্নপ্রাশনে উপস্থিত হওয়ার নিমন্ত্রণ এসেছে। বিবাহবণিকের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো : 'আ-হা! কন্যা হ'লো! পুত্র সন্তান হ'লে ভাল হ'তো।' অধর্ম্মরুচি তখন ভেঙে বললো : 'কি বলবো বাবা, লজ্জা হয়; সে দেশে প্রায় তিন বছর যাই নাই, তাই বলি—মেয়েটা হ'লো!' বিবাহবণিক তখন উচ্চহাস্য করে বললেন : 'বাপু হে! তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি?...' এই নাটকেই আরেকটি ঘটনা আছে— তা হাসির কি করুণ নির্ণয় করা কঠিন। কন্যাদায়গ্রস্ত কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বহুকাল পর এক পাত্র খুঁজে পেলেন তখন তিনি স্থির করলেন ওই একজনের হাতেই তাঁর চার কন্যা সমর্পণ করবেন। বড় মেয়েটির বয়স এতই বেশি হয়ে গেছে যে, বিয়ে নিয়ে তার কোনো কৌতূহলই আর অবশিষ্ট নেই; ছোট মেয়ে এতই ছোট যে বিয়ে কাকে বলে তা

জানে না—বিয়ের দিনে যথারীতি খেলতে চলে গেছে। মা যখন তাকে ধরিয়ে এনে বললেন, আজ তার কোথাও বেরোনো চলবে না, কেননা আজ তার বিয়ের দিন। সে তখন বিস্মিত হয়ে বললো, সে তো জানতো আজ তার দিদিদের বিয়ে। মা বলে দিলেন, হ্যাঁ, দিদিদেরও, তারও। তখন সে মাকে জিজ্ঞাসা করল : 'মা, তোরও?' অর্থাৎ ছোট মেয়েটির ধারণা হয়েছিল যে, বাড়িতে যত স্ত্রীলোক আছে, সকলেরই বোধহয় একসঙ্গে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গলেরাই আন্দোলন শুরু করেন ১৮৩০এর দশকে। তখন তাঁদের প্রতিপক্ষরূপে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, বহুবিবাহ এখন আর তেমন প্রচলিত নেই। এর জবাবে ১৮৩৬ সালে *জ্ঞানান্বেষণ* পত্রিকায় ৬২ থেকে আটবার বিয়ে করেছেন, এমন কুলীনদের একটা তালিকা প্রকাশ করে দেওয়া হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের যত্নে প্রকাশিত স্বল্পায়ু *বিদ্যাদর্শন* পত্রিকাও ১৮৪২ সালে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৮৫৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি, কিশোরীচাঁদ ও অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক; সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও গৌরদাস বসাক। বহুবিবাহ-নিবারণের জন্যে সমিতির পক্ষ থেকে ১৮৫৫ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কাছে আবেদন করা হয়। এই বছরেই বহুবিবাহবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন বিদ্যাসাগর। ঢাকায় এবং পরে সমগ্র পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায়। তিনি নিজেও কুলীন ছিলেন, তাঁর আটজন স্ত্রী ছিল, তবে তিনি বলেছেন, ঘটক দেখে পালিয়ে না গেলে অভিভাবকদের চেষ্টায় তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা শতাধিক হয়ে যেতো। কৌলিন্যপ্রথার মূলে যে মেলবন্ধন প্রথা কার্যকর ছিল রাসবিহারী তা ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন।

বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধের জন্যে ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যেরা বিশেষ করে চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শিবনাথের শ্বশুরের প্রতি কোনো কারণে ক্ষুন্ন হয়ে তাঁর বাবা আবার পুত্রের বিয়ে দিয়ে দেন। শিবনাথ বিয়ে করতে চান নি, কিন্তু পিতার ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। ফলে কলকাতায় পালিয়ে চলে যান এবং প্রথম স্ত্রীকে পিতৃগৃহ থেকে আনিয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। কিছুকাল পর দ্বিতীয় স্ত্রীর দুরবস্থার খবর পেয়ে তিনি খুব উদ্বিগ্ন হন এবং তাঁকেও কলকাতায় আনিয়ে নিয়ে দুই স্ত্রীকে বাসায় রেখে নিজে উল্টোদিকের বাসার বারান্দায় রাত্রিযাপন করতে শুরু করেন। শিবনাথ আরও সংকল্প করেন যে, তিনি অন্যত্র তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর বিয়ে দেবেন এবং যথারীতি পাত্রও অনুসন্ধান করতে থাকেন, কিন্তু তাঁর ঘটকালি বিফল হয়। ওদিকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীর এই মতলব টের পেয়ে ঘোষণা করেন যে, তাঁর পুনর্বিবাহের চেষ্টা হলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। এরপর কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতা শিবনাথকে বোঝান যে, তিনি বহুবিবাহবিরোধী হলেও যে-মেয়েটি মনে-প্রাণে তাঁকে স্বামী বলে জানে, তার আবার বিয়ে দেওয়ার অধিকার তাঁরও নেই। শেষ পর্যন্ত শিবনাথ রাস্তা পেরিয়ে নিজের ঘরে দুই স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতে ফিরে এসেছিলেন।

তবে বহুবিবাহের অনেক বিরোধীও আইন করে এই প্রথা রহিত করার প্রয়াস সমর্থন করেন নি। বিদ্যাসাগরের বন্ধু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল *সোমপ্রকাশ*-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর মধ্যে একজন, বঙ্কিমচন্দ্র আরেকজন। *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* দ্বিতীয় পুস্তকের (১৮৭৩) তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শনে*। তাঁর বক্তব্য এরকম :

> বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধে, তাহা বোধ হয় এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, 'বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।'... যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরই মুখে বহুবিবাহ প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্কার আমরা শতবার শুনিয়াছি; তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এমত চোর কেহই নাই যে, জিজ্ঞাসা করিলে, চুরিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না—কিন্তু অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি করে।...
>
> তবে বহুবিবাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। ... দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা ছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এ কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে।...
>
> ...জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। ... তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত, এমত নহে। সে সমাজমধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচারসম্মত, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত, যাহা লোকাচারবিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না।...
>
> ... যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহুবিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, 'যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না।...'
>
> এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়?
>
> কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা বিদ্যাসাগর

> মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা একমতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক।... এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? ...যদি তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া, নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র.।
>
> আর একটি কথা এই যে, এ দেশে অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে বিধি দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে?...

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে গেল, একটু ভিন্ন প্রসঙ্গেও চলে এলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর বিদ্যাসাগরের রচনায় আছে, স্পষ্টতই তিনি তা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যেকথা এখানে বিশেষ করে লক্ষণীয়, তা হলো, দাম্পত্য সম্পর্ককে শাস্ত্রনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্তুতি।

উনিশ শতকের শেষে কিন্তু হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার কথা বারবার বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে ১৮৮৭ সালে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ নব্য হিন্দুবাদী দেখাতে চেয়েছিলেন যে, হিন্দুরা নারীকে অত্যন্ত উঁচু আসনে বসিয়েছিল; হিন্দুবিবাহে স্বামীস্ত্রীর যেমন একীকরণ হয়, অন্য কোনো জাতির বিয়েতে তা দেখা যায় না; হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক; হিন্দুবিবাহ সামাজিক মঙ্গল ও সাংসারিক সুবিধার অনুকূল। রবীন্দ্রনাথ *মনুসংহিতার* উদ্ধৃতি দিলেন— 'শয্যা, আসন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিত আচার স্ত্রীলোক হইতে হয়, ইহা মনু কল্পনা করিয়াছেন', *মহাভারতের* উদ্ধৃতি দিলেন— 'তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।' তারপর তাঁর ছোট মন্তব্য যে, 'এ-সকল শ্লোকের দ্বারা স্ত্রীলোকের সম্মান কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না' এবং 'স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা স্ত্রীলোককে যথার্থ সম্মান করিতে অক্ষম'। তিনি আরো বলেন, যে-দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত, সেখানে দাম্পত্য সম্পর্কের একীকরণ হয় না : 'বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্নীর বেলায়, পতিকে সে-আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না।' তিনি বলেছেন, 'স্ত্রীপুরুষে শিক্ষার ঐক্য নাই, ধর্মব্রত-পালনের ঐক্য নাই, কেবলমাত্র জাতিকুলের ঐক্য আছে।' মনুর বচন— 'স্ত্রীগণ অপত্যের উৎপাদন, অপত্যের পালন ও প্রত্যহ-লোকযাত্রার প্রত্যক্ষ নিদান হয়েন'— উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন যে, হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার দাবি টেকে না, সংসারধর্মের প্রতি আসক্তিই এতে প্রবল এবং এর ফলেই বহুবিবাহ প্রচলিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, হিন্দুবিবাহে স্বামী-স্ত্রী সমকক্ষ নয়, তাই স্ত্রী অসতী হলে তাকে ত্যাগ

করা যায়, কিন্তু ব্যভিচারী স্বামীকে ত্যাগ করার কোনো উপায় স্ত্রীর নেই।

আমাদের সমাজে নারী যে পুরুষের সমকক্ষ নয়, এ কথাটা রামমোহনের সময় থেকেই উঠেছিল এবং নারীর যে সমকক্ষ হওয়া উচিত, এ কথা ইয়ং বেঙ্গলেরা বলেছিলেন। প্রতিপক্ষ পুরাণ-ইতিহাস ঘেঁটে নারীর মর্যাদার দৃষ্টান্ত দেওয়ার পরেও ১৮৩২ সালে *জ্ঞানান্বেষণ* অভিযোগ করতে ছাড়েন নি যে, 'এদেশের শাস্ত্রের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূদ্রের উপরই অধিক চলে'। নব্য হিন্দুবাদীরা পরে এক নতুন তত্ত্ব বার করেন, অক্ষরচন্দ্র সরকারের ভাষায় তার নাম অনুপাতবাদ :

> হিন্দু সাম্যবাদ না; হিন্দু মানেন অনুপাতবাদ। ক খ যখন সমান নহে তখন তাহারা সমান আসন পাইবেও না; ক যেমন তেমনই ক পাইবে, খ যেমন তেমনই খ পাইবে। ... হিন্দু স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্বীকার করে না; কাজেই হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করে না।

এরই জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তাহলে নিষ্কাম হওয়ার ক্ষেত্রে এই অনুপাতবাদের প্রয়োগ হওয়া উচিত, পুরুষের ভাগে নিষ্কাম ব্রত যেন একটু বেশি করে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দুপত্নী সমকক্ষ তো নয়ই; অন্যপক্ষে মুসলমান কি ইংরেজের পত্নী যে-অর্থে সংসারের নিত্যকার্যের সহায়, হিন্দুপত্নী তাও নয়। তাঁর মতে, হিন্দুবিবাহ সামাজিক বলেই সমাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার নিয়মের পরিবর্তন ঘটছে এবং সামাজিক মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে তার পরিবর্তন হওয়া উচিত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও 'রাজবিধির সহায়তা লইয়া সমাজসংস্কার' অনুমোদন করেন নি। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিপক্ষতা করেছেন, বিধবাবিবাহ ঠিক গ্রহণ করেন নি; পছন্দ করে বিয়ে করার পক্ষে মত দিয়েছেন এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর খুব জোর দিয়েছেন—এমন কি, বাল্যবিবাহ তুলে দেবার একটা শর্ত হিসেবে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন।

৫

বিবাহ ও সন্তানপালনের বাইরে নারীর কোনো ভূমিকার কথাই এতক্ষণ আলোচনায় আসে নি, তার একটা কারণ, সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের প্রসঙ্গ উনিশ শতকের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল। মেয়েদের জীবনে বিয়েটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল, লেখাপড়াটা ছিল ঠিক তেমনি গৌণ। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের *স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক* (১৮২২) পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণে 'দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন' অধ্যায় সংযোজিত হয়। এতে প্রশ্নকর্ত্রী যেসব কথা তুলেছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখযোগ্য :

> ১. সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয়।
>
> ২. স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধাবাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।
>
> ৩. এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা।... সে সকল পুরুষের কায।

রাসসুন্দরী দেবীর *আমার জীবন* (১৮৬৮) বইতেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে *সর্ব্বশুভকরী পত্রিকায়* মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি দেখান যে, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীরা পাঁচটি আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন :

১. শিক্ষালাভের উপযোগী মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি মেয়েদের নেই;

২. স্ত্রীশিক্ষা লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ;

৩. স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখের ভাজন হয়ে চিরকাল কষ্ট পাবে;

৪. বিদ্যাবতী হলে স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী, মুখরা, অহংকারী, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাকারী ও দুশ্চরিত্র হয়ে নিজে পতিত হবে এবং নিজের কুলকে পতিত করবে।

৫. স্ত্রীশিক্ষা দিয়েই বা কি লাভ? তারা চাকরি করবে না, আদালতে যাতায়াত করতে পারবে না, রাজকার্য করবে না, সাহেবসুবোর সঙ্গে আলাপ করবে না, দেশান্তরে যাবে না, হাটবাজারে যাবে না—সুতরাং মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষায় ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্রের *রামারঞ্জিকায়* দেখছি, পদ্মাবতী তার স্বামীকে বলছে :

> মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে।... আবার কেউ ২ বললেন, মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়।... কায নাই বাবু আর লেখাপড়ায় কায নাই! মেয়ে আমার এমনি থাকুক। যে কয়েক দিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাবার জন্যে ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো।

দেখা যাচ্ছে, অন্তত পঞ্চাশ ধরে বাঙালি সমাজে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে এরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপ্ত হয়ে ছিল। কেবল যে প্রাচীনপন্থীরা নারীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তা নয়, বিশিষ্ট কবি ও *Hindu Intellegencer* পত্রিকার সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। অন্যদিকে, বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটা বড় কৃতিত্ব রাধাকান্ত দেবের— যিনি সহমরণ প্রথা বজায় রাখার ও বিধবাবিবাহ্ প্রচলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। তিনি অবশ্য প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাদের না পাঠিয়ে বাড়িতে পড়াশোনার প্রয়োজন হলে বাড়িতে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করে স্ত্রীশিক্ষার—ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী ছিলেন।

প্রকাশ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন খ্রীস্টান মহিলারা ১৮১৯ বা ১৮২০ সালে। প্রথমে The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female Schools এবং পরে Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity নামে দুটি সংগঠন এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল। ১৮২৪এ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার লেখেন :

> কেবল আমারদের দেশের স্ত্রী লোকের লেখাপড়ার পদ্দি আগে ছিল না, এই জন্যে কিছুদিন কেহ করে নাই। কিন্তু প্রথম ইং ১৮২০ শালের জুন মাসে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতার নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এই ক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটা স্ত্রী পাঠশালা হইয়াছে।

এক্ষেত্রে ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের সঙ্গে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মিলে ১৮৫৯ সালে যে হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন (পরে এর নাম হয় বেথুন স্কুল), তার গুরুত্ব খুব বেশি। মদনমোহন নিজের দুই মেয়েকে ওই স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। সরকারী সাহায্যে বিদ্যাসাগর যেসব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাতেও যথেষ্ট ফল হয়েছিল।

তবু প্রশ্ন রয়ে গেল—মেয়েরা অন্তঃপুরে পড়বে, না বাইরে গিয়ে পড়বে। আরেক প্রশ্ন উঠল, তারা কী পড়বে? বিদ্যাসাগর পাঠসূচী নির্ণয় করে দিয়েছিলেন : লিখন-পঠন পাটীগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানাবিষয়ে মৌখিক পাঠ এবং সেলাইয়ের কাজ। রাধাকান্ত দেব প্রস্তাব করেছিলেন যে, সাধারণ বিদ্যালয়ে নবশাক-কন্যাদের ভর্তি করা হোক, তারা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও যান্ত্রিক বিদ্যা আয়ত্ত করুক, পরে তারাই সাধারণ বিদ্যালয়ে এবং হিন্দু প্রধানদের গৃহে ছাত্রী পড়াতে পারবে। প্যারীচাঁদ মিত্র আরো বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছিলেন। মেয়েদের শিখতে হবে প্রথমত গৃহকর্ম : রান্নাবান্না, ভাণ্ডারের হিসাব রাখা এবং দাসদাসীকে শাসনে রাখা; তারপর তাকে শিখতে হবে অর্থকরী বিদ্যা অর্থাৎ শিল্পকর্ম—যাতে অবস্থার বিপর্যয় ঘটলে কিছু রোজগার করা যায়; তারপর স্বাস্থ্যতত্ত্ব জেনে সন্তানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখাতে হবে, কেননা সুমাতা না হলে সুসন্তান হয় না।

আবার *সোমপ্রকাশের* মতে গৃহকর্ম ও রান্নাবান্না মেয়েদের লেখাপড়ার অন্তরায়। ১৮৬৫ সালে তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার পাঁচটি অন্তরায় নির্দেশ করেছেন :

১. যেখানে পুরুষেরাই ভালো করে লেখাপড়ার সুযোগ পায় নি, সেখানে তারা স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হবে কিভাবে?

২. বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় মেয়েরা বেশিদিন স্কুলে যেতে পারে না।

৩. অল্পবেতনের শিক্ষক দিয়ে লেখাপড়ার কাজ ঠিক চলে না।

৪. মেয়েরা যতটুকু লেখাপড়া শেখে, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে চর্চার সুযোগ না থাকায় তা ভুলে যায়।

৫. গৃহকর্ম ও রান্নাবান্না করতে হয় বলে মেয়েরা লেখাপড়ায় মন দিতে পারে না।

মেয়েদের 'সংসারের উপযুক্ত' করে গড়ে তোলাও সহজ ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা-সম্পর্কিত এই বিতর্ক বা আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, উনিশ শতকে শুধু জ্ঞানচর্চার জন্যে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবা হয় নি। এর প্রায়োগিক দিকটা ছিল মুখ্য। মেয়েরা যাতে ভালো স্ত্রী হয়, স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিনী হয়ে ওঠে, ভালো মা হয়, যথাযথভাবে সন্তান গড়ে তুলতে পারে, দৃষ্টিটা ছিল প্রধানত সেদিকে। মেয়েরাও তখনো পর্যন্ত নিজের কাজের কথা ভাবেন নি, স্বামীর কাজে, সংসারের কাজে, মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

তবে ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণে নারীশিক্ষা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল—ঘরে এবং বাইরে। এদিকে ১৮৫৪এ প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার মেয়েদের জন্যে *মাসিক পত্রিকা* প্রকাশ করলেন, ১৮৬৩তে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে *বামাবোধিনী পত্রিকা* অন্তত ষাট বছর টিকে ছিল। ১৮৬৫তে কেশবচন্দ্র সেন স্থাপন করলেন ব্রাহ্মিকা সভা। তিনি এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সস্ত্রীক অবরোধ প্রথা ভাঙলেন। কেশবচন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে যাবেন,

তার জন্যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় পুলিশ ডাকতে হয়েছিল। আর সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে নিয়ে গভর্নমেন্ট হাউজে গিয়েছিলেন। ১৮৭৮এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন। অবরোধ ভেঙে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে দেখে, সত্যেন্দ্রনাথ পরে বলেছেন, তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল।

৬

কেশবচন্দ্র-দম্পতি ও সত্যেন্দ্রনাথ-দম্পতি শুধু যে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, তাই নয়, দাম্পত্য-সম্পর্কেরও একটা নতুন বিন্যাসের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ দাম্পত্য-সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা রচনা করেছিল। বাবুগিরি বা বড়মানুষির স্বীকৃত লক্ষণ ছিল পরনারীতে আসক্তি বা লাম্পট্য—তাও দাম্পত্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছিল বাধাস্বরূপ। পুরুষ ও নারীর অসমকক্ষতার ধারণা ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক প্রচলন ও পারিবারিক আচরণের অংশস্বরূপ ছিল। নারী যেমন পুরুষের হাতে নির্যাতিত হতো, নারীর হাতেও তার লাঞ্ছনা ঘটতো। শাশুড়ি-ননদ-বধূর সম্পর্কের যে ছাঁচ আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল, তার বাস্তব ভিত্তি ছিল। কেশবচন্দ্রের জননী দেবী সারদাসুন্দরীর *আত্মকথা* (১৯১৩) থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিলে কথাটা বোঝা সহজ হবে :

> আমার শাশুড়ি কত ভাল ছিলেন; কিন্তু একটু রাগ বেশি ছিল। আমার দূর্ভাগ্যবশতঃ তিনি প্রথমে আমায় ভাল চোখে দেখেন নাই, বোধ হয় সে আমার দোষ। তাঁর এক প্রকার বিশ্বাস ছিল, তখন আমার দশ বৎসর হইতে অনেক বেশি বয়স। আমার একটু দোষ দেখিলেই তিনি আমার শ্বশুরকে বলিয়া দিতেন, এবং আমায় বকুনি খাওয়াইতেন।

ভূমিকার এই ছাঁচ সতীন বা সৎমায়ের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল এবং নারীপুরুষের সম্পর্কেও সাধারণভাবে সত্য ছিল।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে পুরুষেরা, পরে নারীরা, দাম্পত্য বিষয়ে নতুন ধারণালাভের সুযোগ পায়। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা সম্পর্কেও নতুন ভাবের উদয় হচ্ছিল। একটা উদাহরণ দিই। দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* (১৮৬০) নাটকে দাসী আদুরীকে বাড়ির ছোট বউ সরলতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভালবাসত?' উত্তরে আদুরী প্রমাণসুদ্ধ জবাব দিয়েছিল : 'মোরে বড্ডি ভালবাসত। মোরে বাউ দিতে চেয়েছিল।' অলংকার দিতে চাওয়ার মধ্যে এখানে স্বামীর ভালবাসাব চরম প্রকাশ দেখা হয়েছিল। অন্যপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষে* (১৮৭৩) সূর্যমুখী স্বামীর প্রেম হারিয়ে চিঠিতে লিখছে, 'একথা বলিতে পারি না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ... যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।' উনিশ শতকের আগে তা বোঝা সম্ভবপর ছিল না। এই উপলব্ধির পশ্চাতে সামাজিক আন্দোলন ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও ভূমিকা ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্য নারীর নতুন ভাবমূর্তি-অঙ্কনে ও দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন আদর্শ-স্থাপনে সাহায্য করে। মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬০) বা *বীরাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬২) নারীত্বের এবং নারীপুরুষ-সম্পর্কের নতুন অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের

পরিচয় করিয়ে দেয়। বিহারীলাল চক্রবর্তীর *বঙ্গসুন্দরী* (১৮৭০) ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের *মহিলা* (১৮৮০) কাব্যে আদর্শায়িত নারীরূপের যে বন্দনা আছে, তাও নতুন। ভবানন্দ মজুমদারকে জাঁহাগীর গঞ্জনা দিয়েছিলেন এই বলে যে, পুরুষের মুখে হাত দিয়ে আল্লাহ যে নূর লাগিয়ে দিলেন, হিন্দুরা সেই গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ফেলে। সুরেন্দ্রনাথের মতে, পুরুষেরা যে এমন করে, তাও নারীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল দেখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যে প্রণয় ও দাম্পত্যের নতুন আদর্শকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিল এবং রঙ্গমঞ্চের নাটক যে এ ভাববিস্তৃতিতে সাহায্য করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রণয়ের ভাবগভীরতা ও নারীর ব্যক্তিস্বতন্ত্রের যে প্রকাশ ঘটে, তার মূল্য অপরিসীম। তাঁর উপন্যাস নিয়ে যাঁরা কৌতুক করেছিলেন, তাঁরা বিশেষ করে তাঁর নায়িকা-চরিত্রের অনুকরণকারী পাঠিকার ছবি এঁকে মজা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই নায়িকাদের অন্তরস্থিত শক্তি যে কতখানি ছিল এবং সেই শক্তি কতখানি পাঠকসমাজে সংক্রমিত হয়েছিল, কৌতুকপরায়ণেরা তা দেখান নি। শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' বলে আয়েষার ঘোষণা কিংবা স্বামীর উদ্দেশ্যে কথিত ভ্রমরের দৃপ্ত বাক্য— 'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি' —এসবের মধ্যে উনিশ শতকের নবচেতনাই ধরা পড়েছে, যেমন পড়েছে হীরার বিদ্রোহ ও শাস্ত্রনিরপেক্ষ নৈতিকতায়, বিধবা রোহিণী বা সধবা শৈবলিনীর প্রেমে। এ সবই আমাদের জন্যে নতুন উপকরণ। রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* (১৯২৯) উনিশ শতকের কাহিনী। দাম্পত্য-সম্পর্কের বিষয়ে সেকালের নতুন উপলব্ধি এর নায়িকা কুমুদিনীর মনে কাজ করেছিল বলে সে জিজ্ঞাসা করতে পেরেছিল : 'স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন জাতের লোক?'

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে নারীর যে রূপ দেখা দিয়েছিল, তা যেমন নানারৈখিক, তার উৎসও তেমনি বিচিত্র। আগেই বলেছি, বাস্তব অবস্থা ও সামাজিক আন্দোলন এবং সাহিত্য ও নাট্যাভিনয় সবই কিছু না কিছু প্রেরণা জুগিয়েছে। যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখেন, তাঁরা ঠিক করেন না। নারী সম্পর্কে নতুন ও প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যশিক্ষিত ও পাশ্চাত্যশিক্ষিত উভয় ধরনের মানুষের মধ্যেই ছিল। তাই দেখি, সামাজিক আন্দোলনের সময়ে প্রাচ্যশিক্ষিত ব্যক্তি হয়তো নারীমুক্তির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, পাশ্চাত্যশিক্ষিত ব্যক্তি তার বিরোধিতা করেছেন। একই জন সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের পক্ষে এবং বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে ভূমিকা নিয়েও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে উদ্‌যোগী হয়েছেন। কেউ সতীদাহ সমর্থন করেও বহুবিবাহের বিরোধী ও নারীশিক্ষার সমর্থক হিসেবে দেখা দিয়েছেন। নারীশিক্ষার সমর্থকেরাও আবার নারীর বিশেষ ভূমিকার জন্যে তাকে তৈরি করতে চেয়েছেন এবং তাই তার পঠনপাঠনের সীমানির্দেশ করেছেন। নারী ঘরের বাইরে বার হোক, এ তো অনেকেই চান নি; জীবিকা-অর্জনের জন্যে তার নিজস্ব প্রয়াস অভিনন্দিত তো হয় নি, বরং নিন্দিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। যাঁরা নারীস্বাধীনতা চান নি, বা তার স্বাধীন জীবিকা অনুমোদন করেন নি, তাঁরা কেবল পুরুষ ছিলেন না। কেননা সমাজে ও সংসারে পুরুষপ্রাধান্যের ধারণা নারীপুরুষের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল—সংস্কারের প্রলেপ সত্ত্বেও ঐ প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের প্রশ্ন উঠেছিল রামমোহনের সময়ে—১৮৭৪ সালে আইন

করে কিছু অধিকার মেয়েদের অবশ্য অর্পণ করা হয়েছিল, কিন্তু তাও অনেকটা চক্ষুলজ্জাপ্রসূত বলে মনে হয়।

তবু, বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও সংসার থেকে রাজপথ পর্যন্ত নারীর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসা ও সেবার জীবিকায় সবে তাঁরা যোগ দিয়েছেন; সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এসেছেন; দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর যোগদানের পথ তখন উন্মুক্ত হতে শুরু করেছে মাত্র। একথা বুঝতে হবে যে, উনিশ শতকে নারীমুক্তির পথে বাধা বেশি ছিল বলেই লড়াই বেধেছিল। মরণপণ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ। তবে ইতিহাসের স্রষ্টা কেবল এঁরাই নন। যে-পুরুষেরা নারীকে মানবী বলে ভালোবাসবে না দেবী বলে পুজো করবে কি দাসী বলে পেছনে রাখবে তা ঠিক করতে পারে নি কিংবা সমাজের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে প্রথাবর্জিত কিছু একটা করে ফেলেছে, এবং যে-মেয়েরা নিজেদের ভেবেছে পুরুষের চেয়ে ছোট ও দুর্বল, মানুষ হয়ে উঠতে না চেয়ে বধূ ও মাতা হয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে কিংবা কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তারা সকলেই কিছু না কিছু ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে এরা ভিড় করে আছে। বিশ শতকে আমরা অনেক সুবিধে পেয়েছি, তবে ইতিহাসের চাকা পেছনে ঘুরিয়ে দিতে উন্মুখ ব্যক্তির কিছু অভাব নেই। নারীদের আমরা এখনো মেয়েমানুষ বলে দেখি, সবসময়ে মানুষ বলে দেখতে পারি না; উনিশ শতকেই নারীকে মানুষ বলে দেখা ও ভাবার সূচনা হয়।

ধর্ম ও নারী

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কোনো দেশকালের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বা কাঠামোর সমাজবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় অনিবার্যভাবেই নারীর অবস্থানের প্রশ্ন এসে পড়ে। কারণ নারী সর্বত্রই সমাজের অর্ধাংশ। অতএব আর্থসামাজিক কাঠামোয় নারীর স্থানাংক দেশ ও সমাজের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পরিচায়ক। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে মাতৃতান্ত্রিক উপজাতিগুলিতে নারীর অবস্থান থাকতো আর্থসামাজিক কাঠামোর এবং শাসন ব্যবস্থার ওপরের দিকে। আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে সাধারণত ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সন্তান উৎপাদনের যৌনযন্ত্র, পুরুষের ভোগ্যদ্রব্য এবং পরিবারের অবৈতনিক দাসী হিসেবে গণ্য করা হতো। আবার যাযাবর জাতিদের মধ্যে নারীপুরুষের তুলনামূলক সাম্যের উদাহরণও পাওয়া যায়। বনবাসী, পর্বতবাসী, দ্বীপবাসী প্রভৃতি কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইতিহাসের বিবর্তনে সাধারণভাবে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়েছে প্রধানত পুরুষের বাহুবল এবং শাস্ত্রবলের প্রতাপেই। বর্তমান যুগে আবার দেশে দেশে মূলত পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যেও নারীমুক্তির আদর্শ ও আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সভ্যতায়, তথা সমকালীন মিশরীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতায় দেবতা এবং দেবী উভয়েরই পুজো প্রচলিত ছিলো। যাযাবর আর্যেরা যখন প্রথম এদেশে এসে বসতি স্থাপন করে, তখনও তাদের মধ্যে নারীর স্বাধীনতা ও সাম্য অনেকখানি অক্ষুন্ন ছিলো। কিন্তু নানাবিধ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে ক্রমশ আর্যসমাজে নারীর স্থানাংকের অবনতি আরম্ভ হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৌদ্ধধর্মের জগৎবিমুখিতা এবং অনাসক্তির তত্ত্বের ফলে নারীকে পুরুষের আসক্তি ও কাম থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভের প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা হতো। এ কারণে বৌদ্ধধর্মেও নারীর পক্ষে এক অপমানকর সামাজিক পরিস্থিতি বর্তমান ছিলো। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নারীসমাজকে পদানত এবং শূদ্রতুল্য দাসশ্রেণীতে পরিণত করতে সম্ভবত সুবিধা হয়েছিলো। ধর্মসূত্রের যুগ থেকে আরম্ভ করে শেষে ধর্মশাস্ত্রের যুগে এসে নারীশক্তি ক্রমশ পদানত এবং শৃংখলিত অবস্থানে চলে আসে। নারীর এই আর্থসামাজিক অবস্থানই আমরা ভগবদ্‌গীতায় প্রচারিত ব্রামণ্যধর্মেও দেখতে পাই।

বৈদিক যুগের আর্য সভ্যতার আর্থসামাজিক কাঠামোতে নারীদের সামগ্রিক হীনস্থানের কোন নজির নেই। বরঞ্চ স্ত্রীপুরুষে সাধারণ সাম্য এবং নারীস্বাধীনতার অজস্র উদাহরণ বিভিন্ন বেদে, বিশেষত ঋগ্বেদে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এমনকি যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের উল্লেখও আছে। ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তের ঋষি নারী। পুরুষের সঙ্গে নারীদের যজ্ঞে সমান অধিকার ছিলো। বিধবাদের পুনর্বিবাহে বাধা ছিলো না। তবে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকবার ফলে দাম্পত্য জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই নারীর জীবন সুখের ছিলো না। কিন্তু পরবর্তীকালের ধর্মশাস্ত্রীয়

সমাজের তুলনায় বৈদিক সমাজে সবসুদ্ধ নারীর অবস্থা অনেক উন্নত ছিলো। এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিধানেও নারী তুলনাক্রমে সম্মানিত ও মুক্ত ছিলো। স্বাধীন বিবাহ, সহজ বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবা হলে কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের পরে দ্বিতীয়বার, এমনকি অনেকবার বিবাহের অধিকার ছিলো। নারীদের সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে উদার এবং বিস্তারিত বিধান আছে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রেও পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার ছিলো, নারীদের এরকম অধিকারের কোন ইঙ্গিত নেই। তাছাড়া পুত্রলাভের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন, এই আপ্তবাক্যও রয়েছে এবং কোন স্ত্রী সন্তানের জন্ম না দিলে অথবা কেবল কন্যাসন্তানের জন্ম দিলে স্বামীর আবার বিবাহ করবার অধিকার ছিলো। অবাধ্য স্ত্রীদের শাসন করবার অধিকারও স্বামীদের দেয়া হয়েছিলো। তথাপি সবসুদ্ধ পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রের যুগের মতো নারীর সামগ্রিক হীনস্থানের ছবি অর্থশাস্ত্রে নেই।[১] বিভিন্ন ধর্মসূত্র এবং মনুস্মৃতিতে এসেই আমরা সর্বপ্রথম লাঞ্ছিতা নারীশক্তির সামগ্রিক চিত্র দেখতে পাই। অবশ্য মনুস্মৃতির এক জায়গায় পরিবারের মধ্যে নারীদের বাহ্যিক সম্মান দেখাতে বলা হয়েছে। পরিবারে নারীরা সম্মানিতা হলে দেবতারা তুষ্ট হন, নচেৎ যজ্ঞের সব ফল নষ্ট হয়। যে পরিবারে নারীরা কষ্টে থাকে সে পরিবার উৎসন্নে যায়, আর যে পরিবারে নারীরা সুখী, সে পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হয়।[২] সম্পত্তির ওপরেও কিছুটা অধিকার মনুস্মৃতিতে নারীদের দেয়া হয়েছে।[৩] কিন্তু সামগ্রিক ভাবে মনুস্মৃতির পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে এ সময়ে আর্য সভ্যতায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের আর্থসামাজিক কাঠামোতে নারীর দাসশ্রেণীসুলভ হীনস্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

মনু বলেছেন যে, নারী শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত আজীবন পুরুষের অধীনে থাকবে, কোন কাজই স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছায় করতে পারবে না।[৪] তার পিতা কিংবা ভ্রাতা তাকে যে পুরুষের কাছে অর্পণ করবে সে যদি সম্পূর্ণ গুণহীন, দুশ্চরিত্র, লম্পট এবং অপদার্থ হয়, তথাপি তাকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করাই নারীর ধর্ম।[৫] যে স্ত্রীলোক তার এই কর্তব্য করে সে স্বর্গে যায়।[৬] স্বামীর মৃত্যুর পর নারী অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করে আজীবন বিধবার জীবন যাপন করবে, এবং অন্য কোন পুরুষের নাম চিন্তায়ও স্থান দেবে না।[৭] কিন্তু স্ত্রী আগে মারা গেলে তাকে সৎকার করবার পরই স্বামী আবার বিবাহ করতে পারবে।[৮] মনু আরও বলেছেন যে, নারী স্বভাবত দুশ্চরিত্রা, এবং পুরুষকে ফুসলানো তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এজন্য মা কিংবা বোনের সঙ্গেও কোন পুরুষ নির্জনে বসবে না।[৯] নারীর এই স্বাভাবিক ভ্রষ্টাপ্রকৃতির জন্য তাকে সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখতে হবে।[১০] পুরুষের সৌন্দর্য কিংবা বয়সে নারীর কিছু আসে যায় না। পুরুষ হলেই যথেষ্ট, তাহলেই তারা সুন্দর-কুৎসিত নির্বিশেষে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করে।[১১] নারীদের সৃষ্টি করবার সময় ঈশ্বর তাদের শুধু অশুদ্ধ চিন্তা, অপবিত্র কামনা, রাগ, অসততা, ঘৃণা এবং দুশ্চরিত্র দিয়েছেন বলেই এই বিধানও দিয়েছেন যে, পুরুষেরা সর্বদা তাদের কড়া পাহারায় রাখবে।[১২] স্ত্রীলোকের কতর্ব্য নিপুণভাবে থালাবাসন মাজাসহ পরিবারের সমস্ত দৈনন্দিন কাজ করা এবং খরচ কমানো।[১৩] মনু এই অকল্পনীয় বর্বর বিধানও দিয়েছেন যে, নারী অথবা শূদ্র হত্যা কোন গুরু অপরাধ নয়।[১৪] আর শূদ্রদের মতো নারীদের বেদ পাঠে কিংবা যজ্ঞকর্মে অধিকার নেই।[১৫]

ব্রাহ্মণ্য সংযোজনে পরিবর্ধিত মহাভারতেও নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থান একইভাবে

চিত্রিত হয়েছে, এবং সে চিত্রই ভগবদ্‌গীতাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। মহাভারত কাহিনীর সর্বত্রই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কিংবা ক্ষত্রিয়দের সামনীতিতে প্রায়ই শতশত সালংকারা সুন্দরী যুবতীকে পণ্যের মতো দান ও গ্রহণ করা হচ্ছে। দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় পণ রাখবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনা করে ভীম বলেছেন যে, লোকেরা নিজ গৃহের বেশ্যাদেরও পাশা খেলায় পণ রাখে না। উদ্যোগপর্বের সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের দূত হয়ে পাণ্ডবদের কাছে এসেছিলেন। ফিরে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন যে, সঞ্জয় যেন ফিরে গিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে কৌরব প্রাসাদের বেশ্যাদেরও যুধিষ্ঠিরের হয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। এসব উদাহরণ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, আর্য পুরুষদের বহুস্ত্রী বর্তমানেও বাড়ীর মধ্যে বেশ্যা রাখবার অধিকার ছিলো। উদ্যোগপর্বেরই শেষে লেখা আছে যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে সৈন্যসজ্জার তদারকি করতে গিয়ে বেশ্যাদের শিবিরও পরিদর্শন করলেন। অর্থাৎ সৈন্যদের লালসা চরিতার্থ করবার জন্য নারীদের বেশ্যারূপে ব্যবহার ধর্মযুদ্ধেরই অঙ্গ ছিলো।

নারীশক্তির লাঞ্ছনার এমনি আরো অজস্র উদাহরণ মহাভারত থেকে দেয়া যেতে পারে। বকরাক্ষস বধের কাহিনীতে ব্রাহ্মণী স্বামীকে বলছেন যে, লোকে যে উদ্দেশ্যে ভার্যা গ্রহণ করে তার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কারণ তিনি এক পুত্র ও এক কন্যার জনক হয়েছেন। ব্রাহ্মণীকে রাক্ষস হত্যা করলে ব্রাহ্মণ আবার বিবাহ করতে পারবেন, কারণ পুরুষের বহুবিবাহ ধর্মসম্মত। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর পুনর্বিবাহ ঘোর অধর্ম। অতএব ব্রাহ্মণীর কর্তব্য স্বামীর বদলে তাঁর নিজেরই রাক্ষসের কাছে যাওয়া। দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর সঙ্গে বিবাহের সময় তার নিজের মত কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। পাঁচ ভাই সকলেই তার প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়াতে ব্যাসদেবের পরামর্শে যুধিষ্ঠির সকলের সঙ্গেই তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কাহিনীর পরবর্তী পর্যায়েও দ্রৌপদী চরিত্রে নারীর সম্পূর্ণ পরাধীনতা, পণ্যবস্তু হিসেবে ব্যবহার, এবং হীনস্থান বারবার প্রকাশ পেয়েছে। পাশা খেলার সময় দ্রৌপদীর মতামত না নিয়েই যুধিষ্ঠির তাকে পণ রাখেন। বনপর্বে কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে দ্রৌপদী জানাচ্ছেন যে, পঞ্চস্বামীকে তুষ্ট রাখবার জন্য তিনি সপত্নীদের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে তাদের সেবা করেন। স্বামীরা স্নান, ভোজন, শয়ন করলে তারপরেই তিনি এসব করেন। স্বামীরা বাইরে থেকে আসামাত্র তিনি তাদের আসন ও জল দিয়ে সংবর্ধনা করেন। তারা যা আহার বা পান করেন না তিনিও তা করেন না। তিনি সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সকলের পরে শুতে যান। অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে এদেশের ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত পরিবারের অবৈতনিক দাসী হিসাবে নারীদের যে স্থান নির্দিষ্ট ছিলো, দ্রৌপদীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। সত্যভামাকে তিনি বলছেন, 'আমার মতে পতিকে আশ্রয় করে থাকাই স্ত্রীদের সনাতন ধর্ম; পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি।' যুধিষ্ঠিরের বাড়ীতে রোজ আঠারো হাজার ব্রাহ্মণ ও দশ হাজার স্নাতক খেতো, আর তাছাড়া যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীতবিশারদ এক লক্ষ দাসী ছিলো। 'পাণ্ডবগণ আমার উপর সমস্ত পোষ্যদের ভার অর্পণ করে ধর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকতেন, আমি সমুদয় সুখ পরিহার করে সেই দুর্বহ ভার বহন করতাম।' কিভাবে তিনি কৃষ্ণের ভালোবাসা পেতে পারেন, সত্যভামার এই প্রশ্নের উত্তরে দ্রৌপদী বললেন : 'পতিই পরম দেবতা, পতির ন্যায় দেবতা আর কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। .... তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করে রমণীয় বেশভূষা, সুচারু ভোজনদ্রব্য,

মনোহর গন্ধমালা প্রদান দ্বারা তার আরাধনা করলে তিনি.... অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।.... কৃষ্ণ তোমার কাছে যা বলবেন, তা গোপনীয় না হলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করবে না, কারণ তোমার সপত্নী যদি কখনো সেকথা কৃষ্ণকে বলে, তবে তোমার প্রতি তিনি বিরক্ত হতে পারেন। .... প্রযত্ন সহকারে স্বামীকে দ্বেষ, বিপক্ষ, অহিতকারী ও কুহকীদের সহবাস পরিত্যাগ করাবে।'[১৬] কিন্তু এতো করেও স্বর্গারোহণের পথে দ্রৌপদীর পতন হলো, কারণ তার মনের গহনে নাকি অর্জুনের প্রতি পক্ষপাত ছিলো। বললেন কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি নয়, জ্যেষ্ঠ স্বামী যুধিষ্ঠির। এদিকে দ্রৌপদীর স্বামীরা যেখানে সেখানে, সময়ে অসময়ে বহু বিবাহ করেছিলেন বলে মহাকাব্যে তাদের কোন বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়নি। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী স্বয়ং কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে তার ষোল হাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। এ ছাড়া তাঁর আরও দশ বারোজন পত্নী ছিলেন। চোখে কাপড় বেঁধে গান্ধারীর স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব বরণের মাধ্যমে মহাকবি ধর্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট পাতিব্রত্য ধর্মের চরম উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু স্ত্রীর জন্য স্বামীর আত্মত্যাগের কোন উদাহরণ মহাভারতে নেই, কারণ তা ছিলো ধর্মশাস্ত্রের পরিপন্থী।

মহাভারতের অনুশাসনপর্বে (যা নিঃসন্দেহে ধর্মশাস্ত্রের যুগের ব্রাহ্মণ্য সংযোজন) ভীষ্মের মুখে যে ভাষা ও ভাবে স্ত্রীজাতির নিন্দা করা হয়েছে, তা থেকে মহাকাব্যিক ও ধর্মশাস্ত্রীয় যুগে সমাজে নারীদের হীনস্থান বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। উদাহরণ স্বরূপ ভীষ্ম বলেছেন : 'কামিনীগণ সৎকুলজাত, রূপসম্পন্ন ও সধবা হলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। তাদের চেয়ে পাপপরায়ণ আর কেউই নেই। তারা সকল দোষের আকর। তারা অবসর পেলেই ধনবান ও রূপবান পতিদের পরিত্যাগ করে পরপুরুষ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়।... যেমন কাষ্ঠ রাশি দ্বারা অগ্নির এবং সর্বভূত সংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তেমনি অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তিলাভ হয় না।' এই উদ্ধৃতির বর্জিত অংশে নারীজাতির সম্বন্ধে আরও এমন সব উক্তি আছে যা সম্পূর্ণ অশ্লীল এবং একমাত্র বর্বরের লেখনী থেকেই বেরোতে পারে। তারপর যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করবার অজুহাতে নারীদের সম্বন্ধে এ ধরনের আরও কিছু কুৎসিত কথা বলবার পর ভীষ্ম বললেন : 'ইহলোকে স্ত্রীলোকের চেয়ে পাপশীল পদার্থ আর কিছুই নেই। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু, এ সবের সঙ্গেই তাদের তুলনা করা যায়। .... স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য বা ধর্ম নির্দিষ্ট নেই। তারা বীর্যহীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও মিথ্যাবাদী ... মানুষের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও তাদের স্বধর্মে রক্ষা করতে সমর্থ হন না।'[১৭]

ধর্মশাস্ত্রে ও পল্লবিত মহাভারতে বিধৃত নারীর এই হীনস্থানই ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখে সমর্থিত ও প্রচারিত হয়েছে। সৃষ্টি চরাচরের সব শ্রেষ্ঠ বা সার বস্তুর মধ্যে নিজের প্রকাশের উদাহরণ দিয়ে সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন :

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।[১৮]

—হে কৌন্তেয়, আমি জলের মধ্যে রস, চন্দ্রসূর্যের মধ্যে প্রভা, সর্ববেদে ওঙ্কার, আকাশে শব্দ এবং মানবজাতির মধ্যে পুরুষত্বরূপে বিদ্যমান। ভালো করে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে 'পৌরুষ'

শব্দ এখানে শৌর্যবীর্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নি। পুংলিঙ্গ অর্থে হয়েছে। শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যে বলেছেন, 'পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ যতঃ পুংবুদ্ধির্নৃষু,' অর্থাৎ পুরুষভাব, যা থেকে মানুষের মধ্যে পুরুষত্বের বুদ্ধি বা জ্ঞান হয়। আনন্দগিরি তার টীকায় এই শঙ্করভাষ্যকে সমর্থন করে 'পৌরুষ' শব্দের অর্থ করেছেন 'পুরুষত্বমেব বিশদয়তি'। আরও ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন যে, পৌরুষ অর্থ এখানে 'পুংস্ত্ব', যা দেখে অপরকে পুরুষ বলে চেনা যায়। অর্থাৎ মানব জাতির মধ্যে একমাত্র পুরুষ প্রজাতিতেই শ্রীভগবান নিজের প্রকাশের কথা বলেছেন, নারী প্রজাতির মধ্যে নয়। পুরুষ ঈশ্বরের প্রকাশ, আর নারী ঈশ্বরবর্জিত এক অধম প্রাণী মাত্র। অতএব যেকোন স্ত্রীলিঙ্গ যেকোন পুংলিঙ্গের চেয়ে হীন। এই ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের ঘোষণা।

অবশ্য তথাপি মনুষ্য সমাজে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা হয় নি। নারীর প্রথম ও প্রধান ভূমিকা পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদনের যৌনযন্ত্র হিসেবে। ভগবদ্গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন :

মম যোনি মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।[১৯]

— হে ভারত, মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার যোনি, আমি তার মধ্যে গর্ভাধান করি। এ থেকেই সব প্রাণীর জন্ম হয়।

এ ধরনের একটা প্রায় অশ্লীল কথা শ্রীভগবানের মুখে আরোপ করা গীতাকারদের পক্ষে শোভন হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন আমরা এখানে তুলছি না। কিন্তু এ শ্লোক থেকে গীতার সমকালে নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমত, প্রাচীন ভারতের ধর্মগ্রন্থের লেখকেরা সন্তান উৎপাদনে নারীর জৈব ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। ভীষ্ম যে কারণে বলেছেন নারীরা বীর্যহীন। তারা শুধুমাত্র পুরুষকেই জন্মদাতা, আর নারীকে কেবল সন্তান উৎপাদনের একটা জীবন্ত আধার কিংবা যন্ত্র মনে করতেন। মনুস্মৃতিতেও একই অজ্ঞতা লক্ষ করা যায়। মনু এক জায়গায় বলেছেন যে, নারী মাতা হবার উদ্দেশ্যে আর পুরুষ পিতা হবার উদ্দেশ্যেই জন্মেছে। আরেক জায়গায় বলেছেন যে, নারীর কোন বীর্য নেই, এবং জন্মের ব্যাপারে নারীগর্ভের কোন অবদান নেই, পুরুষের বীর্যই সন্তানের জন্মের একমাত্র কারণ।[২০] প্রকৃতি আমার যোনি, এই কথায় বিভ্রান্ত হয়ে কোন কোন টীকাকার ব্যাখ্যা করেছেন যে, সাংখ্যমতে মহদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মেরই অংশ, অতএব ঈশ্বর নিজের যোনিতে নিজেই গর্ভাধান করেছেন।[২১] কিন্তু এ ধরনের বুরবক ব্যাখ্যা একেবারেই যুক্তিহীন এবং অপ্রয়োজনীয়। এখানে আমার যোনির অর্থ স্পষ্টতই আমার মালিকানা অথবা প্রভুত্বের অধীন যোনি। এই সহজ তাৎপর্যই আরও পরিষ্কার হয়েছে পরের শ্লোকটিতে :

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।[২২]

— কৌন্তেয়, সব যোনিতে যেসব মূর্তি জন্মগ্রহণ করে, তাদের জন্মস্থান মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতি), আর আমি বীজপ্রদ পিতা।

অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র এবং মহাকাব্যিক যুগে নারীকে পুরুষের যৌনযন্ত্র মাত্র মনে করবার যে

রীতি প্রচলিত ছিল, ভগবদ্‌গীতার এই শ্লোক দুটিতে তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। একইভাবে নারীকে স্বভাবত ভ্রষ্টা, দুষ্টা এবং দুশ্চরিত্রা রূপে চিহ্নিত করবার যে রেওয়াজ এ সময়ে প্রচলিত ছিলো, ভগবদ্‌গীতায় তারও স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। গীতার প্রথম অধ্যায়েই অর্জুন বলেছেন যে, জ্ঞাতিদের হত্যা করে কুলক্ষয় করলে অধর্মের আবির্ভাব হবে। আর অধর্মের আবির্ভাবের লক্ষণ কি? অর্জুন নিজেই বলেছেন :

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ।।[২৩]

—কৃষ্ণ, অধর্মের আবির্ভাব হলে কুলস্ত্রীরা দুষিত হয়। হে বার্ষ্ণেয়, স্ত্রীরা দুষ্টা হলে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়।

বর্ণসঙ্করের অজস্র কুফল গীতার বিভিন্ন জায়গায় বিধৃত আছে। এখানে অর্জুন বলেছেন যে, বর্ণসঙ্কর হলে পরে পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দেবার কেউ থাকে না, তাই তারা চিরকাল নরকে বাস করে। কুলধর্ম তথা শাশ্বত জাতিধর্ম এভাবে বর্ণসঙ্করের ফলে উৎসন্নে যায়।[২৪] অর্থাৎ অধর্মের লক্ষণ এই যে কুলস্ত্রীরা দুষ্টা হয়ে কুলের বাইরে বহুগামিনী হয়, আর এভাবে শাশ্বত বর্ণধর্মের এবং সমাজের সর্বনাশ করে। প্রশ্ন এই, অধর্মের আবির্ভাবে শুধুমাত্র কুলস্ত্রীরা দূষিত হয় কেন, অধর্ম কি পুরুষদের স্পর্শ করে না? কুলস্ত্রীরা কি নিজে নিজে নষ্ট হতে পারে, না পুরুষেরাই তাদের নষ্ট করে? বর্ণসঙ্কর ভালো কি মন্দ সে এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এই বর্ণসঙ্কর কি শুধুমাত্র স্ত্রীলোকেরা সৃষ্টি করতে পারে, না কি ব্যভিচারী পুরুষদের যৌন উচ্ছৃংখলতাও এর জন্য দায়ী? সেসব উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ কি কোন অধর্ম করছে না, কিংবা অপবিত্র হচ্ছে না? প্রকৃতপক্ষে মনুস্মৃতিতে ও পল্লবিত মহাভারতে নারীর স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রহীনতার যে অপমানকর তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়েছিলো, ভগবদ্‌গীতায় আমরা সেই তত্ত্বেরই প্রতিফলন দেখতে পাই। তেমনি মনুস্মৃতিতে এবং মহাভারতে পুরুষের বহুগামিতা এবং যৌন ব্যভিচারের যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থন দেখতে পাওয়া যায়, ভগবদ্‌গীতায়ও তারই প্রতিফলন আছে। এদিকে আবার নারীর একনিষ্ঠ সতীত্ব এবং পাতিব্রত্যও মনুস্মৃতি, মহাভারত এবং ভগবদ্‌গীতার কমন আদর্শ।

ওপরের উদ্ধৃতিগুলি অবশ্য অর্জুনের উক্তি থেকে, শ্রীভগবানের প্রবচন থেকে নয়। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানের উক্তিই প্রামাণ্য, অর্জুনের নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে শ্রীভগবান অর্জুনের বক্তব্য খণ্ডন তো করেনই নি, বরঞ্চ সে বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গিয়ে নারীদের 'পাপযোনি' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।।[২৫]

—আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এসব পাপযোনিও পরম গতি লাভ করে থাকে। ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের মতো পুণ্যবান ভক্তদের আর কথা কি? অনিত্য এবং সুখহীন ইহলোকে

জন্মেছো, আমাকে ভজনা করো।

নারী এবং বৈশ্যশূদ্রদের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের এই অমানবিক উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, গীতার সমকালে বৈশ্য ও শূদ্রদের, অর্থাৎ সমস্ত কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর আর্থসামাজিক কাঠামোতে নারী ও শূদ্রের স্থান সমান বলে গণ্য হতো। অর্থাৎ যেসব নারী জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে জন্মেছেন, তাদের জন্যও জন্মনির্বিশেষে দাসসুলভ শূদ্রশ্রেণীর সমতুল আর্থসামাজিক স্থানাঙ্ক নির্দিষ্ট হয়েছিলো। এর ফলে প্রথমেই স্বভাবজ গুণের তত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়লো। কারণ সমাজের অর্ধেক মানুষই নারী। তারা সকলেই পাপযোনি অর্থাৎ তমগুণসম্পন্ন, আর বৈশ্যেরা প্রধানত তমগুণসম্পন্ন। অতএব সমাজের অল্প সংখ্যক পুরুষ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরাই যথাক্রমে বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং প্রধানত রজ ও আংশিক সত্ত্বগুণের মালিক থেকে গেলেন। এই ভূতলস্থ দেবতাদের পরিবারের নারীরা দেবী হতে পারলেন না, তমগুণসম্পন্ন দাসী হলেন। এই ভগবদ্‌গীতার বিধান।

অথচ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের চরম যৌন ব্যভিচারের উদাহরণ মহাভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, স্বর্গের দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের লাম্পট্যের কথা নয়তো ছেড়েই দেয়া গেলো। উদাহরণস্বরূপ বেদব্যাসের পিতা পরাশর ঋষি মাঝিকন্যা কুমারী সত্যবতীকে নদীর মধ্যে নৌকায় একা পেয়ে নষ্ট করেছিলেন। আর তার ফলেই ব্যাসদেবের জন্ম হয়েছিলো, সত্যবতীর কানীন পুত্র রূপে। মহর্ষি গালব গুরু বিশ্বামিত্র ঋষিকে আটশো সাদা ঘোড়া দক্ষিণা দেবার জন্য যযাতির কন্যা মাধবীকে তিনজন রাজার কাছে পরপর দুশো সাদা ঘোড়ার বদলে ভাড়া খাটিয়ে ছয়শো ঘোড়া জোগাড় করবার পরে শেষে বিশ্বামিত্রের কাছেই দুশো সাদা ঘোড়ার বিকল্প হিসেবে ভাড়া দেন। বিশ্বামিত্র তার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করে মাধবীকে ফিরিয়ে দিলে গালব আবার তাকে যযাতির কাছে সমর্পণ করেন। বিশ্বামিত্র, যযাতি, গালব, আর তিন বিখ্যাত রাজা পাপযোনি না পুণ্যযোনি? ভীম, অর্জুন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা যখন তখন যত্র তত্র একটি তথাকথিত বিবাহ করেও পাপযোনি না হয়ে ধর্মাত্মা থাকলেন কি করে? যেসব অগণিত মুনিঋষি এবং প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় কোন সুন্দরী যুবতী দেখলেই আর নিজেদের বশে রাখতে পারতেন না, তারা পুণ্যযোনি হলেন কি করে? সব শেষে সুকঠিন প্রশ্ন, নারী পাপযোনি হলে তার গর্ভে জন্মলাভ করে সব পুরুষও কি অনিবার্যভাবেই পাপযোনি হয় না? প্রকৃত সত্য এই যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবক্তা চতুর ব্রাহ্মণদের কলমের গুণে পুরুষের অবাধ যৌনতা, নারীর একনিষ্ঠ সতীত্ব, এবং নারী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যান্য মৌলিক কুসংস্কারগুলি ভগবদ্‌গীতায় ঈশ্বরের মুখে আরোপ করা হয়েছে।

এভাবে নারীদের অপমানকর এবং শৃঙ্খলিত হীনস্থানের সমর্থন ভগবদ্‌গীতায় শ্রীগভবানের মুখে আরোপ করবার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ ছিলো। বৈদিক সভ্যতায় যে আংশিক নারীস্বাধীনতা এবং নারী-পুরুষ সাম্য ছিলো, পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাস্ত্রীয় অনুশাসন তা সম্ভবত সম্পূর্ণ দমন করতে পারেনি। তাছাড়া আর্য সভ্যতার বহির্ভূত যেসব বহুসংখ্যক অনার্য এবং অধার্মিক 'অসুর' তখন আর্যাবর্তে বসবাস করতো—তারা সম্ভবত নারীদের শৃঙ্খলিত করে রাখতো না। সম্ভবত আর্যেরা নিজেদের স্ত্রীলোকদের নিয়ে এদের কারণে কিছুটা চিন্তিত ছিলো। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের অনেক অংশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং নারীস্বাধীনতার

উল্লেখ মহাভারতে আছে। উত্তর ভারতেও বনবাসী ও পর্বতবাসী অনার্যদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং নারীস্বাধীনতা প্রচলিত ছিলো। এই পরিস্থিতিতে নারীস্বাধীনতার ফলে বর্ণধর্ম নষ্ট এবং বর্ণসংকর সৃষ্টি হবার ভয় আর্যদের ধর্মশাস্ত্রের যুগ পর্যন্ত থেকেই গেছে।

এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রমাণ মহাভারতেই আছে। বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষি ভবিষ্যতের কল্পিত কলিযুগে নারীদের আচরণ সম্বন্ধে বলেছেন : 'বিপরীতচারিণী রমণীগণ উপযুক্ত পতিদের বঞ্চনা করে দাস এবং পশুদের নিয়ে নিজেদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে। কি বীর পত্নীগণ, কি সামান্য মহিলাগণ, সকলেই পতি বর্তমানেই পুরুযান্তর সংসর্গ করবে।' আরও অশ্লীলতর এ জাতীয় অনেক কথা মার্কণ্ডেয় কলিযুগের নারীদের সম্বন্ধে বলেছেন। যেমন ভীষ্ম বলেছেন অনুশাসন পর্বে। কিন্তু মার্কণ্ডেয় ঋষির অনেক কথার মধ্যে যে মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা এই যে, নারীরা সব ব্যাপারে আর পুরুষের সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করে অনেক ব্যাপারেই স্বাধীন আচরণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, 'কোন ব্যক্তিই বিবাহার্থী হয়ে কন্যা প্রার্থনা করবে না, কন্যারা স্বয়ংগ্রহা হবে।' আবার কামিনীগণ লজ্জা পরিত্যাগ করে নিজ নিজ স্বামীকে দ্বেষ করবে।'[২৬] অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্যে নারীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে শুধুমাত্র ভোগ্যদ্রব্য এবং দাসী হিসেবে ব্যবহার করবার যে সামাজিক আদর্শ রচনা করা হয়েছে, ভবিষ্যতে নারী সে অমানবিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজ স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করবে, মহাকাব্য রচয়িতাদের এই ছিলো মূল আশঙ্কা। কিন্তু এভাবে ভবিষ্যতে বাচক ভঙ্গীতে এসব কথা লেখা হলেও এ ঐতিহাসিক সত্য সহজেই ফুটে ওঠে যে, পল্লবিত মহাভারত ও গীতা রচনার সমকালে নারীদের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাস্ত্রীয় অনুশাসন পুরোপুরি চালু করা যাচ্ছিলো না। বাস্তবক্ষেত্রে বর্ণভেদের কঠোরতা, নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব, অথবা ধর্মশাস্ত্রের অমানবীয় অনুশাসন সম্পূর্ণ রূপায়িত করা সম্ভব হচ্ছিলো না। তাছাড়া সমকালীন ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে দেখা যায় যে ম্লেচ্ছ, শবর, নিষাদ, রাক্ষস, কিরাত প্রভৃতি অনার্য জনজাতি এবং শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে আর্যসমাজের চেয়ে অনেক বেশি নারীস্বাধীনতা ছিলো। সেখান থেকে এই 'ব্যাধি' আর্যনারীদের মধ্যেও সংক্রামিত হবার আশঙ্কা ছিলো। এই পরিস্থিতিতেই আর্যসমাজের আর্থসামাজিক কাঠামোতে নারীদের শৃঙ্খলিত হীনস্থানকে এবং নারীদের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবক্তাদের অমানবিক কুৎসিত বক্তব্যগুলিকে ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানকে দিয়ে সমর্থন করিয়ে নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো।

সমকালীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আদর্শ নারীচরিত্রের রূপ কি হবে সে বিষয়ে ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখে কিছুটা আভাস দেয়া হয়েছে। গীতার দশম অধ্যায়ে নিজের অসংখ্য বিভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীভগবান গাছপালার, জীবজন্তু সহ তৎকালীন বিচারে পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গেই নিজের তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, তিনি 'কীর্তি শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।'[২৭] নারীদের এসব গুণাবলীর মধ্যে যে কীর্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে কীর্তির অর্থ কি? আনন্দগিরি তাঁর টীকায় সঠিকভাবেই বলেছেন, 'কীর্তির্ধামিকত্বনিমিত্তা খ্যাতিঃ।'[২৮] আর এই ধার্মিকত্বের নির্যাস হচ্ছে সতীত্ব, পাতিব্রত্য এবং পতিভক্তি। অর্থাৎ সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, গান্ধারী প্রভৃতি যেমন সতীত্ব ও অচলা পতিভক্তি দেখিয়ে কীর্তি স্থাপন করেছেন, সেরকম কীর্তিই নারীজাতির আদর্শ। এই কীর্তি

নারীশক্তির উন্মেষ কিংবা সৃজনী প্রতিভার পরিচয় সূচিত করে না। শ্রী অর্থ শারীরিক সৌন্দর্য, লাবণ্য, যা নারীর মধ্যে পুরুষেরা সর্বদাই কামনা করে। বাক্ শব্দের সরল অর্থ কথা বলা। কিন্তু যে কোনভাবে কথা বলা নিশ্চয়ই নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ হতে পারে না। এক্ষেত্রে একমাত্র সম্ভাব্য অর্থ হচ্ছে নম্র, অবিদ্রোহী, উত্তাপহীন, বিনয়ী, শ্রুতিমধুর কথা বলা। স্মৃতির্মেধা অর্থ শাস্ত্রবুদ্ধি, অথবা ধর্মশাস্ত্রের বিধানে অচলা নিষ্ঠা। আর ধৈর্য ও ক্ষমা অবশ্যই নারীর শ্রেষ্ঠ গুণ হতে হবে, কারণ ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে সমাজপতি, নিজ পরিবার এবং নিজ পতির সমস্ত নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে হবে। আনন্দগিরি ক্ষমা অর্থ করেছেন 'মানাপমানয়োরবিকৃতচিত্ততা,' অর্থাৎ মান অথবা অপমানে চিত্তের কোন রূপ বিকার না হওয়া। কিন্তু এখানে মানের কথা প্রযোজ্য নয়, কারণ মানের জন্য কাউকে ক্ষমা করার প্রশ্ন ওঠে না। অপমানে চিত্তের কোন রকম বিকার না হওয়াই ক্ষমার সারমর্ম। অর্থাৎ সমাজ ও পরিবারের সমস্ত অবহেলা-অপমান নারীদের নিঃশব্দে সহ্য করতে হবে। এটাই নারীদের বড়ো গুণ, এই নারীগুণের সঙ্গেই গীতার শ্রীভগবান নিজেকে তুলনা করেছেন। প্রশ্ন ওঠে, এসব গুণ শুধু নারীদের শ্রেষ্ঠ গুণ হতে গেলো কেন? এসব পুরুষেরও শ্রেষ্ঠ গুণ হতে বাধা কোথায়? কিন্তু ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান এসব গুণকে মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ বলেন নি, কেবলমাত্র নারীদের শ্রেষ্ঠ গুণ হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নারীকে দিয়ে আর্থসামাজিক কাঠামোতে তার নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, হীনস্থান সনাতন ধর্মশাস্ত্রের বিধান হিসেবে গ্রহণ করানো এবং তাকে চিরকাল অবিদ্রোহিনী রাখাই ঈশ্বরের মুখে ভগবদ্গীতায় এ ধরনের আদর্শ নারী চরিত্র চিত্রণের মূল উদ্দেশ্য।

আর্য-অনার্য সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সংমিশ্রণের ফলে ক্রমশ অনেক অনার্য দেবদেবী আর্য সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। বিশেষত শিব ও শক্তির তাত্ত্বিক সমর্থন এবং ব্যবহারিক আরাধনা হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'দেবী মাহাত্ম্য' গ্রন্থে চারটি বিভিন্ন রূপে দেবী আরাধনার যে সমর্থন রয়েছে, তা প্রাক্-আর্য সমাজের মাতৃতান্ত্রিক ধর্মেরই পরিণত আর্য রূপ। পল্লবিত মহাভারতেও শিব এবং দুর্গার আরাধনাসহ আর্যদের বৈষ্ণবধর্ম এবং অনার্যদের শাক্তধর্মের সংঘাত ও সমন্বয়ের চেষ্টার উদাহরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এর ফলে তাত্ত্বিক স্তরে আর্য নারীর দেবিত্ব স্বীকৃত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রামায়ণ-মহাভারতের পতিসর্বস্ব, সতীত্বময়ী, পুরুষের ভোগ্যদ্রব্য এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, আর পরিবারের অবৈতনিক দাসী রূপে নারীর বাস্তব আর্থসামাজিক স্থানাঙ্কের কোন পরিবর্তন হয়নি। জাগতিক পরিচয়ে নারী ভগবদ্গীতার পাপযোনিই থেকে গেছে। অধ্যাপক এ. এল. বেশম যথার্থই বলেছেন : 'The ancient Indian attitude to women was in fact ambivalent. She was at once a goddess and a slave, a saint and a strumpet'।[৯] আরেকটু ব্যাখ্যা করে বললে এই দাঁড়ায় যে, বিবেকের পীড়নে এবং স্তোকবাক্য দেবার জন্য নারীকে তাত্ত্বিক স্তরে দেবীর আসনে বসালেও ব্যবহারিক জীবনে নারী দাসীই থেকে গেছে। পরবর্তীকালে তান্ত্রিকধর্মে নারী-পুরুষের সাম্যের মধ্য দিয়ে নারীর মর্যাদা কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, কিন্তু তান্ত্রিকধর্ম কখনও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারেনি এবং বৌদ্ধধর্মের মতোই বারবার হিন্দুধর্মের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়েছে।

ভগবদ্‌গীতার আদর্শে অদ্বৈত দর্শনের প্রবক্তা শঙ্করাচার্য 'পাপযোনি' নারীদের পুরুষের ভোগ্যদ্রব্য এবং মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধকরূপেই চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর 'মোহমুদ্‌গর' নামক বিখ্যাত স্তোত্রে এ সত্যই প্রকাশ পেয়েছে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ যেমন তাঁকে জাতিবর্ণভেদ এবং শূদ্রশ্রেণীর হীনস্থান সমর্থন করতে কোন দার্শনিক দ্বন্দ্ব অথবা বিবেকের পীড়নের সম্মুখীন হতে দেয়নি, তেমনি নারীজাতিকে পুরুষের মোক্ষের প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করতেও কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেনি। পরবর্তী অদ্বৈতবাদী যুগাবতার এবং ভগবদ্‌গীতার অনুগামী রামকৃষ্ণ পরমহংসও কামিনীকাঞ্চনকে পুরুষের মোক্ষের প্রতিবন্ধকরূপে চিহ্নিত করে মুমুক্ষু পুরুষদের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের উপদেশ দিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য কিংবা রামকৃষ্ণ নারীদের মোক্ষলাভের জন্য পুরুষকাঞ্চন ত্যাগের কোন বিধান দিয়ে যাননি। কারণ ধর্মশাস্ত্র ও ভগবদ্‌গীতার ঐতিহ্য অনুযায়ী পুরুষই নারীকে লোষ্ট্রবৎ গ্রহণ বা ত্যাগ করবার অধিকারী, নারী স্বপ্নেও পুরুষকে গ্রহণ বা ত্যাগের অধিকারী হতে পারে না। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান সমস্ত শ্রেণীর নারী ছাড়া, এবং পুরুষদের মধ্যে শূদ্র ছাড়া, আর কোন পাপযোনি দেখতে পাননি। তেমনিভাবে যে নারী অর্ধেক পৃথিবী, তার মোক্ষ বা মুক্তির কথা শঙ্করাচার্য অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের মনে স্থান পায়নি।

আধুনিক যুগ নারীমুক্তির যুগ। ঘরে-বাইরে নারীপুরুষের সাম্য এই নারীমুক্তির অপরিহার্য আংগিক। আর শূদ্রমুক্তির মতো নারীমুক্তিও মানবসভ্যতার প্রগতির দিশারী। সে মুক্তি আসছে এবং আসবে ব্যাপক নারীশিক্ষা, নারীর স্বাধীন জীবিকা, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক কাঠামোর নিরন্তর পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। ভগবদ্‌গীতার ধর্মীয় আবরণে অথবা অদ্বৈতবাদের দার্শনিক আবরণে নারীমুক্তি সম্ভব নয়। কারণ উপনিষদ এবং ভগবদ্‌গীতার ওপর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ নারী ও শূদ্রের হীনস্থানসহ সার্বিক আর্থসামাজিক অসাম্যকে ছদ্মবেশে সমর্থন করে। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান নারীকে তাঁর পাদপদ্ম আশ্রয় করে পরম গতি লাভের যে আশ্বাস দিয়েছেন, সে গতি পারলৌকিক, ইহলৌকিক নয়। ভগবদ্‌গীতার পৃথিবীতে নারী পুরুষের দাসী, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ভোগ্যদ্রব্য এবং সন্তান উৎপাদন ও কুলরক্ষার যৌনযন্ত্র বিশেষ। সে পাপযোনি। সে কারণেই সম্প্রতি পুরীর 'জগদ্‌গুরু' শঙ্করাচার্য বলতে সাহস পেয়েছেন (১৮ জানুয়ারী ১৯৯৪) যে নারীদের বেদপাঠে অধিকার নেই।

নৃতত্ত্ববিদেরা এ বিষয়ে একমত যে ইতিহাসের আদিপর্বে নারীরাই প্রথমে কৃষিকাজ, হস্তশিল্প, গৃহনির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে মানবসভ্যতার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। শিকার করে খাদ্যসংগ্রহের যুগে পুরুষেরা শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে যেতো, আর নারীরা নিজেদের এবং শিশুদের আর্থিক এবং শারীরিক সুরক্ষার জন্য কৃষিকাজ, হস্তশিল্প এবং ঘর তৈরীতে নিজেদেব উদ্‌ভাবনী শক্তি নিয়োগ করতো। অনেক সময় যুদ্ধ করেও তারা আত্মরক্ষা করতো। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এটা ছিলো অন্যতম মূল কারণ। এ সময়েই দেবী পূজারও প্রচলন হয়েছিলো। কিন্তু তারপর কৃষিকাজ ও যানবাহনে পশুশক্তির ব্যবহার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্‌ভব, লোহার লাঙ্গল এবং ভারী যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধাস্ত্রের আবিষ্কার এবং উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারপ্রথা গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষও এই সাধারণ

বিবর্তনের ব্যতিক্রম ছিলো না। কিন্তু এই কমন কারণগুলোর বাইরে প্রত্যেক সমাজের বিবর্তনের কিছু বিশেষ স্থানীয় কারণ থাকে। সে কারণগুলোই কোন দেশে ইতিহাসের কোন খণ্ডকালে আর্থসামাজিক কাঠামো এবং সে কাঠামোতে নারীশক্তির সঠিক স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করে। ভগবদ্গীতা রচনার সমকালীন ভারতবর্ষে যেসব বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান ছিলো তার আলোচনা আগেই করেছি। কিন্তু এখানে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণটির বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন তা হলো আর্যসমাজে শাসক শ্রেণী দ্বারা শূদ্রশক্তি এবং নারীশক্তিকে ধর্মের বিধানে শৃঙ্খলিত করা। মনুস্মৃতি ও রামায়ণ-মহাভারতে নারীর যে আর্থসামাজিক হীনস্থান ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছিলো, ভগবদ্গীতায় তা সরাসরি প্রশ্নাতীত ঐশ্বরীয় বিধানের রূপ পেয়েছে। এ ভাবেই ধর্মের শাসনে গুরুতর অসাম্য ও দমনপীড়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত অমানবিক আর্থসামাজিক কাঠামোকে চিরায়ত করবার চেষ্টা হয়েছে। আর ভগবদ্গীতার ঐশ্বরীয় অনুশাসনে অধিষ্ঠিত এবং চিরায়ত আর্থসামাজিক কাঠামোতে নারীশক্তি এবং শূদ্রশক্তির শৃঙ্খলিত ও লাঞ্ছিত অবস্থানই যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পথের ধারে এ হতভাগ্য দেশ জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে থাকবার প্রধান কারণ। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এখানেই রয়েছে ভগবদ্গীতার বিশেষ ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অবদান।

পাদটীকা

১. কৌটিল্যীয় *অর্থশাস্ত্র,* ৩/২-৫
২. *মনুস্মৃতি,* ৩/৫৫-৫৯
৩. ঐ, ৮/২৯, ৯/১০৪, ৯/১৩১, ৯/১৯২-৯৮
৪. ঐ, ৫/১৪৭/-৪৮
৫. ঐ, ৫/১৫১, ১৫৪
৬. ঐ, ৫/১৬৪-৬৫
৭. ঐ, ৫/১৫৬-৫৮
৮. ঐ, ৫/১৬৭-৬৯
৯. ঐ, ৫/১৬৭-৬৯
১০. ঐ, ২/২১৩-১৫
১১. ঐ, ৯/১-২৭
১২. ঐ, ৯/১৭-১৮
১৩. ঐ, ৫/১৫০
১৪. ঐ, ১১/৬৭
১৫. ঐ, ৪/২০৫-৬, ১১/৩৬-৩৭
১৬. বেদব্যাসী *মহাভারত,* ৩/২৩২-৩৩
১৭. ঐ, ১৩/৩৮-৩৯
১৮. *ভগবদ্গীতা,* ৭/৮
১৯. *ভগবদ্গীতা,* ১৪/৩
২০. *মনুস্মৃতি,* ৯/৩৭, ৯/৯৬
২১. *ভগবদ্গীতা,* ১৪/৩, শাংকরভাষ্য, আনন্দগিরি টীকা, শ্রীধরভাষ্য

২২. *ভগবদ্‌গীতা,* ১৪/৪

২৩. ঐ, ১/৪১

২৪. ঐ, ১/৪২-৪৪

২৫. ঐ, ৯/৩২-৩৩

২৬. বেদব্যাসী *মহাভারত,* ৩/১৯০

২৭. *ভগবদ্‌গীতা,* ১০/৩৪

২৮. ঐ, আনন্দগিরিটীকা

২৯. A. L. Basham, *The Wonder that was India,* Rupa, Calcutta, 1971 (first published 1954). প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, J. J. Mayer, Sexual Life in Ancient India, London, 1952; A. S. Altekar, *The Position of Women in Hindu Civilization,* Banaras, 1956.

নারী ও প্রতিবিপ্লব

ভীম রাও আম্বেদকর

মনুর মনোভাব শূদ্রের প্রতি যতটা নমনীয়, নারীর প্রতি ততটা নয়। শুরুতে তিনি নারীর প্রতি অত্যন্ত নিচু ধারণা পোষণ করতেন। মনু বলেন :

দ্বিতীয়. ২১৩। (ছলনায় এ বিশ্বে) পুরুষের মন ভোলানোই তাদের কাজ; এই কারণে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা কখনও নারীর সান্নিধ্যে এলে আত্মবিস্মৃত হন না।

দ্বিতীয়. ২১৪। কারণ নারী (এই) বিশ্বের শুধুমাত্র নির্বোধ পুরুষদেরই বিপথগামী করে না, এমন কি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও বিপথগামী করে কামনা ও ক্রোধের দাসে পরিণত করতে পারে।

দ্বিতীয়. ২১৫। কোনও ব্যক্তির মা, বোন অথবা কন্যার সঙ্গে একত্রে নির্জন স্থানে বসা উচিত নয়। কারণ অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর এবং তা কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে।

নবম. ১৪। নারী সৌন্দর্য বিচার করে না, তারা বয়স সম্পর্কেও ভেবে দেখে না। তারা ভাবে; 'যা'ই হোক না কেন পুরুষ তো বটে', সুরূপ, কুরূপ সকলের কাছেই তারা নিজেকে সমর্পণ করে।

নবম. ১৫। পুরুষের প্রতি তাদের ভাবাবেগের মধ্য দিয়ে, তাদের পরিবর্তনশীল মনোভাবের মধ্য দিয়ে, তাদের স্বাভাবিক হৃদয়হীনতার মধ্য দিয়ে, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই বিশ্বে তাদের যতই সযত্নে রক্ষা করা হোক না কেন।

নবম. ১৬। ঈশ্বর পুরুষকে সৃষ্টির সময় যে দুর্বলতা দিয়েছেন তা স্মরণে রেখে (প্রত্যেক) পুরুষের উচিত সর্বশক্তি নিয়োজিত করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা।

নবম. ৭। (সৃষ্টির সময়) মনু নারীকে দিয়েছেন তাদের আসক্তির শয্যা-আসন এবং (আসক্তির) অলঙ্কার, দূষিত কামনা, আসক্তির ক্রোধ, অসততা, ঈর্ষাপরায়ণতা এবং দুশ্চরিত্র।

নারীর বিরুদ্ধে মনুর বিধান এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত। কোনও মতেই নারীকে স্বাধীনতা দেওয়া চলতে পারে না। মনুর মতে :

নবম. ২। (পরিবারের) পুরুষ সদস্যদের অবশ্য কর্তব্য হল দিবারাত্রি নারীকে অধীনস্থ রাখা, এবং যৌন বিনোদনে নিয়োজিত হলে শুধুমাত্র একজনের নিয়ন্ত্রণে তাদের অবশ্যই রাখা উচিত।

নবম. ৩। শৈশবে তার পিতা তাকে রক্ষা করে, যৌবনে রক্ষা করে তার স্বামী, বার্দ্ধক্যে রক্ষা করে (তার) পুত্র; নারী স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অযোগ্য৷৮

নবম. ৫। বিশেষত তুচ্ছাতিতুচ্ছ (মনে হলেও) দুরভিসন্ধি থেকে নারীকে অতি অবশ্যই আড়ালে রাখতে হবে। কারণ, আড়ালে না রাখা হলে, তা দু'টি পরিবারের দুঃখের কারণ হবে।

নবম. ৬। এই কথা মনে রেখে, জাতি নির্বিশেষে সকলের, দুর্বল স্বামীদেরও প্রধান কর্তব্য হল, তাদের স্ত্রীদের প্রহরায় থাকা।

চতুর্থ. ১৪৭। কোন বালিকা, যুবতী এমনকি কোনও বৃদ্ধারও স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করা অবশ্যই অনুচিত, স্বগৃহে হলেও অনুচিত।

পঞ্চম. ১৪৮। শৈশবে নারী অবশ্যই তার পিতার অধীন, যৌবনে পতির, পতিবিয়োগে পুত্রদের; নারী কখনও স্বাধীন হতে পারে না।

পঞ্চম. ১৪৯। পিতা, পতি বা পুত্রের কাছ থেকে কখনওই তার নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাওয়া উচিত নয়। কারণ তার ফলে নারী উভয় পরিবারের (তার নিজের এবং তার পতির) অবমাননার কারণ হবে।

নারীর কখনওই বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকা উচিত নয়।

নবম. ৪৫। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর একাত্ম, অর্থাৎ একবার বিবাহ হলে আর কখনওই বিচ্ছেদ হতে পারে না।

অনেক হিন্দুই এর চেয়ে বেশিদূর এগোতে চান না। মনুর বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের এটাই শেষ কথা। আর এই মতবাদকে তাঁরা মাথায় করে রাখেন নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে যে, মনু বিবাহকে পবিত্র বলে মানতেন বলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন করেননি। এই ধারণা অবশ্যই সত্যের অপলাপ। তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের অন্য অভিসন্ধি ছিল। পুরুষকে নারীর সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নারীকে পুরুষের সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ রেখে পুরুষকে মুক্ত রাখা।

কারণ মনু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা থেকে স্বামীকে নিরস্ত করেননি। বস্তুত তিনি শুধুমাত্র স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার সম্মতিই জানাননি, এমনকি স্ত্রীকে বিক্রয় করার পর্যন্ত অনুমতি স্বামীকে দিয়েছেন। স্ত্রীকে স্বাধীন হওয়া থেকে বাধা দিতেই তিনি সচেষ্ট। তিনি কি বলেন দেখা যাক :

নবম. ৪৬। বিক্রয় বা পরিত্যাগের ফলে পত্নী পতি থেকে মুক্ত হতে পারে না।

অর্থাৎ কোনও নারী, তাঁর স্বামীর দ্বারা বিক্রীত বা পরিত্যক্ত হওয়ার পরে, সেই নারীকে অন্য কোনও ব্যক্তি ক্রয় অথবা গ্রহণ করলেও আইনত সেই নারী সেই ব্যক্তির পত্নীর পর্যাদা পেতে পারে না। এ যদি চরম অন্যায় না হয় তাহলে আর কি? কিন্তু, মনু তাঁর আইনের ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে নির্লিপ্ত ছিলেন। বৌদ্ধযুগে নারী যে স্বাধীনতা পেত তার থেকে তাকে বঞ্চিত করাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। মনু জানতেন, নারী তার স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটিয়ে, শূদ্রের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি জানিয়ে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বিনষ্ট করেছে। মনু তার স্বাধীনতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, আর তা বন্ধ করতে তিনি তাকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেন।

সম্পত্তির ক্ষেত্রেও মনু পত্নীকে ক্রীতদাসের পর্যায়ে নামিয়ে আনেন।

নবম. ৪১৬। স্ত্রী, পুত্র এবং ক্রীতদাস এই তিন জনের নিজস্ব কোনও সম্পত্তি নেই বলে ঘোষিত। তাদের উপার্জিত (সংগৃহীত) ধন সম্পত্তি সবই হল তাদের মালিকের।

বৈধব্যের ক্ষেত্রে মনু তার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করেছেন—স্বামী যৌথ পরিবারের সদস্য হলে; তা না হলে, স্বামীর স্থাবর সম্পত্তির অংশবিশেষ নির্দিষ্ট করেছেন বিধবার সম্পত্তির হিসাবে। কিন্তু মনু কখনওই তাঁকে তাঁর সম্পত্তির কর্তৃত্ব দেননি। মনুর বিধান

অনুযায়ী নারী সাধারণ শাস্তিযোগ্য। এবং মনু পত্নীকে প্রহারের অধিকার পর্যন্ত পতিকে দিয়েছেন।

অষ্টম. ২৯৯। পত্নী, পুত্র, ক্রীতদাস, ছাত্র বা আপন ভ্রাতা, ভুল করলে দড়ি বা বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে তাদের প্রহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ মনু নারীর স্থান শূদ্রের পর্যায়ে নামিয়ে আনেন।

শূদ্রের মতো, নারীরও বেদপাঠ করা নিষিদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয়. ৬৬। নারীর পক্ষে সংস্কার পালন করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু সংস্কার পালনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

নবম. ১৮। বেদপাঠে নারীর কোনও অধিকার নেই। তাই বেদমন্ত্র পাঠ না করেই তাদের সংস্কার পালন করা হয়। ধর্ম সম্পর্কে নারীর কোনও জ্ঞান নেই। কারণ বেদ সম্পর্কে জ্ঞানের কোনও অধিকার তাদের নেই। অপরাধ পালন করতে বেদমন্ত্র উচ্চারণ আবশ্যক; নারী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে না পারায় সে অসত্যের মতোই অপরিশুদ্ধ।

ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুযায়ী অর্ঘ্যনিবেদনই হল ধর্মের আত্মা। মনু নারীকে অর্ঘ্যনিবেদনের অধিকার দিতে নারাজ। তাঁর বিধান হল :

একাদশ. ৩৬। নারী বেদের নির্দেশ অনুযায়ী দৈনন্দিন অর্ঘ্যনিবেদনের কাজ করতে পারবে না।

একাদশ. ৩৭। এমন কৃতকর্মের জন্য তার নরক বাস হবে।

দৈনন্দিন পূজার্চনা বা অর্ঘ্যনিবেদন থেকে বিরত রাখতে মনু তাকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্য নেওয়া থেকেও বিরত থাকতে বাধ্য করেন।

চতুর্থ. ২০৫। কোন নারীর অর্ঘ্যনিবেদন বা পুজানুষ্ঠানে পরিবেশন করা খাদ্য কখনওই কোন ব্রাহ্মণের গ্রহণ করা উচিত নয়।

চতুর্থ. ২০৫। নারীর নৈবেদ্য অশুভ এবং দেবতাদের গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব তা এড়িয়ে চলাই উচিত।

নারীর বুদ্ধিবৃত্তি, স্বাধীন ইচ্ছা বা চিন্তাধারা থাকতে পারবে না। বৌদ্ধধর্মের মতো কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়েও সে যোগ দিতে পারবে না। যদি সে তা করে তাহলে মৃত্যুকালে তার মুখে প্রথানুযায়ী অমৃতবারি সিঞ্চন করা হবে না।

সবচেয়ে, যে জীবনাদর্শ মনু নারীর কাছে তুলে ধরতে চান, মনুর নিজের ভাষাতেই তা বলা ভাল :

পঞ্চম. ১৬৭। পিতা তাকে যাঁর হস্তে সমর্পণ করবেন অথবা পিতার অনুমতি নিয়ে ভ্রাতা যাঁর হস্তে সমর্পণ করবেন, তাঁকে চিরজীবন মান্য করতে হবে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির প্রতি অপমানজনক কিছু করা নিষিদ্ধ।

পঞ্চম. ১৫৪। ব্যক্তিত্ববিহীন, অন্যত্র ভোগবিলাসী এবং সম্পূর্ণ নির্গুণ স্বামীকেও দেবজ্ঞানে পুজো করাই হল পতিব্রতা স্ত্রীর কাজ।

পঞ্চম. ১৫৩। যে স্বামী মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাকে বিবাহ করেছে, সে সব সময়েই তার স্ত্রীর কাছে সুখের উৎসস্বরূপ—সর্বকালে সর্বলোকে।

পঞ্চম. ১৫০। তাকে সব সময়েই হর্ষোৎফুল্ল থাকতে হবে, গৃহকর্ম সারতে হবে নিপুণভাবে,

পরিষ্কারভাবে বাসন মাজতে হবে এবং হতে হবে মিতব্যয়ী।

হিন্দুরা এই ধারণাকে নারীর এক অত্যন্ত উঁচু আদর্শ বলে মনে করেন।

এর সঙ্গে মনুর পূর্ববর্তীকালে সমাজে নারীর স্থানের কথা বিবেচনা করুন।

অথর্ববেদ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নারীর উপনয়নের অধিকার ছিল। অথর্ববেদে বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্যের পর নারী বিবাহযোগ্য বলে বিবেচিত হত। শ্রৌতসূত্র থেকে জানা যায় যে, নারী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে পারত এবং তাকে বেদ পাঠে শিক্ষা দান করা হ'ত। পানিনির অষ্টাধ্যায়ে গুরুকুলে নারীর পাঠাভ্যাস, বেদের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষালাভ ক'রে মীমাংসায় বিবেশযজ্ঞ হ'য়ে ওঠার প্রমাণ র'য়েছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বলা হ'য়েছে, নারীরা শিক্ষকতা ক'রত এবং ছাত্রীরা বেদ শিক্ষা করত। ধর্ম, দর্শন এবং অধ্যাত্মবিদ্যা'র মতো বিষয়গুলি নিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে আলোচনার বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। সাধারণ-সভায় জনক এবং সুলতার মধ্যে বিতর্ক, যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর মধ্যে বিতর্ক, শঙ্করাচার্য এবং বিদ্যাধরীর মধ্যে বিতর্কের কাহিনী প্রমাণ করে যে, মনু-পূর্ববর্তী যুগে নারী জ্ঞান এবং শিক্ষাদীক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রেছিল।

মনু-পূর্ববর্তী যুগে নারী উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিল, একথা অবিসম্বাদীভাবে সত্য। প্রাচীন ভারতে রাজ্যাভিষেকের সময় রত্নদের মধ্যে রানির প্রধান ভূমিকা ছিল এবং রাজা অন্যান্যদের মতো তাকেও অর্ঘ্যনিবেদন[১] ক'রতেন। রাজা শুধুমাত্র যে রানিকেই শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ক'রতেন তাই নয়, তাঁর অন্যান্য নীচ জাতির পত্নীদেরও তিনি পূজার্চনা ক'রতেন।[২] একইভাবে রাজা, রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পর প্রধানদের[৩] স্ত্রীদেরও অভিবাদন জানাতেন।

কৌটিল্যের সময় নারী[৪] ১২ বছর বয়সে এবং পুরুষ ১৬ বছর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্তি লাভ করত। বয়ঃপ্রাপ্তি অর্থে বিবাহযোগ্যতা বৌধায়নের গৃহ্যসূত্র[৫] থেকে প্রমাণিত হয় যে, বয়ঃসন্ধি পার হওয়ার পরেই বিবাহ হ'ত। কারণ বিবাহানুষ্ঠানের সময় পাত্রীর রজঃস্রাব হ'লে এক শুদ্ধীকরণ অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও দেওয়া র'য়েছে।

কৌটিল্যের শাস্ত্রে সম্মতি'র বয়ঃকাল সম্বন্ধে কোন বিধান নেই। এর কারণ হ'ল :

বিবাহ ছিল বয়ঃপ্রাপ্তির পরের বিবাহ এবং কৌটিল্যের বিচার্য ছিল সেই সমস্ত বিবাহ, যেখানে বর বা বধু বিবাহের পূর্বে অন্য কোন বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ বা রজঃস্বলা নারীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমের কথা গোপন রাখে। প্রথম ক্ষেত্রে কৌটিল্য বলেছেন[৬] :

'কোনও ব্যক্তি যদি তার কন্যার কোনও পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার দোষ গোপন ক'রে বিবাহ দেয়, তা হলে শাস্তি হিসাবে তার জরিমানা তো হবেই, শুল্ক এবং গৃহীত স্ত্রীধন তাকে ফেরত দিতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি পাত্রের ত্রুটি না জানিয়েই কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তা হলে তাকে শুধু যে দ্বিগুণ জরিমান দিতে হবে তাই নয় (বধূলাভের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত), শুল্ক এবং স্ত্রীধনও বাজেয়াপ্ত করা হবে।' শেষোক্ত ক্ষেত্রে কৌটিল্যের নীতি হ'ল[৭] :

'জাতিগতভাবে এবং সমাজে স্থান হিসাবে সম-মর্যাদার কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথম ধাতুর পর তিন বছরের বেশি অবিবাহিতা কোন রমণীর সঙ্গে সংশ্রব থাকা দোষণীয় নয়। এমন কি ভিন্ন জাতির কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথম রজঃস্বলা হওয়ার পর তিন বছর অবিবাহিত জীবন অতিক্রান্ত নিরলঙ্কার কোন রমণীর সংশ্রবে আসাও দোষের নয়।'

মনুর সঙ্গে কৌটিল্যের প্রভেদ হ'ল কৌটিল্য বহু-বিবাহে বিশ্বাসী ক'য়েকটি বিশেষ কারণে কোন ব্যক্তি বহু-বিবাহ ক'রতে পারে। সেগুলি হ'ল :

'যদি কোন নারী কোন (জীবিত) সন্তানের জন্ম না দিয়ে থাকে, অথবা তার গর্ভে কোন পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ না ক'রে থাকে, অথবা যদি সে বন্ধ্যা হয়, তার স্বামী আট বছর অপেক্ষা ক'রবে। (পুনর্বিবাহের আগে) তাকে দশ বছর অপেক্ষা ক'রতে হবে। সে যদি কেবলমাত্র কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, তার স্বামীকে বারো বছর অপেক্ষা ক'রতে হবে। তারপর সে যদি পুত্র-সন্তান পেতে আগ্রহী থাকে সে আবার বিবাহ্ ক'রতে পারে। এই নীতি ভঙ্গ ক'রলে তাকে কেবলমাত্র তার শুল্কই ফেরত দিতে হবে তা-ই নয়, তার সম্পত্তি (স্ত্রীধন) এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ (অধিবেদনিকমর্থম্) এবং সরকারকে ২৪-টি পণ জরিমানা দিতে হবে। শুল্ক এবং স্ত্রীধন দেবার পরে, এমনকি যে নারী তার সঙ্গে বিবাহের সময়েও তা পায়নি তাকেও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ এবং যথেষ্ট পরিমাণ ভরণপোষণ (বৃত্তি) সে দেবে। সে যত খুশি বহু-বিবাহ করতে পারে। কারণ, পুরুষের জন্যই নারীর সৃষ্টি।'

মনুর থেকে কৌটিল্যের আরও পার্থক্য হ'ল কৌটিল্যের সময় পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতার কারণে নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতে পারত :

'স্বামীকে ঘৃণা ক'রলেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন নারী বিবাহ্ ভেঙে দিতে পারত না। কোন পতিও পত্নীর সম্মতি ব্যতিরেকে বৈবাহিক সম্পর্ক ভাঙার অধিকারী ছিল না। কিন্তু পারস্পরিক শত্রুতার ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব (পারস্পরম্ দ্বেষমোক্ষ)। কোন ব্যক্তি তার পত্নীর কাছ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা ক'রে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইলে (মোক্ষমইচ্ছেৎ), সে (বিবাহের সময়) তার কাছ থেকে লব্ধ সমস্ত কিছুই তাকে প্রত্যর্পণ ক'রবে। কোন নারী তার পতির কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কায় বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইলে তার সম্পত্তির অধিকার হারাবে। স্বামী চরিত্রহীন হ'লে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইতে পারে।'

'কোন নারী অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী হ'লে, প্রয়োজন বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি অন্ন-বস্ত্র (গ্রাসাচ্ছাদন) পেতে পারে, যা ভরণপোষণকারীর আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক। সময়কাল (যতটা করে গ্রাসাচ্ছাদন তাকে দিতে হবে এবং অতিরিক্ত এক-দশমাংশ) নির্দিষ্ট হ'লে, তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, ভরণপোষণকারীর আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তাকে দেওয়া হবে। (যথাপুরুষপরিব্যাপম) আর তার শুল্ক, সম্পত্তি এবং ক্ষতিপূরণ তাও (স্বামীকে পুনর্বিবাহে অনুমতি দেওয়াব জন্য তার প্রাপ্য)। যদি সেই নারী তার শ্বশুরকুলের কারুর সুরক্ষায় বাস করে অথবা স্বাধীনভাবে বসবাস শুরু করে, তা হলে তার স্বামীর বিরুদ্ধে (ভরণপোযণের জন্য) অভিযোগ জানানো চলবে না। এইভাবে, ভরণপোষণের বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়।'

কৌটিল্যের কালে কোন নারী বা বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না :

'পতির মৃত্যুর পরে কোন নারী পবিত্র জীবন যাপনে আগ্রহী হ'লে, তৎক্ষণাৎ তার যৌতুক (স্থাপ্যভরণম্) ছাড়াও প্রাপ্য বকেয়া শুল্ক সে ফেরত পাবে। এই দুটি বস্তু ফেরত পাওয়ার পরে সে পুনর্বিবাহ ক'রলে তাকে (ঐ দু'টির মূল্যানুপাতে) সুদ সমেত সেগুলি ফেরত দিতে হবে। দ্বিতীয় বিবাহে আগ্রহী হ'লে (কুটুম্বর্কামা), তার পুনর্বিবাহের (নিবেসকালে) সময় তার শ্বশুর বা স্বামী অথবা উভয়েরই দেওয়া সমস্ত কিছু তার হাতে তুলে দিতে হবে। স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের বিচ্ছেদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নারীর পুনর্বিবাহের কাল নির্দেশ করা হবে।

শ্বশুরের মনোনীত কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্যের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'লে নারীকে (শ্বশুরপ্রতিলোমোননিবিষ্ট) তার প্রয়াত স্বামী এবং শ্বশুরের দেওয়া সমস্ত কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হবে।'

'জ্ঞাতির সঙ্গে পুনর্বিবাহে নারীর জ্ঞাতিরা পূর্বতন শ্বশুরকে তার গৃহীত সমস্ত সম্পত্তিই প্রত্যর্পণ ক'রবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে যেই কোন নারীকে গ্রহণ করুক সে তার সম্পত্তিও সুরক্ষিত রাখবে।

কোন নারীই দ্বিতীয় বার বিবাহের পর তার প্রয়াত স্বামীর সম্পত্তির ওপর তার নিজের অধিকার বজায় রাখতে পারবে না।'

'সে পবিত্র জীবন যাপন ক'রলে তা ভোগ ক'রতে পারে (ধর্মকামভুঞ্জিতা)। কোন নারীর একটি বা একাধিক সন্তান থাকলে (পুনর্বিবাহের পর) তার নিজস্ব সম্পত্তি (স্ত্রীধন) স্বাধীনভাবে ব্যবহার ক'রতে পারবে না, কারণ সেই সম্পত্তি পাবে তার সন্তান-সন্ততি।'

'পুনর্বিবাহের পর কোন নারী তার পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান-সন্ততিদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির অধিকার পেতে চাইলে, তার সন্তানের নামেই তার কাছে গচ্ছিত থাকবে।'

'সন্তানবিহীন এবং প্রয়াত স্বামীর প্রতি অনুরক্ত বিধবা, তার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, আজীবনকাল সম্পত্তি ভোগ ক'রতে পারবে। কারণ, বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই নারীকে সম্পত্তি প্রদান করা হয়। তার মৃত্যুর পর তার বিয় সম্পত্তি তার জ্ঞাতিদের (দয়াদ) হাতেই তুলে দেওয়া হয়। যদি কোন নারীর স্বামী জীবিত থাকে, কিন্তু সে মারা যায় তাহ'লে তার পুত্রসন্তান এবং কন্যাসন্তানরা নিজেদের মধ্যেই সম্পত্তি ভাগ ক'রে নেবে। কোন পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যা সন্তানরাই তা পাবে। তারা কেউই যদি না থাকে তাহ'লে মৃতার স্বামী শুল্ক বাবদ যে অর্থ সে দিয়েছিল তা ফেরত নেবে এবং তার আত্মীয়বর্গ যৌতুক হিসাবে যেসব সামগ্রী তাকে দিয়েছিল তা পুনরায় নিয়ে নেবে।' এইভাবে নারীর সম্পত্তির বিষয়টি নির্ধারিত হয়।

'শূদ্র, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ জাতির পত্নীদের মধ্যে যাদের সন্তান-সন্ততি হয়নি এবং যারা স্বল্পকালীন সফরে বিদেশ গেছে, এমন স্বামীদের জন্য যথাক্রমে এক, দুই, তিন অথবা চার বছরের জন্য অপেক্ষা ক'রবে। কিন্তু কোন সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকলে, তাদের অনুপস্থিত স্বামীদের জন্য, এক বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে। যদি তাদের ভরণপোষণ দেওয়া হয় তাহ'লে উল্লিখিত সময়ের দ্বিগুণ সময় অপেক্ষা করতে হবে। তাদের ভরণপোষণ দেওয়া হ'লে তাদের সম্পন্ন জ্ঞাতিদের উচিত তাদের চার অথবা আট বছরের জন্য ভরণপোষণ জোগানো। তারপর, জ্ঞাতিদের উচিত পুনর্বিবাহের জন্য তাদের মুক্তি দেওয়া এবং তাদের বিবাহে দেওয়া উপহার সামগ্রীগুলি ফেরত নেওয়া। স্বামী ব্রাহ্মণ এবং বিদেশে অধ্যয়নরত হ'লে এবং পত্নীর কোন সন্তান-সন্ততি না থাকলে, পত্নীর উচিত পতির জন্য দশ বছর অপেক্ষা করা। সন্তান থাকলে বারো বছর অপেক্ষা করা উচিত।

স্বামী রাজকর্মী হ'লে পত্নী তার জন্য আমৃত্যু অপেক্ষা ক'রবে, কিন্তু কোন স্ববর্ণ, স্বামীর (অর্থাৎ প্রাক্তন স্বামীর সমগোত্রীয় দ্বিতীয় কোন স্বামী) সন্তান গর্ভে ধারণ ক'রলে দোষ হবে না। (স্ববর্ণতাশ্চ প্রজাত ন প্রভেদম লভেৎ)।'

মনুর থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হ'ল বিবাহিত নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা। পত্নীর বিষয়-সম্পত্তি এবং ভরণপোষণ সম্পর্কে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেওয়া নিম্নলিখিত বিধানগুলির থেকেই তা পরিষ্কার হয় :

'ভরণ-পোষণ (বৃত্তি) অথবা অলঙ্কার (অবধ্যায়)-ই হ'ল নারীর সম্পত্তি। দু'হাজারের বেশি মূল্যের সম্পত্তির সংস্থান (তার নিজের নামে)। অলঙ্কারের কোন পরিসীমা নেই। অনুপস্থিত স্বামী যদি ভরণপোষণের কোন সংস্থান না রাখে তাহ'লে পুত্র, পুত্রবধূ অথবা নিজের ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে ঐ সম্পত্তি ব্যয় করা দোষণীয় নয়। বিপর্যয়, রোগ এবং দুর্ভিক্ষের সময় বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে এবং দানকার্যে তার স্বামীও ঐ অর্থ ব্যবহার ক'রতে পারে। যমজ সন্তানের জনক-জননীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এই সম্পত্তি ভোগ করার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ করা চলবে না। প্রথম চার প্রকারের বিবাহের রীতি অনুযায়ী বিবাহিত কোন স্বামী-স্ত্রী এই সম্পত্তি তিন থেকে চার বছর ভোগ ক'রলেও অভিযোগ করা চলবে না। কিন্তু গন্ধর্ব এবং অসুর বিবাহের ক্ষেত্রে এই সম্পত্তি ভোগ করা হ'লে তা পুনরায় সুদ সমেত ফেরত দিতে হবে। রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহের ক্ষেত্রে এই সম্পত্তির ব্যবহার চৌর্যবৃত্তি ব'লে গণ্য হবে। বৈবাহিক কর্তব্যের বিষয়টির এভাবেই নিষ্পত্তি করা হয়েছে।'

'যে নারীর অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য ভারণপোষণের অধিকার র'য়েছে, তাকে তার প্রয়োজন অনুসারে অথবা তার বেশি এবং ভরণপোষণকারীর সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যথাপুরুষপরিব্যাপমবা) অন্ন-বস্ত্র (গ্রাসাচ্ছাদন) অবশ্যই দেওয়া উচিত। সময়কাল (অতিরিক্ত এক দশামাংশ অর্থ সহ, তা যত দিন দেওয়া হবে) নির্দিষ্ট হ'লে, ভরণপোষণকারীর সামর্থের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক কিছুটা পরিমাণে অর্থ তাকে দেওয়া হবে। যদি শুল্ক, সম্পত্তি এবং ক্ষতিপূরণ (তার স্বামীর পুনর্বিবাহে অনুমতি দেওয়ার জন্য) তাকে দেওয়া না হ'য়ে থাকে, যদি সে শ্বশুরকুলের কারুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে, অথবা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে, তাহ'লে তার স্বামীর বিরুদ্ধে আইনত অভিযোগ (ভরণপোষণের জন্য) করা যাবে না। এইভাবেই ভরণপোষণের বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হ'য়েছে।'

আশ্চর্য মনে হ'লেও কৌটিল্যের সময় দৈহিক পীড়ন এবং মর্যাদাহানির জন্য স্ত্রী, স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ জানাতে পারত।

সংক্ষেপে বলা যায় মনু-পূর্ববর্তী যুগে নারী ছিল মুক্ত এবং পুরুষের সম-মর্যাদার সঙ্গী। মনু কেন তার সম্ভ্রমহানি ঘটালেন?

পাদটীকা

১. জয়সোয়াল : ইন্ডিয়ান পলিটি। ভাগ : ২। পৃঃ ১৬।
২. তদেব। ভাগ : ২। পৃঃ ১৭।
৩. তদেব। পৃঃ ৮২।
৪. শ্যাম শাস্ত্রীর 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র'। পৃঃ ১৭৫।
৫. বৌধায়ন। ১. ৭. ২২।
৬. শ্যাম শাস্ত্রীর 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র'। পৃঃ ২২২।
৭. তদেব। পৃঃ ২৫৯।

নারী ও সংস্কৃতি

সেলিনা হোসেন

একটি জনগোষ্ঠীর হাজার বছরের অভিজ্ঞতা তার সংস্কৃতি। এই অভিজ্ঞতা বিশেষ জনগোষ্ঠী অর্জন করে তার জীবনযাপনের নানাবিধ উপাদানের মধ্য দিয়ে। এসব উপাদানের মাত্রা ব্যাপক। এই ব্যাপক মাত্রার উপাদান জনগোষ্ঠীর জীবনে সব সময়ে এক রকম থাকে না। উপাদানের সঙ্গে নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইতিবাচক ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটে — তা বহুবিধ বঙ্কিমচেতনার জটিলতার স্রোতে প্রবাহিত হয়। ফলে তা হতে পারে দুর্বল, অসুস্থ; হতে পারে পরিশীলিত, রুচিশীল। এটি নির্ভর করে, সেই জনগোষ্ঠী কিভাবে নিজেদের গড়ে তুলেছে তার মৌল সত্যের ওপর। মানুষ যদি আপন জীবনাচরণের মৌলিক গুণাবলির পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারে, তাহলে সে খণ্ডিতবোধ তীব্রভাবে আঘাত করে সংস্কৃতিকে। যদি পার্থক্য নির্ণয় করা না যায় ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার, সাহস ও সন্ত্রাসের, শক্তি ও ক্ষমতার, বিনয় ও দম্ভের, সত্য ও নিষ্ঠার — তাহলে মূল্যবোধের ভিত নড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। মূল্যবোধ সংস্কৃতির অনেক উপাদানের একটি। মূল্যবোধের অবক্ষয় দুর্বল করে সাংস্কৃতিক চেতনা। দুর্বল সাংস্কৃতিক চেতনা পীড়িত করে জনগোষ্ঠীর মানবিক বোধ। মানবিক বোধের অভাবে আক্রান্ত হয় নারী বেশি। নারীর মূল্যবোধের চেতনায় শুভ ও কল্যাণের ধারণা পুরুষের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে হিংস্র ও অমানবিক হয়ে ওঠা তার শ্রেয়োবোধে বাধে। কেননা মাতৃত্ব তার প্রাকৃতিক শক্তি — শিশু তার পার্থিব চৈতন্য — এ দুয়ের মিলনে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক ধারণা সমাজকে এগিয়ে দেয় বলেই সংস্কৃতিতে নারী একটি শক্তি।

সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারী ও পুরুষের যৌথ অনুশীলন প্রয়োজন। নারী এবং পুরুষের যৌথ উদ্যোগের ভেতর দিয়ে যে জীবনের শুরু সে জীবন সংস্কৃতি-বিচ্ছিন্ন কোনো ধারা নয়, সেটাই সংস্কৃতির মূল স্রোত। কিন্তু এই মূল স্রোতকে পঙ্কিল করেছে পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে বিবেচনা না করার মনোভাব। জীবনাচরণের এই শঠতা থেকে উদ্ভূত শূন্যতার কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে নারীর মূল্যায়ন যথাযথভাবে চিহ্নিত নয়। এই সংস্কৃতি নারীকে দেখে জীবনযাপনের ধারাবাহিকতার রশি-টানার মানুষ হিসেবে। জানে, নারী রশিটা ছিঁড়ে ফেলবে না, সেটা তার স্বভাব নয়। এই নির্ভরতাটুকু আছে বলেই সংস্কৃতির গলদ উপড়ে ফেলা শূন্যই থেকে যায় প্রায়শ। খুব দ্রুত কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় না। পুরুষশাসিত সমাজের নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া একতরফা ধারণাগুলো কেউ কেউ মানলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা উপেক্ষিত হয়।

দুই

বহুকাল আগের কথা। অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাসে তোলপাড় তুলেছিলেন একজন মানুষ। তিনি পিথাগোরাস। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮০ সালের কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম। তিনি গাণিতিক চিন্তাধারায়

তত্ত্বঘটিত অভিমত উদ্ভাবন করে একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করেছিলেন। এঁরা পিথাগোরিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে ব্যবহৃত বহু শব্দই পিথাগোরিয়ানদের কাছ থেকে পাওয়া। তাঁরাই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা নয়, গোলাকার। পিথাগোরিয়ানরা জোড় বিজোড় সংখ্যার নামকরণ করেছিলেন। তাঁরা বিজোড় সংখ্যাকে স্বর্গীয় এবং জোড় সংখ্যাকে পার্থিব বলে গণ্য করতেন। বিজোড় সংখ্যা ছিলো পুরুষ এবং জোড় সংখ্যা ছিলো নারী। যাঁরা পিথাগোরিয়ানদের এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা ওঁদের ওই একতরফা ভাগযোগে বিস্মিত হননি, বরং এই ভেবে আত্মতৃপ্তি পেয়েছিলেন যে, সে সময়কার নারীজাতি এই ভাগে কোনো প্রতিবাদ করেনি। বরং খুশি মনে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণায় নারী অল্পতে খুশি হয় এবং অল্পতে খুশি হওয়া তাঁদের উচিত।

কিন্তু আমি এই বিষয়টি দেখতে চাই অন্যভাবে। আমার মনে হয়, এমন ধারণা অসঙ্গত নয় যে, অঙ্কের মতো জটিল শাস্ত্রকে যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁরা আবেগহীনভাবেই স্বীকার করেছিলেন যে, পৃথিবী নারীর। স্বর্গ পুরুষের। ধরেই নিতে হবে যে, অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলো পিথাগোরিয়ানদের সময়কার নারীজাতি। মনে হয় সঙ্গত কারণেই তাঁরা স্বর্গীয় হবার লোভে কোনো প্রতিবাদ করেনি। নিজেদের পার্থিব গণ্য করে ইহলৌকিকতার মধ্যেই জীবনের সত্য, সুন্দর, কল্যাণ, মঙ্গলের ধর্ম খুঁজেছিলো। ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী পুরুষের স্বপ্ন পারলৌকিক, যেখানে যুবতী নারী এবং সুরার কোনো শেষ নেই। তাই পার্থিব জীবনেই নিজেদের স্বর্গীয় বলে কল্পনা করতে তাঁরা দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে নারীরা ভেবেছিলো এই পার্থিব জীবনের আহ্বান গৌরবের। এতে কোনো অবমাননা নেই। শত শত বছর আগে পিথাগোরিয়ানদের সময়ের নারীজাতি যে বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো, সে বোধ বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবাহিত। এটা তো এক চরম সত্য যে, পার্থিব জীবনে গৃহস্থালির ধারণা নারীর মধ্যেই প্রবল, পুরুষের মধ্যে নয়। অন্য দেশের সংস্কৃতি এই চরম সত্যকে কতোটা সমৃদ্ধ করেছে তা আমার জানা নেই, কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতি নারীর গৃহস্থালির চেতনাকে কোণঠাসা করে রেখেছে, তার সুযোগটুকু নিংড়ে নিচ্ছে, মর্যাদাটুকু কেড়ে রেখে — এক সরল একরৈখিক নিপীড়নের ভেতরে তার অবস্থান। এই সংস্কৃতিতে নারী যেন বহিরাগত গৃহস্থ, ব্যঞ্জনের সুবাসটুকু নিয়ে তাকে তৃপ্ত থাকতে হয়। সমাজের পঁচাশি ভাগ নারীকে বাড়ির মাননীয় পুরুষ সদস্যদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বেড়ালের মতো চেছেপুঁছে খেতে হয় হাঁড়ির তলানিটুকু। এঁরা বেশির ভাগ গ্রামের কিংবা নিম্নবিত্ত পরিবারের — যাদের দায় আছে, কিন্তু মর্যাদা নেই। তাঁর চেতনায় শস্যের উপস্থিতি যতো প্রবলই হোক না কেন, তাঁর শরীরে শস্যের আস্বাদ প্রায় শূন্য। সংস্কৃতির এই অবহেলা শুধু ক্ষুধা-সংক্রান্ত অবমাননায় শেষ হয় না, আরো বড়ো অবহেলা ঘটে বিবাহিত জীবনের যৌন সংক্রান্ত ধারণায়। ধর্ম সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। এই জনগোষ্ঠীর ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী চারটি বিয়ের অধিকারী। তাই নারীকে সহ্য করতে হয় পুরুষের ধর্মীয় মোড়ক দেওয়া যৌন কামনার যথেচ্ছাচার। নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষা খারিজ করে দিয়ে স্বামীকে ঢুকিয়ে দিতে হয় সতীনের ঘরে। দরজার ওপারে পুরুষের মাংসাশী উল্লাস, এপারে বঞ্চিত নারীর শূন্য হৃদয়ের আর্তি। এই ক্রুর সত্য এই সংস্কৃতি মুখ বুজে পালন করে।

এই সংস্কৃতি নারীকে নির্যাতিত করে শিশু সংক্রান্ত ধারণায়। অসংখ্য পুরুষ অবলীলায়

ছেড়ে চলে যায় তার সন্তান, নারীর পক্ষে সম্ভব নয় বলবান পুরুষের মতো শিশুদের মাতৃহীন করে নিজের সুখের খোঁজে চলে যাওয়া। গ্রামবাংলার নিরক্ষর অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভর নারী স্বামী-পরিত্যক্ত হয়েও বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখে শিশুদের। নিজের খাবারটুকু তুলে দেয় ওদের মুখে, ছায়াটুকু ধরে রাখে ওদের মাথার ওপর, বেঁচে থাকার আশ্বাসটুকু শোনার জন্য আমৃত্যু অপেক্ষা করে। ঘরগেরস্থি সংক্রান্ত এই ইহলৌকিক বোধ দীর্ঘ দিন ধরে এই সংস্কৃতিতে বহমান। নারীসংক্রান্ত ধারণায় সংস্কৃতির এই ব্যর্থতা জনগোষ্ঠীকে কোনো স্বাভাবিক সুস্থতা দেয়নি — দেয়নি মানবিকবোধের কোনো মহত্তম বিকাশ। তাই চারদিকে এতো নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতনের ঘটনা। যে সংস্কৃতি নারী ও শিশুদের নির্যাতন অনুমোদন করে তা পরিশীলিত নয়, কাঁচা। তার সুস্থতার জন্য করতে হবে দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা।

তবে খুব বিচিত্র বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভাবনা। এ দেশের একটি প্রবাদ এমন : 'ভাগ্যবানের বউ মরে আর অভাগার গরু মরে।' কোনো কোনো পুরুষ এই প্রবাদে উৎফুল্ল হয়। ভুলে যায় যে কতো কুৎসিত এর অন্তর্নিহিত অর্থ। এই প্রবাদে নারী গরুর চেয়েও কম মূল্যবান। কেননা অভাগার স্ত্রী মরলে কিছু যায় আসে না, কিন্তু গরু মরলেই সে সর্বস্বান্ত হয়। এখানেই নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রশ্ন। সম্পর্ক যেখানে শরীরের তখন সেটা এমনই কদর্য। এই একই কারণে কোনো সুস্থ মননশীল মস্তিষ্ক যখন বলে, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' সেই সঙ্গে মনমতো পতি যদি মেলে।' তখন দেখা যায় প্রথম পঙ্‌ক্তিটি প্রায়শ উচ্চারিত হয়, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি বাদ দিয়ে। এটাও সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষ সম্পর্কের নেতিবাচক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ, যেখানে অনায়াসে নারীকে দাবিয়ে রাখার এক ধরনের মানসিক কৌশল। নারীকে সংসারের চার দেয়ালের ভেতর বন্দী করে রাখার এমন নানাবিধ উপায় পুরুষ নিরন্তর খুঁজে ফিরেছে। অন্যদিকে সম্পর্ক যেখানে মাতৃত্বের, সেখানে পুরুষ উদার। মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে নারীর অনুভবকেও পুরুষ ব্যক্ত করেছে কৌশলে। আমরা প্রায় সবাই একটি সংস্কৃত শ্লোকের কথা জানি। সেটি হলো : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' এ পঙ্‌ক্তির আগে আর একটি পঙ্‌ক্তি আছে, যেমন— 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তপ।' অর্থাৎ পিতা স্বর্গ হলেও জননী স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী। এ গরীয়সী জননী লোকসাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে দুয়োরানী হিসেবে। রূপকথার দুয়োরানীকে আমরা সবাই চিনি। আসলে সে তো রমণী নয়, সে এক মাতৃমূর্তি, যার ভেতর বিমূর্ত হয়ে ওঠে দুঃখিনী জননী, যে তার সন্তানকে নিয়ে চলে যায় পিতার কাছ থেকে দূরে, পালন করে গভীর মমতায়। কখনো সে মায়ের কোলে জন্মায় পশু-পাখির আকারে — পেঁচা কিংবা বানর বা ব্যাঙ হয়ে। তারপর একদিন দুঃখিনী মায়ের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দিয়ে সেই পশু কিংবা পাখির খোলসের আকার থেকে বেরিয়ে আসে এক অপরূপ সুন্দর রাজকুমার। এই হলো সন্তানের জন্য মায়ের স্বপ্ন। মায়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক শুধু ব্যবহারিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। 'মায়ের কোলে ঘুম যায় রে দুধের কুমারী' বললেই আবেদন ফুরিয়ে যায় না। মায়ের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ বাংলার লৌকিক ছড়ার মধ্যে চমৎকার ফুটে উঠেছে :

খোকন খোকন ডাকে মায়
খোকন গেছে কাদের নায়

সাতটি কাকে দাঁড় বায়
খোকন রে তুই ঘরে আয়।

এ ডাক একটি শিশুর জন্য একজন মায়ের ডাক। এ আর্তি সন্তানের জন্য আবহমান বাংলার মায়েদের। এই প্রসঙ্গে সেই গল্পটির কথা মনে পড়ছে। একটি প্রচলিত গল্প। গল্পটি এমন : প্রেমিক তার প্রেমিকাকে খুশি করার জন্য বলছে, তুমি যা চাইবে সেটাই তোমাকে এনে দিতে পারি। প্রেমিকা অবলীলায় বলে, তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ডটি এনে দিতে পারো? 'নিশ্চয়ই পারি' বলে ছেলেটি মায়ের হৃৎপিণ্ড আনতে যায়। মাকে হত্যা করে হৃৎপিণ্ডটি নিয়ে যখন দৌড়ে আসছিলো তখন হোঁচট খেয়ে উলটে পড়ে যায় ছেলেটি। ওর হাত থেকে দূরে ছিটকে পড়া হৃৎপিণ্ড বলে ওঠে, বাবা ব্যথা পাসনি তো? এই সংস্কৃতিতে এমন গল্পই সত্য। গ্রামে-গঞ্জের স্বামীপরিত্যক্ত অসহায় নারীরা শিশুদের জন্য নিজের হৃৎপিণ্ডই বন্ধক রাখে। এটি শুধু কোনো দৃষ্টান্ত নয়। তবে সামগ্রিকভাবে নারীর প্রতি ধারণা বড়ো নিষ্ঠুর। ওই অভাগার গরু মরার মতো। কেননা শেষ পর্যন্ত সন্তানের অধিকার পুরুষ নিজের দখলেই রাখে। সামাজিক স্বীকৃতি পুরুষকেন্দ্রিক। কোনো বংশরক্ষা নামের প্রক্রিয়া একটি ভূতুড়ে প্রক্রিয়া, যেখানে মাতৃত্বের বড়াই আছে, কিন্তু মর্যাদা নেই।

তিন

নারীর ভেতরের তীব্র ইহলৌকিকবোধ থেকেই কৃষিসভ্যতার আদিপর্বে নারীর ভূমিকা ছিলো অগ্রগামী। কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এখনো বিদ্যমান থাকায় কৃষিঅর্থনীতিতে নারীর প্রাধান্য বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও দেখা যায়। চাষবাস পদ্ধতি সম্পর্কে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিবেশ গঠনে কাজে লাগিয়েছিলেন একজন নারী। রোদ, বৃষ্টি, মাটি, তাপ, আবহাওয়া ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যিনি, তাঁর নাম খনা। আজ পর্যন্ত খনার বচন আমাদের গ্রামবাংলার নিরক্ষর কৃষকদের মুখে শোনা যায়। তাঁরা শিখেছে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে। চাষের প্রায়োগিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়সম্পর্কিত ধারণাগুলো কতো গভীর হলে তা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মুখে মুখে বেঁচে থাকতে পারে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। খনার অনেক বচনের একটি এমন :

যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

লক্ষণীয় যে, মাঘের শেষে বৃষ্টির সঙ্গে শস্যের ধারণাটিকে তিনি কত চমৎকারভাবে রাষ্ট্রশাসন এবং দেশের সু-অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। শস্যের উৎপাদন ভালো হলে দেশে সুদিন আসবে, সাধারণ মানুষ খেয়ে-পরে সুখে থাকবে এবং রাজার জয়গান গাইবে। সেই রাজাই ধন্য যিনি পুণ্য দেশের শাসক। খনার কয়েকশো বচনের মধ্যে শুধু একটি বচন উদ্ধৃত করে দেখালাম যে, তিনি শুধু কৃষি-নির্ভর বচন রচনা করেননি, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রশাসন এবং দেশের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। খনার এই বচনগুলো দেশের সংস্কৃতিতে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছে — আলোকিত হয়েছে জনগোষ্ঠীর জীবন আচরণের এক বিশাল দিক। সংস্কৃতির একটি ক্ষেত্রকে তিনি অর্থবহ করেছিলেন।

সংস্কৃতি কেউ তৈরি করে না, সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, মেধা এই সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে, কখনো বাক বদলের সূচনা ঘটায়। খনা একজন নারী হয়ে নিজের সংস্কৃতির জন্য সেই জরুরি কাজটি করেছিলেন, অথচ আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, এই সংস্কৃতি নারীর প্রজ্ঞাকে গ্রহণ করে উপকৃত হয়েছে, কিন্তু প্রত্যখ্যান করেছে তাঁর বেঁচে থাকার দাবি। খনার শ্বশুর বরাহ ছিলেন রাজসভার পণ্ডিত। খনার বচনগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠলে বরাহের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে আঘাত লাগে। তিনি সহ্য করতে পারেন না। পুত্রকে হুকুম দেন পুত্রবধূর জিহ্বা কেটে ফেলার জন্য। বরাহের এই আদেশের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেছিলেন কিনা জানা যায় না, কৃষককুল ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিনা তারও কোনো প্রমাণ নেই। খনার স্বামী অনুগত পুত্র হয়ে পিতার হুকুম পালন করেছিলেন। এই হুকুম পালন করার আগে কাজটি যে তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় করেছিলেন তার প্রমাণ তিনি খনাকে সুযোগ দিয়েছিলেন তাঁর বচনগুলো সবার কাছে বলে যাওয়ার জন্য। তারপর তিনি স্ত্রীর জিহ্বা কর্তন করেন। খনা মারা যান। উড়িয়া ভাষায় খনা শব্দের অর্থ 'বোবা'। সংস্কৃতির এমন নির্মম পরিহাস। নারী বলে তাঁর এই জীবনদান। সংস্কৃতির এই ধারাবাহিকতায় আজকের দিনে নারীর ওপর নতুন যে নির্যাতন নেমে এসেছে সেটা হলো বরাহরূপী মৌলবাদীদের ফতোয়া জারির ঘটনা। গভীরভাবে বিচার করলে বোঝা যায় যে, এটা সংস্কৃতির ভেতরে সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব। মৌলবাদের মতো অপশক্তি বন্ধ করে দিতে চাইছে নারীর ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ করার সুযোগ — অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার। কেননা নারীর এই যোগ্যতাঅর্জন সংস্কৃতিতে দিচ্ছে ভিন্ন মাত্রা। প্রথাগত জীবনাচার যারা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় তাদের পক্ষে এটা সহ্য করা সহজ নয়। তাই নারীমুক্তির প্রশ্নটি ততদিন দ্বিধান্বিত থাকবে যতদিন সংস্কৃতির ভেতরে এই ধারণাটি স্বচ্ছ হয়ে না উঠবে। কতদিন লাগবে এমন একটি ধারণা সংস্কৃতির চৈতন্যে প্রবেশ করতে? বরাহরা যদি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন সময়কে গ্রাস করে রাখার সুযোগ নেয়, তাহলে সাংস্কৃতিকচৈতন্য জট পাকাবে, গিঁট খুলবে না। সংস্কৃতির এই ব্যর্থতা জনগোষ্ঠীকে বোবা করে ফেলবে। আইন করে দু-চারজনকে শাস্তি দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য চাই প্রবল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ।

অথচ আশ্চর্যজনকভাবে আবহমান কালের গ্রামবাংলার নারী তার সচেতনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্ঞা দিয়ে ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করতে ভুল করেনি। একটি লোকগল্প এমন : গ্রামের একজন ধর্মপ্রাণ সরল মানুষ একজন মৌলবিকে প্রতিদিন তার বাড়িতে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করে। তার ধারণা মৌলবিকে ভাত খাওয়ানো সওয়াবের কাজ। মৌলবি প্রতিদিন দুপুরবেলা ভাত খেতে বসার আগে হাত দিয়ে কোনো প্রাণী তাড়ানোর ভঙ্গিতে জোরে জোরে বলে, দূর, দূর। ভাগ, ভাগ। যা। গেরস্থ তো মৌলবির এই আচরণে গদগদ। কিন্তু বাড়ির গৃহিণী কয়দিন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে এই আচরণ দেখে কৌতূহলী হয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, মৌলবিসাহেব এমন করেন কেন? গেরস্থ ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলে, মৌলবিসাহেব এখান থেকে দেখতে পান যে কাবা শরিফে কুকুর ঢুকেছে। তাই তিনি তাড়িয়ে দেন। আহা এমন কামেলমানুষ হয় না। কিন্তু গ্রামবাংলার ধর্মপ্রাণ নিরক্ষর সরল নারী স্বামীর ভক্তির বহর দেখে অভিভূত হয় না। বরং এই অলৌকিক ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। কারণ তার যুক্তি

ধর্মের সঙ্গে মেলে না। শুরু হয় নিজের ভেতর দ্বন্দ্ব। পরদিন দুপুরবেলা মৌলবিসাহেবের ভাতের ভেতরে কই মাছের তরকারি দিয়ে বাসন বোঝাই ভাত উঁচু করে সাজিয়ে পাঠিয়ে দেয়। মৌলবি সাহেব তরকারির জন্য অপেক্ষা করে। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, কী হলো তরকারি আসে না কেন? সেদিন গেরস্থ বাড়িতে ছিলো না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলো গৃহিণী। মৌলবিসাহেবের চিৎকার শুনে নম্র অথচ তীক্ষ্ণ ভাষায় বলে, যে মানুষ এখানে বসে কাবা শরিফে কুকুর ঢুকতে দেখতে পায়, তাঁর ভাতের ভেতরে যে কই মাছ ঢুকিয়ে দিয়েছি সেটা দেখতে পায় না কেন?

গল্পের এই পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে আমাদের মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যর্থতার কারণে সম্প্রতিকালে বাংলাদেশের সংস্কৃতির মূল স্রোতে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। সেটি হলো এই সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভেতর থেকে মৌলবাদের উত্থান, যে উত্থান মূলত নারীকে কেন্দ্র করে ঘটেছে এবং তার নিপীড়নের লক্ষ্যও নারীসমাজ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যর্থতার ফলেই রাষ্ট্রীয় আদালতের বাইরে এক শ্রেণীর লোক সম্পূর্ণ নিজেদের মনমতো আদালত এবং রায় কার্যকর করার জন্য নিজস্ব পদ্ধতি গড়ে তুলেছে, যারা ফতোয়াবাজ নামে চিহ্নিত হয়ে বিগত বছরগুলোতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিথ গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলো সচেতনভাবে না চাইলেও দেখা যাচ্ছে ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্যের ক্ষেত্রে এই দলগুলোর কার্যত নীরব ভূমিকা তাদেরকে রাষ্ট্রযন্ত্রের অনীহার প্রতি সমর্থক করে তুলেছে। তাই নারীর সহজাত-বোধ, সচেতনতা এই কারণে ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়নি। উল্টো যার বিরুদ্ধে তার এমন কঠোর অবজ্ঞা সেই ধর্ম-ব্যবসায়ী হিংস্র গোষ্ঠীর কাছে পরাজিত হয়েছে সে। এভাবে সামাজিক সংস্কৃতিতে প্রতিরোধের উপাদান সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও তা সংগঠিত হয়নি। বরাং বাংলাদেশের কোনো কোনো গ্রামে ফতোয়াবাজরা ফতোয়া দিয়ে নারীর ভোট প্রদানের ক্ষমতাও হরণ করে রেখেছে। এটা এক ধরনের পেশিশক্তির কাছে মেধাশক্তির পরাজয়। কেননা বাংলাদেশের সংস্কৃতি নারীর প্রজ্ঞাকে কাজে না লাগিয়ে তাদেরকে সংসার সুখের করার জন্য গুণবতী হবার উপদেশ দেয়।

চার

নারী নির্যাতনের সঙ্গে পুলিশের ভূমিকার একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। সহজ ভাষায় যিনি নির্যাতিত হন, তাঁর সাহায্যে ছুটে যায় পুলিশ। কেননা তাঁরা রাষ্ট্রের আইন রক্ষাকারী বাহিনী। নারী হলে তো কথাই নেই। সেটি আরো বেশি গুরুত্ব পায় পুলিশের কাছে। গত কয়েক বছরে আমাদের সংস্কৃতিতে পুলিশের ভূমিকায় একটি মৌল রূপান্তর ঘটেছে। পুলিশের যে ইতিবাচক ভূমিকা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো, সেই ভূমিকা কিছু সংখ্যক পুলিশের ন্যক্কারজনক আচরণের কারণে সংস্কৃতিতে একটি নেতিবাচক প্রশ্নের অবতারণা করেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। সরকার বিব্রত হচ্ছে এবং সমগ্র পুলিশ বাহিনীতে, ধরেই নিতে পারি, একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ছায়া পড়েছে। আমরা বলতে শুরু করেছি, রক্ষক ভক্ষক হয়েছে। মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যাওয়া এই কথাটা কোনো অর্থেই সামাজিক সুস্থতার লক্ষণ

নয়, এবং সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় মতো কোনো গৌরবময় সংযোজন নয়।

সংস্কৃতির রূপান্তর একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ভালো অর্থে হোক বা মন্দ অর্থে হোক সেটা আস্তে আস্তে ঘটে। তাই 'নারী নির্যাতন : পুলিশের ভূমিকা' বিষয়টিকে আমি দুভাবে দেখি। একটি আইনের দিক, অন্যটি সংস্কৃতির দিক। রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান আইনের শাসন। এ ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা সীমাহীন। কেন যে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে আইনের শাসন দীর্ঘসূত্রিতায় পরিণত হয় সেটা আমার বোধের অগম্য। বারো বছর বিনা বিচারে জেল খাটার ঘটনা এ দেশেই ঘটেছে। পত্রিকার পৃষ্ঠায় দেখেছি যে পুলিশ ভুল করে তাকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি পড়ে অনেকে ভেবেছেন, বাহ্, এটিতো একটি চমৎকার ছোটগল্পের বিষয়। এই দীর্ঘসূত্রতার অপরাধ কার? কেন ঠিকমতো বিচার হয় না এবং যে মানুষটির জীবন থেকে বারোটি বছর হারিয়ে গেলো সে অপরাধটি যে করেছে তার শাস্তি কে দেবে? প্রায়ই পত্রিকায় দেখি শত শত মামলা বছরের পর বছর ধরে বিচারের অপেক্ষায় আছে। আইনের এই দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বিবেচনায় নারী নির্যাতনে পুলিশের ভূমিকাকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে দেখে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে দিনাজপুরে ইয়াসমিন হত্যাকে কেন্দ্র করে একটি গণবিদ্রোহ এবং সাতজনের শহীদ হওয়ার বিষয়টি সেই সামাজিক আন্দোলনের ফসল।

বিশাল কিছু অর্জন একবারে সম্ভব নয়, কিন্তু একটি ধাপ অগ্রসর হয়েছে এভাবে যে, ইয়াসমিন হত্যার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পত্র-পত্রিকায় বহু লেখালেখি সত্ত্বেও দিনাজপুর যাননি, দুঃখ প্রকাশ করেনি এবং তদন্তের নির্দেশ না দিয়ে বেইজিং-এ চলে গিয়েছিলেন চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে যোগদান করতে। অপরদিকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দিল্লী যাওয়ার আগে চট্টগ্রাম জেলে সীমার মৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ দিয়ে যান। তারা সীমাকে পতিতা বানায়নি, মিথ্যা প্রেসনোট দেওয়ার চেষ্টা করেনি। বিষয়টি সংসদে আলোচিত হয়েছে এবং এগারো সদস্যের সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। ধরে নিতে হবে ৯৫ সালের ২৪ আগস্টের পর থেকে ৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সংস্কৃতির এই গুণগত পরিবর্তনটুকু যে সাধিত হয়েছে তার কৃতিত্ব সম্মিলিত নারী সমাজের। ইয়াসমিন-হত্যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক আন্দোলনের ফলে এটুকু আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির চেতনাগত রূপান্তর। নারী নির্যাতনের ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকার কথা চিন্তা করে আমি সংস্কৃতির দিকটিকে আমার প্রবন্ধের প্রধান বিবেচনা বলে মনে করছি। কারণ আইনের শাসনের ব্যর্থতা আছে বলেই আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে সামাজিক আন্দোলনের মতো বড়ো অর্জনের মধ্য দিয়ে।

'নিরাপদ হেফাজত' নামে দুটি শব্দ এখন হরহামেশা শোনা যায়। পুলিশের ভ্যানে 'নিরাপদ হেফাজতে' ইয়াসমিনকে দিনাজপুরে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন ভ্যানচালক কনস্টেবল অমৃতলাল। কতিপয় পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিত সীমাকে চট্টগ্রাম জেলের নিরাপদ হেফাজতে প্রেরণ করা হয়। শব্দ দুটি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং মুখে মুখে এমনভাবে চালু হয়ে গেছে যেটি এই সংস্কৃতিতে নতুন অর্থবাহী শব্দ। আইনে নেই, জেল কোডে নেই অথচ রীতি হিসেবে সামাজিক নানাবিধ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আমি বলবো এটি সংস্কৃতির ব্যর্থতা। আইনের

ফোকর গলিয়ে নিরাপদ হেফাজতের নামে জেলখানায় হাজতি ও কয়েদিদের সঙ্গে বন্দী নারীরা মূলত 'সাজা' খাটছে। এখানেই সংস্কৃতির প্রশ্ন। প্রক্রিয়াটি চলছে দীর্ঘকাল ধরে, অথচ উত্তরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। 'ক্লোজ' নামক আরো একটি শব্দও পত্র-পত্রিকায় হরহামেশা চোখে পড়ে। আমি নিজেও এ শব্দটার অর্থ নতুন করে শিখেছি। এ শব্দের অর্থ যদি কোনো পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে তবে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্লোজ করা হয়, অর্থাৎ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়, ইউনিফর্ম পরতে দেওয়া হয় না, ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের আইনরক্ষা বাহিনীর কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে এমন কতোগুলো বিষয় আমাদের সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, যা মোটেও সাংস্কৃতিক সুস্থতার চিহ্ন নির্দেশ করে না। সবচেয়ে বড়ো কথা এ বাহিনীর অনেক সদস্য নানাবিধ অনৈতিক কাজকে নৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আনতে চেয়েছে। যেমন : এক. ঘুষ খাওয়াকে অধিকারে রূপান্তরিত করা; দুই. ঘুষ খেয়ে অন্যায় অপরাধকে চাপা দেয়ার নীতিহীনতাকে নৈতিকতায় উন্নীত করা; তিন. প্রায়শ অন্যায় অপরাধকে সংগঠিত হতে দেওয়ার জন্য নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। এরপরও এ বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখতে পাচ্ছি এ বাহিনীর কতিপয় সদস্যের ভূমিকার কারণে পুরো সিস্টেমে একটি বড়ো ধরনের ধাক্কা লেগেছে। এরা ক্রমাগত এগুচ্ছে। এখন নারী ধর্ষণকেও নিজেদের অধিকার মনে করার জন্য দুঃসাহসী, বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দিনাজপুরে ইয়াসমিনকে কেন্দ্র করে যে গণবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে তারপরও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে কুষ্টিয়া, বগুড়া, ঢাকা, সাতক্ষীরা, খাগড়াছড়ি ইত্যাদি অনেক জায়গা হয়ে চট্টগ্রামে। এরা অবলীলায় নারীকে পতিতা বানিয়ে ফেলতে দ্বিধা করছে না। সবচেয়ে রূঢ় সত্য, এদের কাছে পতিতা মানুষ নয়। তাকে পতিতা বানিয়ে ফেলতে পারলে তার মৃত্যুর সব দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর এমন একটি বোধ তাদের মধ্যে কাজ করে বলেই তারা নিরস্ত হয় না। যতোই ক্লোজ করা হোক, সাসপেন্ড করা হোক কিংবা বদলি করা হোক বা জেলে পুরে রাখা হোক। এরা কলুষিত করছে আমাদের শাশ্বত মূল্যবোধ। এই অপসংস্কৃতি রুখতে হলে প্রয়োজন ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

এখানেও একটি প্রশ্ন আছে। আমরা সাংস্কৃতিক চেতনাবোধের দিক থেকে যতোটা সংগ্রামী, সাংস্কৃতিক নান্দনিকবোধের দিক থেকে ততোটা পরিশীলিত নই। ফলে অন্যায় ঘটনা ঘটলে ছোটোখাটো বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলতে আমাদের সময় লাগে না। গুলির মুখে নির্বিবাদে আমরা দাঁড়িয়ে যেতে পারি — কিন্তু কাঁচা, অপরিশীলিত সাংস্কৃতিক চেতনার কারণে আমরা পিছিয়ে পড়ি। থিতিয়ে যাই। নতুন করে শুরু করতে হয়। যতোদিন না আমরা একটি মানসম্মত সাংস্কৃতিকবোধে উন্নীত হতে পারবো, ততদিন নারী নির্যাতনের মতো অমানবিক ঘটনা আমাদের জীবনকে দুঃসহ করে রাখবে। নিজের জীবন দিয়ে একটি নির্মম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন পতিতা মরিয়ম নেছা, যিনি ইয়াসমিন হত্যা মামলার একজন সাক্ষী। আসামি পক্ষের অ্যাডভোকেট মজিবর রহমানের জেরার এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে মরিয়ম বলেন, 'পুলিশ পারে না এমন কোনো কাজ আছে? ওরা মাইনষক মারি ফেলতেও পারে। আবার ইজ্জতও নিতে পারে। তারা ইজ্জত দিতে পারে না।' (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮.১.৯৭)। একজন পতিতা যখন দেশের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন, সে

লজ্জা ঢাকার জায়গা কি বাংলাদেশের কোনো পুলিশ লাইনে আছে? অথচ আমরা কখনো ভুলে যাই না আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেদের সামান্য অস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এই আমাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য। কিন্তু আমাদের নান্দনিকবোধের অভাব আছে বলেই আমরা নারী নির্যাতন ও শিশু নির্বাতন করছি। আমি অবশ্যই এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করছি যে, পুলিশ বাহিনীর ভেতরে যারা সৎ, একনিষ্ঠ কর্মী তাঁরা তাঁদের কতিপয় সহকর্মীর নারী নির্যাতনের ভূমিকাকে কিভাবে দেখছেন সে সম্পর্কে একটি জরিপ পরিচালনা করা। দ্বিতীয়ত, তাঁরা কি তাঁদের সহকর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন? আমি মনে করি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যতিরেকে সংস্কৃতির যে অংশটুকু পচাগলা, নোংরা তার পরিবর্তন কিছুতেই সম্ভব নয়। এর বাইরে পুলিশ বাহিনীতে গুণগত পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

শিক্ষিত মানুষ যাতে এ বাহিনীতে আসতে উৎসাহী হয় সেজন্য বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাদি মানসম্মতভাবে নির্ধারণ করা। তাদেরকে শুধু অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ না দিয়ে, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। সুকুমার বৃত্তিগুলো চর্চা করার মধ্য দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধও জাগিয়ে রাখার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

এটাও সত্যি আইন মানুষকে শাস্ত দিতে পারে, কিন্তু রাতারাতি মানবিক করতে পারে না। দু-চারটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখলে মানুষের চৈতন্য জাগ্রত হবে এমনটি আশা করা যায়। এবং সংস্কৃতি পরিশীলিত হলে আইন রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা রক্ষকেরই হবে, ভক্ষকের নয়। আমরা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাধান চাই। এ দেশে নারী হত্যার কারণে ফাঁসির উদাহরণ আছে, কিন্তু শুধু একটি দৃষ্টান্ত সমস্যার সমাধান করেনি। বরং নারী নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে। এর অন্যতম সমাধান সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপনের ভেতর মানবিক হয়ে ওঠা। সংস্কৃতিকে পরিশীলিত করে তোলার জন্য জনগোষ্ঠীকে সঠিক দিক-নির্দেশনায় চালিত করা।

পাঁচ

গণমাধ্যমের দুটি শাখা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং, নারীকে বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে নানা ধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। তবে 'নারী ও গণমাধ্যম' যখন বিষয় হিসেবে কেউ চিহ্নিত করে তখন ধরে নেওয়া সঙ্গত যে, এ দুটি শব্দের ভিতর এক অলিখিত এবং অনির্দেশিত বিবেচনা আছে। যেটা খতিয়ে দেখা জরুরি। দেখতে হবে সেখানে ইতি ও নেতি নিজেদের জন্য কতোটা জায়গা করে নিয়েছে।

অথচ দেশের যাট ভাগ নিরক্ষর লোকের জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অর্থাৎ রেডিও-টেলিভিশনের ভূমিকা অনেক বেশি কার্যকর। কিন্তু দেখা গেছে এ মাধ্যম দুটি ব্যাপক অর্থে তেমন বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারেনি। আমার বিবেচনায় এর অন্যতম প্রধান কারণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। এ সংস্থা দুটিকে রাষ্ট্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বলে যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের মর্জিমাফিক সংস্থা দুটো পরিচালিত হয়। ফলে এদের নিজস্ব কোনো চরিত্র গড়ে ওঠার

সুযোগ হয় না। সঙ্গত কারণে কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর কার্যকর অনুষ্ঠানমালা তৈরি করে তাকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হয়। ফলে একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও নিছক বিনোদন পরিবেশন করা হয়ে ওঠে তার মুখ্য ভূমিকা, যা সাধারণ মানুষের মূল্যবোধের গুণগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে তেমন কোনো কাজে আসে না। এই সাংস্কৃতিক ব্যর্থতা একটি জাতির মননের অগ্রগতিকে পিছিয়ে রাখে। ফলে নারীবিষয়ক ধারণায় যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলে একটি সুস্থ প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবনযাপন বিন্যস্ত হতে পারে, সে বোধ থেকে সাধারণ মানুষ দূরে সরে যায়। নষ্ট হয় সামাজিক সুস্থতা, পারিবারিক হৃদ্যতা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যাই এখানে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে মানুষকে অনেক বেশি সচেতন করতে পারে, এই বোধটি তারা লালন করে না। এই মিডিয়া বিনোদন পরিবেশনের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের প্রচারের মুখপত্র হয়। রাষ্ট্রপ্রধান স্বৈরাচারী হলে তো কথাই নেই, সেটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে যায়। তৃতীয় বিশ্বের গণমানুষের ইলেকট্রনিক মিডিয়া সংক্রান্ত স্বপ্নের অনেকটা এভাবে চোরাবালিতে পথ হারায়। রক্ষা প্রিন্টিং মিডিয়াকে দিয়ে।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ধর্ষণের কারণে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সে এক কঠিন সময় ছিলো আমাদের জীবনে। অসংখ্য ধর্ষিত নারীর পুনর্বাসন এবং যুদ্ধশিশুর সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছিলো সেই সময়ের সরকারকে। ১৯৭২ সালে এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছিলো 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'। বহু বছর পেরিয়ে গেছে। ইতোমধ্যে 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি থিতিয়ে গেছে। সামনে এগিয়ে এসেছে অন্য শব্দ। এখন উচ্চারিত হচ্ছে 'মহিলা মুক্তিযোদ্ধা'। নারীসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক বিবেচনার এই একটি বোধ, এমন একটি গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে আমাদের বহু বছর সময় লেগেছে। যাঁরা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, করেছিলেন নারীকে অপমানিত করার জন্য নয়। ভেবেছিলেন এই শব্দের ভিতর যে গৌরব আছে সে গৌরববোধ নারীকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এর বেশি কিছু হয়তো ভাবা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতা এ ব্যাপারে হয়েছে উল্টো। 'বীরাঙ্গনা' শব্দ দিয়ে কতিপয় নারীকে চিহ্নিত না করলে কোনো ক্ষতি হতো না। তারা অনায়াসে মিশে থাকতেন অন্য দশ জন নারীর সঙ্গে। যুদ্ধ কিংবা সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রাকৃতিক নিয়মে নারীকে খানিকটা বাড়তি মূল্য দিতে হয়। এই মূল্য যুদ্ধের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে না কেন? যুদ্ধকালীন সময়ে যে কারণে একটা যুবককে হত্যা করা হয়, সেই একই রাজনৈতিক কারণে একজন যুবতী ধর্ষিত হয়। এই বোধটি বুঝে উঠতে আমাদের দীর্ঘ সময় লেগেছে। আর এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে প্রিন্টিং মাধ্যম। বহু বছর ধরে অসংখ্য লেখালেখি এই মৌল সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। আমাদের সংস্কৃতিতে নারী সংক্রান্ত বিবেচনার এটি একটি প্রচণ্ড অভিঘাত। একটি জনযুদ্ধ নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না, এটি যেমন মৌলিক সত্য, তেমনি নারীও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেটিও সত্য। আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত হয়ে এই ধারণাকে স্থায়িত্ব দিয়েছেন।

তেমনি ডা. সেতারা বেগম বীরপ্রতীকও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য স্থাপিত হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করে নারীর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ভিন্ন প্রেক্ষিত মূর্ত করেছেন। উপাধিতে ভূষিত না হলেও আরো অসংখ্য নারী আছেন। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তারামন বিবিকে জনগণের সামনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব প্রিন্টিং মিডিয়ামের। নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি গ্রহণযোগ্য হয়েছেন। এটি একটি বড়ো ঘটনা।

অধিকার মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদার স্বীকৃতি। যদি তাই হয়, তাহলে শুধু নারীর অধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে কেন? যেখানে বঞ্চনা সেখানেই অধিকারের প্রশ্ন। আর নারীর বঞ্চনার শেকড়টি অনেক গভীরে প্রোথিত। কেননা এই সংস্কৃতির একটি লক্ষণীয় দিক হলো, নারীকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে তাকে নারী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা। ফলে মৌল সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণে এই সংস্কৃতিতে নারীর প্রতি বিবেচনা অনেক ক্ষেত্রেই নেতিবাচক।

তবে এটাও ঠিক, ষাট ভাগ নিরক্ষকের দেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়াই নারী সংক্রান্ত ধারণা রূপান্তরের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর মাধ্যম। সে কারণে সম্প্রতি ঘোষিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি'-র ১৩ অনুচ্ছেদে 'নারী ও গণমাধ্যম' শিরোনামায় বলা হয়েছে : 'গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণে বৈষম্য দূর করা; গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে-শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়ে-শিশুর প্রতিফলন ঘটানো এবং নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচার ব্যবস্থা করা... ইত্যাদি।' যদি এভাবে এগুনো যায়, তাহলে নারী সম্পর্কিত ধারণায় জনসাধারণ দ্রুত নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে পারবে।

তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বাংলাদেশের টেলিভিশনে নারী সংক্রান্ত প্রচারের ধারণা খুবই খারাপ। হাল আমলে জাতীয় সংবাদের একটি দৃশ্যের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কোনো এক (জায়গার নাম ভুলে গেছি) বিশাল জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন। জনসভার হাজার হাজার মানুষের মুখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর মুখ। বোঝা যায় ক্যামেরার কৌশল। প্রধানমন্ত্রীকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনার চেষ্টা। আমার মতে এটি সুস্থ চিন্তার চেষ্টা নয়। যে দরিদ্র, নিরন্ন মানুষ ঐ জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সুন্দর চেহারা দেখতে যাননি। তাঁরা গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী সে এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য কী করবেন, তা জানতে। আর টেলিভিশনের সামনে বসে আমি ভেবেছি প্রধানমন্ত্রী তখনই সুন্দর হয়ে উঠবেন, যখন তিনি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবেন। গণমাধ্যমকে সংস্কৃতির এই তাৎপর্যময় বোধগুলোকে অনুধাবন করতে হবে। নইলে নারী নারীই থাকবে, প্রধানমন্ত্রিত্ব তাকে আলাদা মর্যাদা দেবে না।

এমনিভাবে টেলিভিশনের খবরের আরো একটি বিষয় খুব অশ্লীল মনে হয়। কোনো আলোচনা কিংবা সেমিনারে দর্শকদের সারি থেকে অযৌক্তিকভাবে একটি সুন্দর মেয়ে কিংবা একজন মহিলাকে ক্লোজআপে দেখানো। ভাবটা এমন যে, সেমিনারের জ্ঞানী-গুণীদের চেয়ে এ মুখটি দেখালে দর্শকরা বেশি খুশি হবেন। ক্যামেরাম্যানরা সবাইকে চিনবেন, এমন ধারণা

করা সঙ্গত নয়। কিন্তু তাঁরা জ্ঞানী-গুণীজনের নাম তো সভা- আয়োজকদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন। আসলে অনেক সময়ে তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারেন না যে, কাকে কতোটুকু দেখালে টেলিভিশনের সংবাদের গুরুত্ব বাড়বে। এটা সংস্কৃতির ব্যর্থতা।

'ভোরের কাগজ'-এ 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন' শিরোনামে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন লেখা। এই শিরোনামটি আমার কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। বাংলাদেশের নারীবিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়েছিলো দেশের বিভিন্ন জেলায়। আলোকচিত্র শিল্পী মাহমুদ এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন 'আমাদের পৃথিবী' শিরোনামে। মাহমুদের একটি ছবি এমন : একজন বেদেনির পিঠের নীচে একটি পুটলি, কোলের ওপর একটি শিশু। যদি ধরে নিই পুটলির ভেতরে আছে তার জীবনযাপনের সমগ্র উপকরণ, তাহলে তার কোলের ওপরের শিশুটি জীবনের সত্য। এই নারীকে মাহমুদ স্থাপন করেছেন প্রকৃতির কোলে — তার চারদিকে বেড়া নেই, ঘর নেই — উন্মুক্ত আকাশ, খোলা মাঠ, দিগন্ত। এই নারী বিশ্বের মাতৃত্বের প্রতীক। এই নারী এবং শিশু আমাদের চোখের সামনে থেকে বিভিন্ন দেশের সীমানা মুছে দেয় -- আমি আমার দেশের একটি নারী ও শিশুকে মাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে Boundless Universe-এ প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। আমার সামনে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ থাকে না — আমার সামনে সাদা, কালো, বাদামি রঙের মানুষ থাকে না — থাকে মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদার সত্য। ছবিটি দেখে সেই কথাটিই মনে পড়ছিলো : It conveys what is universal to women anywhere, everywhere and across all cultures and boundaries। তবে এটাও সত্য, নারীদেরও দায়িত্ব আছে নিজেদের জন্য। অনেক সময়ে দেখা গেছে, টেলিভিশনের নাটকে নায়িকা একটি চরিত্র রূপায়ণ করতে গিয়ে কী রকম পোশাকা পরবেন সেটাও নির্ধারণ করতে পারেন না। নিজেকে অকারণে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চরিত্রটির কথা ভুলে যান। পোশাকের বাড়াবাড়িতে সেটা ফ্যাশন শোর মতো হয়ে যায়। নাটকের যে চরিত্রটি তিনি রূপায়াণ করছেন, তার প্রতি সুবিচার করেন না। এটি কারোই ভোলা উচিত নয় যে, নাটক একটি শিল্পমাধ্যম। তার যথাযথ রূপায়ণই দর্শকের কাছে কাম্য।

তাই বলছিলাম গণমাধ্যমকে নিজেদের অনুকূলে গড়ে তোলার জন্য নারীকেও ব্যাপক দায়িত্ব পালন করতে হয়। অনায়াসে পুরুষের হাতে ক্রীড়নক হয়ে যাওয়া আর কতো কাল? কারণ পুরুষ নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থে গণমাধ্যমে নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। নারীরও উচিত কতোটুকু ব্যবহৃত হবেন সে সীমানা নির্ধারণ করা।

ছয়

এই সংস্কৃতিতে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেন আর একজন নারী। তিনি বেগম রোকেয়া। নিজের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে তিনি দ্রোহী হয়েছেন — সংস্কৃতির দুর্বল জায়গাগুলো ধরে এমন শক্ত কথা বলেছেন, যে বলা আঘাত করেছে — সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। ধর্ম যে অলৌকিক নয়, পুরুষ মানুষের তৈরি -- এ কথা নানাভাবে তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ওই ধর্মগ্রন্থগুলোকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' যে সমাজে এবং যে কালে বসে তিনি এই

শক্ত কথাটি বলেছিলেন, সে কথা বলা খুব সহজ ছিলো না। তারপরও তিনি পেরেছিলেন, কারণ ধর্মের মূলটুকু গ্রহণ করে খোলসটা বর্জন করেছিলেন। তাই উচ্চ কণ্ঠে বলেছেন, 'ধর্ম শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।' ধর্মের বাড়াবাড়ি — নিয়ন্ত্রিত জীবনের সারাৎসার রোকেয়ার প্রজ্ঞা ও মননকে পুড়িয়েছে। নিজের জীবনে তিনি অবরোধের নামে ধর্মের অভিশাপ কুড়িয়েছেন — ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে হয়েছেন বঞ্চিত, বিয়ের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়েছে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে। তাই ধর্ম তাঁর কাছে প্রথা, বিশ্বাস নয়। সে জন্য তিনি জোর দিয়ে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন, 'ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্ন-বস্ত্র উপার্জন করুক।' একই সঙ্গে মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে বলেছেন, 'ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন বা observe করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি — তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল পাশ করা বিদ্যাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।' অন্যদিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন নারীসমাজকে। বলেছেন, 'আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে।' বেগম রোকেয়া শুধু লিখেই নিজ দায়িত্ব শেষ করেননি, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, মেয়েদের শিক্ষিত করে সংস্কৃতির চেহারা আমূল বদলে দেবার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং মেয়েদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ভেতরে-বাইরে এক করে দিতে চেয়েছিলেন। এই সংস্কৃতিতে তিনি মাইলস্টোন। অনুধাবন করেছিলেন সংস্কৃতির শক্তি, তাই দ্বিমুখী চেষ্টায় একে বেগবান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতির ব্যর্থতা এমন যে, ধরে রাখতে পারেনি এই বিপুল অনুভবকে। তাই ক্ষয়ের ভাগ বেশি, নির্মাণের অংশ ধীর।

সাত

পৃথিবীতে বসতি শুরু হয়েছিলো নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায়। সভ্যতার শুরুতেই নারী-পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক তফাত তৈরি হয়নি, মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়ার শ্রেয়োবোধটি ছিলো প্রধান। কিন্তু সময় এক রকম থাকেনি, গড়িয়েছে প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। নারী ছিটকে পড়েছে মানুষ নামের বিশেষণ থেকে, শুরু হয়েছে পুরুষের একতরফা কর্তৃত্ব। তারা এ কর্তৃত্ব গড়ে তোলে দুটো ভিত্তির ওপর : একটি ধর্ম, অন্যটি অর্থনীতি। এই দুটি ক্ষেত্র নারীকে প্রবলভাবে কোণঠাসা করে রেখেছে। এ দুটো এ সংস্কৃতির ভেতরে নারী সংক্রান্ত ভাবনার মৌল সত্য। এর পাশাপাশি নানা ধরনের ভিন্নমুখী তরঙ্গ এসে আঘাত করতে শুরু করেছে। একদা আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুফিয়া কামাল তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'আমাদের জাতীয় জীবনে বর্তমান সময়ে এক সংকটময় কাল চলছে। সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, অন্যায়-অবিচার সমাজ জীবনকে গ্রাস করেছে।' তাই তিনি দেশের দুই নেত্রীর মঙ্গল কামনা করে আশাবাদ ব্যক্ত করেনে যে, তাঁরা মায়ের মমতা দিয়ে দেশ শাসন করবেন। মায়ের মমতা যে কোনো

দেশের যে কোনো সংস্কৃতির একটি চিরকালীন মানবিক সত্য। ক্ষমতায় নারী থাকলে সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, মাতৃহৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ তাঁর কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হবে। সুফিয়া কামাল যে সময়ে এমন আহ্বান জানান, তখন বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও প্রবলভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে একটি শব্দের, তা হলো 'সন্ত্রাস'। প্রতিনিয়ত শোনা যায় মায়েদের বুক-ফাটা কান্না। পত্রিকা খুললে দেখা যায় নিহতদের ছবি। বাতাসে লাশের গন্ধে ভরে আছে এ দেশ। চারদিকের পরিস্থিতি দেখে প্রশ্ন জাগে সত্যি কি মমতা নামের কোমল হৃদয়স্পর্শী কোনো শব্দ আছে বাংলাদেশে? যারা সন্ত্রাস করছে তাদেরকে রাজনীতির ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যে উসকে দিচ্ছে সেইসব দল, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে নারী। এ যেন সেই মধ্যপ্রাচ্যে উটের দৌড়ের খেলা। আন্তর্জাতিক শিশু পাচারকারীদের হাতে বাংলাদেশের শিশুরা মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়। উটের দৌড়ের খেলায় শিশুদের উটের পিঠে বেঁধে দেওয়া হয়। শিশুদের মরণ চিৎকারে বিপন্ন হয়ে উটগুলো দ্রুত গতিতে দৌড়তে থাকে। এ দেশের সন্ত্রাসীরা মধ্যপ্রাচ্যের উটের চেয়েও খারাপ। নির্বোধ পশু শিশুর কান্না সইতে পারে না। তাই ছোটার গতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সন্ত্রাসীরা নির্বোধ নয়। তবুও নেতা-নেত্রীদের উচ্ছল, হাস্য-কলরোলের ধ্বনিতে তাড়িত হয়ে তীরবেগে ছুটতে গিয়ে কেউ কেউ মুখ থুবড়ে পড়ে। তরুণরা নিজেরাও বুঝতে পারে যে, চক্রান্তের শিকার হয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে মৃত্যুর দেশে। এ মৃত্যুর দায় নেতা-নেত্রীদের। ঘটনা ঘটিয়ে, মেরে-ধরে ধরাশায়ী করে আহতদের হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে এ দেশে। নিহতদের লাশের পাশে নেতা-নেত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় করুণ চেহারায়। সান্ত্বনা দিতে দেখা যায় শোকার্ত পরিবারকে। সেই সব ছবি ঘটা করে পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়। আহত-নিহত হলে দেখতে যাওয়া এবং শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়া সাংস্কৃতিক আচার। এটা মানবিক বিবেচনারও অংশ। কিন্তু বর্তমানে এ দেশে যেভাবে সন্ত্রাসের কারণে তরুণেরা নিহত হচ্ছে, তা প্রতিদিনের ঘটনায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভাবতে ভয় হয়, এই রীতি জীবনযাপনের অংশ হয়ে যাবে কিনা? এ দেশের সংস্কৃতিতে এ রীতি অঙ্গীভূত হয়ে যাবে কিনা? মমতা কি উড়ে যাবে এ দেশের আবেগের জলহাওয়া থেকে? সম্প্রতি বাজারে একটি শব্দ চালু হয়েছে 'ডিফলটার কালচার'। ব্যাংকঋণ-খেলাপিদের থেকে শব্দটা এলেও, খেলাপকারীর ভূমিকা আমাদের জীবনের সব জায়গাতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানি না মানবিক আবেগের খেলাপকারী সংস্কৃতি আমাদের গ্রাস করতে যাচ্ছে কিনা। এটা তো বিদেশি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ নয়। এটা দেশীয় সংস্কৃতি থেকেই জন্ম নিচ্ছে। বিদেশি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আমরা বড়ো বেশি সোচ্চার — বক্তৃতা, বিবৃতিতে একে রুখতে হবে বলে ঘোষণা দিচ্ছি, কিন্তু টের পাচ্ছি না যে, নিজেদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে — নারীর নেতৃত্বও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারছে না। এ দেশের সংস্কৃতি রাজনীতির কাছে পরাজিত হচ্ছে — পিছু হটছে তার চিরকালীন মূল্যবোধ।

বৌদ্ধ জাতকে আছে আরুণিকের গল্প। বন্যার তোড়ে ক্ষেতের আল ভেঙে গিয়ে ফসল নষ্ট হতে শুরু করলে নিরুপায় গ্রামবাসী গৌতম বুদ্ধের কাছে এলেন। গৌতম বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য আরুণিককে বললেন, যাও, আল বাঁধো। আরুণিক শত চেষ্টা করেও কোনো কিছু দিয়ে আল বাঁধতে না পেরে স্রোতের মুখে নিজের দেহকে অর্পণ করেন। আল রক্ষা হয়।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী 'ডিফলটার কালচার' সুস্থ সংস্কৃতির আল ভেঙে দিচ্ছে — অবক্ষয়ের তোড়ে ভেসে যেতে চাইছে মানবিকতার হাজার রকম বোধ। এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তা রক্ষা করা যায়, যদি নারীরা আরুণিকের মতো আল বাঁধায় প্রতিজ্ঞ হয়। কারণ নারীর মানবিক বোধ সহজাত, প্রাকৃতিক ক্ষমতার দাপট ছাড়া সেটা সহজে টাল খায় না। দু-চারজন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নারীদের বাদ দিয়ে বাকি নব্বই জনই আরুণিক হতে পারে। এই সংস্কৃতি আবহমান কাল থেকেই এ সত্যকে পালন করেছে।

আরুণিক গুরুর ডাক শুনেছিলেন। প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই বিবেক নামক একজন গুরু থাকে। ইচ্ছে করলে তার ডাক শোনা যায়। দুই নেত্রীর প্রতি মায়ের মমতা দিয়ে দেশ শাসনের আহ্বান সুফিয়া কামালই জানাতে পারেন। কারণ, তিনি তাঁর বুকের ভেতর গুরুর ডাক শুনতে পান। তিনি তাঁর আজীবনের নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আহ্বান শোনার দায়িত্ব তাঁদের যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, বিরোধী দলে আছেন। বিপথগামীদের বিপথে ঠেলে দেওয়া সংস্কৃতির ধর্ম নয়। বিপথগামীদের ডাক দিয়ে ফেরাতে হবে। নারীর সম্ভাবনা একশো ভাগ, আগেই বলেছি নারীর ভেতরকার গুণাবলি অনেক বেশি সহজাত। তাই সংস্কৃতির বিপর্যয়কে রক্ষা করতে পারে নারীরা — মুছেও দিতে পারে সংস্কৃতির ব্যর্থতা।

আট

ক. বাংলাদেশের ফেনী জেলার একটি ইউনিয়নের নাম কালীদহ। এ গ্রামের মায়েদের যদি তাদের সন্তানের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁরা অবলীলায় শুধু ছেলে শিশুর সংখ্যা বলেন। মেয়ে-শিশুদের তাঁরা গণনার মধ্যেই গণ্য করেন না।

খ. কুমিল্লা সদর থানা থেকে খুব কাছেই একটি গ্রাম। নাম ধনঞ্জয়। এ গ্রামের অধিকাংশ অভিভাবকরা শিক্ষাকে 'অকাজ' হিসেবে গণ্য করে। আর এই অকাজটি করার জন্য মেয়ে-শিশুদের স্কুলে পাঠানো হয়। আর ছেলে-শিশুটি বাপের সঙ্গে ক্ষেতে, বাজারে, দোকানে কাজের কাজটি করতে যায়। কাজের কাজটি হলো সেই শিশু বয়সে সংসারের জন্য উপার্জন করা।

গ. পত্রিকার পৃষ্ঠায় আমরা দেখেছি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহেশপুর গ্রামের সুরাইয়া বেগম চার কন্যাসহ ট্রেনের নীচে আত্মহত্যা করেছেন। একটি পুত্রসন্তানের জন্য তাঁর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার উদ্যোগ নিলে সুরাইয়া বেগম আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রশ্ন হলো মায়ের কী অধিকার আছে এমন একটি ঘটনা ঘটানোর? মা চেয়েছেন তাঁর মেয়েদের নারী হওয়ার কারণে যেসব দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে তার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে। চাননি তাঁর মেয়েরা তাঁরই মতো একই রকম পরিস্থিতির শিকার হোক। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এখন পর্যন্ত এ ধরনের বড়ো ঘটনার অনুকূলে।

এটি সংস্কৃতির ব্যর্থতা। এই সংস্কৃতিতে বসবাসকারী শিশুরা মায়ের অভিমান ও অভিজ্ঞতার যন্ত্রণার মূল্য দেয় জীবন দিয়ে। আর জীবন দিতে না পারলে বড়ো হয় সংস্কৃতির আস্তাকুঁড়ে পোড়ো জীবনের ধারণা নিয়ে। আর কতোকাল কাঁচা অপরিশীলিত সংস্কৃতির দায়ভার তারা টানবে?

এমন উদাহরণ আরো আছে। উল্লেখের প্রয়োজন নেই। এটি হলো এখনকার বাংলাদেশের নারীভাবনার সামাজিক প্রেক্ষাপটের একটি দিক। অন্য দিকের দু-একটি চিত্র তুলে ধরছি :

ক. বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার উপকূলীয় চরাঞ্চলের একজন নারী। তাঁর স্বামী ধান কাটতে অন্য একটি চরে গিয়ে সেখানে আর একটি বিয়ে করে বসবাস শুরু করে। সেই নারী বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, আমার যৌন চাহিদা আছে, তাই আমি অন্য পুরুষের কাছে যাবো। সন্তানের পিতা কে তা নিয়ে অন্যদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। কারণ সন্তানের প্রতিপালন আমিই করবো। সে আমার পরিচয়ে বড়ো হবে। বাপের দরকার নেই।

খ. যশোর জেলার কোনো এক গ্রামের একটি মেয়ে। স্বামী এবং শাশুড়ির কাছে যৌতুকের জন্য নিগৃহীত হতে থাকলে একজন এন. জি. ও. কর্মীর সহায়তায় বাড়ি ত্যাগ করে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যায়। সেই এন. জি. ও.-তে কাজ করে সে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায় এবং একটি বেড়ার ঘর নিয়ে বসবাস করে। তার এই উন্নতি দেখে স্বামী ফিরে আসতে চায়। মেয়েটি সন্তানের পিতৃপরিচয়ের কারণে স্বামীকে ক্ষমা করে এবং একসঙ্গে বসবাস শুরু করে।

গ. ঢাকা শহর। উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়ে। বাবা-মা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে। ছেলেটি বিদেশে থাকে। মেয়েটি মাকে বললো, তোমরা আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে চাইছো আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমি ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

নির্দিষ্ট দিনে দুজনে কোনো এক রেস্তোরাঁয় বসে। মেয়েটি বলে, লুক, আই অ্যাম নট ভার্জিন। ছেলেটির উত্তর, আই ডোন্ট মাইন্ড।

ঘ. ঢাকা শহর। একজন মা। মেয়ের বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান করবেন। মেয়েটি একটি বিদেশি ছেলেকে বিয়ে করেছে। মা আমাকে বললেন, বিয়ের কার্ডে লিখবো যে, মেয়ের তৃতীয় বিয়ে উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান। জিজ্ঞেস করলাম, তৃতীয় নিয়ে লিখতে হবে কেন? মায়ের সগৌরব স্মার্ট উত্তর : ছেলেরা চারটা-পাঁচটা করতে পারলে মেয়েরা পারবে না কেন?

এগুলো হলো আজকের বাংলাদেশের নারীবিষয়ক ভাবনার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিন্তা। এটি কোনো অর্থেই দেশের সামগ্রিকতা নয়। তবে এসবের ভেতর দিয়েই সমাজের দ্বান্দ্বিক দিকটি পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। প্রথম উদাহরণগুলোর দিকে যদি তাকাই, তাহলে অবশ্যই মনে হবে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময় থেকে খুব একটা এগোইনি। এখনও বাল্যবিয়ে আছে। কিশোরী পতিতার সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এখন সতীদাহ প্রথা নেই ঠিকই কিন্তু ধর্ষণ, নির্যাতন, হত্যা খুন ইত্যাদির মধ্যে তার রূপান্তর ঘটেছে। ধরনটা পালটেছে শুধু।

অন্যদিকে সমাজের একটি অংশ খুব দ্রুত নারীবাদী প্রক্রিয়ার ভেতর নিজেদের স্থান করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় আঘাত হানার চেষ্টা করছে। নারীকে নানাবিধ নারী সংক্রান্ত ধারণায় সচেতন করে তুলবার চেষ্টা করছে। গর্ভধারণের সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সমকামিতা পর্যন্ত নারীর অধিকার বলে দাবি করা হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মৌলচিন্তা, উত্তরাধিকার আইনে যথাযথভাবে উত্তরাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

বিশ্ব জুড়ে নারীবাদী ধারণা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। চলাটা স্বাভাবিক। তবে যতো

যা কিছুই ঘটুক না কেন পঁচানব্বই ভাগ নারীই কিন্তু এখন পর্যন্ত জীবনের মূল সত্যটুকু থেকে দূরে সরে যায়নি। উদাহরণ প্রিন্সেস ডায়ানা। তাঁর সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব, বিত্ত, খ্যাতি ইত্যাদি দিয়ে তিনি জগৎজোড়া মিথ হয়েছেন। কিন্তু অসাধারণ তাঁর মাতৃত্ববোধ, তীব্র তাঁর সন্তানের মঙ্গলচেতনা। এই একটি জায়গায় তিনি সব মোহের ঊর্ধ্বে।

১৯৯৪ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ফেলোশিপে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের SOAS-এ কাজ করেছি ডক্টর উইলিয়ম রাদিচের সঙ্গে। বাংলা বিভাগের ছাত্রী ছিলো রিনি চ্যাটার্জি। কলকাতা থেকে তিন বছর বয়সে বাবা-মার সঙ্গে লন্ডনে আসে। ইংরেজ বিয়ে করেছে। একটি মেয়ে আছে। SOAS-এর স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সদস্য ছিলো। একদিন বিভাগীয় নোটিস-বোর্ডে তসলিমা নাসরিনের ছবির ক্লিপিং দেখে বললো, আপনি SOAS-এও উগ্র নারীবাদী সমিতি পাবেন। ওরা লেসবিয়ান। উচ্ছৃঙ্খলতাকে অধিকার মনে করে। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ওই সমিতির মেম্বার? বললো, মোটেই না। আই হেট অল দিস নুইসেন্স। শুনে অবাক হবেন, আমার পরিচিত একটি কানাডিয়ান মেয়ে ওর বুড়ো বাবা-মাকে দেখাশোনার জন্য চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছয় মাসের জন্য কানাডায় যাচ্ছে। আমরা এসব মূল্যবোধেই বিশ্বাস করি। SOAS-এর লম্বা করিডোরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমা সভ্যতায় বড়ো হওয়া একটি মেয়ের কথা শুনে স্বস্তি বোধ করি। ও আরো বলে, ফ্যামিলির বন্ধন অনেক বড়ো। আমি বললাম, প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে। বিপরীত স্রোতে বেশিক্ষণ সাঁতরানো যায় না।

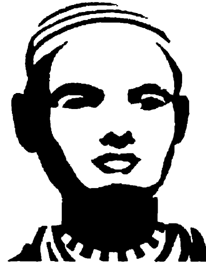
বাংলাদেশের মতো হতদরিদ্র একটি দেশে বই পাড়ার আড্ডায় বসে যারা নারীবাদের তুমুল বিতর্কে আসর মাতিয়ে তোলে, তাদের বিপরীত অবস্থানে আছে গার্মেন্টসে কর্মরত নারী শ্রমিকরা। ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় এটি একটি অসাধারণ দৃশ্য। ভোর বেলা দল বেঁধে ঘরে ফেরে। সংস্কৃতির নারী সংক্রান্ত নেতিবাচক ধারণায় এটি একটি অসাধারণ ইতিবাচক সংযোজন।

সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়া খুব ধীর। এই প্রায় নিরক্ষর সমাজে নারীকে নিয়ে ভাবনা খুব সহজ কথা নয়। তবে গ্রামেগঞ্জে কাজের সুযোগ তৈরির ফলে নারীদের ভাবনায় প্রাগ্রসরতা এসেছে। প্রথাগত শিক্ষাব বাইরে নিজের প্রজ্ঞা, বিবেক এবং মেধার ব্যবহার করতে শিখছে। তবে আগেই বলেছি প্রক্রিয়াটা ধীর গতির। রাতারাতি কিছুই হবে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সংস্কৃতি আপন নিয়মে ভালোটুকু রেখে আবর্জনাটা ফেলে দেবেই।

বাংলাদেশের নারীরা মুক্ত হবে সংস্কৃতির হাজার রকম জঞ্জাল থেকে। আমাদের বেঁচে থাকা পরিশীলিত এবং রুচিশীল হবে। নারী-পুরুষের একসঙ্গে বেঁচে থাকার মানবিক শ্রেয়োবোধ এই ছোট্ট ভূখণ্ডের দারিদ্র্য-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রস্ফুটিত হবে। কবে? সময়ের অপেক্ষা। সে সময় তৈরি করতে হবে আমাদেরকেই। তবে যা কিছু সত্য, সুন্দর, স্বাভাবিক সে মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রবীণ এবং নবীন উভয়ের সমন্বয়ে।

নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতন, গণতন্ত্র ও সুশীলসমাজ ● নারী নির্যাতনের ফন্দি-ফিকির ● নারী নির্যাতন : এর শেকড়ের সন্ধানে ● নারী নির্যাতনের সেকাল-একাল ● মধ্যপ্রাচ্যের নারীসমাজ ও নারী নির্যাতন ● জাতিভিত্তিক নিপীড়ন : নিম্নবর্গের নারী ●



'সর্বপ্রকারের শাস্ত্রিক সামাজিক নৈতিক সংস্কারের বন্ধনমুক্তিই নারীকে দাম্পত্য, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দেবে সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। আর্থিক স্বনির্ভরতাই নারীকে নিপীড়নমুক্ত করবে।'



'সব শাস্ত্রে পুরুষই নারীর অভিভাবক। অতএব শাস্ত্র পরিহার করে নাস্তিক না হলে নারী পুরুষের মতো পূর্ণ স্বাধীন হতে পারবে না।'

নারী নির্যাতন, গণতন্ত্র ও সুশীলসমাজ

আলী আনোয়ার

ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণা ইউরোপের দেশে দেশে গৃহীত হতে থাকে। অনেকেই মনে করেন সে-ই আধুনিক রাষ্ট্রের সূচনা। রাষ্ট্রের এই ধারণা যে সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তবায়িত হল, তা ঠিক নয়। তবে রাজতন্ত্রের ধারণা তার গ্রহণযোগ্যতা হারাল। জন্মপরিচয় ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারভিত্তিক ক্ষমতার বিন্যাসের ন্যায্যতা ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। গোত্র, বংশ, শ্রেণিনির্বিশেষে ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি একটি লক্ষ্য ও দাবি হিসেবে উচ্চারিত হল। ইতিহাসে এই প্রথম ব্যক্তি তার সমস্ত সত্তা নিয়ে, তার রাজনৈতিক অধিকারের দাবি নিয়ে আবির্ভূত হল। ব্যক্তির স্বীকৃতি ছাড়া গণতন্ত্র নেই। এই অধিকার সকলের হয়ে, সকলের জন্য। ব্যক্তির বিকাশ আধুনিকতার সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি এবং সে জন্যেই তা সর্বজনীনভাবে আজও বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তির বিকাশ মানে প্রতিটি ব্যক্তির অনন্যতার স্বীকৃতি এবং তার মেধার, আনন্দময় জীবনযাত্রার ও সৃষ্টিশীলতার জন্য পরিসর তৈরী করা, তথা তার নিজের জীবনের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কী তাই ঘটল? না, তা সর্বতোভাবে অর্জিত হল না কিছু কিছু অধিকার অর্জিত হল—কোথাও কোথাও। কিন্তু এসব অধিকার কারও কারও থাকবে কারও থাকবে না- এরকম হলে কিন্তু ঠিক গণতন্ত্র অর্জিত হয় না। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে গণতন্ত্রের সূতিকাগার গ্রীকসমাজেও মেয়েদের এবং দাসদের রাজনৈতিক অধিকার ছিল না—এরিস্টটল এতে অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি। আরও দু হাজার বছর পরেও মেয়েদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিলনা। শুধু যে রাজনৈতিক অধিকার ছিল তাই নয়, মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না, ব্যাংকে টাকা রাখার অধিকার ছিল না, শিক্ষার অধিকার ছিল না, বিবাহে অসম্মতি ও বিচ্ছেদের অধিকার ছিল না। সন্তানদের ওপর অধিকার ছিল না। তারা ছিল বস্তুত দাসদের মতো। মিল এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'bond slave in marriage'। ফলত গণতন্ত্র ঠিক হয়ে ওঠেনি। যুক্তরাষ্ট্রে যেমন দাসদের শুধু যে রাজনৈতিক অধিকার ছিল না তাই নয়, তাদের নিজেদের জীবনের ওপর, তাদের স্ত্রী-সন্তানের ওপরও কোনো অধিকার ছিল না ১৮৬৫ সালে দাসপ্রথা অবলুপ্তির আগ পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা রাজনৈতিক অধিকার পেয়েছে মাত্র সেদিন। ভোটাধিকার মানে কিন্তু সমতা নয়—মেয়েদের ক্ষেত্রেও নয়। তবু গণতন্ত্র আদর্শ হিসেবে বাঞ্ছনীয়, কারণ সর্বসাধারণের অধিকার অর্জনের অন্য কোনো রাজনৈতিক কাঠামো আমাদের প্রাপ্তির সীমার মধ্যে নেই। অবশ্য আজকের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, গোষ্ঠীগত ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পরিমণ্ডলে এটুকু আদর্শও অপ্রাপনীয় বলে মনে হয়।

পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতিবাহিত আধুনিকতার জন্য এরকম প্রচণ্ড মূল্যও মানুষকে দিতে হচ্ছে। সেই মূল্য পাশ্চাত্যকেও দিতে হয়েছে, এখন দিতে হচ্ছে আমাদের মতো অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে। রাষ্ট্র ক্রমেই নৈর্ব্যিক্তিক, সর্বগ্রাসী ও সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র

ব্যক্তিকে গিলে খাচ্ছে। হবস্ অবশ্য সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগেই রাষ্ট্রের ওই প্রবণতা আঁচ করেছিলেন এবং একে তুলনা করেছিলেন বাইবেলকথিত এক বিশাল তিমি 'লেভিয়াহানের' সঙ্গে, যার পেটের মধ্যে রয়েছি আমরা। হবস্ যেখানে একে অনিবার্য মনে করেছিলেন, রুশো সেখানে এই সর্বগ্রাসিতা থেকে মানুষকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, তাই ভেবেছিলেন। বস্তুত তার চিন্তার প্রস্থানভূমিই হচ্ছে রাষ্ট্রের হাতে ব্যক্তির বন্দিত্ব; অথচ মানুষ তো আত্যন্তিকভাবেই স্বাধিনতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে 'Man is born free, but everywhere he is in chains' (1762)। তার সমস্ত চিন্তা হচ্ছে এই শৃঙ্খলমুক্তির চিন্তা। রক এবং মিল্টন এবং আরও একশ' বছর পরে উইলিয়াম গডউইন ও বাকুনিন অত্যাচারী শাসকদের বলপ্রয়োগ করে উৎখাতের কথা বলেছিলেন। টুর্গেনিভের উপন্যাস 'পিতাপুত্রে' নিহিলিস্টদের আর্বিভাব লক্ষ্য করি। 'নিহিলিস্ট' বা নৈরাজ্যবাদী শব্দটিও টুর্গেনিভেরই সৃষ্টি। কিন্তু যেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল, যারাই রাষ্ট্রের হাত থেকে ব্যক্তির মুক্তির কথা বলেছিলেন, তারা নারীর অধিকার ও মুক্তির প্রশ্নকে ওই সামগ্রিক মুক্তির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল—যিনি ব্যক্তির মুক্তি বিষয়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী নিবন্ধটি রচনা করেছিলেন, তিনিই নারীমুক্তি সম্বন্ধে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি চয়ন করে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন : On the Subjection of Women (1869)। এটাও আপতিক নয় মোটেও যে, উইলিয়াম গডউইনের স্ত্রী মেরী উলস্টোনক্রাফট প্রথম ইংরেজ মহিলা, যিনি নারী-অধিকার নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করলেন, *Vindication of the Rights of Women (1792)*। গ্রন্থটি যেন তার স্বামী কর্তৃক রচিত *Political Justice*-এরই পরিপূরক গ্রন্থ। এটাও লক্ষ্য করার মতো যে, অষ্টাদশ শতকের পর থেকে রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিলেতের চার্টিষ্ট আন্দোলন থেকে আমেরিকার হে-মার্কেট পর্যন্ত যত আন্দোলন ও সংগ্রাম হয়েছে, তার মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় নিয়মিত। ডিকেন্সের শ্রমিকজীবন সংক্রান্ত উপন্যাস এবং মিসেস গ্যাসকেলের *Mary Barton*-এ এর প্রমান পাওয়া যাবে। দাসমুক্তির আন্দোলনে বিলেতে এবং যুক্তরাষ্ট্রে নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রীবৃন্দই পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। হ্যারিয়েট বীচার স্টো, এলিজাবেথ ক্যাডি স্টানটন, লুক্রেশিয়া মট, লুসি স্টোন প্রমুখের কথা মনে করা যেতে পারে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে নারীমুক্তির প্রতীক জর্জ সাঁদ তাঁর উপন্যাস Valentine-এ নারীমুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে যৌনমুক্তির কথাই শুধু বলেননি, সম্পত্তি পুনর্বণ্টনের কথাও বলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে একজন সচেতন বিপ্লবী কর্মী হিসেবে ১৮৪৮-এর ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণও করেন। ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মিসেস গ্যাসকেলের মতো জর্জ এলিয়টের Adain Bade-র কথাও আমাদের মনে পড়বে। সম্প্রতিকালেও বিভিন্ন দেশের—বিশেষ করে মরক্কো, আলজেরিয়া ও প্যালিস্টাইনের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলাদের উপস্থিতি কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্যালেস্টাইনীয় মহিলা মুক্তিসংগ্রামী লায়লা খালেদ, মরোক্কার ফাতিমা মেরিনিসি, সেনেগালের মারি এঞ্জেলিক, আমাদের দেশের প্রতিলতা ওয়াদ্দেদার, সেলিনা বানু, জাহানারা ইমাম এঁরা স্মরণীয় উদাহরণ।

পাঁচের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবৈষম্যবিরোধী কৃষ্ণাঙ্গমুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত Civil Rights আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন মন্টগোমারি আলাবামার অসম সাহসিকা রোজা পার্কস, যিনি

আলাবামার রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বসলেন। বাসে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নিধারিত আসেন না বসে সাদাদের জন্য সংরক্ষিত অংশে অবস্থান গ্রহণ করে এক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সূচনা করলেন। ওই শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন মুহূর্তের মধ্যে সংঘাতপূর্ণ বৈপ্লবিক আন্দোলন হিসেবে অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হল।

নারীমুক্তি আন্দোলন অচিরেই বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছে বারবার। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জনকল্যাণ সংক্রান্ত দাবি-দাওয়ার আন্দোলনেও মহিলাদের নেতৃত্ব লক্ষ্য করার মতো। শিশুশ্রম নিরোধক আন্দোলন, মহিলা শ্রমিকদের কাজের জায়গায় পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, শিশু পরিচর্যার পরিসর, পারিশ্রমিকের সমতা প্রভৃতি নিয়ে মহিলারাই আন্দোলন করেছেন। তাদেরই আন্দোলনের ফলে বিলেতে ও যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় তদন্ত কমিশন বা পার্লামেন্টারি হিয়ারিং প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিলেতে ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে Proceedings of the Knights of Labour : Report of General Investigation of Women's work। পরবর্তীকালে সংস্কারমূলক আইন প্রণীত হয়েছে, যার সুফল পেয়েছে পুরুষ শ্রমিকরাও—বরং তারাই পেয়েছে বেশি। আমাদের দেশেও উনবিংশ শতকে মেরি কার্পেন্টার, মিসেস বিভারিজ, লেডি ডাফরিন প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বাঙালি মহিলা বুদ্ধিজীবী ও সমাজকর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি তাঁর মেধা ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং নারী নির্যাতনের উৎসগুলো বিশ্লেষণ করে মহিলাদের চেতনাকে শাণিত করেছেন, তাদের আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ় এবং মুক্তির আকাঙ্খায় বেগের সঞ্চার করেছেন।

১৮৪৮-এর সেনেকা ফল্‌স কনভেনশ্‌নের 'Sentiment of Rights'-এর ঘোষণা থেকে মহিলারা নারীমুক্তির দিকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। আজ সারা বিশ্বেই মেয়েদের নাগরিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার, পারিবারিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। শিক্ষায় ব্যাপক অগ্রগতিও হয়েছে। মহিলাদের পেশাগত জীবনও বিস্তৃত হয়েছে। এখন আর নারীদের পেশাগত জীবন শুধু স্কুল শিক্ষয়িত্রী বা নার্সিং পেশাতেই সীমিত নয়—বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পেশায় তারা নিয়োজিত হচ্ছেন। মহিলা ডাক্তার, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক, ব্যাংকার, আইনজীবী,সাংবাদিক, সমাজকর্মী, সংসদ-সদস্য এমনকি পুলিশ অফিসারও এখন খুব দুর্লভ নয় আমাদের মতো অনুন্নত দেশেও। কিন্তু মহিলাদের প্রকৃত অবস্থানের খুব একটা উন্নতি হয়েছে কি? না, তা খুব একটা হয় নি। বরং সারা দেশে মহিলারা ঘরে এবং বাইরে নির্যাতিত হচ্ছেন। ব্যাপক সন্ত্রাসের পরিমণ্ডলে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। শ্রেণী, শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থাননির্বিশেষে মহিলারা সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হচ্ছেন। মহিলাদের স্বাধীনতাই শুধু খর্ব হচ্ছে না, তারা যেন একটি নিরাশ্রয়, বিপন্ন জীবনযাপন করছেন। এটা অবশ্য একদিনে ঘটেনি।

পাশ্চাত্যেও যেদিন থেকে নারীস্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হয়েছে, সেদিন থেকেই নারীস্বাধীনতার প্রবক্তাদের প্রবল সামাজিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ নর-নারী সম্পর্কের বিষয়টি হাজার বছরের অসম সম্পর্কের সংস্কার ও আধিপত্যের আবেগ দ্বারা সুরক্ষিত, যুক্তির সেখানে প্রবেশ নিষেধ। অসম সম্পর্ক বলেই, নারী অধস্তন বলেই, নর-

নারীর সমান অধিকারের দাবিটি উঠেছে, আর অসম সম্পর্ক বলেই যাদের হাতে ক্ষমতা— অর্থাৎ পুরুষ শ্রেণিটি, যারা নারীর ওপর এতকাল আধিপত্য করে এসেছেন, তারা বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছাড়তে রাজি নন। ক্ষমতা এবং আধিপত্যের একটা উত্তেজনা, একটা আত্মপ্রসাদ আছে। যৌক্তিকতার নামে কেউই সেটা ছাড়তে রাজি নন বরং স্থিতাবস্থাকেই স্বাভাবিক ও মঙ্গলকর বলে প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছেন। নারীপ্রকৃতির মধ্যেই তার দুর্বলতার ও অধস্তনতার বীজ নিহিত, এমন তত্ত্ব সমাজের সর্বস্তরে প্রচারিত হয়েছে। ওই তত্ত্বের অসরতা প্রমাণকারী কোনো স্বাধীষ্ঠান প্রয়াসী, দ্রোহী নারীর আবির্ভাব হলেই প্রথমত তার চরিত্র হননের চেষ্টা করা হয়েছে। এর দ্বারাও তাকে নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ হলে তাকে 'কুহকিনী' (temptress) 'মৃত্যুবহনকারী বিষকন্যা' (fatale femme) প্রভৃতি অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ওই অভিধার দ্বারা তাদের স্বসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বা বহিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। মধ্যযুগে এদেরই ডাকিনী বলে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এসব অভিযোগ প্রমাণের কোনো প্রয়োজন হয় না, ফতোয়াই যথেষ্ট। মেরি উলস্টোন ক্রাফ্ট, জর্জ এলিয়ট, জর্জ সাঁদ সকলের ক্ষেত্রেই ওইসব অভিধা প্রযুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের এক মন্ত্রীও সম্প্রতি 'ভালো নারী' ও 'মন্দ নারী' বলে দুটি ভাগ করেছেন।

শুধুমাত্র মিথ সৃষ্টি বা সামাজিক অনুশাসনেই নয়, প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় সূত্রাবলিতেও নারীর অবমূল্যায়ন করা হয়েছে; যথা : 'নরকে মেয়েরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ' অথবা 'মানুষকে বিপথগামী করার যত প্রলোভন ও প্ররোচনা আছে, নারীর সঙ্গে তুলনীয় পথভ্রষ্টকারী আর কিছু নেই।' ধর্মীয় বক্তৃতায়, আচারে, অনুষ্ঠানে, মাহফিলে, মিলাদের নিরন্তর অন্তহীন পুনরুচ্চারণে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সমর্থক ওইসব মূল্যবোধ ও ধারণা লোকের মজ্জায় মজ্জায় আপ্ত বিশ্বাসের মতো প্রবেশ করে বাসা বেঁধেছে। ফলে গত দু'শ' বছর ধরে দীর্ঘ বাকবিতণ্ডা, আন্দোলন, বিশ্লেষণ ও আলোচনার পরে নারীর অধিকারসূচক আইন প্রণীত হলে কি হবে— তা প্রয়োগ করবে কে? সমাজের সমস্ত স্তরে কর্তৃত্বে আছে পুরুষ একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে। সমাজে প্রশাসক, পুলিশ, আইনজীবী, বিচারক, মন্ত্রী, সাংসদ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, বিনোদন-শিল্পের আধিকারিক সবাই পুরুষ এবং প্রচলিত পুরুষ আধিপত্যের সুবিধাভোগী এবং তাদের মানসিক জগত নির্মিত হয়েছে প্রচলিত আবহমান ওই মূল্যবোধ দ্বারা। নারীজাগরণের দ্বারা এরা সকলেই আধিপত্য হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কিতবোধ না করলেও, অস্বস্তিবোধ করেন। ফলে, নারীমুক্তির সব ধারণা ও কার্যক্রম তাদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। নববর্ষের দিন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বাঁধন বলে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ঘটলে একজন সাংসদ তৎকালীন সংসদে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় মেয়েটিকেই দায়ী করেন এবং *বাঁধনের বিচার চাই* বলে গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য সাংসদ চুপ করে থেকে ওই বক্তব্যকে কার্যত সমর্থনই করেন। শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশ বাহিনীকে মেয়েদের ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে শারীরিক নির্যাতন করলে মন্ত্রীবর ও পুলিশ প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যন্ত তার সপক্ষে সাফাই গাইতে থাকেন। এর প্রতিবাদে সমগ্র ছাত্রসমাজ উত্তাল হয়ে উঠলে মন্ত্রীবর ছাত্রীদের মিছিলটিকে ভাড়াটে গার্মেন্টস কর্মীদের মিছিল বলে চালানোর চেষ্টা করলেন। তারই অনুসৃতি হিসেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখা দিলে, প্রতিবাদে অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর সন্ত্রাসীরা

সশস্ত্র হামলা চালায় এবং ছাত্রী সোনিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। কড়া পুলিশ প্রহরারত ক্যাম্পাসে কী করে এসব ঘটে, তার কোনো ব্যাখ্যা কর্তৃপক্ষের কেউ করেননি। পরবর্তীকালে কথিত হত্যাকারীকে ক্যাম্পাসে দেখা গেলেও পুলিশ নাকি তাকে খুঁজে পায়নি। ধর্ষণকারীদের, অ্যাসিড নিক্ষেপকারীদের, হত্যাকারীদের পুলিশ প্রায় কোনো সময়েই খুঁজে পায় না। বাংলাদেশে নারীনির্যাতনের তালিকা অসহনীয়ভাবে দীর্ঘ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিবেদন অনুযায়ী : 'অনেক মামলা গ্রহণ না করার পরও পুলিশ প্রশাসনেরই রিপোর্টে নারীনির্যাতন বিষয়ে যা নথিভুক্ত হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান দেখলে যে-কোনো বিবেকবান মানুষই বিচলিতবোধ করবেন।' পুলিশের খাতায় রেজিস্ট্রিকৃত ৫ বছরের নারীনির্যাতনের চিত্রে দেখা যায়, ১৯৯৭ সালে মোট নারীনির্যাতন সংঘটিত হয়েছে ৫ হাজার ৮শ' ৪৩টি। ২০০১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ হাজার ৯শ' ৫৮টিতে [সূত্র : ২৪শে আগস্ট ২০০২, প্রথম আলো]। পাঁচ বছরে মোট নির্যাতনের শিকারের মধ্যে ধর্ষণের সংখ্যা ১৪ হাজার ১শ' ২৮টি, অ্যাসিড নিক্ষেপ ৬শ' ৪৯টি, গুরুতর আহত ১ হাজার ২শ' ৯৩টি। দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০০৩ সালের প্রথম তিন মাসেই মোট নারীনির্যাতনের খবর এসেছে ৯শ' ৭৩টি; এর মধ্যে ধর্ষণ ১শ' ৯৮টি, গণধর্ষণ ৬৪টি, অ্যাসিড নিক্ষেপ ৪৩টি, হত্যা ১শ' ৬২টি। রাষ্ট্র কি এসব নির্যাতনের জন্য দায়ী? না, রাষ্ট্র প্রকাশ্যে এসব সমর্থন করেনি। তবে পুলিশ যে এসব অপরাধের দুর্বৃত্তদের অধিকাংশকেই ধরতে পারে না—তার একটা জবাবদিহিতার দায় রাষ্ট্রের আছে। পুলিশের এই ব্যর্থতা এবং কথিত নিষ্ক্রিয়তা অপরাধীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অনুকূলেই একটি 'বাতাবরণ' তৈরি করে, যা সমাজকে ক্রমেই বর্বরতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। রাজনৈতিক ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও হত্যার বিষয়টি এবং সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি এর থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তবে সেটি এই আলোচনার বিষয়ভুক্ত নয়। কিন্তু এটি লক্ষ্য না করে উপায় নেই যে, এসব সন্ত্রাসীর অধিকাংশই রাজনৈতিক দলের পক্ষপুটচ্ছায়ে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে। নারীনির্যাতনের প্রশ্নটি তাহলে আমাদের সমাজে ক্ষমতার বিন্যাস ও তার কর্মপদ্ধতি থেকে আলাদা করা যায় না।

এসবের যোগফল হল এই যে, ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গেছে সমাজের—এ সমাজ আর মানবিক নেই, মানবিকতা যেন অপসৃত। রাষ্ট্র ক্রমেই মহাপরাক্রমশালী ও সর্বভুক হয়ে উঠেছে। এর প্রবণতা হচ্ছে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও একনায়কতন্ত্রের দিকে। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর আত্যন্তিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে একে প্রভাবিত ও ব্যবহৃত করা যায় এবং করা হয়েছে। অন্যদিকে, আধুনিক টেকনোলজির অবদান—সহজে বহনযোগ্য মারণাস্ত্র, পরিবহন ব্যবস্থা এবং মোবাইল ফোন—এসব ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী এবং তার পোষ্য চর-অনুচরদের জন্য খুব সহায়ক হয়েছে। সর্বোপরি আছে যারা ক্ষমতা পরিচালনা করছেন তাদের লম্বা বাহু অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এবং অনানুষ্ঠানিক মুখাবয়বহীন পার্টি-ক্যাডার। এদের মন ও মানসিক জগৎ হচ্ছে এদের হাতের অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রাভিগ টানে তা গেছে বিকৃত, অমানবিক হয়ে। ক্ষমতা যতই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, ততই তা মদমত্ত হয়ে উঠেছে। সমগ্র সমাজকে বিজেতা এবং বিজিত, প্রভু এবং ভৃত্য, অধীশ্বর এবং অধস্তন, শাসক এবং শাসিত—এই দ্বিমাত্রিক বিপরীত দৃষ্টিকোণ

থেকে দেখার প্রবণতা সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। একেই পিতৃতান্ত্রিক পৌরুষের macho manhood-এর পরাকাষ্ঠা বলে ভাবছেন অনেকে। শুধু সন্ত্রাসী মস্তানরাই নয়, বহু মন্ত্রী, সাংসদ, সেনাবাহিনী থেকে ডেপুটেশনে নিযুক্ত প্রশাসক এবং অসংখ্য ক্ষমতার দ্বারা স্বপ্নতাড়িত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোক ওই ভুয়োদর্শনে গোপনে বা প্রকাশ্যে আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন। এই পিতৃতান্ত্রিক 'মাচো' মূল্যবোধ সমাজে নর-নারীর আত্যন্তিক নিভৃত সম্পর্ককেও দিয়েছে বিষিয়ে, পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে উঠেছে সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের, দ্বৈরথের ও টেনশনের প্রতিবিম্বিত রূপ। এভাবে রাষ্ট্র নিজেই অমানবিক হয়ে উঠছে না, উপকথার মিডাসের মতো যাকে স্পর্শ করছে, তাকেও অমানবিক করে তুলছে। সুশীলসমাজ অতটা সুশীল থাকছে না। যেমন একদিকে পুলিশের আধিপত্য ও অন্যদিকে অবজ্ঞা ও অপমান— লাঞ্ছিত নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্যের লেশমাত্র থাকছে না, সুকুমারবৃত্তিগুলো অপসৃত হচ্ছে, ভালোবাসার তরুটিতে আর মমতার জল সিঞ্চিত হচ্ছে না। ফলত, সমগ্র সমাজের নর-নারী এক ভালোবাসাহীন, বিদ্বিষ্ট সম্পর্কের উষরতার মধ্যে জীবনযাপন করতে থাকে। হৃদয়হীন যৌনতাই সম্পর্কের সূত্রটিকে কোনো রকমে ধরে থাকে। বোধহীন, বিশ্বাসহীন, সন্ত্রাসীরা এটাই চারিদিকে দেখতে পায় এবং এতে অকল্যাণও কিছু দেখে না। মানবিক সম্পর্কের সৌন্দর্য তারা দেখতে পায় না, পাশবিক যৌন নিপীড়নের বিকৃত উত্তেজনাকেই জীবনের পরম প্রাপ্তি মনে করে। এভাবেই আস্তে আস্তে সমগ্র সমাজ আপাত নাগরিক চাকচিক্য সত্ত্বেও অমানবিকতার গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে।

তাহলে কী করা দরকার? দরকার মানবিকতার পুনর্বাসন। গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে তা বিযুক্ত নয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধহীন রাজনীতির দ্বারা তা অর্জিত হবে না। গ্রিনপিসের আন্দোলন যেমন শুধুমাত্র ক্ষমতার কথা ভাবে না— সমগ্র প্রকৃতিকে নিয়ে আসে রাজনৈতিক বিবেচনার মধ্যে, ঠিক তেমনি সংঘাতপ্রবণ 'মাচো' দর্শনের বলয় থেকে বেরিয়ে সুস্থ সমাজের জীবনদায়িনী (Pro-life) মূল্যবোধগুলোকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রাখতে হবে। তবেই হয়তো মানব-মানবীর সম্পর্ক আবার পরিশ্রুত হবে এবং একটি আনন্দময় সুখী সমাজের দিকে আমরা যেতে পারবো। সমাজতন্ত্রীরা যেমন একসময় জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) এবং প্রায়োগিক (pedagogical) কার্যক্রমকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গ করেছিলেন, তেমনি আবারও নতুন এক মানবিক বোধের ভিতের ওপর কর্মকাণ্ডকে সাজাতে হবে। হয়তো রোজা লুক্সেমবুর্গ বা রোজা পার্কস-এর মতো মহিলাদেরই এগিয়ে আসতে হবে নতুন প্যারাডাইম নিয়ে। তবে একটি নতুন humanist paradigm বা রাজনৈতিক প্রকল্পের আগে আমাদের চেতনাকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে হবে।

নারী নির্যাতন : এর শেকড়ের সন্ধানে

আহমদ শরীফ

আজকাল শহুরে শিক্ষিতলোকেরা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও প্রচারণায় উচ্চকণ্ঠে যাঁর যেমন যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান-রুচি-ন্যায়বোধ, তিনি তেমন সব করুণ ও জোরালো কথায় বাকজাল বিস্তার করেন। কিন্তু এ নির্যাতনের গোড়ায় যে শাস্ত্রিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক নীতি-নিয়মের ও রীতি-রেওয়াজের সমর্থন রয়েছে, এতে যে পুরুষের শাস্ত্রিক ও নৈতিক জন্মগত ও প্রাজন্মক্রমিক অধিকার রয়েছে, তা তাঁরা বিবেচনা করেননা।

চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে প্রথমে রোগের লক্ষণ নিরূপণ করতে হয়, পরে তার কারণ নির্ণয় করতে হয় এবং পরে তার প্রতিকারের বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হয়। নারী নির্যাতনের কারণগুলো আগে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে নিরূপণ করতে হবে, তারপর প্রতিকার পন্থা আবিষ্কার তেমন কঠিন নাও হতে পারে। কিন্তু উপায় সর্বদা-সর্বত্র প্রয়োগসাধ্য করার জন্যে আর্থিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক অবস্থা ও অবস্থান বাঞ্ছিত মানে, মাপে ও মাত্রায় উন্নীত ও বিকশিত করতে হবে।

১. বিয়ে প্রথা চালু করতে হয়েছে কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি নিবারণের জন্যেই, এ আমরা অনুমান করতে পারি। কারণ আদিকাল থেকেই প্রাণী হিসেবে পুরুষরে 'জরু'-র প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ নরের নারীসম্ভোগ লিপ্সা যেমন বিশেষ বয়সে সার্বক্ষণিক, গোড়ার দিককার অবিকশিত চেতনার নারীর মধ্যে তা উন্মেষিত হয়নি হয়তো,—কারণ প্রাণিজগতে প্রায়ই নারীর কামবাঞ্ছা কেবল সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্যেই অপ্রতিরোধ্যভাবে জাগে—তার তীব্রতা তাকে যেন যন্ত্রণাগ্রস্ত করে তোলে, রতিসম্ভোগেই তার এ যন্ত্রণা মুহূর্তে ঘোচে—সে হয় যথাসময়ে সন্তানবতী। মনুষ্যপ্রজাতি সম্ভবত ক্রমাগত মানসোৎকর্ষের ফলে নারীর মধ্যেও কামবাঞ্ছা কৃত্রিম উপায়ে জাগিয়ে রতি-রমণ আনন্দ উপভোগ করে। দৈহিক অবয়বে প্রবল এবং মানসিকভাবে সদা-প্রস্তুত নরজাতীয় প্রাণীরই ভূমিকা রতি-রমণ ক্ষেত্রে সক্রিয়, নারীজাতীয় প্রাণী বাহ্যত নিষ্ক্রিয়, এর থেকেই প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা হয়েছিল যে পুরুষই সম্ভোক্তা এবং নারী সম্ভোগ্য মাত্র। এ ধারণা এ যুগেও প্রবল।

২. যখন আদিতে নারী ছিল যে-কোন পুরুষের ভোগ্য, তখন সন্তান লালনের দায়িত্ব ছিল কেবল মায়েরই এবং সন্তান চিহ্নিত হত মায়ের নামেই। এ মাতৃকেন্দ্রিক যৌথজীবনেও যখন দ্রৌপদী-বিয়ে চালু হল, অর্থাৎ এক নারীকে হিমালয় উপত্যকার কিন্নরদের মতো সবভাইয়ের স্ত্রী করে উপভোগ প্রথা চালু হল, তখন সে-নারী হল মক্ষিরানীর মতো। এ যৌথসম্পদ নারী ও সন্তানগুলো কারো একার ছিল না বলে, তার ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ছিল না বলেও ওই নারী ছিল স্বাধীন। আবার সববোনের এক স্বামী-প্রথাও ছিল চালু। ভুটান রাজার ক্ষেত্রে এখনো তা চালু রয়েছে। উনিশ শতক অবধি হিন্দুদের মধ্যে এমনি ব্যবস্থা ক্বচিৎ প্রচলন ছিল।

৩. আরো পরে যখন কাড়াকাড়ি ও হানাহানি মুক্ত নিরুপদ্রব সমাজকাম্য হল, তখন বিয়ে প্রথা চালু হল পুরুষের স্বার্থে নিরুপদ্রব-নির্দ্বন্দ্ব সম্ভোগ লক্ষ্যে। তখন একপুরুষ বাহুবল ও খাদ্য সংগ্রহশক্তি অনুসারে বহুপত্নীক হতে থাকল। তখন নারী হল পুরুষের সম্ভোগ পাত্রী। তার স্বাধীনসত্তা হল অস্বীকৃত। এখন থেকে নারীর দেশের অধিকারী এবং তার ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের অভিভাবক, নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক হল পুরুষ। নারীর ভোগ্যপণ্যসত্তার ও বাদীসত্তার শুরু এভাবেই।

৪. পুরুষের চিত্তবিনোদন ও রতি-রমণ পাত্রী হওয়াই যখন নারীর একমাত্র সামাজিক উপযোগ বলে বিবেচিত হল, তখনই সভ্য সমাজে দুনিয়ার সুন্দরীতম নারীর সন্ধান এবং তাকে বাহুবলে ছিনিয়ে আনাই হল বীরত্ব, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব, পার্থিব জীবনে সবচেয়ে বড়ো কৃতি ও কীর্তি বলে হল বিবেচিত। একারণেই নারী হল বীরভোগ্যা। এবং বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের, সাহসের সঙ্গে শক্তির, সংকল্পের সঙ্গে উদ্যোগের সমন্বয়ে জনবল-ধনবলকে পুঁজি ও পাথেয় করে রাজপুত্তুর পাড়ি দিত অজ্ঞাত-অকূল সমুদ্রে। সব আদি রূপকথার ও মহাকাব্যের বিষয় এ-ই। সভ্যতার বিকাশের ধারায় প্রথমে এ 'জরু' নিয়েই শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত, জঙ্গ-যুদ্ধ-লড়াই। তারপর যাযাবর জীবনের অবসানে 'জমি' নিয়ে এবং পরে সম্পদ প্রতীক 'জর' নিয়ে নারী-ভূমি-স্বর্ণ নিয়ে চলতে থাকে চিরন্তন লড়াই।

এখন যা মুদ্রা-প্রতীক সম্পদে স্থিতি পেয়েছে-ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সম্পদের 'চেক' হাতে থাকলেই নিশ্চিত ভোগ-উপভোগের জীবন। আগে কেবল জরু ও জমি ছিল বীরভোগ্য। কেননা তা মনোবল, বাহুবল, জনবল ও ধনবল প্রয়োগে কাড়তে, অর্জন বা অধিকার করতে হত। এখন ছল-চাতুরী-প্রতারণা প্রয়োগেই সম্পদ অর্জন বা সংগ্রহ-সঞ্চয় করতে হয়। তাই একালে অর্থ-সম্পদই হচ্ছে একালের বীরত্বের ও বড়ত্বের পরিমাপক।

৫. নারীকে যখন মূল্যবান ভোগ্যবস্তুর মতো করে ভাবল মানুষ, তখন থেকেই তার মনে রিরংসাপ্রসূত ঈর্ষা-অসূয়া-অসহিষ্ণুতা জন্ম নিল। এ ভোগ্য সামগ্রীর প্রতি অন্যের লোলুপদৃষ্টি, ভোগেচ্ছা, মানস-দুর্বলতা সে সহ্য করতে অপারগ হল, তখন থেকেই নারী হল সযত্ন সতর্ক প্রহরার পাত্রী, গৃহকোণ হল তার নির্বিঘ্ন আশ্রয়, নারীর পর্দা ও সতীত্ব এভাবেই পেল গুরুত্ব। নারীর 'সতীত্বে'-র গুরুত্ব পুরুষের রিরংসাজাত অসূয়ায় ও অসহিষ্ণুতায়। ভীতা নারীর মধ্যে প্রাজন্মক্রমিক বিশ্বাসে-ভয়ে এ সতীত্ববোধ তার দেহের রক্ত-মাংসের মতোই অবিচ্ছেদ্য সংস্কারে পরিণতি পেয়েছে। আজো পুরুষ-স্পৃষ্টা বলেই বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজে ঘৃণ্য। এবং এক সময় বিধবাকে এক্‌ক ব্যক্তিভোগ্য বলেই পুড়িয়ে মারা হত।

৬. শৈশবে-বাল্যে বিবাহের উদ্ভব ওই 'সতী' রাখার গরজেই। আট-নয়-বারো বছরে নারীর বিবাহ দিতেই হত। নইলে সমাজে নিন্দিত ও পতিত এবং অভিভাবকের নরকে স্থিতির আশঙ্কা থাকত।

৭. এ শৈশব-বাল্য বিবাহ থেকেই শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ও স্বামী-ভাসুরের অভিভাবকত্বের, কর্তৃত্বের তথা-শাসনের-নিয়ন্ত্রণের-হুকুম-হুমকি-হামলা চালানোর, পিটানোর, বেঁধে রাখার, অনাহারে রাখার অধিকার প্রয়োজনীয় বা জরুরী হয়েছিল। এভাবেই স্বামী হল নারীর মর্ত্যজীবনের ঈশ্বর, ভগবান, মালিক, পূজ্য, তার পায়ের তলায় তার স্থান তথা স্বামীর কাছে

আত্মা ও আত্মসমর্পণ করেই, সত্তার স্বাতন্ত্র্য বর্জন করেই, দেহ-মন-চেতনা স্বামীর অনুগত করেই নারীজীবন সার্থক ও ধন্য করতে হয়। দুনিয়ার সবভাষাতেই স্বামীবাচক শব্দগুলো প্রভুত্বজ্ঞাপক। পত্নীমাত্রই সেবিকা। এ জন্যে দুনিয়ার সব ধর্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে নারীর স্থান পুরুষের নিচে। নারীর অভিভাবকত্ব পুরুষের তথা পিতার, স্বামীর ও সন্তানের অধিকারে। নারী হচ্ছে পিতা-স্বামী ও সন্তান পাল্য ও পোষ্য অবলা-অকেজোপ্রাণী, যদিও উৎপাদন-নির্মাণনির্ভর সমাজে নারী গোড়া থেকেই শ্রম দিচ্ছে, ব্যতিক্রম কেবল শাহ-সামন্ত-সদাগর-শাসকঘরেই লভ্য।

৮. এ শাস্ত্রিকব্যবস্থা নারীকে আজো হীনমন্যতায় ভোগাচ্ছে। মুসলিমঘরের চাকুরে নারী আজো 'কাবিন' নিয়ে সম্ভোগ্য প্রাণী হিসেবে বিক্রীত হতে আগ্রহী। আজো স্বামীর 'পদবী' স্বনামে যোগ করে ইন্দিরা-ম্যারগ্যারেট ধন্যা। আত্মসত্তায় ও স্বাতন্ত্র্যে স্থিত থাকা নয়-আত্মসমর্পণেই-সেবিকাভাবেই তার সুখ। এ আধি থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে সচেতন প্রয়াসে।

৯. মনস্তাত্ত্বিকভাবে এ মুহূর্তেও নারী কিছুতেই নিজেকে স্বাধীন সত্তায় পুরুষের [দৈহিক শক্তি ব্যতীত] সর্বপ্রকারে সমকক্ষ বা সমান বলে ভাবতেই পারে না। যদিও সভায় উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করে। পুরুষও উত্তমন্যতায় ভোগে। আজ অবধি সমাজের ও সমাজ-মানসেররূপ এমনিই।

১০. আদিতে যখন লেখা-পড়ার কোন আর্থিক মূল্য ছিল না, তখন সেই নিরক্ষর সমাজে কন্যাপণই ছিল। এখনো অনেক দেশে বহু দামে কনে কেনা হয়। বড়োঘরে মানীপরিবারে বিয়ে করাতে হলে চিরকালই টাকা দরকার হত। বামুণের মেয়েকে তো দিয়েথুয়ে সম্প্রদান করাই ছিল আবহমান কালের প্রথা। এ-ও উল্লেখ্য যে, সুপ্রাচীন কাল থেকেই কোন কোন অঞ্চলে-সম্ভবত আবহাওয়ার দরুন বা অন্য কোন জৈব কারণে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম থাকত বা থাকে, সেখানে নারীর বাজারদর বেশি। কোথাও কোথাও নারী বেশি, পুরুষ ছিল কম, সেখানে আবার পুরুষের বহুবিবাহ ছিল সহজ এবং সামাজিকভাবে জরুরী। এ ভাবেই এক নারী বহু স্বামী, এবং এক স্বামী বহুপত্নী প্রথা চালু হয়েছিল। এ ছিল অনেকটা চাহিদা-সরবরাহের আনুপাতিক হারনির্ভর।

১১. একালের যন্ত্র-প্রকৌশল-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত জগতে আদিম কৃষি ও বাণিজ্য নির্ভরতার বিবিধ ও বিচিত্র বিকাশের ফলে মানুষের ধন-মান-পদ-পদবী-খ্যাতি-ক্ষমতা বহু ও বিচিত্রভাবে সামাজিক মানুষের মান-মর্যাদা-অর্থ-বিত্ত অর্জনের পথ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কারণে ভালো ও বড়ো চাকুরে, বৃহৎশিল্পের মালিক বা প্রকৌশলী-বিদ্বান-চিকিৎসক, ক্ষমতাবান ও উচ্চপদস্থ আমলা-উকিল-সাংসদ প্রভৃতির সঙ্গে কুটুম্বিতা তথা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের আগ্রহী হয়েছে মানুষ। তারাই বর বা জামাই কেনে বহু অর্থ-সম্পদ দিয়ে। প্রলুব্ধ বর ও তার অভিভাবক দরকষাকষি করে, চড়া পণ হাঁকে—সম্বন্ধলিপ্সু কনে পক্ষ 'যৌতুক' নামে উঁচুদরে দাম দিয়ে 'জামাই' ধরে।

১২. শিক্ষিত শহুরে সমাজে দরিদ্র এবং মনের দিক দিয়েও কাঙাল পুরুষেরা যৌতুক দিয়ে সচ্ছল হতে চায়। দরিদ্র ঘরের মাঝারি ও রূপহীন কন্যারা যৌতুক যোগাড় করতে পারে না বলে অনূঢ়া থাকে—এখন প্রায় তা রীতি-রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

১৩. কিন্তু গাঁয়ের অনক্ষর চাষী-মজুর-গৃহস্থ ঘরে ও অন্ত্যজ সমাজে আজো কন্যা অনূঢ়া রাখা চলে না, নিন্দিত পতিত ও শাস্ত্রিকভাবে মহাপাপী হতে হয়। আজো অন্তর্জলি মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গেও বিয়ে দিয়ে নিন্দা-পাপ মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই নিঃস্ব-দরিদ্র অভিভাবক সাধ্যাতীত অর্থের যৌতুক দেয়ার অঙ্গীকার করে কন্যার 'অনূঢ়া' নাম ঘুঁচিয়ে নিন্দা ও পাপমুক্ত হয়। বধূর অক্ষম মা-বাপের অঙ্গীকার ভাঙার, কথার খেলাপের দায়ে প্রাণ হারায় তরুণী বধূ। এসব বধূ শিক্ষিতা হলে তথা রোজগারে সমর্থ হলে সামাজিকভাবে বাইরে কাজ করার অধিকার পেলে, শিক্ষিতা মহিলাদের মতোই অনূঢ়া থাকার সামাজিক অধিকার পেত এবং চাকুরে হিসেবে টাকার গাছরূপে শ্বশুরঘরে নিরুপদ্রব জীবনযাপন সম্ভব হত। কাজেই গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বন্দরে নারীমাত্রই রোজগেরে হলে যৌতুক দেয়া-নেয়া বন্ধ করা বা হওয়া যেমন সহজ হবে, তেমনি নিপীড়ন-নির্যাতনেরও কোন আর্থিক কারণ থাকবে না। অবশ্য দাম্পত্যে মানসিক অসুখের ও অস্বস্তির অন্য কারণ কারো কারো জীবনে থাকবে। এবং এ যুগে তালাক মাধ্যমে সে-সব দুঃখমুক্তির উপায়ও রয়েছে।

১৪. আগে হাটে-বাজারে বেশ্যালয় ছিল, তখন পাড়ায় গৃহস্থের মেয়েরা থাকত হামলামুক্ত। ধর্ষণ ছিল না বললেই চলে। সমাজটা হচ্ছে মধ্যযুগীয় মন-মানসিকতা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার জড়িত ও নিয়ন্ত্রিত আবর্তিত সমাজ। এখানে অত্যুৎসাহে বেশ্যালয় বন্ধ করে দিলে গৃহস্থঘরের বউ-ঝিরাই যে হবে আক্রান্ত—তা বোঝার জন্যে কোন বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তবু সরকার জনপ্রিয় হওয়ার জন্যে সারাদেশে ধর্ষণ ছড়িয়ে দিয়েছে। এ হচ্ছে সেই 'মদন ভস্মেরই' বৃত্তান্ত। অপ্রতিরোধ্য প্রাণী প্রবৃত্তির ধারণা নিয়ে বলা যায় 'ধর্ষণ' বন্ধ করা সমাজ পরিবর্তন না করলে সম্ভব হবে না। যৌনজীবন সম্বন্ধে আমাদের দেশ-কাল-প্রয়োজনঅনুগ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। তা হলেই সমাজস্বাস্থ্য বাঞ্ছিতমানে উন্নীত হবে।

১৫. নারী-নির্যাতনের ও মানসিকভাবে নারী-নিপীড়নের মূলে রয়েছে সুপ্রাচীন কাল থেকে পুরুষ-প্রধান সমাজের নানা নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ এবং দেশ-কালগত নানা বিশ্বাস-সংস্কার, এর মধ্যে সম্ভোগ্য সম্ভোক্তা সম্পর্কটাই মুখ্য। নইলে নারীকে ও পুরুষকে কি দুই ভিন্ন জাতের বা সম্প্রদায়ের প্রাণী বলে ভাবা সম্ভব? স্বামীসম্ভোগ্য বলেই উচ্ছিষ্ট-অকেজো নারীকে হিন্দু সমাজে পুড়িয়ে মারা হত। আজো পুরুষ স্পৃষ্টা বলেই বিধবা বিবাহ ঘৃণ্য।

১৬. ক. ঘরে-সংসারে মা হচ্ছে জননী—সন্তানের নিশ্চিন্ত অভয় আশ্রয়। সন্তান পামর বা নররূপীপশু না হলে কি সে মাকে নির্যতিত করতে বা হতে দিতে পারে? মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়েইতো আত্মীয় পরিজন পরিবার।

খ. স্ত্রী হচ্ছে যৌন সম্পর্কের প্রিয়া, পরম আকর্ষণের ও আদরেব সঙ্গিনী। অমানুষ না হলে তার মন-ভাঙা কোন বিবেচক স্বামীর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে অনুরাগ অবসিত হলে তাকে এ কালে ত্যাগ করাই মনুষ্যোচিত কর্ম—পীড়ন নয়। বস্তুত মায়ের পরেই স্ত্রীই হচ্ছে পুরুষের মর্ত্য জীবনে অভয়শরণ। এ স্ত্রী সন্তানের জননী, বংশ রক্ষার উৎস।

গ. আর কন্যা হচ্ছে ঘরে ঘরে পিতার স্নেহস্নাত সন্তান। ভাইবোনের সম্পর্কও শৈশবে বাল্যে ও কৈশোরে স্বার্থবুদ্ধি-শূন্য নিছক গভীর মমতার।

অতএব, জননী-জায়া-জাতারূপে মা-স্ত্রী-কন্যারূপে কোন পুরুষের কি পর হতে পারে? হতে পারে কি নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার? কাজেই নারীমুক্তি শহুরে সমিতি-করা মহিলাদের বক্তৃতানির্ভর নয়। এর জন্যে দেশের নারী-পুরুষের হাজার হাজার বছর ধরে লালিত শাস্ত্রিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাবৃত্তিক ধারণা বর্জন করতে হবে। নারী-পুরুষ যে সমান তার যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য অঙ্গীকার করে সহমর্মিতায় সহাবস্থানে সম্মত থাকতে হবে।

যদি দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-বংশ-ভাষা-সংস্কৃতি-যোগ্যতা, আর্থিক-শৈক্ষিক-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান নির্বিশেষে কেবল ছেলেমেয়েদের প্রেম-পছন্দের মিলন বা পরিণয় প্রথা এ দেশেও চালু হয়, তাহলেও নারীর অনেক সমস্যার সমাধান মিলবে। সেক্ষেত্রেও অবশ্য মনোমালিন্যে দাম্পত্য টুটবে—ঘর ভাঙবে। তখন প্রতীচ্য দেশের মতোই দাম্পত্য হবে ঠুনকো, ভঙ্গুর—স্বল্পকাল স্থায়ী। তবে সমাধিকারের ভিত্তিতে সমকক্ষতায়, সহযোগিতায় ও সহিষ্ণুতায় সহাবস্থানের অঙ্গীকারে ঘর বাঁধলে তাকে একটা ইহজাগতিক ব্যক্তিক ও সামাজিক চুক্তি হিসেবে গ্রহণ বরণ করলে তা হৃদয়গত ট্রাজেডীর ও পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ নাও হতে পারে। পেশা বদলের মতোই দাম্পত্য বদলও স্বাভাবিক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের রূপ পাবে। যেভাবেই হোক, সর্বপ্রকারে শাস্ত্রিক সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের রূপ পাবে। যেভাবেই হোক, সর্বপ্রকারে শাস্ত্রিক সামাজিক নৈতিক সংস্কারের বন্ধনমুক্তিই নারীকে দাম্পত্যে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দেবে সত্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। আর্থিক স্বনির্ভরতাই নারীকে নিপীড়নমুক্ত করবে। নারীমুক্তির লক্ষ্যে আপাতত নারীর শিক্ষার ও অর্থকর পেশার ব্যবস্থা করা জরুরী।

শাস্ত্র, সমাজ ও নারীমুক্তি

পরিবারে জননী কখনো সন্তানের শত্রু হয় না। পুত্র কখনো মাকে পর ভাবতে পারেই না। বরং মা-ই হচ্ছে জগতে ও জীবনে ভালো-মন্দ-মাঝারি, আধা-কানা-খোঁড়া-পঙ্গু-পাগল সন্তানের অভয় আশ্রয়। শৈশবে মায়ের কোলই তো শিশুর সার্বক্ষণিক কাম্য শরণ। কাজেই মা সন্তানের অপ্রিয় হতেই পারে না, তবে অসমর্থ উদাসীন সন্তান মায়ের আদর-কদর-যত্ন-সেবা নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে মা অবহেলা পায় মাত্র, পীড়ন পায় না।

তারপর মনের মতো পত্নী তো প্রিয়াই। রূপবতী নারী গুণবতী না হলেও কাম-প্রেমের বন্ধনে অনুরাগের আসক্তির ভালোলাগার-ভালোবাসার, সে কারণে আদর-কদরের পাত্রী হয়, দাম্পত্যে পারস্পরিক আকর্ষণ-অনুরাগ থাকলে পত্নী কখনো পীড়িতা-নির্যাতিতা হয় না স্বামীর হাতে। পুরুষের সম্মতি না নিয়ে তার অদেখা অপছন্দের বউ নিয়ে তাকে পারিবারিক বা সামাজিকভাবে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে যৌবনে বউয়ের প্রতি কামে-প্রেমে আকৃষ্ট না হয়েও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের জননী স্ত্রী চোখসহা, মনসহা আপনজন-আত্মীয়া এবং আস্থার-নির্ভরতার ও ভরসার পাত্রী হয়ে ওঠে।

আর জননী-জায়ার পরেই পুরুষ মাত্রেরই নিঃশর্ত স্নেহ-মমতার পাত্রী হয় কন্যা। মনস্তাত্ত্বিক কারণেই কন্যা পিতার আদর পায়, তা রূপ-গুণের ওপর নির্ভর করে না। মায়া

জাগায় বলেই তো কন্যা 'মেয়ে'। জননী-জায়া-কন্যা কেউ পুরুষের অশ্রদ্ধার, অবজ্ঞার, হিংসার, ঘৃণার কিংবা ঈর্ষার পাত্রী নয়, এক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্য বা পরিজনের কথা ওঠে না। কেননা পৃথগন্ন হলেই শাশুড়ী-জা-ননদ-দেবর-ভাশুর পীড়নের অধিকার হারায়। অতএব, আপাতত পুত্রের হাতে জননীর, স্বামীর হাতে স্ত্রীর এবং পিতার হাতে কন্যার অনাদর-বঞ্চনার কোন স্বাভাবিক কারণ নেই। বরং পুত্রের ঘর মায়ের, স্বামীর ঘর স্ত্রীর এবং বাপের ঘর কন্যার সর্বোত্তম আশ্রয়। এ অবধি প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের কথা বয়ান করা হল। তবু নারীর চেতনায় বাপের বাড়ি ও শ্বশুরের বাড়ি আছে। নিজের বাড়ি নেই।

এবার আমরা নারীর বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং পরম্পরাগত শাস্ত্রিক ও সামাজিক কারণগুলো বর্ণন, আলোচন ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব। গোড়াতেই বলে রাখি নারীমুক্তির বাধা শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ, সামাজিক নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-পদ্ধতি আর কিছু অবস্থা ও অবস্থানগত অলীক বিশ্বাস সংস্কার।

পশ্চিম এশিয়ার শামীয় সমাজে আদম-হাওয়া দিয়েই মনুষ্য সৃষ্টির কিস্‌সার শুরু। তাতে দেখা যাচ্ছে, নারী হাওয়া স্বল্পবুদ্ধি, সহজে প্রলুব্ধা এবং আবেগাভিভূতা তাই শয়তানের খপ্পরে পড়ে সস্বামী স্বর্গচ্যুতা হন। কিস্‌সার প্রভাবেই আরবে আপ্তবাক্য আজো প্রচলন রয়েছে যে 'নারী জাহান্নামের দ্বার'। আরো আগের মিশরীয় কাহিনীর বাইবেল —উক্ত বর্ণনায় দেখা যায় পেটিফ্যারার পত্নী নবী যোশেফের প্রেমে পড়েন। কোরানে এ ঘৃণ্য পরকীয়া প্রেমের উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম সূফীরা অবশ্য আজিজ মিসির পত্নী জোলায়খার ও ইউসুফের এ প্রেমকে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের মতো আধাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রশংসিত করেছে। সাহিত্যে উপভোগ্য হলেও আবেগতাড়িতা নারীর অসংযমের উপাখ্যানের প্রভাব সামাজিক জীবনে অনভিপ্রেত বলেই বিবেচিত হয়েছে ইদানীং পূর্বকালে। উপাখ্যানের প্রভাব সামাজিক জীবনে গ্রীকরা নারীতে ও দাসেতে আত্মার অস্তিত্ব প্রায় স্বীকারই করত না। ভারতেও চালু প্রবচন হচ্ছে 'স্ত্রীয়াশ্চরিতম দেবা ন' জানন্তি, কুতঃ মনুষ্যা।' নারী আজো দুনিয়ার পুরুষের চোখে 'রহস্যময়ী'—তার 'হ্যাঁ' ও 'না' নাকি সব সময়েই দ্ব্যর্থবোধক। আরো এক আপ্তবাক্য আমরা জানি, তা এই, 'নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'।

যদিও আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্যে ও চালুরীতির প্রমাণে বিবাহপ্রথা চালু হওয়ার আগে একটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করি এবং পৃথিবীর বহু বুনো-বর্বর ও সভ্য-অসভ্য সমাজে এখনো সেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজের রেশ-লেশ রয়ে গেছে, তবু তা যে আদি ও আদিম অবিকশিত স্তরেরই ছিল, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ মেলে পৃথিবীতে চালু ভাষাগুলোতে। প্রতিটি ভাষায় অধিকাংশ বিশেষ্য-বিশেষণ পুরুষবাচক, আকার-ইকারযোগে শব্দের রূপান্তর ঘটিয়ে নারীবাচক শব্দ তৈরি হয়, এতেই বোঝা যায় সংস্কৃতি-সভ্যতা পুরুষের প্রয়াসের-উদ্যমের-উদ্যোগের অনুশীলনের ও অধ্যবসায়ের ফল। এজন্যেই যদিও নরপ্রাণীর চেয়ে নারীপ্রাণী আকারে ও রূপে খাট, তবু কাম-প্রেমবশে নারী নরচোখে আকর্ষণীয়া। কিন্তু সৃষ্টির আন্তঃপ্রেরণা ব্যতীত ক্ষেত্রপ্রতীক নারীজাতীয় প্রাণীরা সাধারণত যৌন সম্ভোগে বিমুখ। এবং প্রাণিজগতে এ-ও দেখা যায়, কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত থাকলেও পুরুষপ্রাণীও বলাৎকারে

বিমুখ। সৃষ্টি সম্ভবা না হলে ক্ষেত্রপ্রতীক উর্বরা নারীজাতীয় প্রাণীর এবং মানুষের মধ্যে যৌন সঙ্গমে নারীর নিষ্ক্রিয়তা থেকে সমাজে ধারণা হয়েছে যে নারী মাত্রই সম্ভোগপাত্রী, সম্ভোগী ভোক্তা হচ্ছে পুরুষ। মানুষের জীবনাচার স্বরচিত, তাই কৃত্রিম। প্রকৃতিকে দাস ও বশ কিংবা প্রকৃতির সঙ্গে আপোস করে মানুষ প্রকৃতিনির্ভর হয়েও তার চাহিদা পূর্তিলক্ষ্যে উৎপাদনে নির্মাণে ব্যবহারের উপযোগ সৃষ্টিতে যত্নবান হয়ে জীবন-জীবিকা ক্ষেত্রে মাটি-জল-বায়ু-আগুন আর প্রকৃতির সৃষ্ট জীব-উদ্ভিদকে হাতের-হাতিয়ারের-যন্ত্রের ও বুদ্ধির প্রয়োগে কাজে লাগিয়েছে। এর মধ্যে বিদ্বানেরা বলে থাকে বটে যে, আঙিনায় কৃষির বৃক্ষ লতার বীজ বপন নারীরই মানস ও উদ্যমপ্রসূন।

তবু বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার আগেও নারী পুরুষের সম্পর্ক ছিল ভোগ্যা-ভোক্তাভোগীর। অর্থাৎ নারী ছিল পুরুষ সম্ভোগ্যা আর পুরষ হল সম্ভোগকারী। এ ধারণার উদ্ভবের কারণ নারী যৌনসুখ পায় দলিতা হয়ে নিষ্ক্রিয়া থেকে আর পুরুষ পায় দলিত করে। সম্পর্কটা যে-দলক-দলিতার, পীড়ক-পীড়িতার। সচেতনভাবে নারীও সজ্জাপ্রিয় পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্যেই। সৃষ্টিসম্ভবা হলেই নারীর পুরুষ সান্নিধ্য আবশ্যিক হয়ে ওঠে। প্রাণিজগতের সবশ্রেণীর মধ্যেই পুরুষ যৌনসম্ভোগে সদা প্রস্তুত বলেই এবং সদা আগ্রহী বলেই সে নারীর মন যুগিয়ে বশ করার চেষ্টায়ও থাকত। বিবাহ প্রথা চালু হওয়ার পূর্বাবধি তাই নারীর মনকাড়ার মাধ্যমে নারীদেহে অধিকার লাভই ছিল লক্ষ্য। এ আপোসে বিশেষ নারীর প্রতি আসক্তি বিস্তারের কামজ প্রয়াসের নাম প্রেম। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়াব্যাপী যত রূপকথা, উপকথা, প্রেমকথা, গাথা-গীতিকা, কাব্য, কবিতা মুখে মুখে কিংবা লিখিতভাবে তৈরি হয়েছে, সবগুলোরই নায়ক তাই পুরুষ আর নায়িকা হচ্ছে অপরিচিতা রূপসী জীন-পরী-অপ্সরা এবং মানবী। এক পলক চোখে দেখে, তসবীর বা আলেখ্য দেখে, কিংবা স্বপ্নে দেখা পেয়ে অথবা লোকমুখে শুনে নায়ক অজানা অলঙ্ঘ্য দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র অরণ্য পর্বত অতিক্রম করে সেই রূপসীকে পাবার জন্যে প্রাণপণে অনিশ্চিত অভিযানে অভিসারে যাত্রা করেছে। কেবল মৌখিক বয়ানে কথকতায় শ্রুতি-স্মৃতির রোমন্থনে নয়, পৃথিবীর আদি ও আদিম লিখিত গান-গাথা-গল্প-গীতিকা এবং কাব্যগুলো কাম-প্রেমবিষয়ক। এ জন্যেই শৃঙ্গাররস আদি ও প্রধানরূপে অভিহিত। হাজরা আফসানা, আলেফ লায়লা, ইলিয়াড, ওডেসি, রামায়ণ, মহাভারত, ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, কিংবা বোকাসিওয়োর রচনা থেকে বৃহৎকথা-কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শাহনামা অবধি এবং আধুনিকতম গল্প-উপন্যাস-কাব্য-কবিতা-নাটক-চিত্র সর্বত্রই পাই ওই আদি রসেরই লঘু-গুরু-ভিয়ান—এ না হলে চৌষট্টি কলার অনেক কলাই থাকে অসম্পূর্ণ ও অনাকর্ষণীয়। সাহিত্য চিত্র স্থাপত্য ভাস্কর্য, চারু-কারু-দারু শিল্পে তাই কাম-প্রেমরসাশ্রিত নারী-পুরুষ সম্পর্কের আলেখ্য বিজড়িত। নাচে-গানে-বাজনায়ও পুরুষ নারীরূপের স্তাবক ও ভাবক। এক কথায় পুরুষের-সুকুমার কিংবা ললিতকলার তথা পুরুষের ললিত মধুর ভাব-চিন্তা-কল্পনার অবলম্বন চিরকালই নারী। তা সত্ত্বেও নারী কেন পুরুষের বাস্তব জীবনে তাচ্ছিল্যের, পীড়নের, নির্যাতনের পাত্রী, তা এবার বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যিক। তা না হলে নারীমুক্তির, নারীর স্বাধীনতার পথে বাধা কি কি এবং কোথায়

ও কেন, আর জীবন-জীবিকার এবং সমাজের, সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার চাওয়ার ও পাওয়ার এবং দেয়ার যৌক্তিকতা বোঝা-বোঝানো যাবে না।

ফল-মূল-মৃগয়াজীবী মানুষের যাযাবর জীবনের অবসানকালে, মানব প্রজাতির প্রাণীরা পশুপালক কিংবা কৃষিজীবী হয়ে স্থায়ী নিবাস স্থাপনে হল আগ্রহী। তার আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল অজ্ঞ মানব সমাজে প্রায় অসম্ভব। কেননা, তারা তখনো রোগের প্রতিষেধক এবং প্রসূতি ও জাতক বাঁচানোর সব জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি বলে মৃত্যু প্রতিরোধ করা, মহামারী ঠেকানো ছিল এ শতকের প্রথমার্ধ অবধি অনুন্নত দেশে অসম্ভব।

গোষ্ঠীবদ্ধ যাযাবর জীবনে রূপসী-স্বাস্থ্যবতী তরুণীর প্রতি একাধিক পুরুষের আসক্তি-আকর্ষণের দরুণ অপ্রতিরোধ্যভাবে কখনো কখনো কোন-না-কোন নারী নিয়ে প্রতিযোগী-প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি-মারামারি ও হানাহানি চলত। রূপসী নারীহরণ ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাতের মুখ্য কারণ। তাই বেদেও দেখি, ভিন্ন গোত্রের নারীহরণ করা, গোধন লুট করা, ইন্দ্রের হুকুমে ও নেতৃত্বে নগরের সম্পদ লুট করা, আর্যভাষীদের পেশায় ও নেশায় পরিণত হয়েছিল। হরণ ও বহন করে আনা হত বলেই হৃতা নারীকে বলা হত বধূ। তাছাড়া অনার্য গোত্রের নারী ঘরে তুলত বলেই আর্যভাষীর স্ত্রী স্বামীকে বলত আর্যপুত্র। দেবতাদের রাজারা, ইন্দ্ররা পুরলুণ্ঠনকারীরূপে 'পুরন্দর' নামে ছিলেন কুখ্যাত। যৌথজীবন নির্বিরোধ-নির্বিবাদ নিরুপদ্রব ও নিরাপদ শান্তি-স্বস্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যেই সুখ্যাত বিবাহ প্রথা উদ্ভাবিত ও চালু হল। এতে সর্বসম্মতিক্রমে এক একজনকে নারী বন্টন করে দেয়ার ব্যবস্থা হল যাতে নির্বিঘ্নে পুরুষ নারীসম্ভোগের সুযোগ পায়। একারণেই বুনো-বর্বর সভ্য ভব্য সমাজে সামাজিক উৎসবের মাধ্যমেই বিবাহানুষ্ঠান হয় একে সর্বসম্মত ও প্রকাশ্য অধিকার বলে স্বীকৃত করার লক্ষ্যেই। আরো একটা নীতি-নিয়ম হল, সুন্দরী বোন নিয়ে বা রক্তের সম্পর্কের নারী নিয়ে আত্মীয়দের মধ্যে কাড়াকাড়ি নিবারণের জন্যে কোন কোন প্রাচীন গোত্রে ও সমাজে তথা শাস্ত্রে আত্মীয়বিবাহ নিষিদ্ধও হয়ে গেল। আবার গৌত্রিক-গোষ্ঠীক নিরাপত্তা-প্রতিরক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য-সংহতি বজায় রাখার লক্ষ্যে কোথাও কোথাও ভিন্ন গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করাও হল। এসব প্রথাপদ্ধতি আজো প্রায় অটুট রয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আলোচ্য নয়, বিরলতায় দুর্লক্ষ্য বলে। যেহেতু নারীমাত্রই সম্ভোগ্য তথা পুরুষভোগ্যা, সেহেতু পুরুষভোগ্যা নারীকে সোনা-রূপোর মতো মূল্যবান ভোগ-উপভোগের, সম্ভোগের সামগ্রী হিসেবেই বিবেচনা করা হল। পুরুষের কামজ ঈর্ষার বা রিরংসার প্রসূন হল বালিকা-কিশোরী বিবাহপ্রথা। যাতে অনাঘ্রাত পুষ্পের মতো নারীও থাকে অস্পর্শে অশিহরিতা— এর নাম নারীর সতীত্ব। এটি পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে এখনো নারীর রক্তের সংস্কারে পরিণত রয়েছে। অবগুণ্ঠন অবরোধ পর্দাপ্রথার প্রচলনও হল এ কারণেই। স্থূল যুক্তিতে সন্তানের পিতৃ পরিচয় অসংশয়িত রাখাই নারীর সতীত্বের গুরুত্ব আবশ্যিক বলে মানা হলেও ঈর্ষার কারণেই ভারতীয় সমাজে আট-নয়-বারো বছরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিলে মা-বাবার নরক বাস সুনিশ্চিত হয়ে যেত এবং ওই ঈর্ষার তীব্রতাই পুরুষস্পৃষ্ট বিধবার কৃচ্ছ্রতাক্লিষ্ট জীবনযাপন বা সহমরণ আর অধবার পতিতা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কারণ ওরা পুরুষস্পৃষ্টা বলেই ঘৃণ্য।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বাল্যবিবাহ চালু ছিল। পশ্চিম এশিয়ার আদি সভ্যসমাজেও বিবাহকালে নারী পুরুষ সংসর্গে এসেছিল কি-না, তা পরীক্ষা করে নেয়া হত—এখনো হয়তো নিরক্ষর সমাজে, তা চালু রয়েছে। অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজে এখনো দ্রৌপদীবিয়ে তথা সব ভাই মিলে এক নারী সম্ভোগ কিন্নর গোত্রে এবং দাক্ষিণাত্যের নায়ার-নামুদ্রী গোত্রে এখনো অবিলুপ্ত।

অতএব বালিকা-কিশোরী বিবাহ্ নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত—নিশ্চিন্ত থাকার জন্যেই প্রচলিত হয়। ফলে এদের অভিভাবকত্ব পায় শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদী প্রভৃতি। এরা গৃহগত জীবনই যাপন করে। এদের ঘর হতে আঙিনাও দূরে কোন সমাজে, এরা অল্পবিস্তর অসূর্যম্পশ্যা। কাজেই অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের জন্যে এরা স্বামীনির্ভর। এজন্যেই হিমালয়-মেনকাও গৌরী সম্প্রদানকালে শিবের হাত ধরে মিনতি জানায়, 'কুলীনের পো তোমায় কি বলিব আর। হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট পূরে ভাত।' এভাবে নারী পুরুষভোগ্যা প্রাণীরূপে শাসিতা-পোষিতা-লাঞ্ছিতা আজো পরিবারে পরিবারে। শিক্ষিতা চাকুরে রোজগেরে নারীই কেবল বাহ্যত স্বাধীন। আর মানসিকভাবে আজো সে দাসী, সেবিকা, চরণাশ্রিতা, কেননা স্বামীর পায়ের তলেই তার স্বর্গ। কোরআনে আল্লাহ্ও বলেন, 'আমি পুরুষকে (স্বামীকে) নারীর অভিভাবক করে দিয়েছি এবং অন্যত্র তুমি স্ত্রীকে (এবং একাধিক) যেমন খুশি তেমনভাবে সম্ভোগ কর।' এখানেও নারী যে সম্ভোগ্যা, তা বলা হল। সাংখ্যদর্শনে পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বেও, পুরুষ হচ্ছে বীজ বপনকারী নারীযোনী বা গর্ভরূপ ক্ষেত্রে। স্বামীর অসামর্থ্যে স্বামীর নির্বাচিত ও নিমন্ত্রিত অন্য পুরুষও ক্ষেত্ররূপ নারীতে শুক্ররূপ বীজ বপন করতে পারত। মহাভারতে এমনি ঘটনার ছড়াছড়ি দেখা যায়। নারী সম্ভোগ্যাপ্রাণী বলেই বহু আসমানী শাস্ত্রানুসারেই পুরুষমাত্রই যুগপৎ একাধারে একাধিক, হাজার, অসংখ্য নারী গ্রহণের ও সম্ভোগের অধিকারী।

অতএব ১. নারী পুরুষভোগ্যা ২. নারী পুরুষের চরণাশ্রিতা সর্বপ্রকারে। ৩. নারীজমি স্বরূপ, পুরুষ হচ্ছে চাষীস্বরূপ, তাই পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজে-শাস্ত্রে সন্তানে রয়েছে কেবল বাপের অধিকার, মায়ের অধিকার স্বীকৃত নয়। ৪. পুরুষের ভোগ্য বলেই পুরুষের রিরংসা প্রসূন ঈর্ষা সুপ্ত রাখার জন্যেই নারীর স্বামীনিষ্ঠ থাকা আবশ্যিক। এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে আশৈশবের মগজধোলাইয়ের ফলে নারীমনে দেহের ত্বকের মতো, প্রাণের উৎস রক্তের মতো এক প্রকার হীনমন্যতা, পুরুষনির্ভরতা এবং শাস্ত্রিক বিশ্বাসসংস্কার অবিমোচ্য অপরিত্যাজ্য হয়ে রয়েছে।

একালে নারীরা পুরুষের সহচরী সঙ্গী সহযোগীরূপে পুরুষের সমান অধিকার দাবি করে বটে, কিন্তু এখনো তার স্বাধীনতার বা মুক্তির চেতনা পূর্ণতা পায়নি। প্রমাণ নারী এখনো স্বামীর পদবী পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করতে গৌরব-গর্ববোধ করে। মুসলিম নারী জানে, মুসলিম নারীর দাম্পত্য একটা জাগতিক চুক্তিমাত্র এবং নারী যে পুরুষভোগ্যা সে-স্বীকৃতির প্রমাণ কাবিন। কাবিন হচ্ছে সম্ভোগের দামস্বরূপ আর্থিক মূল্যের দলিল, এ জেনেও উচ্চ দক্ষতার চাকুরে নারীও কাবিন যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে সম্ভোগ্যারূপে আত্মবিক্রয়ের অবমাননাকর দলিল মাত্র, তা আজো মনে করে না। এ-ও মনে করে না যে,

শাস্ত্রানুসারে নারী পুরুষভোগ্যা প্রাণীমাত্র, তাই এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী অনুমোদিত।

সাধারণ নারীর মুক্তির কয়েকটি শর্ত পূরণ হওয়া চাই, নারীকে শাস্ত্রিক বিধিনিষেধ দ্রোহিনী হতে হবে। ২. সর্বাবস্থায় পুরুষ একপত্নীক হবে, এবং তালাকে বা বিচ্ছিন্নতায় সমান অধিকার থাকবে। ৩. সন্তানের ওপর স্ত্রীরও সমান অধিকার থাকবে। ৪. কাবিন আত্মবিক্রয়ের দলিল বলেই গর্হিত এবং পরিত্যাজ্য হবে, এক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার আনুগত্য পরিহার করতে হবে। ৫. স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গী-সহচরী-সহযোগীরূপেই রোজগেরে হয়ে বা স্বাধীনভাবে বাস করবে। স্বামী প্রভু বা অভিভাবক হিসেবে স্বীকৃত হবে না। বন্ধু ও হিতৈষী-সহকারী-সাহায্যকারী-সহযোগীরূপে ঘরে বাইরে সঙ্গী থাকবে মাত্র। ৬. অর্থ-সম্পদে কন্যারও সমান অধিকার থাকবে। পিতৃপ্রধান সমাজে কেবল চার সংখ্যক শর্তটি মুসলিম নারী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হবে। স্বামী বলেই কোন পুরুষই স্ত্রীর বা নারীর মান্যজন, অভিভাবক, শাসক, নিয়ন্ত্রক, কর্তা হবে না। স্ত্রী স্বামীর নাম বা পদবী ধারণ করবে না। পুরুষ কায়িক শক্তিতে, কর্মক্ষমতায় ও বয়সে স্ত্রীর চেয়ে এগিয়ে থাকায় ক্রমে স্ত্রীর নিজের শক্তি-সামর্থ্য-সাহস-কর্মক্ষমতা-স্বসত্তার মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে আস্থাহীন করে তোলে এবং প্রাজন্মক্রমিক এ ধারণা স্থায়ী মানসিকতায় পরিণত হয়। ফলে নারী প্রথমে পিতার, মধ্যে স্বামীর এবং বার্ধক্যে বৈধব্যে পুত্রসন্তাননির্ভর হয়ে থাকে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আত্মপ্রত্যয়ী নারীও অবশ্য সব যুগেই নগণ্য সংখ্যায় ছিল। এ যুগে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং শাসনমুক্ত অর্থার্জনে সমর্থ নারী যে, যে-কোন পুরুষের সমান ও সমকক্ষ, তা নিঃসংশয় প্রমাণে ক্রমশ স্বীকৃত হচ্ছে সব সমাজে। ব্যায়ামে, অনুশীলনে, চর্যায় যুদ্ধে কিংবা কায়িক পরিশ্রমেও তারা যে পুরুষের সমকক্ষ তা-ও প্রমাণিত হচ্ছে। নারী ললিতলবঙ্গলতারূপ ললনা থাকবে না। তার প্রকাশ্য লক্ষণও দুর্লভ নয়। যুগান্তরে সমাজ বিবর্তনের ফলে অতীতের নীতি-নিয়ম, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি বদলাতেই হয় স্বকালে উদ্ভূত পারিবারিক ও জাগতিক জীবনের সমস্যা-সঙ্কট উত্তরণের জন্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে য়ুরোপেও নারীশিক্ষা তেমন প্রশ্রয় পায়নি, নারীও কায়িক শ্রমে কিংবা মানসিক শ্রম প্রয়োগে অর্থ উপার্জনের তেমন গরজবোধ করত না। সমাজ ছিল পুরুষশাসিত, ঘরও ছিল পুরুষনিয়ন্ত্রিত। যুদ্ধজাত আর্থিক সামাজিক বিপর্যয় য়ুরোপীয় নারীদেরও ঘরের বাইরে এসে বেপর্দা হয়ে পরপুরুষের পাশে ও সাথে কাজ করতে হল জীবিকার্জনের গরজে। ক্রমে তারা হায়া-শরম-সংকোচ মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক মানুষ বা মানবীরূপে সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, আমাদের দেশেও প্রথমে ব্রাহ্ম ও দেশী খ্রিস্টান সমাজে উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে নারী। এমনকি কোলকাতায় যখন নারী গ্রাজুয়েট ও ডাক্তার হয়, তখনো খাস লন্ডনেও উচ্চ শিক্ষা নারীদের মধ্যে চালু ছিল না। ১৯৩০ সনের আগে ব্রিটিশ নারীরা ভোটাধিকারও পায়নি, অথচ ১৯৩৭ সন থেকেই আমাদের গাঁ-গঞ্জের অশিক্ষিতা নারীও ভোটাধিকার পেয়েছে।

নারীশিক্ষা চালু হওয়ায় ব্রাহ্ম-খ্রিস্টান ভদ্রঘরে কেবল যে বাল্যবিবাহ বন্ধ হল তা নয়, চির অনূঢ়া থাকার অধিকারও এসব সমাজে স্বীকৃত হল। তারপরে ভদ্র বর্ণহিন্দুরা যখন মেয়েদের স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো শুরু করে, তখন শাস্ত্রানুগত্যবশে পাপের

ভয়ে অল্পবয়সে কন্যার বিয়ে দেয়ার রীতি ভঙ্গ করতেই হল। শুধু তা নয় লাবণ্যহীনাদের কিংবা অর্থাভাবে পালটি ঘরে কন্যার বিয়ে দেয়া অসাধ্য হয়ে উঠলে ঘরে ঘরে অনূঢ়া বয়স্কা কন্যা থাকায় পাপের ও নরকের ভয় দেখানোর, সামাজিক নিন্দা-কলঙ্ক রটানোর উপায় রইল না কারো। ফলে একটা সঙ্কট এভাবেই কেটে গেল শিক্ষিত ভদ্র সমাজে। এখন মুসলিম সমাজেও বিয়ে না হওয়া কোন অনূঢ়ার পক্ষে আর লজ্জা-শরম-সংকোচের বিষয় নয়, নয় নিন্দা-কটাক্ষের বিষয়ও।

কিন্তু গাঁ-গঞ্জের অজ্ঞ-অনক্ষর-সাক্ষর সমাজে তা আজ এক মারাত্মক সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সব ধর্মের সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে। পণ বা যৌতুক দিয়ে যোগাড় করতে হয় বর। সে-যৌতুক যোগাড় করা সম্ভব হয় না দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে। যৌতুকের অর্থ-সামগ্রী পরিশোধের মিথ্যা অঙ্গীকার-শপথ করে কন্যার বিয়ে দিলে বিবাহোত্তরকালে ছয়/নয় মাস কিংবা বছরের মধ্যেই যৌতুকের বাকি অর্থ বা সামগ্রী না দিলে বধূকে পিটিয়ে পুড়িয়ে মারা, তালাক ত্যাগের মাধ্যমে বাপের বাড়িতে ফিরিয়ে দেয়া প্রভৃতি গোটা উপমহাদেশে একটা অমানবিক বর্বরতার বিস্তার ঘটাচ্ছে। প্রতি বছর কয়েক হাজার নারী এভাবে পীড়িতা-নির্যাতিতা-লাঞ্ছিতা হয়ে হতাশায় ও আত্মহত্যায় অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। গাঁয়ে-গঞ্জেও সব পরিবারে নারী শিক্ষার ও জীবিকার্জনের প্রশিক্ষণের প্রসার না ঘটালে এ সমস্যার সমাধানের কোন বিকল্প উপায় মিলবে না। কেননা নারী জীবিকাক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হলেই কেবল নারী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা অবস্থায় স্বাধীন সত্তায় নিরুপদ্রবে বাঁচতে পারবে। তখন দাম্পত্য আর অপরিহার্য থাকবে না।

এবার আমরা সূত্রাকারে নারী নির্যাতনের ও তার মানবিক অধিকারহৃতা হওয়ার কারণ সন্ধান করছি।

১. অন্য প্রাণীর মতো কেবল সৃষ্টিসম্ভবা নারীতেই সঙ্গমবাঞ্ছা জাগে না, কৃত্রিম মনন অনুশীলনে নারী-পুরুষের রতি-রমণবাঞ্ছা বলতে গেলে সার্বক্ষণিক বা বারোমেসে। নারী নিয়ে একাধিক পুরুষের কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি নিবারণের জন্যে ও যৌথ বা সামাজিক জীবনে নির্বিরোধ সহাবস্থানের জন্যে আত্মীয় সমাজ গড়ে তোমার লক্ষ্যে বিবাহপ্রথা চালু হয়।

২. যেহেতু গোড়া থেকেই পুরুষেরা নারীকে সম্ভোগ্যা প্রাণীরূপেই জেনেছে, সেজন্যে রিরংসাজাত ঈর্ষাবশে নারীকে একক পুরুষসম্ভোগ্যা বলে চিহ্নিত করেছে, এ জন্যেই নারীমনে সতীত্বের ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল করে দিয়েছে পুরুষেরাই। নারীও তা পুরুষশাসিত সমাজে মেনে নিয়েছে এবং এ আবশ্যিক গুণের ও সংযমের গৌরবে গর্বে নারীও অভিভূতা।

৩. বিবাহপ্রথা চালু হওয়ার আগে মানুষ মাতৃ পরিচয়ে হত চিহ্নিত। তখন পিতার সন্ধান নির্দিষ্ট করে মিলতও না, প্রয়োজন ছিল না। কাজেই সন্তান লালনের দায়িত্ব চিরকালই ছিল স্তন্যদাত্রী মায়েরই। তখন নারী ছিল স্বাধীন এবং পুঁরুষেরা করত তার স্তাবকতা ও তাকে তোয়াজ। ভারতে সব সহোদরাই কোন এক পুরুষের স্ত্রীরূপে সতীন হতে পারত। উনিশ শতক অবধি বাঙলাদেশেও তা ক্বচিৎ চালু ছিল। ভূটানের রাজা এখনো এমনি বিয়েই করেন।

৪. পুরুষের রিরংসাপ্রসূন ঈর্ষা সুপ্ত রাখার জন্যেই নারীর বাল্যবিবাহ চালু হয় ভারতীয় সমাজে এবং অন্যত্র এমনি বিবাহে নারীর সতীত্ব তথা অন্য পুরুষস্পৃষ্টা না হওয়া বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এভাবেই নারী শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদী-স্বামীর শাসনপাত্রী হয়ে গেল, পীড়ন-নির্যাতন তারই ফল।

৫. পুরুষের চিত্তবিনোদন ও রতি-রমণ পাত্রী হওয়াই যখন নারীজীবনের একমাত্র উপযোগ ও সার্থকতা বলে বিবেচিত হল, তখনই বর্ণ হিন্দু সমাজে বিধবা নারী অবাঞ্ছিত বোঝা হয়ে দাঁড়াল। সহমরণে তার মৃত্যুর কিংবা কৃচ্ছ্রতায় তার জীবন ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা হল। এ সূত্রেই স্মর্তব্য যে, (নারী হল বীরভোগ্যা), সুন্দরী নারীর সন্ধানে নিরুদ্দেশ অভিযাত্রাই হল বীরের ও রাজপুত্রের শক্তি-সাহস-উদ্যম-উদ্যোগের বিষয়। দুনিয়ার কাব্য-কবিতা-চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের এবং আজকের গল্পের-উপন্যাসের নয় কেবল বিজ্ঞাপনেরও অবলম্বন নারী। আজো প্রাগ্রসর সমাজেও জরু'রই (নারী) পুরুষচেতনায় রয়েছে প্রাধান্য, এর পরের স্থান জমির এবং জরির (সোনার)।

৬. আদিতে যখন লেখা-পড়ার কোন আর্থিক মূল্য ছিল না, নারীশিক্ষাও ছিল ভদ্র কুলীন ঘরেও অপ্রচল, তখন ধনী-মানী-কুলীন তথা সম্ভ্রান্ত বা খ্যাতি ক্ষমতাবান পরিবারের কন্যা বধূরূপে ঘরে এনে মানুষ কুলীন বা সমাজে সম্মানিত স্থানে উন্নীত হত এবং কোথাও কোথাও যেমন পশ্চিম এশিয়ায়, বেলুচিস্তান থেকে মধ্য এশিয়ায়ও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কম থাকত, ফলে কনেপণপ্রথাই ছিল চালু, বহু অর্থ ব্যয়ে কুলীন ঘরের কন্যা বধূরূপে ক্রয় করে আনতে হত। এটি মুসলিম সমাজে বিশ শতকেও কোথাও কোথাও চালু ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (যদিও ব্রাহ্মণেরা চিরকালই বিনা পণে কন্যা সম্প্রদানে অভ্যস্ত ছিল) শিক্ষিত চাকুরে লোকের সামাজিক সম্মান ছিল সুউচ্চ। কেরানী-ডেপুটি-মুন্সেফ-জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে আদর-কদর-সম্মান ছিল বলে ওদের পণ-যৌতুক নামে অর্থ-সম্পদ দিয়ে ক্রয় করার রেওয়াজ চালু হল প্রথমে বর্ণ-হিন্দু সমাজে, পরে শিক্ষিত মুসলিম সমাজেও। এখন তা গাঁয়ের চাষী-মজুর সমাজেও দুষ্টক্ষতের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা সমাজকে করে তুলেছে মানবিকবোধ বুদ্ধি-যুক্তি-বিবেক-বিবেচনাহীন যান্ত্রিক লেনদেনের বাজার। একালে কেবল বরই বাজারে যোগ্যতানুসারে ক্রীত-বিক্রিত হয়। এও স্মর্তব্য যে, যে-সব দেশে পুরুষ ছিল কম, নারী ছিল বেশি, সেখানে পুরুষের বহু বিবাহ ছিল সহজ ও স্বাভাবিক সামাজিক স্বার্থেই. আবার যেখানে নারী কম কিন্তু পুরুষ ছিল বেশি, সেখানে এক নারীর বহুস্বামী গ্রহণে বাধা ছিল না।

৭. শাস্ত্রে নিষিদ্ধ অপকর্ম জেনেও সমাজস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যেই প্রবাসী বা নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রয়োজনে বেশ্যাবৃত্তি পরোক্ষে সমাজঅনুমোদিত একটা ব্যবস্থা ছিল। তার উচ্ছেদ বা বিলুপ্তি সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনসাপেক্ষ। কিন্তু ইসলামী জোশে বা জনপ্রিয়তার লোভে সরকার হাটে বাজারে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে কেবল গাঁয়ে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে নারীর সামাজিক নিরাপত্তাই বিঘ্নিত করেছে মাত্র। ধর্ষণ করে হত্যা করার এবং ব্যর্থ কামুকের এসিড প্রয়োগে নারী দেহের বিকৃতি সাধনের মতো দুষ্কর্ম তো পতিতালয়ের অভাবজাত সামাজিক উপসর্গ উপদ্রব মাত্র।

৮. পণ ও যৌতুকের ক্ষেত্রে সামাজিক বিবর্তন পরিবর্তনের ধারা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে ও শাস্ত্রে বিচিত্র প্রকারের। হিন্দু ঐতিহ্যে হরণ-বরণ জোর-জুলুম-প্রেম-প্রস্তাব প্রভৃতি আট প্রকারের বিবাহপ্রথা চালু ছিল। সে-যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও চালু ছিল :

১. স্বেচ্ছাবৃত বা স্বয়ম্বরা হওয়া

২. পণ নিয়ে কন্যা বিক্রয়

৩. খোরপোশ এবং নগদ পরিশোধ্য ও পরে পরিশোধ্য অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয়।

৪. যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের কন্যা-জায়া-ভগ্নী দান করে বিজয়ী পক্ষের তুষ্টি সাধন আর দাসীর, যুদ্ধবন্দিনীদের বিয়ে না করেই, সম্ভোগ কোন কোন শাস্ত্রে বিধেয়। ১৮৬৩ সনে দাসপ্রথা রহিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত অবধি মার্কিন রাষ্ট্রে নিগ্রোনারী সম্ভোগে প্রভুগোষ্ঠীর অধিকার ছিল অবাধ।

৫. তারপরে সভ্যতর সমাজে পারিবারিক ও সামাজিক সম্মতিক্রমে প্রেমজ বিবাহ।

৬. পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাল্পতার দরুন কনেপণ দিয়ে বিবাহ।

৭. পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাগুরুত্বের জন্যে বিনা পণে বিবাহ ও বহুবিবাহ।

৮. রূপসী নারীর জন্যে প্রতিযোগীর সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে বা ফলে নিলামী বস্তুর মতো উচ্চহারে কনেপণ দাবি করা।

৯. সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে ধনী-মানী খ্যাতি-ক্ষমতাসম্পন্ন পরিবারে কিংবা উঠতি পড়তি কুলীন পরিবারে বিয়ে করার জন্যে অর্থ দিয়ে কনে ক্রয় করা।

১০. দরিদ্র ও নিঃস্ব কিন্তু অভিজাত পরিবারে অথবা রূপসী কন্যা বিয়ে করার জন্যে কন্যার পিতাকে বিবাহোৎসবের ব্যয় বাবদ নগদ অর্থদান। উল্লেখ্য যে, বিয়ের আনন্দভোজ এবং মৃতের সদগতিভোগ পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালেই যেন চালু ছিল এবং এখনো রয়েছে।

১১. ব্রাহ্মণদের সালঙ্কার কন্যা সম্প্রদান।

পৃথিবীর নানা গোত্রের ও অঞ্চলের বিভিন্ন সমাজে আরো বিচিত্র সব রীতি রেওয়াজ, প্রথা-পদ্ধতি চালু ছিল, আজো রয়েছে, যা জানা ও বয়ান করা সমাজ বিজ্ঞানীদের পক্ষেও অর্থ, সময় ও শ্রমসাধ্য কাজ।

আগে মানুষের ব্যক্তিক পরিচয় ছিল তুচ্ছ। মানুষ পরিচিত হত গৌত্রিক, গৌষ্ঠীক পরিচয়ে কিংবা স্বজ্ঞাতি পরিবারের প্রখ্যাত ব্যক্তির বংশীয় বলে। তাই তখন হত 'ক' গোত্রের বরের সঙ্গে 'খ' গোত্রের কনের কিংবা 'ক' বংশের বরের সঙ্গে 'খ' বংশের কন্যার বিবাহ। পরে শিক্ষার প্রসারে মুদ্রিত নিমন্ত্রণপত্রে বাবার নামে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্র-কন্যার বিয়ে বিজ্ঞাপিত হত, এখন পিতা-মাতা-পুত্র এবং পিতা-মাতা-কন্যা সবার নাম থাকে আমন্ত্রণপত্রে, কারণ এখন ওরা সবাই শিক্ষিত বলেই স্বনামে খ্যাত বা পরিচিত, স্ব-সত্তার মূল্যে মর্যাদায় স্বীকৃত।

আমরা যদি সতীত্বকে নারীসম্ভোগে পুরুষের একাধিপত্যের স্বাক্ষর ও স্বীকৃতি বলেই ঘৃণা করি, আমরা যদি কাবিনকে নারীসম্ভোগের দাম বলে অশ্লীল ও নারীর পক্ষে অবমাননাকর বলে জানি, আমরা যদি নারীসম্ভোগ্যা এবং পুরুষসম্ভোক্তা—এ চালু তত্ত্ব ভুল বলে মানি, নারী ও পুরুষ সমমাত্রায় ও সম প্রয়োজনে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এ তথ্য স্বীকার করি,

আমরা যদি জানি ও মানি যে মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে বহু কাল ধরে নারী ঘরে ঘরে পুরুষপোষ্য হিসেবে ব্যায়ামে, শ্রমে-শিক্ষায় স্বাধীনতায় জীবিকা অর্জনে আত্মবিকাশে অধিকার পায়নি বলেই তাদের সম্বন্ধে আমরা ভুল ধারণাই পোষণ করি, আমরা যদি বুঝি ও মানি যে কেবল সন্তানধারণকালে ব্যতীত কায়িক শক্তিতে শ্রমে, বুদ্ধিতে, শিক্ষায়-শাসনে-প্রশাসনে ঘরে-বাইরে, সমাজে রাষ্ট্রে, সর্বত্রই নারী স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ পেলেই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, যুক্তিবাদী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে আমরা যদি অতীতের শাস্ত্রে ও পরম্পরাগত বিশ্বাস সংস্কারে আস্থা পরিহার করি, আমরা যদি আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্তি-যন্ত্র-কৌশল-প্রকৌশল-প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্রজগতে ও যন্ত্রনির্ভর জীবনকে প্রয়োগ ও চাহিদাঅনুগ স্বকালের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নির্মাণে রাজি থাকি, তাহলে আমাদের পরম্পরাগত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। আমাদের পণ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে নারীতে পুরুষে শ্রম প্রয়োগে কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, দফতরে, প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, আড়তদারিতে বা দোকানদারিতে জীবিকা অর্জন করতেই হবে। কেউ কারো ঘাড়ে বসে খেলে পোষ্যের হীনমন্যতা থেকে মুক্তি মেলে না। তাই নারীকে জীবিকা ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতেই হবে। সমাজে নতুন দিনের নতুন প্রয়োজন স্বীকার করে নিতে হবে। বিয়ের ক্ষেত্রে ১. সন্তানদের স্ব স্ব জীবনসাথী গ্রহণের পূর্ণস্বাধীনতা দিতেই হবে। ২. সমাজতন্ত্র অঙ্গীকার করতে হবে। ৩. মানুষকে কেবল মানুষ পরিচয়ে গ্রহণ করতে হবে, কুলশীল জাত-জন্ম-বর্ণ-ভাষা-নিবাসের পার্থক্যকে তুচ্ছ বলে মানতে হবে। আমাদের নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নারীর মনে স্বাধীনতার ও পীড়নমুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে মননে-রুচিতে-সংস্কৃতিতে য়ুরোপীয় প্রভাবের ফল। কাজেই আমাদের নারীমুক্তির পথ য়ুরোপীয় আদলেই তৈরি করতে হবে, সেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ার মতো মেয়ে বা ছেলে পাওয়া না গেলে নারী ও পুরুষ অবিবাহিত থাকতে রাজি থাকে। আমাদের দেশেও হিন্দু-মুসলিমে অনেক নারীই আজকাল অনূঢ়া তথা অবিবাহিতা থাকে, তাদের নিন্দা ঘৃণা করে না কেউ। যদি দাম্পত্য জীবনের অভাবে তাদের জৈব সঙ্কট-সমস্যা তাদের জীবন বৃথা ও ব্যর্থ করে দেয় এর প্রতিকারও প্রতীচ্যদেশে Living together নীতির মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। আমরা তেমন প্রাগ্রসর মন-মনন-রুচি-অনুশীলনের মতো উদার হতে পারিনি বটে, কিন্তু প্রয়োজন ও পরিবেশ আমাদেরও সে-পথে টানবে। সবটাই প্রয়োজনেই পরিবর্তিত হয়, এ যন্ত্রনির্ভর-জীবনে আমরা কি বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন-শাস্ত্রিক-সামাজিক-নৈতিক-আচারিক বিশ্বাসসংস্কার, খাদ্য, পোশাক, তৈজস, আসবাব, শিক্ষা, চিকিৎসাপদ্ধতি পরিবর্তন করিনি—পুরোনোকে বর্জন করে নতুনকে বরণ করছি না প্রতিদিন অঙ্গে ও অন্তরে, ঘরে ও সমাজে? নারীশিক্ষা প্রথম চালু হল ব্রিটিশপ্রভাবে শিক্ষিত শহরে ব্রাহ্ম ও দেশজ খ্রিস্টান সমাজে। পরে শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজে আন্দোলন-প্রচার-প্রচারণা মাধ্যমে চালু হয় নারীর উচ্চশিক্ষা। আর মুসলিমসমাজে যারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করল, তারাও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকলেও নিজেদের নগণ্যতার দরুন কন্যাকে শিক্ষালয়ে পাঠাতে সাহস পায়নি। বিশশতকের চতুর্থ দশক থেকে শিক্ষিত মুসলিমেরা নারী শিক্ষায় উৎসাহী হয়। এখন যে-কোন সচ্ছল গৃহস্থই

ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝে, তাই গাঁয়ে গাঁয়েও সচ্ছল নিরক্ষর পরিবারের মেয়েরাও উচ্চবিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। শিক্ষিত নারীর হার দ্রুত বাড়ছে। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় উর্দুভাষী মেয়েদেরই স্কুল ছিল, বাঙালি মেয়ে ছিল মাত্র দু'জন ১৯২৭ সনে। কাজেই বাঙালি ঘরে শিক্ষা বিস্তারে রোকেয়ার দান প্রত্যক্ষে ছিল না, অবশ্য তাঁর লিখিত সাহিত্য সমকালে কিছু শিক্ষিত বাঙালিকে নারীশিক্ষা দানের গুরুত্বসচেতন করেছিল। কাজেই বাংলাদেশে মুসলিম নারীশিক্ষার প্রসারে বেগম রোকেয়ার অনুপ্রেরণার চেয়ে কালের দাবিই অধিক কাজ করেছে। এর জন্যে মুসলিম সমাজে আন্দোলন করতে হয়নি কোথাও।

বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের মেসিডোনিয়ার এক লোকগীতিতেও পাই পত্নীত্বের গৃহগত শৃঙ্খলিত জীবনের করুণ আলেখ্য। কেতকী কুশারী ডাইসনের তর্জমা উদ্ধৃত করছি :

তুমি যথেষ্ট দিন বালিকা থেকেছ
যথেষ্ট দীর্ঘ বেণী বেঁধেছ
এখন থেকে অপেক্ষা করবে
হাট থেকে স্বামীর ফেরার জন্য
বন থেকে ভাশুরের ফেরার জন্য
আঁধার কারাগার
তোমার বাহুর উপরে ভারী লোহা
তোমার মাথার উপরে ভারী বোঝা
আঁধার কারাগার তোমার স্বামী
ভারী লোহা তোমার শিশু
ভারী বোঝা তোমার গৃহ।

এতক্ষণ যে-সব কথা বলা হল, তা নারীমুক্তির জন্যে বাংলাদেশের অজ্ঞতা-অনক্ষরতাদুষ্ট পরিবেশে প্রতিবেশে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। তাই এ মুহূর্তে বাংলাদেশে নারীমুক্তির জন্যে না হোক, নারীনির্যাতনের উপশম ঘটানোর জন্যে যা করা আবশ্যিক ও জরুরী তা হচ্ছে শিক্ষিতা, স্বল্পশিক্ষিতা, সাক্ষর, নিরক্ষর নারীমাত্রকেই বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে কিংবা কায়িক শ্রমে জীবিকার্জনে সমর্থ করে তুলতে হবে। তাহলেই খোর-পোশ আশ্রয়ের অভাবে যেসব অসহায়-নিরুপায় নারী ভাত-কাপড়ের জন্যে স্বামীনির্ভর থাকে বলেই স্বামী-শাশুড়ীর নির্যাতন সহ্য করতে বাধ্য হয়, জীবিকার্জনে সমর্থ হলে সে-সব নারী স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে পীড়ন-মুক্ত হয়ে।

নারীকে শিক্ষা দেয়া ও নারীকে যে-কোন কাজে প্রশিক্ষণ ও প্রেরণা প্রবর্তনা দেয়া সরকারের, রাজনীতিক দলের এবং সাধারণভাবে সর্বশ্রেণীর সমাজসেবী ও বুদ্ধিজীবীর আবশ্যিক নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলেই কেবল গাঁয়ের গৃহস্থ ঘরের অনূঢ়া মেয়েরাও মা-বাবা-ভাইয়ের বোঝা হয়ে থাকবে না। গাঁয়ে গাঁয়ে, গৃহস্থদের মেয়ের বিয়ে দেয়া যে অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্ব নয়, তা রেডিয়ো-টিভিযোগে কথিকা-নাটক মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে, ভদ্রঘরের চির অনূঢ়া মহিলাদের দৃষ্টান্ত তুলে

ধরে গরীব গৃহস্থদের বল-ভরসা যোগাতে হবে, যাতে পণ-যৌতুক দানে অসমর্থ পিতা মিথ্যা অঙ্গীকারে কন্যা বিয়ে দিয়ে কন্যার লাঞ্ছনার মৃত্যুর কিংবা ফেরত আসার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। ভদ্রলোকদের মতো মেয়ে অনূঢ়া রাখার ও থাকার জন্যে পাপভীতি কিংবা সামাজিক নিন্দাভীতি মুক্ত হতে পারলে পণ ও যৌতুক উঠে যাবে এবং প্রেমের বা পছন্দের বিয়ে চালু হবে। এ পথে অবশ্য ইতোমধ্যেই গাঁয়ের মেয়েরা এগিয়েছে, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে, কুটির শিল্পকেন্দ্রে, ইট ভাঙা, মাটি কাটার কাজ নিয়েছে। বিয়ে হলেও রোজগেরে বউকে নির্যাতন করা সম্ভব হবে না, আর না হলেও মেয়ে পিতা-মাতার বোঝা হয়ে থাকবে না। পর্দা অবরোধ-অবগুণ্ঠন উঠে যাচ্ছে। পুরুষের মধ্যে নিঃসংকোচে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়েছে ও হচ্ছে নারী। এপথেই ঘটবে নারীমুক্তি আর্থসামাজিক ও মানসিকভাবে। জানি, এসব বলা সহজ, বোঝানো কঠিন, বাস্তবায়ন কঠিনতর। শহরে শিক্ষিত ধনীরাই কেবল শাস্ত্র, সমাজ ও দেশাচার উপেক্ষার অবাধ শক্তি রাখে। কোন কোন শাস্ত্রমতে নারীর মর্ত্যজীবনে স্বামী মাত্রই ঈশ্বর, মর্ত্যদেবতা। জগতের সব ধর্মশাস্ত্রেই নারী পুরুষসম্ভোগ্যা, পুরুষসেবিকা পুরুষাধীনরূপেই বর্ণিত। সব শাস্ত্রে পুরুষই নারীর অভিভাবক। অতএব শাস্ত্র পরিহার করে নাস্তিক না হলে নারী পুরুষের মতো পূর্ণ স্বাধীন হতেই পারবে না। নাস্তিক না হলে নারীর স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের অধিকার মিলবে না। কেননা, শাস্ত্রের অনুরাগী, অনুগামী ও অনুগত কেউ স্বাধীনতার কল্পনাই করতে পারে না।

নারী নির্যাতনের ফন্দি-ফিকির

চিত্ত মণ্ডল

নারী নির্যাতন এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই একবিংশ শতকেও নারীকে গরুছাগলের মতো বিবেচনা করা হয়। গণ্য এবং ভোগ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনার কারণে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা এখনও মেয়েছেলে বা মেয়েমানুষ। এখনও তাঁরা মনুষ্যপদবাচ্য কোনো প্রাণী হয়ে উঠতে পারেনি। একটি মাত্র ক্রোমোসোমের পার্থক্যের কারণে একজন প্রভু এবং অন্যজন তাঁর সেবাদাসী বা পরিচারিকা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার অভাব এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা না থাকার কারণে বেশিরভাগ নারীই এখনও পুরুষনির্ভর। পরনির্ভরতা ও পরজীবীচেতনা তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের পথে অর্গল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যুগযুগ ধরে নারীকে বুদ্ধিবিকাশ-এর ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ না দেয়ার ফলে নারীও খড়িরগণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফ একদা এক প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সিনসিয়ার বেশি এবং সে-কারণে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের রেজাল্ট ভালো হয়। কিন্তু যে-পরিমানে বিদ্যা হয় সে-পরিমানে বুদ্ধি হয় না। ফলে এঁরা খাঁচাকেই বেশি পছন্দ করে। আর এই খাঁচার বন্দীত্বেই এঁরা প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলে। শিক্ষাহীনতা, পরনির্ভরতা, আর্থিক স্বনির্ভরতার অভাবের কারণেই এঁরা পরজীবী, নির্যাতিতা। দীর্ঘদিনের এই সংস্কার ও অভ্যাস এঁদের নিজস্ব অস্তিত্ব ও সত্তার গভীর বোধ ও চৈতন্যের মাত্রা লুপ্ত করে দিয়েছে। কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ, নারীবাদী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কিছু আইন এঁদের পক্ষে দাঁড়ালেও অত্যাচার ও লিঙ্গবৈষম্যের মাত্রা খুব একটা হেরফের হয়েছে বলেও মনে হয় না। নারী নির্যাতনের কারণ, তার মনস্তত্ত্ব কিংবা অত্যাচারের করুণ কাহিনীর প্রেক্ষাপট নিয়ে ভুরিভুরি বৃত্তান্ত রচিত হয়েছে। সেমিনারে, জনসভায়, নারীবর্ষে কিংবা নারীদশকে মাইকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা হয়েছে। হচ্ছে। দীর্ঘ তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে বহুকথামালা, চিন্তা, তর্ক, যুক্তি এবং মুক্তির নানা কথা।

কিন্তু নারীদের সর্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গৃহকোণে বন্দী করে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে রাখা হয়েছে। এবং এসব করতে যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজ ফন্দি-ফিকির এবং কলাকৌশলের দীর্ঘ তালিকা বানিয়ে ফেলেছেন।

সমাজ ক্রমশ এগুচ্ছে। নারীসমাজ সচেতন হয়ে উঠছেন দিনদিন। শিক্ষার আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁদের চোখে মুখে। নারী মুক্তির ঢেউ উঠেছে প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে, তা সত্ত্বেও বিশ্বের এই অর্ধেক আকাশ এখনও অন্ধকারে নিমজ্জিত। লক্ষ্য করা গেছে, জন্মের পরে প্রায় ৯৮ শতাংশ মেয়েকেই তৈরি করা হয় গৃহবধূরূপে, শিশুকন্যাকে টিপ পরিয়ে, চুলে ঝুঁটি বেঁধে তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়, সে নারী হওয়ার জন্যেই জন্মেছে। পরের ঘরই তাঁর নিয়তি। পুরুষের জন্য তৈরি করা হয় তাঁর শরীর। অজাতযোনী সেই শিশু সযত্নে রক্ষা করে তাঁর কৌমার্য পুরুষের

ভোগের জন্য। একদিন সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সে চলে যায় পরের ঘরে। মৃত্যু অবধি তাঁর নিজের কোনো ঘর হয় না। বাকি ২ শতাংশের ১ ভাগ লড়াই করে একটা পর্যন্ত উঠলেও সামাজিক ঘেরাটোপে তাঁকে সাপলুডুর মতো নামিয়ে আনে একদম সমতলে। রণেভঙ্গ এই নারী বিপর্যস্ত হয়ে দাসে রূপান্তরিত হয়। বাকি এক শতাংশ বহু লড়াই শেষে, বন্ধু-পুরুষের সহায়তায়, নানা ঘাটের জল ছেনে ছেনে একদিন সেলিব্রেটি হয়ে ওঠেন, নারীমুক্তির কথা বলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নারীদের ওপর থেকে প্রভুত্বের ও অত্যাচারের ও লিঙ্গ-বৈষম্যের মাত্রা খুব একটা কমে না। একথা সত্য যে, বিগত কয়েক দশক ধরে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের সীমানাটা বেশ কিছুটা চওড়া হয়েছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি নারী নির্যাতনের রেখাচিত্র দীর্ঘায়িত হয়েছে। অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে, গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। উন্নত এবং উন্নয়নমুখী—সবধরণের দেশেই নারী নির্যাতন যেন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ১৪০০ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার (৭২ বর্ষ ৩৫২ সংখ্যা রবিবার ২২ ফাল্গুন) 'নারী নিগৃহ অব্যাহত' শিরোনামে যে সম্পাদকীয়টি প্রকাশিত হয়েছিল, আজও নারী নির্যাতন সম্পর্কে তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। নির্যাতনের সেই ধারা, ব্যাপকতা এবং নির্যাতন সম্পর্কে যে উদ্বেগ ঐ নিবন্ধে প্রস্ফুটিত, তা এতদিনে এতটুকু কমেছে বলে মনে হয় না :

নারী নিগ্রহ অব্যাহত

'নারী নিগ্রহের ঘটনা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। নারী স্বাধীনতা এবং নারীনিগ্রহের প্রতিকারের দাবিতে আন্দোলন, আলোচনাচক্র, কমিশন, সেল ইত্যাদির অভাব নাই। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একটি করিয়া মহিলা শাখা সংগঠন আছে। নারীর প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিশ্লেষণ করিয়া ভারী ভারী কেতাব লেখা হইতেছে, সেমিনারে গবেষণাপত্র পঠিত হইতেছে। নারী নিগ্রহ কিন্তু সেই অনুপাতে কমিতেছে না, বরং বাড়িয়া চলিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতে পারে, নারীর প্রতি বঞ্চনা বৈষম্য বা পীড়নের বিরুদ্ধে জনমত সেভাবে জাগ্রত হইতেছে না এবং এ ব্যাপারে যেসব আন্দোলন বা আলোচনা চলিতেছে তাহা অন্ধকারে মাথা খুঁড়িতেছে, বৃহত্তর বহুজনসমাজকে তাহা স্পর্শ করিতেছে না। তাহা যদি না হইবে, তবে কেন মহানগরীর প্রকাশ্য রাজপথে প্রৌঢ়া বিধবাকে বিবস্ত্র করিয়া প্রহার করা হয় এবং প্রতিবাদ করিতে কেহ আগাইয়া আসে না?

মহিলা কমিশনের বক্তব্য নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ গুরুপাপে নিগ্রহকারীর লঘুদণ্ড। কখনও জোরালো সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে, কখনও বা নিগ্রহকারীর অর্থবল বা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিপত্তির কারণে প্রাপ্য কঠোর শাস্তি অপেক্ষা অনেক সহজে অপরাধীরা পার পাইয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকলজ্জা বা সামাজিকভাবে কলঙ্কিত ও একঘরে হইবার ভয়ে নিগৃহীত নারীরা নীরবে অপমান-লাঞ্ছনা হজম করাই শ্রেয় মনে করেন। পুরুষতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে কলঙ্ক এখনও নিগৃহীতা নারীর গায়েই লাগে, নিগ্রহকারী পাষণ্ড পুরুষের গায়ে নয়। নারীর মর্যাদারক্ষাকারী সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন। নিগৃহীতা নারী নির্দিষ্ট অভিযোগ লইয়া নিজে আগাইয়া না আসিলে রাজ্য সমাজ কল্যাণ পর্ষৎ কোনও মামলা গ্রহণ করেন না। যেন কোনও ধর্ষিতা নারীর পক্ষে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আপন লাঞ্ছনার কথা

বলিয়া বেড়ানো কিংবা প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়া হলভর্তি উৎসুক বহিরাগতদের কাছে লাঞ্ছনার কাহিনী পূর্বাপর বিবৃত করা এই সমাজে খুব সহজ ব্যাপার। একদিকে গুরু অপরাধে লঘু শাস্তি, অন্যদিকে অপরাধীকে আদৌ কাঠগড়ায় তুলিতে না পারা নারীনিগ্রহকারীদের উত্তরোত্তর সাহসী ও উদ্ধত করিয়া তোলে। তবে এ ধরনের অপরাধীরা কোনও বিশেষ গোত্রের কোনও বিশেষ মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন লোক নয়, ইহারা এই সমাজেরই ফসল এবং আমাদের সকলের নিহিত অন্ধকারেই কমবেশি এই প্রবণতা লালিত হয়। এদেশের বিচিত্র সমাজে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র ও আগ্রাসী বৈশ্যতন্ত্র আনুষঙ্গিক মূল্যবোধ এমনভাবে মিশিয়া আছে যে নারীকে এখানে একইসঙ্গে ক্রীতদাস এবং ভোগ্যপণ্য উভয় বর্গ হিসাবেই শোষণ করা হয়। একদিকে নারী সন্তান উৎপাদন যন্ত্র, পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী প্রজননের মাধ্যম, পেটভাতায় বিনা বেতনের গৃহপরিচারিকা, অন্যদিকে তাহাকে মোহিনী ভাবে চিত্রিত সজ্জিত করিয়া পুরুষের ভোগসুখের উপকরণ হিসাবে তুলিয়া ধরার প্রবণতা। বিপরীতধর্মী এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মিশ্রণই নারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধগুলির মূলে সক্রিয়। বধূহত্যা ও নারীনিগ্রহের ঘটনাগুলি যদি সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত অপরাধ হয়, শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলি তবে ধনবাদী সমাজের ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ।'

একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮ সেকেন্ডে একজন করে মেয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। প্রতি ৬ মিনিটে ধর্ষিতা হচ্ছে একজন। ভারতে প্রতিদিন পণের বলি হয় ৫ জন করে নারী। প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে ধর্ষিতা হয় একজন অর্থাৎ একদিনে সাতাশ জন। ২০০২ সালের এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, এই সংখ্যাটি বেড়ে ২৪ ঘণ্টায় ধর্ষিতার পরিমান ৪২ জন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও নারী নির্যাতনের চিত্রটি আরো ভয়াবহ।

পশ্চিমবঙ্গের ছবিটিও কম উদ্বেগের নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমানতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে তা নিরশন করার জন্য বৈঠক করেছেন। সংবাদ মাধ্যমের এই খবর নারী নির্যাতনের অব্যাহত গতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৯২ সালে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে ১৮শ এবং ধর্ষণের ঘটনা প্রায় হাজার খানেক।

১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে উত্তরাঞ্চলের তিনটি জেলার নারী নির্যাতনের যে পুলিশী পরিসংখ্যান মিলেছে, তা থেকে নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাই পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

১৯৯৬ সালে দার্জিলিং জেলাতেই নারী-হেনস্থার ঘটনা ঘটেছে ১৭৪টি; কোচবিহারে এর পরিমান ছিল ১৩১টি এবং জলপাইগুড়িতে ৩০৭টি। ১৯৯৭ সালে উত্তরাঞ্চলের এই তিনটি জেলায় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে ৩২৫টি। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ কিংবা শ্লীলতাহানীর যত ঘটনা ঘটে, তার সবটা থানায় লিপিবদ্ধ হয় না বলে নারীদের ওপর যৌনহয়রানির পুরো পরিসংখ্যানের চিত্রটি পাওয়া যায় না। এর পেছনে দুটি কারণ কাজ করে :

ক. সামাজিক কারণেই অনেক victim বা পরিবার এই ধরনের ঘটনার কথা জানাতে

কিংবা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে থানায় আসেন না। পারিবারিক বদনাম বা কলংকের ভয়ে অনেকেই এইসব ঘটনাকে চেপে যান। এঁদের আশংকা জানাজানি হলে যদি মেয়ের বিয়ে না হয় কিংবা বিবাহিতার সামাজিক বা পারিবারিক সংকটের সৃষ্টি হয়।

খ, তবে সাহস করে অনেকে থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে এলেও থানা এঁদের ফিরিয়ে দেয়। এফ. আই. আর গ্রহণ করেন না।

তবে এটি সত্যি যে, অনুন্নত জেলা থেকে উন্নত জেলাগুলিতে নারী নির্যাতনের পাল্লাটি বেশি ভারি।

২০০০ সালের এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, পুলিশের কাছে যৌনহিংসার ঘটনা যতটা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার পরিমান উত্তর চব্বিশ পরগণায় ১৪৮টি, বর্ধমানে ১৩৯টি এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতে ১৩৮টি। পুলিশীসূত্র থেকে জানা গেছে, যৌননিগ্রহ এবং ধর্ষণের ঘটনা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, খোদ রাজধানী দিল্লীতেই যৌন নিপীড়নের শিকার ৭২ শতাংশ মহিলা। শ্লীলতাহানির আতংকে দিন কাটাচ্ছেন অন্তত ৬১ শতাংশ নারী। ঐ দৈনিকটির হয়ে এই সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছিল টি. এন. এস. মোড নামের একটি সংস্থা। কিছুদিন আগে কলকাতার মেয়ে-শিশুদের ওপর হিংসাশ্রয়ী আচরণ নিয়ে 'ইনসটিটিউট অব সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশন রিসার্চ' নামক একটি সংস্থা একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। ঐ সমীক্ষার পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে যে, সমাজের দ্বারা মেয়ে-শিশুরা উত্যক্ত ও যৌন-নিপীড়নের শিকার হয় ৯২ শতাংশ। এদের বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছর। ৮—১০ বছর বয়সী ৮১ শতাংশ, ১১—১৩ বছর বয়সী ৬৭ শতাংশ; ৫—৭ বছর বয়সীরা ২৫ শতাংশ এই ধরণের নিপীড়নের শিকার হয়।

নারীদের ওপর কীভাবে চলে নিপীড়ন-নির্যাতন, এবার তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। নারীবাদী নেত্রী মেরি ডালি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'Gyn-Ecology : The Metaethic of Radical Feminism'-তে লিখেছেন :

'ভারতে সতীদাহ, চীনদেশে মেয়েদের পা বেঁধে রাখার প্রথা, আফ্রিকায় অল্পবয়সী মেয়েদের যৌনাঙ্গচ্ছেদ করার রীতি, ইউরোপের নবজাগরণের সময় ব্যাপকহারে মেয়েদের 'ডাইনী' সন্দেহে পুড়িয়ে মারা, আমেরিকায় স্ত্রীরোগ ও মানসিক চিকিৎসার নামে নারীহত্যা ইত্যাদি সবই মেয়েদের প্রতি ঘৃণা এবং তাদের ওপর অত্যাচারের নিদর্শন।'

ভারতে ১৯৮৮ সালে বিভিন্ন স্বশাসিত নারী-সংগঠন মিলে 'নারীমুক্তি সংঘর্ষ সম্মেলন' নামে একটি সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। পাটনায় অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলন থেকে নারীমুক্তি বিষয়ে বেশ কিছু সংকল্প ধ্বনিত হয়। সম্মেলনের প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত হতে পারে :

'মেয়েদের ওপর নানা ধরণের অত্যাচার চলে—ধর্ষণ, যৌন-নির্যাতন, কন্যাভ্রূণ হত্যা, ডাইনী হত্যা, সতীদাহ, পণের জন্য হত্যা, বধূ-নির্যাতন ইত্যাদি। এই অত্যাচার এবং নিরাপত্তাহীনতার বোধ মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখে। ফলে, তাঁরা অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অবদমনের সম্মুখীন হন। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে

যে সংগ্রাম চলছে, সেখানে একথা স্বীকৃত যে এই অত্যাচারের একটি প্রধান উৎস হল রাষ্ট্র এবং নারীর বিরুদ্ধে পরিবারের, কর্মস্থলে এবং পথে-ঘাটে পুরুষের যাবতীয় পীড়নকে রাষ্ট্র সমর্থন করে। এই জন্যেই ঘর এবং বাইরের এই নির্যাতনকে রুখতে নারী আন্দোলন সংগঠিত করা জরুরী।'

ইনসটিটিউট অব সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রিসার্চ বা আইপার এই ব্যাপারে যে-সমীক্ষা চালাচ্ছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মেয়ে-শিশু, বালিকা, যুবতী এবং নারীরা পারিবারিক, সামাজিক ও কর্মস্থলে নিপীড়নের শিকার হয় হামেশাই। সমীক্ষার ফলাফল এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে :

ক. ১০০ শতাংশ মেয়ে ব্যক্তিগতভাবে হিংসাশ্রয়ী আচরণের শিকার হয় কিংবা সরাসরি শিকার না হলেও সাক্ষী হয়। তবে বেশির ভাগকেই এই দুটোরই মুখোমুখি হতে দেখা যায়।

খ. ৯০ ভাগ মেয়ে জানিয়েছে তাদের প্রহার করা হয়।

গ. ৫—৭ বছর বয়সী মেয়ে-শিশু জানিয়েছে তারা নিয়মিত প্রহৃত হয়।

ঘ. ৮—১০ বছর বয়সী মেয়েরা জানিয়েছে, তাদের মারধর করা হয়।

ঙ. ১৪—১৬ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে ৮৩.৩৩ শতাংশ জানিয়েছে, তারা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়।

চ. ৯০ ভাগ মেয়ে-শিশু জানিয়েছে, বাড়িতে তাদের প্রায়শই হিংসাত্মক ব্যবহারের মুখোমুখি হতে হয়।

ছ. ৫৬.৬৬ শতাংশ বালিকাকে মারধর করেন তাদরে মায়েরা; ৪৬.৬৬ শতাংশ মার খায় তাদের বাবার হাতে। দাদারা মারে ১৩.৩৩ শতাংশ বালিকাকে। ৩৫ শতাংশের ক্ষেত্রে হিংসার আক্রমণ আসে পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

এইসব সমীক্ষা ও প্রতিবেদন থেকে দেখা গেল যে, মেয়েদের ওপর নানা ফন্দি-ফিকিরে নির্যাতন চলে শিশু বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। সিলভিয়া ওয়ালবি নারীদের ওপর পুরুষদের ভয়াবহ এইসব অত্যাচারকে হিংসাত্মক একটি নির্মিত বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি তাঁর 'Theorising Patriach' গ্রন্থে ১৯৯০ সালে লিখেছেন যে, নারী নিয়মিতভাবে পুরুষের আচরণের সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্র ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্র ছাড়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে এবং এইভাবে পুরুষের এই অত্যাচারকে অনুমোদন করে।

নারী নির্যাতনের ফন্দি-ফিকিরের মানচিত্র

নারীকে বিক্রি করা, ভুল করলে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে প্রহার করার অধিকার পতিদের দিয়েছেন মনু। সন্তান উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক পিতৃতন্ত্র। সম্পত্তি পুরুষের হাতে, তার উত্তরাধিকারীও পুরুষ। নারী পুরুষের ভোগ্যপণ্য। একটি ক্রোমোসোমের পার্থক্যের কারণে পুরুষ প্রভু এবং নারী তাঁর সেবাদাসী। নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তাই ফন্দি-ফিকিরের অভাব নেই। রাষ্ট্র, ধর্ম এবং পুরুষতান্ত্রিকতা নারীসমাজকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। বহু নিয়ম, অনিয়ম, বেনিয়ম এবং প্রথা, রীতি, শাস্ত্র-এর বেড়াজাল

দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে মেয়েদের। এই একবিংশ শতকেও পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। ভাস্বতী চক্রবর্তী তাঁর 'পথে বিপদে : মেয়েদের নিরাপত্তা' শীর্ষক গ্রন্থে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভাস্বতী চক্রবর্তীর গ্রন্থে বর্ণিত নারী নির্যাতনের সীমানা এবং মানচিত্রকে খণ্ড খণ্ডভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

ক. পায়ে চলা রাস্তাঘাট, বাস-ট্রাম, মেট্রোরেল, লোকাল ট্রেন, অটো-রিকশা, শেয়ার-ট্যাক্সি : এসব ক্ষেত্রে যৌননিগ্রহ শারীরিক ও মানসিক। এখানে Molestation-ই বেশি হয়। তবে লোকাল ট্রেন, দূরপাল্লার ট্রেন, ট্যাক্সিতে নারীধর্ষণের সংবাদ ইদানিং গণমাধ্যমে প্রায়শই প্রকাশিত হচ্ছে।

খ. পুলিশ থানায় হেনস্থা এবং উৎপীড়ন অন্যরকম। সমাজের নানা স্তরের নারীদের এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা প্রায় একইরকম।

গ. স্কুল-কলেজ, টিউটোরিয়াল হোম অর্থাৎ যেকোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও সেক্সচুয়াল হ্যারেসমেন্টের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করার জন্য সেল গঠিত হয়েছে।

ঘ. হাসপাতালে রোগিনী বা রোগীর আত্মীয়ার ওপর যৌনপীড়নের ঘটনা প্রায়শই ঘটে।

ঙ. সংশোধনাগারে, ত্রানগৃহে, পুনর্বাসন কেন্দ্রে শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণের ঘটনা সংবাদপত্রে ও গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়।

চ. মানসিক রোগের আবাসিক হাসপাতালে, দৃষ্টিহীনদের স্কুলে, আবাসে মেয়েদের ওপর যৌন অত্যাচার চলে।

নারীদের অসহায়তার কারণেই এইসব ক্ষেত্রে যৌননিগ্রহ-এর মত ঘটনা ঘটার সুযোগ পায়। আসলে পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে পুরুষের আনন্দ-এর জন্য নারীকে একটি যৌন সামগ্রী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই বিবেচনা থেকে নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে জেনে তাঁর ওপর পুরুষেরা অধিকার ফলায়। নারীদের ওপর যৌন-অধিকারের কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য পুরুষেরা নীতিগত, অর্থনৈতিক, আইনী এবং এমনকি শারীরিক চাপ ব্যবহার করে। রাশেল তাঁর 'The Politics of Rape' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, যে মেয়ে-শিশুটি শিশুবয়সে ধর্ষিতা বা যৌননিগ্রহিত হয়েছে তার সৎ পিতার দ্বারা, সেই-ই পরে ধর্ষিতা হয়েছেন স্বামীর দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। ২০০২ সালে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ' নারীদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে জানতে পেরেছেন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ৫৬ শতাংশ শিক্ষিতা নারী তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের স্বামী কর্তৃক নিয়মিত ধর্ষিতা হন।

ছ. পাড়ার বৌকে ব্যভিচারিণী সাব্যস্ত করে রাস্তায় নামিয়ে এনে মেরেধরে বিবস্ত্র করে পাড়া ঘোরানো হয়। চুল কামিয়ে, কালি মাখিয়ে জুতোর মালা গলায় পরিয়ে ঢ্যাড়া পিটিয়ে উল্লাস প্রকাশের নজিরও অজস্র।

জ. গ্রামের বুড়িকে কিংবা যুবতী বৌকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে বুকে পেটে ছুরি মেরে, ক্ষুর দিয়ে কেটে, ঘর থেকে জমি থেকে উৎখাত করা হয়। অবশ্য এসব বেশিরভাগই ঘটে অনুন্নত আদিবাসী সমাজে।

ঝ. অন্য ধর্মাবলম্বী কিংবা নিম্নবর্গের যুবককে ভালবাসার অপরাধে কিংবা বিয়ে করার কারণে মেয়েকে যুবকটির সঙ্গে গাছের ডালে ফাঁসিতে লটকে দেয়া হয়।

ঞ. নিম্নবর্গের দিনমজুর সম্পন্ন উচ্চবর্ণের মালিকের কাছে ন্যায়সঙ্গত 'রোজ' চাইলে তাদের বাড়ির মেয়ে-বৌদের ওপর ধর্ষণ বা গণধর্ষণ চালানো হয়।

ট. স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহমরণ প্রথার মাধ্যমে নারী হত্যার নজির আছে ইতিহাসে। একালে গুজরাটে রূপ কানোয়ারকে সহমরণে যেতে হয়েছে। আইনী বাধা থাকলেও সুযোগ পেলেই এখনও এই অন্ধপ্রথার শাস্ত্রীয় রূপান্তরে নারীকে প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত করে হত্যা করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এছাড়া, কেরোসিন গায়ে ঢেলে পুড়িয়ে মারা হয় নারীকে। অ্যাসিড ছুড়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয় নারীর মুখ ও শরীর। পুরুষের কাছে নারীর শরীরই একমাত্র প্রকাশ। সেকারণে সে অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয় নারী-শরীর।

ঠ. পণ-এর বলি হয় শতশত। নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সমাজে এই দৃষ্টান্ত অজস্র। পণের কারণে পুড়িয়ে মারা হয় নীরবে। তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয়, কখনো খুন করা হয়।

ড. ইভটিজিং-এর ঘটনা ঘটে নিয়মিত। রকে, প্রকাশ্য রাস্তায়, পাড়ার মোড়ে, ইস্কুল-কলেজের সামনে এসব ঘটে—যৌন উল্লাস, হাত ধরে টানাটানি, অশ্লীল সংলাপ, আচরণ এবং অঙ্গভঙ্গির প্রকাশ ঘটানো হয় মেয়েদের দেখে।

ঢ. পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর নিজের শরীর তাঁর নিজের নয়। স্বামী নামক প্রভু তাঁর শরীরের কর্তা। ইচ্ছেমত যখন তখন আইনের অধিকারে সে ভোগ করতে পারে এই দেহ। গর্ভ ধারণের অধিকারও নেই নারীর। এখানেও পিতৃতান্ত্রিকতা। আর এই কারণেই স্ত্রীর ওপর চলে স্বামীর নির্যাতন : মারধোর, মানিসক নিষ্ঠুরতা, বহুবিবাহ, স্ত্রীকে পরিত্যাগ, জোর করে যৌনকর্মে লিপ্ত করা, কথায় কথায় তালাক দেয়া, ফতোয়া জারি করে ধর্মের নামে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা, অত্যাচার ইত্যাদি। এছাড়া আছে হিল্লা বিয়ের নষ্টামী।

ণ. কন্যাভ্রূণ হত্যা বা নবজাতক কন্যা হত্যা ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত রীতি। পিতা যেহেতু পুরুষ, সেকারণে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে চায় পুত্র বা পুরুষ-সন্তান। কন্যা তাই অবাঞ্ছিত।

ত. কর্মক্ষেত্রে যৌননিগ্রহের ঘটনা ঘটে হামেশাই। স্থূলভাবে এর প্রকাশ ঘটে সবরকম অফিস-আদালত, ছোটবড় কারখানা, ডাকঘর, ডাক্তার বা উকিলের চেম্বার, স্কুল-কলেজ, দোকান ইত্যাদিতে। এইসব ক্ষেত্রে নারীকে যৌন হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়। যৌন হেনস্থা মূলত কাকে বোঝাব? সুপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশে যৌন হেনস্থার সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন :

১। অবাঞ্ছিত শারীরিক সম্পর্ক এমনকী শরীরকে ছোঁয়াও যৌন হেনস্থা
২। যৌন সম্পর্কের জন্য দাবি অথবা অনুরোধ জানানো
৩। আদিরসাত্মক মশকরা বা মন্তব্য
৪। অশ্লীল ছবি দেখানো
৫। শারীরিক, বাচনিক অথবা ইঙ্গিতপূর্ণ যৌন আচরণ

থ. পরিবারের মধ্যেও দেখা যায় রক্তের সম্পর্কের কোনো মেয়ের সঙ্গে যৌন সঙ্গম অথবা

অত্যাচার করতে। বাচ্চা মেয়েদের ওপর যৌন উৎপীড়ন তো অহরহই ঘটে।

দ. মধ্যপ্রাচ্য এবং বাংলাদেশে পাথর ছুড়ে নারী-হত্যা, মুসলিম দেশে অনাচার কিংবা প্রেমের কারণে তলোয়ার দিয়ে মুণ্ডুচ্ছেদ-এর ঘটনা সমাজে বিদ্যমান।

ধ. পর্দানসীনতার ঘেরাটোপে গৃহবন্দী নারী; নারী বিক্রি, যৌনকার্যে শরীর-ব্যবস্থায় নিয়োগ এক মধ্যযুগীয় প্রথা—একালেও বিদ্যমান।

পিতৃতন্ত্র নারীকে মানুষ বলেই মনে করে না। নারী ভোগ্যপণ্য। সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ। পুরুষনির্ভর সমাজব্যবস্থায় সে পুরুষের হাতের ক্রীড়ণক। পুরুষের যৌন-সুখ এবং আনন্দের জন্যই সে জন্মেছে এই পৃথিবীতে। আর্থিক স্বনির্ভরতা, শিক্ষা এবং আধুনিক মনন নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। নারীবাদী আন্দোলনকে অর্থনীতিনির্ভর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে নারীসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামতে হবে। নারীর ভাগ্য নারীর নিজেকেই গড়তে হবে।

নারী নির্যাতনের সেকাল-একাল

সুমনা ঘোষাল

অতীত যুগের শুরুতে আদিম মানুষ—যাযাবর শ্রেণী—ধীরে ধীরে গোষ্ঠী-পরিবার-রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়ে বাংলায় বিংশ শতকের শেষে নারীর অবস্থান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হলেও তাঁদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। পৃথিবী জুড়ে মেয়েদের জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে। মেয়েরা নিজেরা শিক্ষিত হয়েছে, স্বাবলম্বী হয়েছে কর্মজগতে প্রবেশ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও প্রকৃত অর্থে 'মুক্ত মানুষ' হতে পারেনি আজও। প্রতি পদে পদে তাঁর বাধা। সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে নির্যাতনের নানাপ্রক্রিয়া। নারী আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কতভাবে নির্যাতিত হচ্ছে—এই প্রবন্ধে এই সত্যেরই মুখোমুখি দাঁড়াবো আমরা।

১

আদিমযুগে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। নারী ও পুরুষ শারীরিক ও মানসিক স্তরে ছিল সমান সমান। তাঁরা পুরুষের সাথে শিকারে যেত, সমানতালে পুরুষের সাথে কাজ করত সহকারী হিসাবে নয়, সহকর্মীরূপে।

ক্রমে ক্রমে গুহাবাসী, যাযাবর মানুষ গৃহচারী হল। তাঁরা কুটির নির্মাণ করল। ধীরে ধীরে শুরু হল শ্রমবিভাজন। পুরুষেরা লড়াইয়ে, শিকারে যেতে শুরু করল, নারী সামলাতে থাকল ঘরসংসার। পশুপালন, কৃষিকাজ প্রভৃতি শুরু হল। নারীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য ক্রমশ পুরুষ প্রভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তাঁর দায়িত্ব বাড়ল, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পেল। অন্যদিকে নারীর ওপর চাপল দাসত্ব। ধীরে ধীরে নারীর মানসিক চিন্তাশক্তির ঘটল অবলুপ্তি, বাড়ল শারীরিক পরিশ্রম।

প্রাচীন ভারতেও নারীর অবস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে পর্যালোচনা করে সুকুমারী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, ভোগ্যবস্তু এবং পণ্যদ্রব্যরূপে নারী বহুদিন থেকেই পরিচিত। 'রামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যাখ্যান করার সময়েও বলেছেন পরহস্তগতা নারীকে তিনি 'ভোগ' করতে পারবেন না; এই হল প্রাচীন ভারতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল কথা।' [১]

ক্রমশ নারীকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হল, শুরু হল তাঁর পর্দানসীন জীবন। নারীর ওপর পুরুষের সবরকম শোষণের মূলে ছিল পুরুষের ওপর নারীর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, যা অতীতেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

২

আদিম সমাজের যাযাবর গোষ্ঠী থেকে শুরু করে নতুন সমাজব্যবস্থায় নারীর গোষ্ঠী থেকে একক পুরুষের 'সামগ্রী' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে 'নারীনিগ্রহ' থেমে থাকেনি। পরিবার

পত্তনের পরে নারী বিনিময় সামগ্রীতে পরিণত হল। এক মালিক থেকে অন্য মালিকে হাতবদল হতে থাকল 'নারী'। গবাদি পশুর সঙ্গে নারীরও বিনিময় চলল সমানতালে। নারী পরিণত হল পুরুষরে সম্পত্তিতে। পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীগৃহে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিত্রালয়ের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যেত।

অন্যদিকে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল ব্যাপক হারে। কন্যাসন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না। কিন্তু বিবাহের সময় কন্যাপক্ষ যৌতুকসামগ্রী দিত পাত্রপক্ষকে। আবার যুদ্ধের সময় লুঠের মাল হিসাবে নারীহরণও সমাদৃত ছিল। সুন্দরী নারীদের 'মূল্য' ছিল সব থেকে বেশি। যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের কাছ থেকে দখল করে নেওয়া সুন্দরী নারীরা স্থান পেত হারেমে। এইভাবে মধ্যযুগীয় নবাব-বাদশাদের হারেমে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেত সুন্দরী নারীর সংখ্যা।

নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকল এবং ক্রমশ তা নির্যাতনের রূপ ধারণ করল। নারীর যাতে পরপুরুষের সঙ্গে যৌনসংযোগ হতে না পারে, সেদিকে কড়াকড়ি করা হল। কিন্তু পুরুষ ইচ্ছা করলে একাধিক নারীর সঙ্গে যৌনসম্ভোগে লিপ্ত হতে পারত। এইভাবে নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া হল। নারী পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল। শুরু হল পর্দাপ্রথার, নারীকে অন্তরীণ করে রাখা হল, বাইরের জগত থেকে নারী ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারীমুক্তির চেতনাও বিকশিত হতে থাকল। পর্দানশীন নারী পেল জ্ঞানের আলো, পর্দাপ্রথার কঠোর বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এল সমাজের আঙিনায়। মহিলাদের লেখনীধারণের ফলে তাদের মনের কথা, আশা-আকাঙ্খা, চাহিদার কথা, হতাশা-বেদনা, ক্ষোভ-বিক্ষোভের কথা সমাজ জানতে পারল। ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত নারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকল। কিন্তু নারীনিগ্রহ, নারী নির্যাতন, নারীর অপমান—অসম্মান, এসব বন্ধ হল না। নারীর দুঃখ-দুর্দশার সামান্যতম হেরফের হলেও প্রকৃতঅর্থে নারীর শৃঙ্খল মোচন হয় নি। জার্মানির পণ্ডিত আগস্ট বেবেল তাঁর 'Woman in the Past, Present and Future' গ্রন্থের শুরুতে বলেছিলেন, 'মানবজাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্খল পরেছে। নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে ইতিহাসে দাসপ্রথারও পূর্বে।'[২]

বিংশ শতকের প্রথম দিকে শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও নারী-নিগ্রহের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বাংলা ১৩৪৩ সালে 'বাঙলার নারী-নিগ্রহ' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত তৎকালীন বাংলার নারীনির্যাতনের ঘটনাগুলি সংকলিত আছে। এই বইটি থেকেই বিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলার মেয়েদের দূরবস্থার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই বইয়ের অবতারণিকা অংশে সম্পাদক লিখেছেন, 'সংবাদপত্রের পুরাতন ফাইল দৃষ্টে জানা যায় যে, রঙ্গপুরই নারী-হরণ ও নারী-ধর্ষণের আদি রঙ্গভূমি। রঙ্গপুরের জনৈক উকীল সেশন আদালতের নারী-হরণ-ঘটিত মামলার বিবরণ হইতে এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া নারী-হরণের উৎপত্তিকাল ১৯১৯ খ্রিঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সংবাদপত্রের ফাইলে সন ১৩৩০ সালের (১৯২৩ খ্রি:) বৈশাখ হইতে নারীহরণের ধারাবাহিক রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে।'[৩]

শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, 'প্রায় দুই শতাব্দী হইতে চলিল, ব্রিটিশ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মাত্র বিগত চৌদ্দ বৎসর হইতে ভয়াবহভাবে বাঙলায় নারীনিগ্রহের সূত্রপাত হইয়াছে। বাঙলার 'অন্ন-সমস্যা' ও 'বস্ত্র সমস্যা'র ন্যায় নারী-নিগ্রহও ইদানীংকালের একটা প্রধানতম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরের নারী-নির্যাতন ও আধুনিক মনোরম বেশভূষায় হিন্দু নারীদের রাস্তাঘাটে অবাধ চলাফেরাতেই নারী-নিগ্রহের উৎপত্তি এবং ইহাতে দুর্বৃত্ত নরপশুদের অন্তরে যে চাঞ্চল্য উদ্রিক্ত করিয়া তোলে—তাহাই ইহার হেতু বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার পূর্বে কাহারাই বেশিরভাগ নারী-নিগ্রহের জন্য দায়ী. দেখা যাউক। অধিকাংশ স্থলে নারী-নিগ্রহের জন্য মুসলমান দুর্বৃত্তগণের পাশবিক মনোভাবকেই দোষণীয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু সংবাদপত্রে চারি শ্রেণীর দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক বঙ্গীয় অবলা ললনাকুলের প্রতি নিগ্রহ ও পাশবিক অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ রাখিয়াছে। যথা: ১. স্বামী, শাশুড়ী ও ননদ; ২. হিন্দু ও মুসলমান বদমায়েস; ৩. দারোগা ও কনস্টেবল ও ৪. রেলকর্মচারীগণ। এই চারিপ্রকার লোকের দ্বারা নারী-নিগ্রহের কাহিনী সংবাদপত্রে এত বেশি পাওয়া যায় যে, এজন্য একমাত্র মুসলমান দুর্বৃত্তগণের উপরই দোযারোপ করা যায় না।'[৪]

সেকালে শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েদের লাঞ্ছনার কোনো সীমা থাকত না। নববধূরূপে শ্বশুরবাড়ীতে আসার পর থেকেই সূচনা হত তাঁর লাঞ্ছিত জীবনের। শাশুড়ী, ননদ, স্বামী প্রমুখের দ্বারা সে নির্যাতিতা হত। তাঁর ওপর ছিল অন্যসব আত্মীয় স্বজনের বাক্যবান। শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েদের নির্যাতনের এমনই বহু ঘটনা 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তার কয়েকটি তুলে ধরা হল :

১৯ এপ্রিল, ১৯২৩ সালে এমনই একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কাশীর কোনো সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের একমাত্র কন্যাকে তাঁর স্বামী রোজ মদ খেয়ে বিষম প্রহার করে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁর বাবার দেওয়া সব গহনা কেড়ে নিয়ে একখানা মাত্র কাপড় দিয়ে তাকে মামারবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল।

১৭ জুন, ১৯২৩ সালে এইরকমই একটি ১৮ বছরের মেয়েকে তাঁর স্বামী এবং পরিবারেব লোকজন মিলে ক্রমাগত অমানুষিক অত্যাচার করে মেরে ফেলে। পরে তারা তা আত্মহত্যা বলে প্রমাণ করতে চায়।

এইরকম অসংখ্য অত্যাচারের কাহিনী সংবাদপত্রের পাতায় ছড়িয়ে থাকত, যা আজও অব্যাহত আছে। মেয়েদের ওপর নির্যাতন আজও বন্ধ হয়নি। শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েরা যে কতপ্রকারে লাঞ্ছিত হয়, কতরকম অত্যাচার তাঁদের সহ্য করতে হয়, কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হয় তার করুণ কাহিনী আজও সংবাদপত্রের পাতা খুললেই চোখে পড়ে। হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক তার পরিসংখ্যা ক্রমশ কমছে, পাল্টাচ্ছে অত্যাচারের পদ্ধতি ও কৌশল। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতেও নারী নির্যাতন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়নি, মেয়েরা আজও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীতে অত্যাচারিত হতে হতো নানা কারণে। তার মধ্যে প্রথম কারণ হল চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ফারাক। পণের টাকা সম্পূর্ণ না পাওয়া, পাত্রপক্ষের চাহিদামত গহনা দিতে না পারা, যৌতুক সামগ্রী পাত্রপক্ষের পছন্দ না হওয়া, মেয়ের সঙ্গে যথাযথ উপঢৌকন না পাঠানো প্রভৃতি নানান কারণতো ছিলই, তার ওপর ছিল পাত্রপক্ষের মনোমত আদর-

আপ্যায়ণ না হলে বধুর ওপর সীমাহীন অত্যাচার। বধূনির্যাতন ছাড়াও মেয়েরা সমাজের দ্বারাও নির্যাতিত হত। নারীহরণের ঘটনাও তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তারও কিছু উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে :

২৭ এপ্রিল, ১৯২৪ সালে টাঙ্গাইলে এক অসহায়া দরিদ্র পত্নীর ওপর ভীষণ অত্যাচারের ঘটনা আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একটি ১৪ বছরের বধূর ওপর কয়েকজন মিলে পাশবিক অত্যাচার করেছিল।

২৬ জুন, ১৯২৪ সালে একটি অপ্রাপ্তবয়স্কা হিন্দু বালিকাকে তার অভিভাবকদের কাছ থেকে চুরি করে আনার অপরাধে কয়েকজনের শাস্তির খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

এইরকম নারীহরণের অজস্র ঘটনা তৎকালীন পত্রিকাগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। সাধারণত দরিদ্র ঘরের মেয়েদের ওপর এই ধরণের অত্যাচার বেশি হত। যাদের না ছিল অর্থনৈতিক সামর্থ্য, না ছিল আইনী সাহায্য নেওয়ার ক্ষমতা, সর্বোপরি তাঁদের কোন সামাজিক প্রতিপত্তিও ছিল না। এভাবে পারিবারিক, সামাজিক দিক থেকে নির্যাতিত মেয়েরা অর্থনৈতিক দিক থেকেও ছিল বিপর্যস্ত। তাঁরা না পেত সুবিচার, না পেত পারিবারিক সহানুভূতি বা সমর্থন। নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এইসব মেয়েরা ভুগত পারিবারিক সমস্যায়, সামাজিক অবহেলায়। ফলে তাঁদের মনে একধরণের হীনমন্যতাবোধ কাজ করতে থাকে যে, 'মেয়ে হয়ে জন্মানোই বৃথা।' জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের প্রতি যে অবহেলা করা হত, জ্ঞান হবার পর থেকেই তাঁরা তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারত। ফলে মেয়ে হয়ে জন্মানোর যে অপরাধবোধ ছোট থেকে তাঁদের মনে দানা বাঁধতে থাকত, ক্রমশ তা মন-মস্তিষ্কে এমন প্রভাব বিস্তার করত যে, তাঁরা সমস্ত নির্যাতন, নিগ্রহ মুখবুজে সহ্য করত,—তাঁদের না ছিল প্রতিবাদের ভাষা, না ছিল প্রতিকারের ক্ষমতা।

বিংশ শতকের শেষভাগে কী অবস্থায় বাংলার মেয়েরা ছিল, নির্যাতনের চেহারাটাই বা কেমন রূপ নিয়েছিল তা দেখা প্রয়োজন। তবে বিংশ শতকের শেষভাগে দেখা যায় নারী নির্যাতনের হার যেমন কিছু কমেছে, তেমনি নির্যাতনের পদ্ধতিগত পরিবর্তনও ঘটে গেছে। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও, সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও, মেয়েদের সহজেই মেরে ফেলা হয়— অত্যাচার করে মেরে ফেলার এই প্রক্রিয়া চলে ভ্রূণাবস্থা থেকে গৃহবধূ হওয়া পর্যন্ত।

এই আধুনিক সভ্য সমাজে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যথা : ১. স্বামীদের স্ত্রী নির্যাতন; ২. যৌন নির্যাতন; ৩. ধর্ষণ; ৪. অশ্লীল আচরণ ও অশালীন মন্তব্য।

১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনের চিত্রটি নিচে দেওয়া হল। এই পরিসংখ্যানটি[৫] থেকে পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের অবস্থার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে।

১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গে নারী-নির্যাতন ইত্যাদির ঘটনা এরকম :

১. নারী-হত্যা—২৬৭টি; ২. অনিচ্ছাকৃতভাবে নারী-হত্যা—৯০টি; ৩. আত্মহত্যার জন্য নারীকে প্ররোচনা দেওয়া—৭১৯টি; ৪. নারীকে খুনের চেষ্টা—২৮টি; ৫. নারীকে মারাত্মকভাবে জখম করা—২১টি, ৬. নারী-অপহরণ—৫২টি; ৭. নারীকে বলপূর্বক অপহরণ বা বিবাহের

জন্য বাধ্য করা—৪৪২টি; ৮. ধর্ষণ—৪৩০টি; ৯. নির্যাতন—১৩০টি; ১০. পণপ্রথার বলি—২০০টি।

স্বামীগৃহে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা বা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন এমন নববিবাহিতা বধূ বা গৃহবধূর সংখ্যা ছিল : ১৯৮৭ সালে—৩৪২ জন; ১৯৮৮ সালে—৭৪৪ জন; ১৯৮৯ সালে—৭৮৪ জন; ১৯৯০ সালে—৭৮৮ জন; ১৯৯১ সালে—৭৫৪ জন।

পণপ্রথার বলি হতে হয়েছে এমন গৃহবধূর সংখ্যা : ১৯৮৭ সালে—৫৫ জন; ১৯৮৮ সালে—৮৮ জন; ১৯৮৯ সালে—১৩১ জন; ১৯৯০ সালে—২০৬ জন; ১৯৯১ সালে—২১৭ জন।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার ঘটনা : ১৯৮৭-৮৮—১১৯টি; ১৯৮৮-৮৯—১৩২টি; ১৯৮৯-৯০—১৫৩টি।

গৃহবধূর ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে : ১৯৮৭ সালে—২৮৯টি; ১৯৮৮ সালে—১১৩৭টি; ১৯৮৯ সালে—১৪০৪টি; ১৯৯০ সালে—১৫৩৭টি; ১৯৯১ সালে—১৪৫৫টি।

গ্রেপ্তার ও শাস্তিবিধান : সাধারণত নারীনির্যাতনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড বা জরিমানা বা উভয়রকম শাস্তিরই নজির আছে।

নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য পশ্চিমবঙ্গে গ্রেপ্তারের সংখ্যা : ১৯৮৯ সালে—৪৬৩৭ জন; ১৯৯০ সালে—৪৭৪৪ জন; ১৯৯১ সালে—৪৯৯২ জন।

চার্জশিট দিয়ে এ ধরনের কেস শেষ হয়েছে : ১৯৮৯ সালে—২৬৪০টি; ১৯৯০ সালে—২৫৭২টি; ১৯৯১ সালে—২৭০৯টি।

সাজা হয়েছে এমন কেসের সংখ্যা : ১৯৮৯ সালে—৩৭; ১৯৯০ সালে—৩১; ১৯৯১ সালে—৪১।

প্রতিনিয়ত ঘটে চলা অসংখ্যা নারী নির্যাতনের ঘটনা এই স্বল্প পরিসর গণ্ডীর মধ্যে তুলে ধরা সম্ভব নয়। অতি সম্প্রতি বরযাত্রী মেয়েদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী আদিম বর্বরতারই সাক্ষ্য দেয়। সুরূপা গুহ, দেবযানী বণিকের মত গৃহবধূদের আজও নির্যাতনের শিকার হয়ে পৃথিবী থেকে মুছে যেতে হয়। এইরকম অনেক মেয়েই আছে যাদের কথা হয়ত বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের পাতা অলংকৃত করতে পারে না, কিন্তু জগৎসংসারের মায়া ত্যাগ করে অতি অল্প বয়সে তাদের চলে যেতে হয় নির্যাতনের শিকার হয়ে। একবিংশ শতকের পৃথিবীতে এটা লজ্জার।

গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য; আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৬; পৃ. ৩৯।

২. নারী : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে, আগস্ট বেবেল, অনুবাদ : কনক মুখোপাধ্যায়; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল '৯০; পৃ: ১২।

৩. বাঙ্গালার নারী-নিগ্রহ, পণ্ডিত শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য্য সম্পাদিত, মডেল পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সংস্করণ, বইমেলা ১৯৯৪; পৃ: ৭।

৪. ঐ। পৃ: ৭।

৫. বিভাব, শীত সংখ্যা ১৯৯৪ থেকে পরিসংখ্যানগুলো নেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের নারীসমাজ ও নারী নির্যাতন

সোমা বসুবিশ্বাস

নির্যাতিত নারী, নির্যাতিত শিশু এবং নির্যাতিত পুরুষ : এর মধ্যে আলোকবৃত্তে এখন প্রথমটাই। আর এই প্রথমটার সঙ্গে দ্বিতীয়টির খুবই নিবিড় সম্পর্ক। এই প্রবন্ধে তাই প্রথম বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব। আমরা দেখব বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে নির্যাতিত নারীদের প্রাচ্যের; ছোটোবৃত্তে, বিশেষত, মধ্যপ্রাচ্যের।

মেয়েদের বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনো কোনো দেশে যেমন রাশিয়ায় মা হিসেবে নারীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম, আবার কোনো দেশে যেমন চীনে, একদা শিশুকন্যা হত্যায় ছিল বাড়বাড়ন্ত।

এ প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি রাষ্ট্র যেমন, ইরান, ইয়েমেন ও ইস্রায়েল-এ ধর্ম ও রাষ্ট্র কিভাবে নারী নির্যাতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা নিয়ে। মৌলবাদীদের অত্যাচার, পারিবারিক নির্যাতনসহ রাষ্ট্রের জনসমষ্টিও বোরখা ও তালাকপ্রথাকে অত্যাচারের অস্ত্র হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করে, তা নিয়েও কথা বলবো। সমাজ কিভাবে প্রাচীন আইনকানুন দিয়ে নারীকে দমিয়ে রাখে, মধ্যপ্রাচ্যের উল্লিখিত তিনটি দেশ কিভাবে পারিপার্শ্বিক দেশগুলির ওপর প্রভাব ফেলছে, তা নিয়েও আলোচনা করব। আলোচনা করবো মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন ও বিক্ষোভ, তা নিয়েও।

রাষ্ট্র বা তন্ত্র (system) 'বিয়ে' নামক একটা সামাজিক প্রক্রিয়াকে মহিলাদের ওপর চাপিয়ে দেয়, যা মহিলাদের সামাজিকভাবে অস্বীকৃত মজুরীবিহীন শ্রম-এর দিকে ঠেলে দেয়। এই জায়গা থেকে দেখলে মহিলারা শোষিত, নির্যাতিত এবং নিগৃহীত। সন্তানাদি উৎপাদন, শিশু পালন, গৃহস্থালির পরিচালনার দায়িত্ব মেয়েদের দেয় ঠিকই, কিন্তু তার কোনো স্বীকৃতি নেই।

যৌতুক, পণ, বিবাহ, মহিলাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন ও যৌতুকের কারণে হত্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি কোনো কোনো দেশে এক ধরনের ভিন্ন সমস্যা বলে পরিগণিত হয়। যেমন বাংলাদেশে, সে দেশে এটা কোনো generalised সমস্যাই নয়।

নগদ টাকার প্রয়োজনে যখন পুরুষেরা শহরে, তখন ক্ষেতের কাজে দায়িত্বে থাকেন মহিলারা এবং অপ্রাপ্তবয়স্করা। বীজ বোনা থেকে ফসলকাটা পর্যন্ত পুরো কৃষি-শ্রমটাই তাদের দিতে হত একদা, যার বিনিময়ে তাদের মজুরী মিলত না। প্রায় ৯০ শতাংশ কার্পেট বুনোনী বা তাঁতী ছিলেন মহিলারা। এরা হচ্ছেন মজুরীবিহীন পারিবারিক শ্রমিক, যাঁরা শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক তো পেতেনই না, এমনকি সামাজিক স্বীকৃতিটুকুও জুটতো না এদের।

ঐতিহ্যিক ইসলামে মহিলারা হচ্ছেন এমন এক দুর্বল জীব, যাঁরা স্বামীর তথা সংসারের দাসী। দুর্বলতার কারণে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং পর্দার আড়ালেই তাঁদের সঠিক স্থান। প্রাচ্যের আরেকটি হিন্দু প্রধান রাষ্ট্র। ভারত, সেখানেও চলে ঐ একই ধরণের ব্যবহার।

কৃষিকাজে, গৃহস্থালীর কাজে মহিলাদের প্রয়োজন এতটাই অনুভূত ছিল যে, এদের শিক্ষার প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি। এর সরাসরি প্রতিফলন পাওয়া যায় ৮৩ শতাংশ নিরক্ষরতার হারে। নাবালিকা বিবাহের হার ছিল যথেষ্ট উঁচু। তার কারণও ছিল। কৃষিকাজে মানব সম্পদের প্রয়োজন ছিল। সে সময় mortality trate ছিল উঁচু। তাই সন্তানের জন্ম দিয়ে যাওয়া ছিল নারী জীবনের একটা বড় কাজ। তাই মা হিসেবে মহিলাদের গুরুত্ব বেশি ছিল সোভিয়েত রাশিয়াতেও। গর্ভপাত বা গর্ভনিরোধ ছিল ধর্মবিরোধী কাজকর্ম। এজন্য ইরানে একাধিকবার গর্ভপাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ১৯৭৮ সালে একবার এবং পরবর্তীকালেও খোমেইনী সরকার এর প্রতি সমর্থন জানায়। খোমেইনী সরকার ঘোষণা করে, 'ইসলাম মাতৃত্বকে অপরিসীম মূল্য দেয়।' এমনকি ইসলামী সংবিধানে লিপিবদ্ধও করে যে, 'মাতৃত্বই মহিলাদের প্রধানকাজ।' সব ধর্ম বা রাষ্ট্রই মাতৃত্বকে অপরিসীম মূল্য দেয়। কিন্তু তা মহিলাদের জীবনের প্রধান কাজ কিনা, এ প্রশ্ন যথেষ্ট সন্দেহজনক।

দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন সরকার সব সময়ই চায় দেশবাসী অশিক্ষিত থাক, আর আমরা তাদের শোষণ করি। কারণ অশিক্ষিতদের নিজেদের ভালোমন্দের বোধটা কম। তা সে ইরানের সরকারই হোক বা অন্য কোনো দেশ অথবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজই হোক। ঐ একই শাসন প্রয়োগ করা হয় সর্বক্ষেত্রের মহিলাদের ওপর, যেমন সহশিক্ষা এবং বিবাহিত মহিলাদের জন্য শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হল। সাধারণ শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের জন্য পরিকাঠামো তখন এমনিতেই কম ছিল। তাছাড়া বিবাহিত তরুণীদের বিয়ের পরে সংসারের ঘানি টেনে (অর্থাৎ যা আগে উল্লেখ করেছি গৃহস্থালীর কাজকর্ম, কৃষিকাজ, সন্তানাদি উৎপাদন) পড়তে যাওয়াটাই অত্যাচারের তর্কটা নতুন মাত্রা হতে পারে। সুতরাং যে কোন শিক্ষা স্তরেই মেয়েদের প্রতিষ্ঠানকে বানিজ্যিক বা অর্থনির্ভর কোনো দিনই ভাবা যায় নি, অন্যভাবেও তাকে গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব ছিল না।

এবার আসি পারিবারিক নির্যাতনের কথায়। নিম্ন-মধ্য এবং উচ্চবিত্ত বিভিন্নস্তরে আবহমানকাল ধরে এই নির্যাতন চলে এসেছে। আর্থ-সামাজিক স্তর ভেদে অত্যাচারের প্রকার ভেদও আলাদা। কোথাও মদ, জুয়ায় সংসারের পুরো আয় হারিয়ে এসে অবসাদে চলে অত্যাচার। কোথাও যৌতুকের নামে সারাজীবন ধরে চলে অর্থনৈতিক শোষণ, শারীরিক অত্যাচার, যৌন নিপীড়ন, যৌন অত্যাচার, যৌনাঙ্গের ওপর অত্যাচার, যা আজ সভ্য জগৎকে একটা মানবিন্দুতে নিয়ে এনেছে যে, সংজ্ঞা অনুযায়ী স্ত্রীও স্বামীর দ্বারা ধর্ষিতা হতে পারে। সমীক্ষা অনুযায়ী ৯৮ শতাংশ নারী তাদের স্বামী কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে স্ত্রীদের কিছু বলার থাকে না। কিন্তু ইদানীং এই দাম্পত্য অত্যাচার ও পারিবারিক নির্যাতনের ব্যাপারে মহিলারা সোচ্চার হয়েছেন। প্রাচ্যের অনেক দেশে অনেক সহায়ক সংগঠন এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এমনকি শচীন তেণ্ডুলকরের মতন বিশিষ্ট ক্রিকেটারও এর প্রতিবাদে অত্যাচারিত নারীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেশে সরকার এই ধরনের অত্যাচার বন্ধে আইন তৈরী করেছে।

১৯৬৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করা গণপ্রজাতান্ত্রিক ইয়েমেনের কথায় এবার আসা যাক। স্বাধীনতার পরেও দেখা যাচ্ছে সেখানে মহিলাদের

অপমান, মর্যাদা হ্রাস, নির্যাতন এবং শোষণ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও মহিলাদের 'যোগ্যতাহীন' বলে ঘৃণা করা এবং মারধর বা শারীরিক নির্যাতন, অকথ্য নোংরা কথা বলা এতটুকু কমেনি। এদের নিকট আত্মীয়েরা অর্থাৎ বাবা, ভাই বা স্বামীরাও নির্যাতন করে থাকে। বাড়ীতে মহিলাদের ওপর অত্যাচার, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চনা, পণপ্রথা এবং পণপ্রথার জন্য গরু ভেড়ার মতন বিক্রি করে দেওয়ার প্রথা এখনও কমবেশি এ দেশে বিদ্যমান।

অন্যদিকে ধরা যাক ইস্রায়েলকে। ১৯৪৮ সালে ইস্রায়েল স্বাধীনতা লাভ করে। সেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র পাশাপাশি চলে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যকে প্রত্যাখ্যান করা হলেও, বাস্তবে রাষ্ট্র এর ঠিক উল্টো পথেই হাঁটেছে। যেমন প্রত্যেক পেশাকেই নারী অথবা পুরুষের পেশা বলে চিহ্নিত করা হলেও স্বাভাবিকভাবে সব কাজের জন্য সমপারিশ্রমিকের ব্যাপারটিকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

বলতে গেলে ইস্রায়েলে কোন সংবিধান নেই। কিছু মৌলিক আইন সময়ে সময়ে বানিয়ে কাজ করা হয়। যেগুলি সংবিধানের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। ১৯৫১ সালে ইস্রায়েলের সংসদে 'নারীর সমানাধিকার আইন'— (যদিও এটি মৌলিক আইন নয়) গৃহীত হয়। এর সংশোধনীতে একটি অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দান ও নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সমানাধিকার গ্রহণীয় নয়। আবার ১৯৭৫ সালে ইস্রায়েলের সংসদে নারীর সমানাধিকার সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব মৌলিক আইন হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই ২৫ বছরে রাষ্ট্রের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন বা অগ্রগতি হয়নি।

ধর্মীয় আইন অনুযায়ী, কোনো মহিলা শুধু মহিলা হওয়ার কারণে আইন সংক্রান্ত এবং আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পেশাগুলিতে নিয়োজিত হওয়ার অযোগ্য। এমনকি আদলতে সাক্ষী হিসেবেও মহিলারা উপস্থিত থাকতে পারেন না।

ইস্রায়েলে বিয়ের পরে মহিলারা স্বামীর সম্পত্তিতে পরিণত হন, যে নারী অন্য কোনো পুরুষের দ্বারা ব্যবহার্য নয়। এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে এবং তাঁর দ্বারা পরিত্যক্তা না হলে, বন্ধনছিন্ন করতে পারেন না। এবং মহিলারা শুধু স্বামীর সম্পত্তিই নয়, নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে, সেই মহিলার ওপর প্রথম দাবি তার স্বামীর ভাইয়ের অর্থাৎ দেওরের। পারিবারিক সম্পত্তি যাতে বাইরে যেতে না পারে, তারই জন্য বৌদিকে বিয়ে করার এই রীতি শুধু ইস্রায়েল কেন, মধ্যপ্রাচ্যের বহুদেশেই বিদ্যমান।

নারীদের ওপর অত্যাচার প্রসঙ্গে প্রাচ্যের আরেকটি দেশ পাকিস্তানে সদ্য ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। দৈনিক The Telegraph পত্রিকার ১৩ মার্চ ২০০৫-এর সংখ্যা থেকে নেওয়া। পাকিস্তানের মুলতান শহরের ৮০ মাইল পূর্বদিকে একটি গ্রাম মীরওয়ালা। এই গ্রামের একজন সহকারী শিক্ষিকা মুক্তারণ মাই। তাকে গ্রামের পরিষদগণ ধর্ষণ করার আদেশ দেয় প্রতিশোধমূলক শাস্তি হিসাবে। কারণ, তার ভাই সমাজের উচ্চশ্রেণীর সম্মানে আঘাত হানবার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। এই গণধর্ষণের শাস্তি যখন মুক্তারণের ওপর প্রয়োগ করা হয়, তখন প্রায় দেড়শোর বেশি লোক বাইরে বিজয়োল্লাসে কলরব করছিল। মুক্তারণকে সম্প্রদায়ের কাছে অপমান ও নীচু করবার জন্যই এটা করা হয়। নগ্ন এবং রক্তাক্ত

অবস্থায় গ্রামের মাটির রাস্তা ধরে তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন তাকে সাহায্য করবার মত তাঁর ক্রন্দনরত বাবা ছাড়া আর কেউ সঙ্গে ছিলেন না। আর সেই অসহায় বাবার কাছেও মেয়ের লজ্জা নিবারনের জন্য একটিমাত্র শাল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঘটনাটি ৩ বৎসর আগে ঘটেছিল। মুক্তারণ এখন ৩৩ বৎসর বয়সী নারী। তিনি আজ পাকিস্তান এবং বাইরের নিগৃহীত মহিলাদের শক্তির প্রতীক। মীরওয়ালাতে তার দুই কামরাযুক্ত ঘরের বাইরে এখন ৭জন পুলিশকর্মী পাহারা দেয়। কারণ, গ্রাম্য পাকিস্তানের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতীকী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সম্প্রতি পাকিস্তানি আদালত, ২০০২ সালের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, তার ওপর চারজন আক্রমনকারীকে বেকসুর খালাসের হুকুম দিয়েছেন। এই ঘটনার পর মুক্তারণ আরও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার সংগ্রাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি কোন রকম নির্যাতন, শোষণ, সংস্কার এবং প্রথার সামনে মাথা নোয়াবেন না। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজ্যপাল মুক্তারণকে ২,৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়। কিন্তু তিনি সেই টাকা নিজের পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার না করে, তাঁরই গ্রামের ছেলে এবং মেয়েদের জন্য দুইটি পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। সারা পৃথিবী থেকে অনুদান সংগ্রহ করে তিনি দশটি মহিষ এবং ৫০টি ভেড়া নিয়ে একটি ফার্ম চালু করার চেষ্টা করছেন, যেটা বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রী জোটাতে সাহায্য করবে। পাকিস্তান সরকার তাঁকে তাঁর সুরক্ষার জন্য ইসলামাবাদ বা লাহোরে বাংলোবাড়িতে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। অথচ সরকার ঐ গ্রামে একটি বিদ্যালয় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়নি।

মুক্তারণ একজন নিরক্ষর; রবিবার বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। কোরানের মুখস্থ পংক্তি হল তার বিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজকর্ম। কিন্তু মুক্তারণ বিশ্বাস করেন তাঁর মত মহিলাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাবিকাঠি হচ্ছে বিদ্যালয় বা শিক্ষা। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি শৈশবে কোনদিন শিক্ষার কথা চিন্তা করেননি, তাঁকে বিদ্যালয়ে পাঠানোও হয়নি। আজ গ্রামের এবং শহরের শিক্ষিত মানুষেরা তাকে একজন সাহসী মহিলা রূপে দেখেন। কিন্তু নিরক্ষরেরা তাকে দুর্বল কণ্ঠ হিসেবে দেখেন যেন সেই কণ্ঠ কোন দিনই কোন পরিবর্তন আনতে পারবেনা।

বোরখা ও তালাকপ্রথা

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইরানে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল। প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, কোনো না কোনোভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইরানের গণঅভ্যুত্থানে মহিলাদের গণঅংশগ্রহণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, তাঁদের দুটি বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল : এক, তাঁদের বিপুল অংশগ্রহণ এবং দুই পর্দাধারণ। সুসংগঠিত মহিলা বাহিনীর আন্দোলনে এত বৃহৎ আকারে অংশগ্রহণ হয়ত অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যাবে না। পর্দানসীন মহিলাবাহিনীর পক্ষ থেকে যে পর্দা মহিলাদের ওপর শুধু চাপিয়েই দিতেন না; তা ব্যবহার করতে বাধ্যও করা হতো। স্বাধীনতা তখন এতটাই কাম্য ছিল যে, পর্দা-বেপর্দার বিষয়টি ছিল অপ্রাসঙ্গিক।

গণঅভ্যুত্থান শেষ : রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ—খোমেইনীর ক্ষমতাগ্রহণ

গণঅভ্যুত্থানের মাসখানেকের মধ্যেই মহিলা অভ্যুত্থান। এবারের অভ্যুত্থানের কারণ খোমেইনীর ঘোষণা। 'কর্মজীবী মহিলাদের বোরখা পরতে হবে।' অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য 'চাপিয়ে দেওয়া জিনিষ চলবে না।' ঠিক আরেকটি ঘটনা এর বিপরীত চিত্র বহন করে। আলজেরিও মহিলারাও বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বোরখা পরে। কিন্তু যেহেতু বিপ্লব- পরবর্তীকালে মহিলাদের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, তাই সেখানে সংগঠন করে মহিলাদের অধিকার আদায়ের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে খোমেইনীর এই বোরখা চাপানোর নির্দেশ-এর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অস্ত্রধারী নারীরা সরব হয়ে ওঠেন।

রক্ষণশীল পরিবারগুলিতে ছোটবেলা থেকেই মহিলাদের মধ্যে ধর্মের মূল্যবোধ প্রবেশ কারনো হয়। যেমন বোরখাপরা বা অন্দর মহলে থাকা, পর্দানশীন থাকা, 'লজ্জাই নারীর ভূষণ'—এই জাতীয় কিছু শ্লোক ছোটবেলা থেকেই মগজে ঢোকানো হত। এই সব পরিবারের মহিলারা শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হয়ে যখন বৃত্তি অবলম্বন করলেন, তখন তাঁরা মূল্যবোধ এবং আধুনিকতার সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরাই হলেন আলোকপ্রাপ্ত বিশ্বের সূর্যের মতো প্রদীপ্ত প্রথম মহিলা উত্তরাধিকার। বোরখা ত্যাগ, সর্বশেষ ইউরোপীয় ফ্যাশান অনুসরণ করা, পুরুষদের সঙ্গে খোলামেলা মেলামেশা ইত্যাদি ঘটনাগুলি সংকটের সৃষ্টি করল। কিছু মহিলা সংগঠন ব্যাপারটাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তারা এর অন্যরকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন, বোঝালেন, বোরখা বা পর্দা আবশ্যিক নয়। শালীনতা রক্ষা করতে পারে এরকম কাপড়ই যথেষ্ট।

যাইহোক এই পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে মধ্যবিত্ত মুসলিম মহিলারা, যিনি প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে বাইরের বিশ্বে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রথম পা রেখেছেন, তাঁরা বোরখা ঢাল হিসেবেই বেছে নিলেন। কারণ, ক. বোরখা বা পর্দা বাইরের জগৎকে ঠেকিয়ে রাখবে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় ঢুকতে দেবেনা। খ. বোরখা বা পর্দা স্বতন্ত্র পরিচিতি দেবে। এটা আসলে ধর্মীয় রাজনীতির অভিলাষী অস্তিত্ব। কিন্তু যাই বলা হোক, পর্দানসীনতা বা বোরখাপ্রথা মূলত নারীদের দাসত্বেরই প্রতীক।

হিন্দু রাষ্ট্রে শাখা, পলা, সিঁদুর ও ঘোমটার ব্যবহারও একদল শিক্ষিতা মহিলা গ্রহণ করেছিলেন এই একই কারণে, এতে ধর্মীয় যৌক্তিকতার যতই রং চড়ানো হোক না কেন, আসলে নারীকে এসব দিয়ে চিহ্নিত করে আলাদা করে রাখা হয়। এ-সব নারীর দাসত্বেরই প্রতীক।

শাহ সরকার ভোগবাদের উসকানি দিয়ে চলেছিল। আর ইসলাম এই নবজাগ্রত আক্রমনাত্মক নারীকূলকে চিহ্নিত করেছিল। এই ভোগবাদকে প্রত্যাখ্যান করার অস্ত্র হিসেবে একদল আবার বোরখা তুলে নিলেন প্রতিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে। এই মেরুকরণের অর্থ সহজেই বোঝা যায়। নিগৃহীত মহিলারা এটা বুঝে গেছিলেন যে, খোমেইনীর বোরখা চাপানোটা হচ্ছে শুরু। শেষ হচ্ছে, মহিলাদের সবকিছু থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। কারণ রক্ষণশীল পরিবারে বোরখার ব্যবহার হচ্ছে, 'মহিলাদের পৃথকীকরণ ও বিচ্ছিন্নকরণ'। এতে অত্যাচার আরও বাড়ল। বোরখা না পরার অজুহাতে অনেক সম্ভাবনাময়, জ্ঞানবতী, যোগ্যতাসম্পন্না নারীকর্মীর চাকরী চলে গেল।

এদিকে ইয়েমেনে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ১৯৬৩ সালে যখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন; পরিবারের বিভিন্ন সংস্কারাচ্ছন্ন প্রথার বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন তারা লড়ছেন, তখনও ইয়েমেনের মসজিদের ইমামেরা মহিলাদের বেপর্দা হওয়া, সর্বোপরি ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। আসলে একটা ভয় সব সময়েই কাজ করত, তাহল বেপর্দার কারণে পারিবারিক সম্মান হারানো। কারণ বেপর্দা মানেই অবাধ মেলামেশা এবং তার থেকে অতিরিক্ত দাম্পত্যের বোঝা, যৌনতায় জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি। কিন্তু এরই পাশাপাশি দেখা যায় যে, গ্রামের দিকের মহিলারা বোরখাও পরতেন না বা চাদরে মুখও ঢাকতেন না। কারণ কৃষিকাজ, হস্তশিল্প বা কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে বোরখা একটা বাধা। এটা সহজবোধ্য। কিন্তু ইয়েমেনের নারী আন্দোলনে বোরখা নিয়ে খুব একটা মাতামাতি দেখা যায় না। এতে ইয়েমেনের সংগঠনকারী মহিলাদের কাছ থেকে একটা স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, বোরখা নারী আন্দোলনের পথে বাধা নয়। কারণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত মহিলারা বোরখা পরেই অংশগ্রহণ করেছিল। একমাত্র যারা সামাজিক উন্নয়নে অংশীদার হতে চাননা, তাদের মতে বোরখার ব্যবহার প্রত্যক্ষ। বোরখা আসলে একটা বাধা। বোরখার বাইরে বেরিয়ে আসা মানে এই বাধার দেওয়ালকে অতিক্রম করা। ১৯৭২ সালে ইয়েমেনে বোরখার উচ্ছেদ নিয়ে আন্দোলনও হয় একবার। কিন্তু সেটা ছিল জনপ্রিয় শ্লোগান মাত্র। কারণ এটা সবাই জানত যে, মেয়েদের বাড়ীর বাইরে অধিষ্ঠিত করার সাথে সাথে বোরখা এক সময়ে অপ্রচলিত হয়ে যাবে। কারণ বোরখা নিজেই একটা বাধা। বোরখা নিজেই নিজেকে উচ্ছেদ করবে। পরবর্তীকালে আমরা দেখি, ইয়েমেনের স্কুলে মেয়েরা চাদর বা বোরখা পরে না। অফিস ও কারখানায় মহিলা কর্মচারীদের জন্য আলাদা পোশাক আছে। ১৯৭৭ সালেই আমার দেখেছি, বোরখা এবং চাদরের ব্যবহার কম হচ্ছে বা সেটা জামা হিসেবে উন্নীত হচ্ছে।

তালাক

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর খোমেইনীর সরকার পুরুষদের একপেশে তালাক ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রবর্তন করেন। শাহের আমলে পরিবার আইনের কিছু ভাল দিক যোগ হয়েছিল। সেগুলোও বাতিল হল।

পাশাপাশি ইয়েমেন প্রজাতান্ত্রিক ১৯৭৪ সালে একটি পারিবারিক আইনের বলে প্রত্যাখ্যানের দ্বারা তালাক প্রথার উচ্ছেদ, বহুবিবাহকে বিশেষ পরিস্থিতির স্থানে যুক্ত করা হয়। তালাক প্রাপ্ত মহিলাদের সন্তানদের কাছে রাখার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। নাবালক বয়সে বিবাহ ও পাত্র-পাত্রীর সম্মতি ছাড়াই বিবাহ রদ করা হয়। এই আইনের লক্ষ্যই ছিল ইসলামের প্রথাগত ব্যবহারবিধির যুগোপযোগী মৌলিক সংশোধন।

ইস্রায়েলে মহিলারাও বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে পারেন, কিন্তু পাবেন সেই নিস্ক্রীয় একপেশে তালাকই।

ইরানের গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের পরিস্থিতি ও গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ

দারিদ্র্যের কারণে ইরানের গ্রামের কৃষক পরিবারের পুরুষ এবং প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা শহরে আসে কলকারখারা বা অন্যান্য কাজে দৈনিক শ্রম দিয়ে নগদ টাকা রোজগার করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই তাদের এই অনুপস্থিতি, ক্ষেতের কাজে মহিলাদের এবং অল্পবয়স্কদের ঠেলে দিয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে ধীরগতিতে যান্ত্রিকতার প্রয়োগ হয়তো কিছু ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমকে কমিয়ে এনেছে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হয়েছে, যেখানে মহিলাদের কোনো অংশগ্রহণ ছিলো না। সুতরাং যান্ত্রিকতার প্রয়োগ মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো সুরাহা করেনি। যন্ত্রের প্রয়োগ কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ফলে উৎপাদন পরবর্তী manual labour-এর চাহিদা মেটায় মহিলা এবং শিশুরা।

দেশীয় এবং রপ্তানীর বাজারে ইরানী কার্পেটের চাহিদা বাড়ায় তাঁতী বুনোনীদের প্রয়োজন বেড়েছে, এই তাঁতীদের প্রায় ৯০ শতাংশ মহিলা। হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র শিল্পতেও মহিলাদের সংখ্যা বেশি। পাশাপাশি সংসার ধর্মতো আছেই।

এককথায় এই সমস্ত কৃষি খামারে হস্তশিল্পে, কুটিরশিল্পে মহিলা শ্রমিকরা ছিলেন মজুরীবিহীন পারিবারিক শ্রমিক। সামাজিকভাবে অস্বীকৃত পারিবারিক এই শ্রমিকদের আমি পারিবারিক শোষণের শিকার বলব না। কিন্তু রাষ্ট্র এদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক দুর্নীতির কোনো সুরাহা করতে পারেনি। এরা রাষ্ট্রের দ্বারা পরোক্ষভাবে শোষিত। এশুধু ইরানে নয়, প্রাচ্যের যেকোনো দেশেই এই চিত্র বিদ্যমান। এসব মহিলার জীবন আটকে ছিলো রোজকার নিয়মে, ক্ষেতের কাজে, হস্তশিল্পে এবং শোষণমূলক গ্রামীন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। দৈনন্দিন দারিদ্র্যের চাপে সাংসারিক কাজকর্মের বেড়াজাল টপকে, শ্রেণী সংগ্রামের উর্দ্ধে উঠে মহিলারা নিজেরাই যে একটি শ্রেণী—এটা প্রতিষ্ঠিত করার মতো সময় ও ধৈর্য্যও তাদের ছিলো না। সেজন্য সংগঠন এবং গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ এক পর্যায়ে ছিল খুবই সীমিত।

শহরাঞ্চলে মহিলাদের পরিস্থিতি ও গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ

সমসাময়িক সময় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শহরাঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার ভাল পরিমানে বেড়েছিলো। ১৯৬৬তে যা ছিলো ৩০%, ২০ বছর পরে তা হয়ে দাঁড়ায় ৬৫%। তার কারণ হলো শিল্পায়ন। গ্রামাঞ্চলের ভূমিসংস্কার পরবর্তী পুরুষ-জনসমষ্টিকে অল্পই কাজে লাগাতে পেরেছে। শিল্পায়নের ফলে যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছিলো, তা পূরণ করার জন্য প্রয়োজন ছিলো দক্ষ শ্রমিকের, এছাড়া আমলা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমাজ পরিষেবার ক্ষেত্রেও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন ছিলে। তাই রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিলো কিছু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলাকে সংগঠিত করতে। ফলে সেখানে শিক্ষার সুযোগও বেড়ে যায়। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই এর সরাসরি প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাবে। প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা, শিক্ষকতা এবং প্রশাসনিক কাজে মহিলা কর্মীদের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটেছে। উচ্চ এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের বৃদ্ধি ঘটেছে। শিক্ষিতা চাকুরীজীবী, বোরখাহীন এবং শিক্ষিতা, চাকুরীজীবী বোরখাপরিহিতা মহিলাদের দুটি দলের উদ্ভব হলো এখান থেকেই। বোরখাহীন মহিলারা প্রধানত আমলা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ছোট বেলায় এরা শিক্ষার মাধ্যমে

নিজেদের প্রকাশ করতে পেরেছেন। এরা হয়ে উঠেছেন আধুনিক স্বাধীনচেতা এবং বাকপটু সচেতন। স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যেকার পার্থক্যটা এদের কাছে স্পষ্ট। এই ধরণের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মহিলারাই ফিদায়েন গেরিলা ও বামপন্থী সংগঠন গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্যের কিছুটা সম-কাঠামোর ফলে বেশ অগ্রসর চিন্তাভাবনা করতেন। এবং এরা মহিলা সংগ্রামের ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করেন, যাতে মহিলাদের দাবীগুলো আরও গুরুত্ব পায়। বোরখাযুক্ত মহিলারা এসেছিলেন মূলত ব্যবসায়ী বা সওদাগর পরিবার থেকে। এই বুর্জোয়া পরিবারগুলির একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, এদের ধর্মীয় বৃত্তায়ন ছিল অনেক বেশি। ধর্মতত্ত্ব, ইসলামের প্রভাবে এরা প্রভাবিত। ইসলামী মতাদর্শ, ধ্যানধারণা এরা বহন করেন। বেশকিছুটা গোঁড়া, সংস্কারপন্থী নয়। আবার আধুনিকতা বাধ্য হয়ে এরা কিছুটা মেনে নিয়েছেন। এসব পরিবারের মেয়েদের মধ্যে ছোটবেলা থেকে ইসলামী মূল্যবোধ এবং সংস্কার ঢুকিয়ে দেওয়া হতো। বোরখাপরা এরই একটা অংশ; এই পরিবারের মহিলারা হচ্ছেন আধুনিক শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত প্রথম জেনারেশন। এখানেই আধুনিকতার সঙ্গে পুরনো মূল্যবোধের বিরোধ।

এই মহিলারা একটা সংকটময় ঘূর্ণাবর্তসময়ের মুখোমুখি হয়েছেন, যার ফলে তৈরী হয়েছে সংশয়। এর প্রতিক্রিয়াই ইসলামের কাঠামোর মধ্যেই একটা Confused State-এর জন্ম দেয়, যা পরবর্তীকালে মহিলাদের পুরাতনকে ভেঙে ফেলার বিপ্লবের সূচনার সাংগঠনিক শক্তি তৈরী করে।

এর পরবর্তীকালে বোরখার ব্যাপারটা তুলে নেওয়া হলে আন্দোলন কিছুটা থমকে যায়। কারণ, সংগঠনগুলো উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়ে। বোরখার বিষয়টি বাদ দিলেও আরো অনেক বিষয় ছিল। কিন্তু সেগুলো খুব একটা উপরিতলে আসতে পারছিল না। ফলে, মহিলাসংগঠনগুলো দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এবং কোনো কোনো দলের মহিলা শাখা হয়ে রইল। পারিবারিক আইনের বিষয়টি প্রকাশ্যে গুরুত্বের সঙ্গে চলে আসায় মহিলাসংগঠনগুলোকে আবার জাতীয় স্তরে লড়াই করার একটা সুযোগ এনে দেয়। তালাক আইন, সমান সুযোগ, চাকুরীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-এর মত বিষয় নিয়ে এগিয়ে এলেন অ-শ্রমিক, শিক্ষিত এবং বৃত্তিজীবী মহিলারা।

গণপ্রজাতান্ত্রিক ইয়েমেনে সংগঠন, সংগ্রাম ও সাফল্য

১৯৬৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর ইয়েমেনের প্রথম শাসকদল হল ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট, যা পরবর্তীকালে 'ইয়েমেনী সোসালিস্ট পার্টি' হিসেবে পরিচিত হয়। এই বামপন্থী দলের কর্মসূচীতে সম্পূর্ণ নারীমুক্তির বিষয়টি যুক্ত হয়। ১৯৬৩তে দলের জন্মলগ্ন থেকেই শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবা-র মত মহিলা ইউনিয়ন দলের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কিন্তু প্রথম থেকেই এই সংগঠন খুব সংগঠিত। সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পারচালিত হত। যেমন :

১. প্রদেশ এবং অঞ্চলগতভাবে সাব-কমিটি, কমিটি, কোর-কমিটি, কাউন্সিল ও সুপ্রিম কাউন্সিল।

২. এই পার্টি কাঠামোর প্রত্যেক স্তরে অন্তত একজন মহিলা সদস্য নিজ থেকে ওপর স্তর পর্যন্ত রয়েছেন।

৩. Supreme Peoples' Council বা সর্বোচ্চ আইন প্রনয়ণকারী সংস্থা। এই সংস্থাতেও মহিলারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারতেন। অথচ ইরানে এখনও চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে একটি সর্বশেষ তথ্য নিয়ে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের বর্তমান চিত্রটি তুলে ধরা যাক। দৈনিক The Telegraph পত্রিকার ১৭ মে ২০০৫ সংখ্যা থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৬ মে ২০০৫, মহিলাদের ভোটাধিকার এবং মহিলাদের ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কুয়েতের পার্লামেন্টে প্রথমবার কোনো আইন পাশ হয়েছে। পুরোপুরি পুরুষশাসিত কুয়েত পার্লামেন্টে সংখ্যাগুরুর ভোটে এই আইন পাশ হয়েছে। ৩৫ জন পার্লামেন্টারিয়ান এর স্বপক্ষে ভোট দান করলেও, ২৫ জন এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, এটা লক্ষনীয়। এই প্রসঙ্গে কুয়েতের পূর্বতন পার্লামেন্ট সদস্য এবং Kuwaity Human Rights Association-এর প্রধানের বক্তব্য, প্রণিধানযোগ্য : 'যদিও ৪৫ বৎসর বিলম্বে তবুও এটা গণতন্ত্রের উৎসবের সময়।'

২০০২ সালে ওমান সে দেশের ২১ বৎসরের উর্দ্ধে নাগরিকদের ভোটাধিকার এবং মহিলাদের ভোটে দাঁড়ানোর স্বীকৃতি দেয়।

২০০৪ সালে কাতার সেদেশের মহিলাসহ নাগরিকদের ৪৫ সদস্যের পার্ল্যামেন্টের ৩০টির নির্বাচনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়।

ফিরে যাই ইয়েমেনে। প্রাক্-স্বাধীনতাব সময় থেকেই পরবর্তীকালেও পার্টির মহিলা শাখা বরাবরই খুব সক্রিয় ছিল। ১৯৬৮ সাল থেকে দলের মহিলা সংগঠন স্বাক্ষরতার প্রচার অভিযান শুরু করেন এবং পরিবার আইনের সংশোধন সংক্রান্ত কথাবার্তা চালিয়ে যান। এবং সময়ের সাথে সাথে ইয়েমেনে নারীদেরও অনেক উন্নতি হয়। যেমন—মহিলাদের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ দলের একটা নির্দিষ্ট পদক্ষেপ। ১৯৭০ সালে নতুন সংবিধানে আইন, শিক্ষা ও পরিবারের ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান অধিকার দেয়া। ১৯৭৪ সালে পরিবার আইন, সম-মজুরীর নীতি এবং মাতৃত্বের অধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ। মহিলারা ন্যূনতম ৫০ দিন এবং উর্দ্ধে ৭০ দিন বেতনসহ মাতৃত্ব ছুটি ভোগ করতে পারেন ইত্যাদি।

উৎপাদন ক্ষেত্রে মহিলা সংগঠন এবং দলের নেতৃত্ব কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। সাধারণ মহিলাদের কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে শীততাপনিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি, বেতারমেরামতি শেখান হয়। তাছাড়া সামরিক প্রশিক্ষণ, স্বাক্ষরতার ক্লাস, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, রাজনৈতিক শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থাও রয়েছে।

ইয়েমেনের সংগঠনের সাফল্যের ক্ষতিয়ানে শেষ সংযোজন হল, সরকার বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনকারী মহিলাদের জন্যে বিকল্প কর্মসংস্থান করেছেন, টমেটো প্রক্রিয়াকরণের কারখানায়।

এতদসত্ত্বেও ইয়েমেনের মহিলাআন্দোলনের পথে এখনও অনেক কাঁটা আছে। যেমন গৃহকর্মের পুনর্বন্টন না হওয়া, লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন, বাজারে মহিলাদের জন্যে কম বেতনের কাজ, কুমারিত্ব নিয়ে মাতামাতি—ইত্যাদি ইরানেও আছে। কিন্তু সবথেকে বড় বাধা যেটা, সেটা হচ্ছে, ইয়েমেনের মহিলা সংগঠন স্ব-শাসিত নয়। নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি দল এবং রাষ্ট্রের

হাতে ন্যস্ত। তাই মহিলাদের সকল স্বার্থকে আলাদা এবং স্বাধীনভাবে তুলে ধরা খুবই কষ্টকর। তবুও বলব সমসাময়িক অন্যান্য মুসলিম দেশ (যারা ধনী আরব দেশগুলির অর্থ সাহায্যে উপকৃত এবং ইসলামীয় ঐতিহ্যের কাঠামোতে আবদ্ধ) বা তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের তুলনায় ইয়েমেনের মহিলারা স্মরণযোগ্য সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন।

এবার চোখ ফেরান যাক ইস্রায়েলের দিকে। ইস্রায়েলে বসবাসকারী ইহুদিরা কতটা ধর্মে মগ্ন, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু তাদের জীবনধারা, ইহুদি নারী এবং তাদের পারিবারিক মর্যাদার নিয়ন্ত্রণের ওপর ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রচণ্ড প্রভাব, যা ইহুদিবাদী আন্দোলনে গুরুত্বলাভ করেছে। কিন্তু মার্কিনবাসী সংস্কারপন্থী ইহুদিগণ বা ইস্রায়েলের বাইরে বসবাসকারী ইহুদিগণ নারী, বিবাহ্ পরিবার আইনের ওপর ধর্মের একচেটিয়া রাজ বিলোপ করার জন্য রাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু, ইস্রায়েলের ইহুদিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রে মিলমিশ যতদিন না মিটবে, ততদিন সংগঠনের বা আন্দোলনের সাফল্য আসা খুব দুষ্কর।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি

ইরান এখন

ইসলাম, পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ও তার পরিবারসহ তাঁর কোন প্রতিনিধিকে যদি কেউ অপমান ও সমালোচনা করে তবে তার শাস্তি হবে জনসমক্ষে ফাঁসি।

আল্লাহ্, মহম্মদকে বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোককে বলতে যে, তাদের সম্পদ (দৈহিক)-কে অচেনা অপরিচিতদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে। ইসলামিক দেশগুলিতে কতদূর জামাকাপড় পরলে মহিলাদের সম্পদ লুকায়িত হবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ সীমানা নির্দেশ করেছেন। যেমন চিবুক পর্যন্ত ঢাকা থাকবে; শুধু মুখমণ্ডলটুকু দেখা যেতে পারে। শরীর আবৃত থাকবে কবজি পর্যন্ত। তাই চাদর অথবা বোরখা সবথেকে ভাল ব্যবস্থা।

বর্তমান সরকারের আদেশ অনুসারে যে স্ত্রীলোক তার চুল ঢাকেনা এবং পায়ের পাতাকে দৃশ্যমান করে তোলে বা চাদরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে ব্যবহার করে, তার মারাত্মক শাস্তি হতে পারে। সেখানে শিক্ষা মন্ত্রক ন্যূনতম ছয় বৎসরের বিদ্যালয়গামী বালিকাদের পোশাক সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছে : কালো, মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা। আর নির্দেশনা মন্ত্রক বয়স্ক মহিলাদের জন্য নির্দেশ দিয়েছে শুধুমাত্র কালো, বাদামী এবং গাঢ় নীল রঙের পোশাক। উজ্জ্বল রঙ, বিশেষত লাল রঙ একেবারেই ব্যবহার করা চলবে না।

১৯৯১ সালের ঘটনা, ইরানের Prosecutor General-এর ঘোষণা : 'যে বোরখার নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে ইরানে, সে একজন স্বধর্মত্যাগী। এবং ইসলামীক আইনে একজন স্বধর্মত্যাগীর শাস্তি মৃত্যু।'

অবাধ্য মহিলাদের দমন করার জন্য সরকারী গার্ডরা রাস্তায় টহল দেয় এবং যেসব মহিলা ইসলামিক ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে। শাস্তির সীমা বকুনি থেকে ৭০ ঘা চাবুকাঘাত অথবা একমাস থেকে ১ বৎসরের জেল। ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে ফ্রান্সের একজন সংবাদ প্রতিনিধি একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে জানান যে, তেহেরানের রাস্তায়

টহলদারী পুলিশ প্রায় দশজন মহিলাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। কারণ ঐ মহিলাদের ইসলামী নিয়মের পোশাক ছিল না। মাথায় রঙিন স্কার্ফ ব্যবহার করেছিল এবং স্বল্প প্রসাধনীও ব্যবহার করেছিল।

শিক্ষা

আয়াতোল্লা মোতাহারী ইরানের একজন প্রধান ভাববাদী। তিনি বলছেন, 'এই সমাজের মহিলাদের নির্দিষ্ট কাজ হচ্ছে বিয়ে করা এবং সন্তান ধারণ করা। বিচারবুদ্ধি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার দিক থেকে মহিলারা পিছিয়ে, তাই আইন প্রনয়ণ, বিচার সংক্রান্ত বৃত্তিগুলিতে প্রবেশ থেকে তাদের নিরস্ত করা হবে।'

ইসলামিক সংবিধানে ১৬৩নং অনুচ্ছেদে একজন বিচারকের যোগ্যতার মাপকাঠি ধর্মের পরিমাপে মাপা হয় এবং মহিলাদের সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে অযোগ্য বলা হয়েছে।

যন্ত্রবিজ্ঞান, কৃষিবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা, ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ রক্ষণাবেক্ষন, কারিগরি শিল্প ইত্যাদি বিদ্যাশিক্ষা মহিলাদের জন্যে নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে ১৬৯টি বিষয়ের মধ্যে ৯১টি পড়ার বিষয়-ই মহিলাদের জন্যে নিষিদ্ধ। এবং সহশিক্ষারতো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

বিবাহ

ইসলামিক আইনে পুরুষদের বহুগামিতা সিদ্ধ। যেকোনো পুরুষ আইনত চারটি স্থায়ী স্ত্রী রাখতে পারে। মেয়েদের বিয়ের বয়স কমিয়ে ১৩ বৎসর এবং পিতার অনুমতি সাপেক্ষে নয় বৎসরেও হতে পারে। পুরুষদের বিবাহের বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সম্প্রতিকালে মেয়েদের বিয়ের বয়স আরও কমিয়ে নয় বৎসর করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আয়াতোল্লা খোমেইনীর উক্তি উল্লেখযোগ্য, প্রথম মাসিক ঋতুস্রাব পিতার ঘরে হওয়ার চেয়ে স্বামীর ঘরে হওয়াই কাম্য। এবং মেয়েদের বিয়ের সেটাই সবথেকে উপযুক্ত সময়। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ইরানের মহিলারা কোনো বিদেশীকে বিয়ে করতে পারে না। কারণ এই ধরনের বিয়ে আইনত স্বীকৃত নয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

এক পাক্ষিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়েছে ইরানে। একজন স্বামী তার স্ত্রীর অজ্ঞাতসারেই স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছেদ করতে পারেন। এবং কোনোরকম পূর্ববর্তী আলোচনা ছাড়া সেটা মেনে নেওয়াই মহিলাদের পক্ষে নিশ্চিত বৈধ। ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিঃসন্দেহে পুরুষের অধিকার, যদি না বিবাহ আইনে অন্য কিছু লেখা থাকে।

মহিলারা সব সময়ই উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষ অংশীদারদের তুলনায় অর্ধেক পাবে

একজন অবিবাহিত মহিলা বা মেয়ে দেশত্যাগ করতে পারবে না। একজন বিবাহিত মহিলা তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ভ্রমণ, কাজকর্ম, সম্মেলনে যোগদান করতে পারবে না। উচ্চবিদ্যালয়ে যাওয়া, এমনকি তার বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ীতেও যেতে পারবে না।

একজন মহিলা সেখানেই বসবাস করবে, যেখানে তার স্বামী তাকে রাখবে।

কোনরকম শর্ত ছাড়াই একজন মহিলা স্বামীর যৌন চাহিদা মেটাতে প্রস্তুত থাকবে এবং প্রত্যাখ্যান করলে খাদ্য, বস্ত্র আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে।

হোজাতোলেস্লামইযামী নামক একজন ইরানী ধর্মীয় নেতার বক্তব্য :

একজন বিবাহিত মহিলার তার স্বামীর দ্বারা কৃত যে কোনো রকমের হিংস্রতা, উগ্রতা বা অত্যাচার দৃঢ়ভাবে সহ্য করা উচিত। কারণ সে তার স্বামীর ইচ্ছামতো ব্যবহারের আয়ত্তাধীন।

শাস্তি পাথর নিক্ষেপ

ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১১৫নং অনুচ্ছেদ অনুসারে পাথর নিক্ষেপ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি পাথর নিক্ষেপে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নারী গর্ত থেকে উঠে পালিয়ে যায় (যে গর্তে তাকে কোমর পর্যন্ত সমাধি দেওয়া হয়), সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে এনে শাস্তি বজায় রাখতে হবে। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি তার ব্যাভিচারের কথা স্বীকার করে, এবং পালানোর ঘটনা যদি প্রথম পাথর নিক্ষেপের পরে ঘটে, তবে তাকে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ফৌজদারী আইনের ১১৬নং অনুচ্ছেদ অনুসারে নিক্ষিপ্ত পাথরের আকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পাথর এত বড় হবে না যে, প্রথম বা দ্বিতীয় নিক্ষেপেই সে মারা যায়। আবার একেবারে নুড়ির আকারে হলেও চলবে না।

শেষকথা

এ পর্যন্ত এসে একটি সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, মধ্যপ্রাচ্যে নারী নির্যাতিত এবং শোষিত। কিছু সংখ্যক নারীবাদী এই যুক্তি দর্শান যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের প্রাধান্য সর্বজনীন এবং পুরুষ একটি নির্যাতনকারী শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত। সেজন্য পুরুষরাই মহিলাদের প্রধান নির্যাতনকারী শত্রু।

অন্যদিকে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী নারীবাদীরা শ্রেণি ও যৌন নিপীড়নের ওপর জোর দেন এবং একথা বলেন যে, আন্দোলন করে এই দুটিকে অপসারণ করলে সমস্যার সমাধান হবে।

পূর্বোক্ত আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, ধর্মনিরপেক্ষ আইনীব্যবস্থাতেও কিছু কিছু ব্যক্তিগত আইনকে মৌলিক আইন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবনতা আছে, যা জন্মদাত্রী নারীসমাজের ওপর কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং চর্চা করে। নারীরা বিনিময়কৃত হোক বা না হোক, তাঁরা জনসমষ্টি দ্বারা ব্যবহৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু জনসমষ্টির পূর্ণ সদস্যপদ পায় না। তাই পরিবারের আইনের শর্তগুলো যখন সংস্কার করা হয় তখন পুরুষেরা বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এবং ফলত পৃথিবীর সর্বত্র পুরুষেরা এর বিরোধিতা করে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন।

এটা ভাবা যেতেই পারে যে, মহিলাদের এই অবস্থার জন্য পুরুষরাই দায়ী। কিন্তু পুরুষেরাই একমাত্র কারণ নয়, তাঁরা উপলক্ষ্য মাত্র, কারণ তাঁরাও সামন্ত ও উপজাতিক সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে শাসিত। ধনতান্ত্রিক দেশে পুরুষগণও নিপীড়িত। ধনীকশ্রেণী পুরুষ ও মহিলাদের নিপীড়িত করে। তাই পুরুষ ও নারীর মধ্যে বৈপরীত্যের যে ধারণা আছে তা

প্রশ্নাবকাশ রাখে। মহিলাদের সংগ্রাম হবে আলাদা, পুরুষদের বিরুদ্ধে, কারণ পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র বলে—এ ধারণা ঠিক নয়। একটা অনুন্নত সমাজে পুরুষদের চিন্তা অনুন্নত থাকে। অনগ্রসর পুরুষেরা যদি অপরিণত চিন্তায় আবদ্ধ থাকে এবং system-এর মধ্যে কাজ করতে থাকে, তাহলে সমতা কোনদিনই আসবে না।

একহাজার বছরের এই অনগ্রসরতা তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন। এ কারণে তাঁরা নারী, পুরুষের সমানাধিকারের দাবীকে অস্বীকার করে থাকেন : এই সম্পর্ক খুবই জটিল, তবে এক্ষুনি পুরুষদের এই পরিবর্তন হবে, এটা আমরা দাবী করতে পারি না।

নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত চিন্তার বেশ কিছু পুরুষ চিরকালই কর্তব্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এখনও দিচ্ছেন।

তাই অনগ্রসর সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে পুরুষদের সাথে নারীদের একই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। ধনীক শ্রেণির বিরুদ্ধে দুইজনকেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে। অবশ্য পৃথিবীর কোনো আন্দোলনেই বোধহয় একটি শ্রেণি বা একটি গোষ্ঠী সফলতা আনতে পারেনি। যখন সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনই সাফল্য এসেছে।

এই পর্যায়ে এসে এটুকু বোঝা যায় যে, একমাত্র সত্যিকার শিক্ষাই কি পুরুষ, কি নারীর, কি সমাজের অনগ্রসরতা দূর করতে পারে। তাই Whole some education-টাই Keyword. আন্দোলন চলতে থাক। সাফল্য আসবেই। সহস্র অভিবাদন আন্দোলনকারীদের।

জাতিভিত্তিক নিপীড়ন : নিম্নবর্গের নারী

বঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডল

আধুনিক চিন্তা চেতনা, গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের প্রসার সত্ত্বেও আজও সারা বিশ্বে নারীরা বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে নারীদের প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়ন দূর করার জন্য কিছু অধিকার ও রক্ষাকবচ থাকলেও তা প্রায়শই উপেক্ষিত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকার এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিতে সার্বজনীনভাবে অনেকগুলি অধিকার ও রক্ষাকবচের কথা ঘোষিত হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দুর্বলতম অংশ দলিত ও আদিবাসী তথা নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নতি এবং তাঁদের ওপর বিদ্যমান বৈষম্য-বঞ্চনা দূর করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাই সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থার পাশাপাশি নিম্নবর্গীয়দের মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পরে বেশ কিছু আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের অস্পৃশ্যতা বিরোধী আইন পাশের প্রায় দুই দশক পর ১৯৭৬ সালে 'প্রটেকশন্ অব সিভিল রাইটস্ অ্যাক্ট' পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী স্কুল, কলেজ, হস্টেল, হাসপাতাল, মন্দির, সরকারী জলাশয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করার কথা ঘোষিত হয়। এই আইনের সীমাবদ্ধতা হ'ল নিম্নবর্গের মানুষের ওপর যেসব বর্বরোচিত আক্রমণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ ঘটে তার সবগুলি এতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তাই ১৯৮৯ সালে দলিত ও আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ ও আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত পদক্ষেপ হিসেবে 'শীডিউলড্ কাস্টস অ্যান্ড শীডিউলড্ ট্রাইব্স প্রিভেনশন অব অ্যাট্রসিটিস অ্যাক্ট' পাস হয়।

প্রশ্ন হল সংবিধানে উল্লিখিত বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা ও অন্যান্য রক্ষাকবচ নিম্নবর্গের নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে কতটা কার্যকর। বিভিন্ন সাংবিধানিক ও আইনগত বিধিব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজকের বাস্তবতা হ'ল নিম্নবর্গের নারীদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে বিধিব্যবস্থাগুলি শুধু চরমভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে তাই নয়, পদে পদে সেগুলি লঙ্ঘিত হচ্ছে। নিম্নবর্গের প্রতি শোষণ-বঞ্চনার এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বিভিন্ন তথ্য পরিসংখ্যানে এটা স্পষ্ট যে, স্বাধীনতার প্রায় ছয় দশক পরেও নিম্নবর্গের নারীদের ওপর অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্য আদৌ কমে নি। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হচ্ছে তাঁদের মানবিক অধিকার। স্বাভাবিকভাবে ন্যায়বিচার তাঁরা পাচ্ছেন না।

ভারতের জাতপাতভিত্তিক হিন্দু সমাজে দলিতরা মনুষ্যেতর বা হীনতর জীব হিসেবে চিহ্নিত। দলিত পরিবারে জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে তাঁর জীবনের সাথে একটা জাতিগত তকমা (Caste Stigma) আরোপিত হয় যা তাঁর অশুদ্ধতা ও অশুচিতার পরিচয় বহন করে। এই অশুদ্ধতা ও অশুচিতাকে ভিত্তি করে সমাজে তাঁকে অস্পৃশ্য বলেই চিহ্নিত হতে হয় এবং

আটকে পড়তে হয় নানা ধরণের সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে। এই সামাজিক বিধিনিষেধের বাঁধনটা এতটাই শক্ত যে দলিতরা আজও তা ছিন্ন করতে পারেন নি। বরং তাঁরা হিন্দু সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে রয়েছেন। আধুনিক চিন্তাচেতনা ও গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সর্বসাধারণের জন্য নির্ধারিত জলাশয় থেকে নিম্নবর্গীয়দের জল নিতে না পারাটা আজও প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। তাই সরকারী জলাশয় এবং জলের কল থেকে জল নেওয়ার সময় নিম্নবর্গের মহিলাদের মানসিক ও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়। এমনকি অনেক সময় উচ্চবর্গের ভূস্বামী-জমিদারদের যৌন হিংসা থেকে তাঁরা রেহাই পান না।[১] উচ্চবর্গের নারীদের থেকে নিম্নবর্গের নারীদের সহজে চেনার জন্য তাঁদেরকে ছেঁড়া নোংরা জামাকাপড় পরতে বাধ্য করা হয়।[২] দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুর অনেক গ্রামে আজও বর্ণহিন্দুদের ভয়ে কোনো নিম্নবর্গের নারী-পুরুষ হাওয়াই চপ্পল পরতে সাহস পান না।[৩] এমনকি দলিত কোনো মহিলা তাঁর শরীরের ওপরের অংশ ঢাকতে পারেন না।[৪]

উপযুক্ত শিক্ষা না থাকায় চাকরি তাঁদের নেই। ফলে তাঁদের একটা বড় অংশ খুব অপরিচ্ছন্ন নীচু কাজের সাথে যুক্ত, যে কাজগুলি সম্মানের তো নয়ই বরং সাধারণ মানুষ তাকে অত্যন্ত হীন চোখে দেখে। অর্থাৎ রাস্তাঘাট ও অন্যান্য জায়গার নোংরা আবর্জনা পরিস্কার করা, শৌচালয় পরিস্কার করা, মানুষের মলমূত্র পরিস্কার করা ও তা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া—এই সব অপরিচ্ছন্ন ও অমানবিক কাজে মূলত নিম্নবর্গের নারী-পুরুষই যুক্ত। নিম্নবর্গীয়রা সমাজের ধুলো ময়লা ছাপ করে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখলেও তাঁরা যেখানে বসবাস করেন সেটা আদৌ মানুষের বাসযোগ্য নয়। অথচ সরকারী নাগরিক পরিষেবা তাঁরা পান না। আর্থিক সহায় সম্বল না থাকার জন্য গ্রামাঞ্চলে ও শহরের যৌন কর্মীদের একটা বড় অংশ হলেন নিম্নবর্গের নারী। এই নারীদের একটা বড় অংশ মজুরী-শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও ন্যায্য মজুরি তাঁদের দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে চরম লিঙ্গবৈষম্য বিদ্যমান। বৈষম্য-বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের কারণে মৌলিক চাহিদাগুলি তাঁরা পূরণ করতে পারেন না। ফলে তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের মধ্যে ভগ্ন স্বাস্থ্য, স্বল্প আয়ু ও মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি। আন্ত-বিবাহের ক্ষেত্রেও নিম্নবর্গের প্রতি সামাজিক বিধিনিষেধ অত্যন্ত কঠোর। নিম্নবর্গীয়দের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করতে না দেওয়াটা গ্রামীন ভারতের প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা।

এছাড়া যে কোনো অজুহাতে দলিতদের বিশেষ করে নিম্নবর্গের নারীদের ওপর উচ্চবর্গ ও আধিপত্যকারী জাতিগোষ্ঠীর ভূস্বামী-জমিদাররা খুন-জখম, যৌন উৎপীড়ন ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি হিংসাত্মক আক্রমণ ঘটিয়েই চলেছেন। তফসিলী জাতি-উপজাতি জাতীয় কমিশনের বিভিন্ন রিপোর্টে দলিত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের বিভিন্ন দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে। রিপোর্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দলিত ও আদিবাসী নারীদের ওপর বর্বরোচিত হিংসাত্মক আক্রমণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঐ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, দলিতদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, মারাত্মকভাবে আঘাত করা, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার মত ঘটনা শুধু ঘটছে তাই নয়, তা ক্রমশ বাড়ছে। নীচের চিত্রে কমিশন প্রদত্ত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে ১৯৯৪ থেকে ২০০০ সাল এই সাত বছরে দলিতদের

ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ ঘটেছে মোট ২০০৯০১টি। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ৭৮ জন দলিত নরনারী বর্বরোচিত আক্রমণের শিকার হয়েছেন। চিত্রে এটাও স্পষ্ট যে প্রতি দুই দিনে তিন জন দলিত নারী-পুরুষ খুন, গড়ে প্রতিদিন একজন করে দলিতকে অপহরণ, প্রতিদিন ১০ জন্ দলিত নরনারীকে মারাত্মক আঘাত এবং প্রতিদিন ৬৩ জনকে অন্যান্য আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। একই সময়কালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর এই ধরণের আক্রমন ঘটেছে মোট ৩২৯৮৫টি। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন ১৩ জন আদিবাসী নরনারী আক্রান্ত হয়েছেন। এটাও লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'ল দলিত ও আদিবাসী নারীদের ওপর ধর্ষণের হার ক্রমবর্ধমান। উপরোক্ত সাত বছরের সময়কালে ৬৭৭৯ জন দলিত এবং ২৫১১ জন আদিবাসী নারী ধর্ষিতা হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতিবছর ৯৬৮৪২ জন দলিত এবং ৩৫৮৭১ জন আদিবাসী নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে, যার অর্থ হ'ল প্রতিদিন প্রায় তিনজন দলিত এবং এক জন আদিবাসী মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। দলিত হিউম্যান রাইটস-এর দলিলে উল্লিখিত দলিত জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণের চিত্ররূপ প্রায় একই। ঐ দলিলে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় দুই জন দলিত নিগৃহীত হচ্ছেন। এছাড়া প্রতিদিন তিনজন দলিত নারীকে ধর্ষণ, প্রতিদিন দুই জন দলিত খুন, প্রতিদিন দুই জন দলিতের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।[৫] নানা সাংবিধানিক ও আইনগত বিধিব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিম্নবর্গীয়দের ওপর শোষণ-বঞ্চনা ও আক্রমণ হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ছক—১

১৯৯৪-২০০০ সাল পর্যন্ত তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের ওপর ঘটা বর্বরোচিত আক্রমণসমূহ।

সাল		১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	সর্ব মোট
খুন	SC	৫৪৬	৫৭২	৫৪৩	৫০৩	৫১৭	৫০৬	৪৮৬	৩৬৭২
	ST	১০৫	৭৫	৯৪	৯৫	৬৬	৮০	৫৩	৫৬৮
মারাত্মক আঘাত	SC	৪৫৪২	৪৫৪৪	৪৫৮৫	৩৪৬২	৩৮৯৮	৩২৪১	৩২৯৮	২৪২৭২
	ST	৬৯৯	৬৮৮	৬৯৪	৭০৬	৬৫৪	৬৪৬	৪১২	৪৪৯৯
ধর্ষন	SC	৯৯২	৮৭৩	৯৪৯	১০০২	৯৩১	১০০০	১০৩৪	৬৭৭৯
	ST	৩৮৫	৩৬৯	৩১৪	৩১৫	৩৫৩	৩৮৪	৩৯১	২৫১১
অপহরণ	SC	২৫১	২৭৬	২৮১	২৪২	২৫৩	২২৮	২৪২	১৭৭৩
	ST	৬৪	৭৪	৫০	৪১	৬০	৫৯	৪৫	৩৯৩
অন্যান্য* অপরাধ	SC	২৭৫৭৭	২৬৭৩৩	২৫০৮২	২২৭৩৫	২০১৭৮	২০১১৮	১৮৬৮২	১৬১১০৫
	ST	৩৭৬৬	৪২৯২	৩৮২১	৩৪৮৭	৩৩১০	৩২৮১	৩০৫৭	২৫০১৪
মোট	SC	৩৩৯০৮	৩২৯৯৭	৩১৪৪০	২৭৯৪৪	২৫৭৭৭	২৫০৯৩	২৩৭৪২	২০০৯০১
	ST	৫০১৯	৫৪৭৮	৪৯৭৩	৪৬৪৪	৪৪৪৩	৪৪৫০	৩৯৫৮	৩২৯৮৫

* অন্যান্য অপরাধ বলতে প্রটেকশন অব সিভিল রাইটস অ্যাক্ট এবং সিডিউলড্ কাস্টস অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইব্‌স প্রিভেনশন অব অ্যাট্রসিটিস অ্যাক্ট-এর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ সমূহ।

সূত্র : ১। তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি জাতীয় কমিশনের পঞ্চম রিপোর্ট ১৯৯৮-১৯৯৯ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৮০-২০১ থেকে গণনা করা।

২। তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি জাতীয় কমিশনের ষষ্ঠ রিপোর্ট (হিন্দীতে) ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১, পৃষ্ঠা ২৭৯-২৮৬ থেকে গণনা করা।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত তফসিলী জাতি উপজাতি জাতীয় কমিশনের পঞ্চম রিপোর্ট এবং ১৯৯৯-২০০০ এবং ২০০০-২০০১ সালে নিম্নবর্গীয়দের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণের যে রাজ্য ভিত্তিক তথ্য দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে তাঁদের ওপর সিংহভাগ আক্রমণ ঘটেছে।[৬] ষষ্ঠ রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০০ সালে সমাজের দুর্বলতম অংশের বিরুদ্ধে যে সব আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে, তার ৭০ শতাংশই ঘটেছে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে। অন্যদিকে, আদিবাসীদের ওপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে। এবং রাজস্থান আছে দ্বিতীয় স্থানে। মধ্যপ্রদেশে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের গতিও উর্ধমুখী। এক্ষেত্রে আরও লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'ল উত্তর-পূর্ব ভারতে দলিত ও আদিবাসীদের ওপর আক্রমণাত্মক ঘটনার উপস্থিতি প্রায় নেই। পশ্চিমবঙ্গে উপরোক্ত সময়কালে এদের বিরুদ্ধে একটি মাত্র বর্বরোচিত আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।[৭] তবে অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও কোচবিহার জেলার কয়েকটি গ্রামের স্কুলে দলিত ও সংখ্যালঘু মহিলাদের দ্বারা রান্না করা 'মিড ডে মিল'কে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নভাবে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার পরিপক্কতা ও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার প্রসার সত্ত্বেও অমানবিক অস্পৃশ্যতাজনিত বাছবিচার আজও রয়ে গেছে। অর্থাৎ তথাকথিত প্রগতিশীল মন অস্পৃশ্যতাজনিত লক্ষণগুলি থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়, প্রচ্ছন্নভাবে হলেও তা এখনও টিকে আছে।[৮]

খুন জখম, ঘরবাড়ী পোড়ানো, মহিলাদের উৎপীড়ন প্রভৃতির মাধ্যমে নিম্নবর্গীয়দের মানবিক অধিকার চরমভাবে ক্ষুন্ন হলেও মহিলাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের বিষয়টি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। যে কোন অজুহাতে উচ্চবর্গীয়দের পিছিয়ে পড়া দুর্বলতর শ্রেণীর মহিলাদের যৌন উৎপীড়ন করা, ধর্ষণ করা খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে নিম্নবর্গীয়দের উচিত শিক্ষা দেওয়া ও তাঁদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য উচ্চবর্গের ভূস্বামী-জমিদাররা ধর্ষণকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে দলিত মহিলাদের ওপর যৌন নীপিড়ন এবং অন্যান্য বর্বরোচিত হিংসাত্মক আক্রমণকে হাতিয়ার করে বর্ণহিন্দু ও আধিপত্যকারী জাতিগোষ্ঠীর ভূস্বামী-জমিদার ও পুলিশ দলিত সম্প্রদায়ের আন্দোলনকে ভাঙার চেষ্টা করেন।[৯] ১৯৯৭ সালে বিহারের লক্ষ্মণপুর বাথেতে গণহত্যা চালানোর পূর্বে জমিদার ও ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত বাহিনী রণবীর সেনা দলিত মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার ও ধর্ষণের পথ নিয়েছিলেন।[১০] তামিলনাড়ু, বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে পুলিশ দলিত বসতিতে তল্লাশি

চালানোর সময় তাঁদের মহিলাদের মারধর করা, বন্দী করা বা শারীরিক দিক থেকে চরমভাবে লাঞ্ছনা করেছেন এরকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক সময় পুলিশ লুকিয়ে থাকা পুরুষ-আসামী ধরার জন্য দলিত রমণিকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ হেফাজতেই ধর্ষণ করেছেন,—[১১] কিন্তু ধর্ষণকারীদের কোন শাস্তি হয় নি—এরকম দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। আসলে আইনগত বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নবর্গীয়দের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে উচ্চবর্গের ভূস্বামী-জমিদার পুলিশ ও অন্যান্যরা বারবার যৌন হিংসায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন। উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে দলিত মহিলাদের চরম দুর্দশা সম্পর্কে 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর ২০০১ সালের মে মাসে প্রকাশিত সমীক্ষায় উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে জমিদার-ভূস্বামী শ্রেণির লোকজন ও পুলিশ মহিলাদের ওপর যে যৌন হিংসা, যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, মারধর ও যৌন হয়রানি চালায় তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে নিম্নবর্গের মানুষদের বিশেষ করে মহিলাদের মানবিক মর্যাদা সম্পর্কে ন্যূনতম শ্রদ্ধার অভাব ও বৈষম্যমূলক মানসিকতার কারণে এই সব অভিযোগের পাঁচ শতাংশও আদালত পর্যন্ত পৌঁছায় না।[১২]

নিম্নবর্গের মহিলাদের ওপর ধর্ষণের আরও একটি মাত্রাগত দিক হ'ল বহু যুগ ধরে তাঁরা উচ্চবর্ণের দ্বারা নানাভাবে ধর্ষিতা হলেও আইনের চোখে সেগুলি ঠিক ধর্ষণ বলে গণ্য হয় না। 'দেবদাসী প্রথা', 'আডাবাপা' 'ডোলা' প্রভৃতি পরিচিত ব্যবস্থাগুলির দ্বারা নারীরা এক প্রকার ধর্ষিতাই হন। এর পেছনে মেকী ধর্মীয় স্বীকৃতি রয়েছে বলে আজও তা চলছে। দেবদাসী প্রথাতে কোনো যুবতী নারীকে মন্দিরের দেবতার প্রতি উৎসর্গ করা হয়। এই সব যুবতী নারীর কাজ হ'ল ঈশ্বরের নামে মন্দিরের পুরোহিত ও গ্রামের উচ্চবর্গীয় পুরুষদের যৌন চাহিদা পূরণ করা। দেবদাসী হিসেবে নিযুক্ত সিংহভাগ যুবতী নারীই দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথার নামে দলিত যুবতী নারীদের যৌনকর্মীর বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হয়।[১৩] উৎসর্গীকৃত ঐ যুবতী অন্য কোনো সাধারণ পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন না কিংবা মন্দিরের বাইরে অন্য কোনো কাজের সাথেও নিজেকে যুক্ত করতে পারেন না। বাস্তবে যৌন দাসত্ব ছাড়া তাঁদের আর কিছুই করার থাকে না।[১৪] ১৯৮১ সালে কর্ণাটকে এবং ১৯৮৭ সালে অন্ধ্রে এই ঘৃণ্য অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা হলেও 'ধর্মীয় বিষয়' হিসেবে আজও তা টিকে আছে।[১৪(ক)]

অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানাতে প্রচলিত 'আডাবাপা' প্রথায় যুবতী নারী পুরোপুরি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এখানে উচ্চবর্ণের নববধুর সাথে দলিত যুবতীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নববধুর শ্বশুরালয়ে, যেখানে তাঁর কাজ হ'ল নববধূর গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ করা, তাঁকে সঙ্গ দেওয়া, গর্ভধারণকালে তাঁর স্বামীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করা, তাঁদের সন্তান-সন্ততি লালন-পালন করা প্রভৃতি। অর্থাৎ ঐ যুবতী একাধারে স্ত্রী, গৃহিনী এবং মা। আবার একই সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তিনি কোনোটিই নন। তিনি নারীসুলভ যাবতীয় কাজ সম্পাদন করলেও নারী হিসেবে তাঁর মর্যাদা ও স্বাধীনতা পুরোপুরিই বিপন্ন।[১৫]

আবার 'ডোলা' প্রথায় সদ্য বিবাহিত দলিত নারীকে গ্রামের উচ্চবর্গেরই কোন ভূস্বামী-জমিদার বা অন্য কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে বিয়ের পর প্রথম রাতটি অতিবাহিত

করতে হয়। এখানে তিনি ভালভাবে জানেন যে উচ্চবর্ণের পুরষটি তাঁর আইনসম্মত স্বামী নন। তবুও এক্ষেত্রে তাঁর আদৌ সম্মতি আছে কিনা কখনোই তা জানতে চাওয়া হয় না।[১৬] এই প্রথাটিও ধর্ষণ এবং বিবাহের আইনসম্মত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। তাই এই অমানবিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চবর্ণের ভূমিহার ও রাজপুতরা দলিত নারীদের ওপর যৌন ব্যভিচার আজও টিকিয়ে রেখেছেন।[১৭]

দলিতদের, বিশেষকরে দলিত মহিলাদের ওপর বর্ণহিন্দু ও আধিপত্যকারী অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর এই সব বর্বরোচিত আক্রমণের পেছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান। শ্রেণি বিন্যস্ত ভারতীয় সমাজে এই সব আক্রমণের অন্যতম কারণ হ'ল দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উর্ধমুখী সচলতা। সংরক্ষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও চাকরিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ, বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈপরিত্যগুলি দূর করার চেষ্টা, আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রভৃতি দুর্বলতর শ্রেণির উর্ধমুখী সচলতায় সহায়ক হয়েছে। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে দলিতদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সীমিত উন্নতি ও উর্ধমুখী সচলতা উচ্চবর্গের হিন্দুদের একটা বড় অংশের মধ্যে ঈর্ষা ও ক্ষোভের সঞ্চার করেছে এবং এক ধরনের মানসিক সংকট তৈরি করেছে।[১৮] এই পরিস্থিতিতে সমাজের দুর্বলতম অংশ তাঁদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হলেই সমাজের উচ্চবর্গীয়রা তাঁদের সনাতনী আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে এবং দলিত অংশকে অবদমিত রাখার তাগিদেই হিংসাত্মক আক্রমণ সংগঠিত করছেন।

উপযুক্ত শিক্ষা ও চাকরি না থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলিতদের জীবন-জীবিকা জমির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেই জমিই তাঁদের নেই। ১৯৯০-৯১ সালের কৃষি-সুমারী অনুযায়ী দলিতদের ৭৭ শতাংশই ভূমিহীন। আবার যাদের একটু জমি আছে তাঁদের মধ্যে ৮৭ শতাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। সারা ভারতে ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে কাগজে কলমে কিছু জমি বণ্টিত হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাজ্য ছাড়া অন্য কোথাও দলিতরা বাস্তবে কোনো জমিই পাননি। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে গুজরাটে ৫১৬০৬ হেক্টর উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে, যার বেশিরভাগ অংশই দলিত, বণ্টিত হলেও এক ইঞ্চি জমিও ভূমিহীনরা পান নি। ঐ রাজ্যের সুরেন্দ্রনগর জেলার চারটি তহশীলে ২১৮ জন জমির মালিক ১৪১৮ হেক্টর জমি কাগজে কলমে হস্তান্তর করলেও বাস্তবে তা আদৌ হয় নি! শুধু তাই নয়, কাগজে কলমে ২৪০ জন ভূমিহীন ১৫৪৪ হেক্টর উদ্বৃত্ত জমির মালিক হলেও সমীক্ষায় দেখা গেছে জমির মূল মালিক যারা ছিল তাঁরা কেউই তাঁদের স্বত্তাধিকার ছাড়েনি।[১৯] অর্থাৎ কাগজে কলমে ভূমিহীন দলিতদের নামে কিছু জমি বণ্টিত হলেও আধিপত্যকারী ভূস্বামীদের ভয়ে তাঁরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাই যখনই ঐ জমিতে তাঁরা অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন তখনই ভূস্বামীশ্রেণি তাঁদের ওপর নির্মম আক্রমণ নামিয়ে এনেছেন। ১৯৯৮-এর ডিসেম্বরে বিহারের পূর্নিয়া জেলার কয়লাটোলা ও কান্দাবাড়ী টোলাতে এই জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করেই দলিতদের বিরুদ্ধে এক গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল। এই গণহত্যায় ভূস্বামীশ্রেণি আদিবাসী সাঁওতাল

সম্প্রদায়ের ৭ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারেন এবং তাঁদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেন।[২০] জমি-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দলিত নারীদের ওপর ভূস্বামীশ্রেণির আক্রমণের ভিন্ন মাত্রাগত দিক বোঝার জন্য আর একটি ঘটনার উল্লেখ নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উত্তর প্রদেশে দলিত রামচন্দ্র উচ্চবর্ণের ভূস্বামীশ্রেণির হাতে জমি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করায় তাঁর স্ত্রী রামবতী গণধর্ষণের শিকার হন। এই ঘটনার পর রামচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী থানায় অভিযোগ করতে গেলে থানা অভিযোগ নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে। এরপর তাঁরা জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন এবং তিনি ধর্ষণের তদন্তের আশ্বাস দিলেও স্থানীয় পুলিশ কার্যকর কোনো ব্যবস্থাই নেন নি। ইতোমধ্যে ভূস্বামীশ্রেণির ভীতি প্রদর্শনের জেরে তাঁরা দূরের এক গ্রামে আশ্রয় নেন। দীর্ঘ চার মাস বাদে গ্রামে ফিরে এসে সম্পত্তির দাবী করলে তাঁদের ওপর নির্মম আক্রমণ নেমে আসে এবং রামবতীকে পুনরায় গণধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনায় রামবতী মারাত্মক আঘাত পান এবং মারা যান।[২১] সমাজ কর্মীদের চাপে পুলিশ সন্দেহভাজন কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ পুলিশের পক্ষ থেকে নেওয়া হয় নি।

উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এবং আর্থিক সঙ্গতি ও সহায় সম্বল না থাকার জন্য দলিত ও আদিবাসী মহিলাদের একটা বড় অংশ কৃষি-শ্রমিকের কাজ করেন। কিন্তু ন্যায্য মজুরী তাঁদের দেওয়া হয় না। তাঁরা পুরুষদের সমান পরিশ্রম করলেও মজুরীর ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যও অত্যন্ত প্রকট। তাই দলিতরা ন্যায্য মজুরির দাবী করলে 'উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য' তাঁদের ওপর ভূস্বামী-জমিদার শ্রেণির ব্যক্তিগত বাহিনীর নির্মম আক্রমণ নেমে আসে। এই আক্রমণের মাত্রাগত দিকগুলি হ'ল জমি থেকে উৎখাত করা, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানী, ধর্ষণ করা, খুন জখম করা প্রভৃতি। কিছু ঘটনার উল্লেখ সাপেক্ষে এই সব বর্বরোচিত আক্রমণের স্বরূপ বোঝা সম্ভব। ১৯৬৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর থাঞ্জাভুর জেলার পূর্বভেনমানি গ্রামে ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ফার্ম ওঅ্যারকারস ইউনিয়নের সদস্যরা মজুরি বৃদ্ধির দাবী জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের উচ্চবর্গীয় ভূস্বামীশ্রেণি দলিত নারী ও শিশুসহ ৪৪ জন কৃষি-শ্রমিককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারেন।[২২] একইভাবে ২০০২ সালের ২৩ এপ্রিল উত্তর প্রদেশের উন্নাও জেলার ভক্তখেদা গ্রামে দলিত চামার ও পাশিরা মাত্র পাঁচ টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ভূস্বামীশ্রেণির খামারে কাজ করা বন্ধ করে দেন। (যাদের মূল মজুরি ছিল মাত্র ১০ টাকা)। এর পরিণতিতে ভূস্বামী যাদবরা দলিত শ্রমিকদের 'উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য' দলিতদের ওপর গণধর্ষণ, যৌন নিপীডন, খুন, লুঠতরাজ চালান। এই ঘটনায় তিন জন দলিত মহিলা গণধর্ষিতা হন, এক জন বৃদ্ধ খুন হন, ১৮ জন মারাত্মকভাবে আঘাত পান এবং ২ বছরের এক শিশু কন্যা ছুরিকাহত হয়। মাত্র পাঁচ টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে এতটা কঠিন মূল্য দিতে হবে দলিতরা তা ভাবতেও পারেন নি। ঘটনার পরে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসন সমগ্র বিষয়টিতে কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা না নিয়ে ধামাচাপা দিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই ঘটনায় গণধর্ষণের শিকার পঁচিশ বছর বয়স্কা উষমা অভিযোগ করতে থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগ নথিভুক্ত না করে ভয়

দেখিয়ে বলেন, 'তুম চামার লোগ সব চিনার হো, ভাগো ইহা সে নেহী তো থানে মে বন্ধ কর দুঙ্গি আউর বলাৎকার করুঙ্গী।' [২৩]

জাতিভিত্তিক সামাজিক বিধিনিষেধ অমান্য করার কারণেও নিম্নবর্গীয়দের ওপর বর্ণহিন্দু ও আধিপত্যকারী জাতিগোষ্ঠীর নির্মম আক্রমণ নেমে আসছে। স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরেও জাত্পাতভিত্তিক হিন্দু সমাজে সামাজিক বিধিনিষেধের কঠোরতা আদৌ কমেছে বলে মনে হয় না। আইন থাকা সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অস্পৃশ্যতাজনিত আচার-আচরণের তীব্রতা আজও রয়ে গেছে। আন্ত:বিবাহের ক্ষেত্রেও সামাজিক বিধিনিষেধের কঠোরতা আজও অধিকাংশ হিন্দু কঠোরভাবে মেনে চলার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে উচ্চবর্গীয় হিন্দু সমাজ নিম্নবর্গীয়দের অশুচি বলেই মনে করেন। তাই নিম্নবর্গের কোন যুবক-যুবতী উচ্চবর্ণের কোনো যুবক-যুবতীকে বিয়ে করলে তাঁদের পরিবারসহ সকলকে খুন, অঙ্গহানী, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া, গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। এক্ষেত্রে দলিতরা কেবলমাত্র বর্ণহিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন এমন নয়—তথাকথিত পিছিয়ে পড়া জাতের অগ্রসর অংশের দ্বারাও আক্রান্ত হচ্ছেন। বিষয়টি বোঝার জন্য সাম্প্রতিক একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট।

২০০৪ সালে ৪ জুলাই মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার ভোমাটোলাতে দলিত মাহার এবং ওবিসি গওলি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাধে। বিরোধের কারণ হ'ল মাহার যুবক নীতিশ এবং গওলি যুবতী সন্তোষী চন্দ্রবংশী প্রেমঘটিত কারণে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁদের খুঁজে না পেয়ে গওলি 'সম্প্রদায় উচিত শিক্ষা' দেওয়ার জন্য মাহার পরিবারের ওপর সংগঠিতভাবে আক্রমণ চালান এবং মাহার পরিবারের তিন জন মহিলাকে প্রকাশ্যে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে স্থানীয় পঞ্চায়েত ভবনের পিছনে নিয়ে গণধর্ষণ করেন। গ্রামে মাহাররা সংখ্যায় বেশি থাকা সত্ত্বেও আধিপত্যকারী গওলিদের বর্বরোচিত আক্রমণ, অসহায়ভাবে দেখা ছাড়া কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহস পান নি।[২৪]

সামাজিক বাধানিষেধের অঙ্গ হিসেবে নিম্নবর্গীয়দের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। আজও গ্রামীন ভারতে অবস্থার তেমন বিশেষ হেরফের হয় নি। ১৯৯১ সালে মহারাষ্ট্রের মারাঠাদা অঞ্চলের চারটি জেলার ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে ৯৫টি গ্রামের ৭৫টি গ্রামের মন্দিরে দলিত নারীপুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই। এর মধ্যে ৮১টি গ্রামে তাঁরা বর্ণহিন্দুদের বাড়িতেও প্রবেশ করতে পারেন না। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে কোনো দলিত এই সামাজিক বাধাকে ছিন্ন করে মন্দিরের ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁকে সামাজিক বয়কট করা, অপমান করা, এমনকি শারীরিক দিক থেকে চরমভাবে নিগৃহীত হতে হয়।[২৫] মহারাষ্ট্রের মত একটা 'প্রগতিশীল রাজ্যে' যেখানে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, বাবা সাহেব আম্বেদকরের মত মহান সমাজসংস্কারক জাতপাত ও অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বের বিশাল কর্মকাণ্ড বিস্তৃত সেখানেই দলিতদের এই অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার হতে হচ্ছে। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে মোটামুটিভাবে একই অবস্থা বিদ্যমান। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলিতদের ক্ষমতায়ন ও বর্ণহিন্দুদের দ্বারা তাঁদের ওপর আক্রমণের প্রবণতা বাড়ছে। গ্রামের যাবতীয় বিষয় এবং গ্রামীন অর্থনীতি এতদিন যাদের

নিয়ন্ত্রণে ছিল বিকেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই পরিবর্তন তাঁদেরকে অসহিষ্ণু করে তুলছে।[২৬] তাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সময় থেকেই দলিতদের ওপর হিংসা খুন জখম বেড়েই চলেছে। কেননা পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নির্বাচিত দলিত প্রতিনিধিরা বর্ণহিন্দু ও আধিপত্যকারী জাতিগোষ্ঠীর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করলেই তাঁদের ওপর হিংসা, ধর্ষণ প্রভৃতি আক্রমণ নেমে আসছে। ১৯৯৮ সালের ১৫ আগস্ট রাজস্থানের দৌসা জেলার ঠিকারী গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী প্রধান মিশ্রী দেবীকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে নগ্ন করে অপমান করা হয়। শুধুমাত্র দলিত বলেই মধ্যপ্রদেশের ডমহ্ জেলার পাটেরা গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমতী অনিতা বাঈ আহীরওয়ারকে বর্ণহিন্দু ও সরকারী আধিকারিকদের চাপে ২০০৫ সালে ৫৮তম স্বাধীনতা দিবসেও জাতীয় পতাকা তুলতে দেওয়া হয় নি। প্রকাশ্যে তাঁকে বলা হয়েছিল 'চামার-চামারিয়ারা জাতীয় পতাকা তুলতে পারবে না।' [২৬(ক)]

উচ্চবর্গীয় ভূস্বামীশ্রেণি দলিতদের ওপর যে অত্যাচার, নিপীড়ন চালাচ্ছেন তাতে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে দলিতরা কি ন্যায় বিচার পাচ্ছেন কিংবা অত্যাচারী নিপীড়নকারীদের কি আইন অনুযায়ী যথাযথ শাস্তি হচ্ছে? বাস্তব ঘটনা হ'ল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না এবং দলিতরাও উপযুক্ত ন্যায় পাচ্ছেন না। প্রাশাসনিক স্তরে এটা একটা বড় ব্যর্থতা। অপরাধীরা যদি আইন অনুযায়ী যথাযথ শাস্তি পেত তবে দলিতদের ওপর হিংসা নিপীড়ন অত্যাচার হয়তো কিছুটা হলেও হ্রাস পেত। আসলে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া এবং দলিতদের ন্যায়কে সুনিশ্চিত করার যে প্রক্রিয়া, সেখানে নানাধরনের দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, জাতপাত ও লিঙ্গবৈষম্য বিদ্যমান। এখানে কয়েকটি ঘটনার বিশ্লেষণে এই বিষয়টির কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে।

ন্যাশ্ন্যাল কমিশন ফর উইমেন, হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ নারীর অধিকার সম্পর্কিত স্থানীয় ও জাতীয় বেসরকারী সংগঠনসমূহ, সংবাদপত্র, বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতিতে উল্লিখিত তথ্যে এটা স্পষ্ট যে নিম্নবর্গের নারীপুরুষদের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত আক্রমণকারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো শাস্তি হচ্ছে না। কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এইসব আক্রমণের ঠিকমত তদন্ত হচ্ছে না। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে ধর্ষণ কেসের ক্ষেত্রে নারীরা এফ. আই. আর. করা থেকে আদালত পর্যন্ত নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আর যদি ধর্ষিতা সেই মহিলা গ্রামে বসবাসকারী গরীব এবং নিম্নবর্গের হন তাহলে তাঁর পক্ষে ন্যায়বিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। আক্রান্ত নারীকে পুলিশ, প্রশাসন, ডাক্তার, আইনজীবী, বিচারপতি এমনকি নিজের পরিবারের মধ্যেও প্রতিকূল বাধার সম্মুখীন হতে হয়।[২৭] 'আমনেস্টি ইন্টারন্যাশ্ন্যাল'-এর সমীক্ষাতেও বলা হয়েছে আক্রান্ত মহিলারা স্থানীয় থানায় প্রাথমিক অভিযোগ নথিভুক্ত করার সময় থেকে সমস্যার সম্মুখীন হন। পুলিশ যখন দেখেন অভিযুক্তরা উচ্চবর্ণের বা স্থানীয় প্রভাবশালী পরিবারের তখন অভিযোগ নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। আরও নেতিবাচক দিক হ'ল যেসব মহিলা যৌন নিগ্রহ বা ধর্ষণের অভিযোগ নথিভুক্ত করার চেষ্টা করেন তাঁদেরকে পুলিশ অপমান বা নিগ্রহ করতে দ্বিধা করেন না। এছাড়া পুলিশ নিয়মিতভাবে

ঘুষ চান, সাক্ষীদের ভয় দেখান, সাক্ষ্য প্রমান লোপাট করার চেষ্টা করেন, আক্রান্ত মহিলার স্বামীকে পর্যন্ত মারধোর করেন।[২৮] পুলিশ প্রাথমিক অভিযোগ নথিভুক্ত করতে বাধ্য হলেও প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করতে প্রায়শই ব্যর্থ হন। অনেকসময় পুলিশ বর্ণহিন্দুদের আক্রমণ থেকে নিম্নবর্গের মহিলাদের রক্ষা করার পরিবর্তে ধর্ষণকারীদের সাথে যুক্তভাবে দলিত ধর্ষিতার ওপর আক্রমণ চালায়। আর অভিযুক্তদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে দলিত মহিলাদের ওপর ধর্ষণের অভিযোগের ৩০ শতাংশ ভিত্তিহীন মিথ্যা বলে পুলিশ বাতিল করে দেয়।[২৯] এই সব বাধা অতিক্রম করে যদি মামলাটি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তাহলে নতুন সমস্যা দেখা দেয় সরকারী আইনজীবী ও বিচারপতিদের কাছ থেকে। অনেক সময় সরকারী আইনজীবী মামলা বন্ধ করে দেওয়ার শর্তে অভিযুক্তদের কাছ থেকে ঘুষ নেন। শুধু তাই নয়, বিচারপতিদের লিঙ্গবৈষম্য ও জাতিগত পক্ষপাতিত্বের ধারণা মামলার রায়কে প্রভাবিত করে।[৩০] ফলে ধর্ষণকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেকসুর ছাড়া পেয়ে যান।

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত নারীদের প্রতি অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে ২৫.২ শতাংশ। 'ন্যাশ্‌ন্‌ল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী নারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী অপরাধীদের খুব কম ক্ষেত্রে সাজা হয়েছে।[৩১] তথ্য অনুযায়ী ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২ এবং ১৯৯৩ সালে যে সব ধর্ষণ মামলার বিচার পর্ব শেষ হয়েছে সেই সব ক্ষেত্রে আসামীর দণ্ডপ্রাপ্তির হার যথাক্রমে ৪১.৫ শতাংশ, ৩৪.২ শতাংশ, ৩৩.৮ শতাংশ এবং ৩০.৩ শতাংশ। অর্থাৎ এই তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে বেকসুর ছাড়া পাওয়ার হার ক্রমবর্ধমান। শুধু তাই নয় ৮০ শতাংশেব বেশি ধর্ষণ মামলার বিচার অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে।[৩২] সাধারণ চুরির অপরাধীদের যে হারে শাস্তি হয় ধর্ষণের মত মারাত্মক অপরাধীদেরও সেই হারে শাস্তি হয় না।[৩৩]

ধর্ষিতা দলিত মহিলারা পুলিশ আইনজীবী ও বিচারপতিদের কাছ থেকে যে ধরনের বাধার সম্মুখীন হন তা বোঝার জন্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৯৭ সালে তামিলনাড়ুতে উচ্চবর্ণের থিবর করুপ্পাস্বামী ১২ বছর বয়স্কা এক দলিত নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় গেলে থানা অভিযোগ নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে। কারণ থিবররা ইতোমধ্যে কেসটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য পুলিশকে ঘুষ দেন এবং ঘটনাটি জানাজানি না করার জন্য ধর্ষিতার বাবাকে চরম পরিস্থিতির হুমকি দেন। এতসব সত্ত্বেও পুলিশ চাপে পড়ে মামলা রুজু করতে বাধ্য হলেও তা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধর্ষণ ও ধর্ষণের শাস্তিসংক্রান্ত ৩৭৫ ও ৩৭৬ ধারায় করেন নি। পুলিশ সচেতনভাবে 'মাদ্রাজ সিটি পুলিশ অ্যাক্ট'-এর ৭৫ ধারায় কেসটি নথিভুক্ত করেন।[৩৪] স্বাভাবিকভাবে অভিযুক্তের অল্প কয়েকদিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে জেল হয় এবং পরে জামিনে মুক্তি পান।

একইভাবে ১৯৯৬ সালে তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির কাম্মাপট্টি গ্রামের ২৬ বছর বয়স্কা দলিত মহিলাকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের উচ্চবর্ণের থিবররা গণধর্ষণ করেন। উপযুক্ত প্রমান থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ধর্ষিতার ভাইকে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে নিষেধ করেন।[৩৫] শেষ পর্যন্ত ধর্ষিতার গ্রামের মানুষের চাপে পুলিশ অভিযোগ নথিভুক্ত করতে

এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হন। এরপর অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পুলিশ চার অভিযুক্তসহ মোট ১৮ জনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেন। তা সত্ত্বেও ধর্ষিতা তাঁদের সনাক্ত করতে সমর্থ হন। শেষ পর্যন্ত হাতে যথেষ্ট প্রমান থাকা সত্ত্বেও পুলিশের দিক থেকে যথাযথ উদ্যোগের অভাবের জন্য অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি হয় নি।

আইন সম্পর্কে দলিতদের অজ্ঞতাকে সমাজেব আধিপত্যকারী শ্রেণি এবং পুলিশ শুধু কাজে লাগাচ্ছেন তাই নয়, অনেক সময় সরকারী আইনজীবী ও বিচারকরাও নেতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছেন। ২০০২ সালের মার্চ মাসে রাজস্থানের উদয়পুর জেলায় ১৮ বছর বয়স্কা নর্বদাকে উচ্চবর্ণের এক রাজপুত ভূস্বামী ধর্ষণ করে। এরপর ঘটনাটি নথিভুক্ত করার জন্য থানায় যাওয়ার চেষ্টা করলে অন্তত ৫০ জন রাজপুত তাঁকে বাধা দেন। দুদিন পর যখন তিনি স্থানীয় থানায় উপস্থিত হন তখন পুলিশ তাকে অকথ্য গালিগালাজ করেন এবং অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য ৫০০ টাকা ঘুষ চান। তাঁরাও ঘুষ দিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ সুপারের নির্দেশে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়। এরপর মামলাটি যখন আদালতে যায় তখন সরকারী আইনজীবী মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য নর্বদার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন।[৩৬]

আদালতে জাতিগত পক্ষপাতিত্ব ও নীচুজাতের মহিলাদের ন্যায় না পাওয়ার অনন্য দৃষ্টান্ত হ'ল রাজস্থানের বিখ্যাত বানওয়ারী দেবী মামলা। ১৯৯২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বানওয়ারী দেবী উচ্চবর্ণের গুজ্জরদের দ্বারা তাঁর স্বামীর সামনেই গণধর্ষিতা হয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ হল তিনি রামকরণ গুজ্জরের এক বছরের শিশুকন্যার বিয়ের ব্যাপারটা রাজস্থান সরকারের 'উইমেন'স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম'কে জানিয়েছিলেন।[৩৭] এই মামলায় আদালত আসামীদের বেকসুর মুক্তি দিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে, 'উচ্চবর্ণের কেউ নীচুবর্ণের কোন মহিলাকে ধর্ষণ করে নিজেকে কলুষিত করতে পারেন না।'[৩৮] মনে রাখা দরকার বানওয়ারী দেবী মামলার রায় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

১৯৮৮ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি বিহারের দেওঘর জেলায় পাঁচ জন দলিত মহিলাকে পুলিশ গণধর্ষণ করে এবং তাঁদের ঘরবাড়ী ভাঙচুর করে। বিহার সরকারের পক্ষ থেকে ভেঙে যাওয়া ঘরবাড়ী পুনরায় তৈরী করার জন্য প্রত্যেক আক্রান্ত মহিলাকে সাহায্য হিসেবে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল।[৩৯] ১৯৮৯ সালের ১৩ মে বিচারপতি ও. পি. সিন্‌হা অভিযুক্ত আটজন পুলিশ ও ছয় জন চৌকিদারকে বেকসুর মুক্তি দিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে আক্রান্ত মহিলারা যেহেতু খুবই গরীব তাই তাঁদের চরিত্র সন্দেহের উর্ধে নয়। রায়ে আরও বলা হয়েছিল ১০০০ টাকা পাওয়ার জন্যই তাঁরা হয়তো মিথ্যা কথা বলছেন—এই ধারণা কি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায়? কেননা আক্রান্ত ঐ মহিলাদের কাছে ১০০০ টাকা অনেক বেশি টাকা এবং ভদ্রসমাজের নারীদের সঙ্গেও তাঁদের তুলনা করা যায় না। যেহেতু তাঁরা নীচু কাজের সঙ্গে যুক্ত তাই তাঁদের 'চরিত্র সংশয়-জনক'।[৪০] কি অদ্ভুত যুক্তি গরীব নীচু কাজের সঙ্গে যুক্ত হলেই তাঁর 'চরিত্র সন্দেহজনক'! কেন গরীব দলিত মহিলাদের কি আত্ম-মর্যাদা, আত্ম-সম্মান বোধ কিছুই থাকতে পারে না যে ১০০০

টাকা পাওয়ার জন্যই আক্রান্ত মহিলাদের সকলকেই অসত্য কথা বলতে হবে। যাই হোক পরবর্তীকালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায়েও প্রায় এক ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬(২) ধারা অনুযায়ী পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের শাস্তি ন্যূনতম দশ বছর। তা সত্ত্বেও বিখ্যাত 'সুমন রানী কাস্টোডিয়াল রেপ' মামলায় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত অপরাধী পুলিশ অফিসারকে দশ বছরের শাস্তি দিতে অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে, ধর্ষিতার 'চরিত্র সন্দেহজনক' (questionable character)।[৪১] এছাড়াও ডাক্তারী রিপোর্ট উল্লেখ করে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল মহিলা একাধিকবার যৌন সহবাসে লিপ্ত হলেও তাঁর শরীরের কোথাও যৌন নিগ্রহের চিহ্ন নেই।[৪১] প্রশ্ন হ'ল থানার মধ্যে একজন পুলিশ অফিসার একজন মহিলাকে ধর্ষণ করছেন এবং তিনি যদি আবার দলিত হন তাহলে তাঁর কি সত্যি প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে—যে প্রতিরোধের ফলে তাঁর শরীরে যৌন নিগ্রহের চিহ্ন ফুটে উঠবে?

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে, বর্ণহিন্দু এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণির অগ্রসর অংশ ও ভূস্বামীশ্রেণির দ্বারা নিম্নবর্গের মহিলাদের অত্যাচার, নিপীড়ন, খুন জখম, ধর্ষণ প্রভৃতি হিংসাত্মক আক্রমণ অব্যাহত। বিভিন্ন সাংবিধানিক ও আইনগত বিধিব্যবস্থা সত্ত্বেও তাঁদের মানবিক অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু ন্যায় বিচার তাঁদের কাছে সুদূরপরাহত। আসলে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও আইনগত বিধিব্যবস্থার প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জাতপাত ও লিঙ্গবৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁদের ওপর অত্যাচার নিপীড়নের জন্য অনেকাংশে দায়ী এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাধা। তবে এই সমস্যাগুলি মূলত সমগ্র সমাজব্যবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত। তাই বিভিন্ন সাংবিধানিক ও আইনগত ব্যবস্থা, আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, আজকের বিশ্বায়ন, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার সত্ত্বেও নিম্নবর্গের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন এবং মানবিক অধিকার লঙ্ঘন আটকানো যাচ্ছে না। নিম্নবর্গের নারীদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন বন্ধের জন্য তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, উপযুক্ত মজুরি, জমি বণ্টন, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, সামাজিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যথাযথ অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায় সমাজে বিদ্যমান উচ্চবর্গের জাতিগত আধিপত্য ভাঙতে হলে এবং নিম্নবর্গীয়দের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। তবে নিম্নবর্গের নারীদের বিদ্যমান সমস্যাগুলি যেহেতু সমগ্র সমাজব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত, তাই সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ছাড়া তাঁদের অমানবিক অবস্থার অবসান ও প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে না।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

১. 'Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against Women'.http://www.Unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/677297d 5a 260 6d06c 1256665000531f26? Opendocument. *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, Geneva, Switzerland. (লিখিত এই বিবৃতিটি এশিয়ান লীগ্যাল রিসোর্স সেন্টারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের

'Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective', op. cit.

Human Rights Watch, op. cit.

'In Brief : Recient Rape Cases' in *Kali's Yug,* New Delhi, November, 1996, P. 20. As cited in *Human Rights Watch.* Ibid., P. 3.

Indira J., 'Indian Rape Law and Dalit Women', op. cit. P. 134.

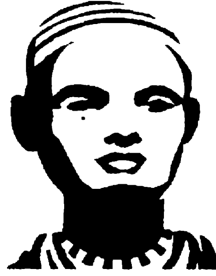
Flavia Agnes, *Gender State and the Rhetoric of Law Reform,* Bombay : Rcws Gender Series, 1995, PP. 123-124. As quoted in Indira J. Ibid.

1989 Supp (I) SCC, P. 287. As quoted in *Human Rights Watch.* op. cit. PP. 5-6.

Human Rights Watch, Ibid., P. 6.

নারী আন্দোলন

নারীমুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা ● নারীমুক্তি আন্দোলন ● মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি ● বাংলার নারীপ্রগতির ধারা ● নারীর অধিকার ও আইন ● নারীর জন্য আইন : মুক্তি না বন্ধন? ● নারী ও তাঁর ক্ষমতায়ন ● নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ● বধূনির্যাতন, পণপ্রথা ও পণপ্রথাবিরোধী রবীন্দ্রচেতনা ● ভারতীয় উপমহাদেশে নারী আন্দোলন ● মেহনতি মানুষের আন্দোলন ও নারীসমাজ ● নারী আন্দোলন . দেশ-দেশান্তরে ● নারীরা আজো ভালো নেই ● নারীবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি ● রচনার উৎস ● লেখক পরিচিতি



'সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রীজাতিকে নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত।'



'নারীমুক্তি-আন্দোলন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপক সংগ্রামের একটি অংশ।'

নারীমুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

লেনিন বলেছেন, কোনও দেশের মুক্তি আন্দোলনই সফল হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ হিসাবে নারী সমাজও তার অংশীদার হয়ে উঠছে এবং তাদের মুক্তি সাধনের সংগ্রামও বৃহত্তর মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। লেনিনের এই কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল ভাবনা।

১৯১০ সালের ৮ মার্চ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজবাদী নারী সম্মেলনের মঞ্চ থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের খ্যাতনামা নেত্রী ক্লারা জেটকিন এই দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেন। অবশ্য নারী দিবসের পটভূমি বা প্রেক্ষাপট তারও আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে প্যারি জেটকিন সর্বপ্রথম সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবি জানান।

১৮৫৭ সালে নিউ ইয়র্কের দর্জি কারখানায় নারী শ্রমিকের উপযুক্ত বেতন ও দশঘণ্টা কাজের দাবিতে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। ১৯০৭ সালে জার্মানির স্টুটগার্টে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্লারা জেটকিন এই নবগঠিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পূর্ববর্তী পটভূমি ছিল একদিকে সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী শক্তির আক্রমণ অন্যদিকে সাম্যবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ক্রমবিকাশ। এই দুয়ের মধ্য থেকেই শুরু হয় সমাজের সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত ও অবহেলিত অংশ নারীজাতির মুক্তি সংগ্রাম। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়েই ১৯০৮ সালের ৮ মার্চ তারিখে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে দর্জি মেয়েরা ঐতিহাসিক ভোটাধিকার ও আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। পরের বছর ১৯০৯ সালের ৮ মার্চ শিকাগো শহরের নারী শ্রমিকেরা সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদির দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে এক সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হন এবং একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বার করেন।

মার্কিন দেশের নারী শ্রমিকদের এই আন্দোলনের প্রভাব ধীরে ধীরে ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি প্রভৃতি পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানেও নারী শ্রমিকদের মধ্যে গণ আন্দোলনের চেতনা দানা বেঁধে ওঠে। এরই ফল হিসাবে আসে ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজবাদী নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনেই ৮ মার্চ তারিখটি চিহ্নিত হল বিশ্বের অবহেলিত বঞ্চিত নারীজাতির শোষণমুক্তি আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে।

এই সম্মেলন থেকেই ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি, সমকাজে সমমজুরি, নারী ও শিশু শ্রমিকদের প্রতি বিভিন্ন বঞ্চনামূলক কাজের প্রতিকারের দাবি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি বঞ্চিত মানুষের ওপরে শোষনের অবসানের দাবিও ঘোষণা করা হয়।

এর পর ১৯১৭ সালের ঐতিহাসিক ২৩ ফেব্রুয়ারি। এই দিনটিকে রাশিয়ার ইতিহাসে

'নারী দিবস' হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে যদিও শুধুমাত্র নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে মামুলি সভা-সমিতি ও প্রচারপত্রের মাধ্যমেই দিনটি পালন করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে এই ঐতিহাসিক ২৩ ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করেই ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন অমিত বিক্রমে লড়াই চালিয়েছিলেন রাশিয়ার অবহেলিত ও নির্যাতিত মেয়েরা জারের 'সামন্ততান্ত্রিক' শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ওই দিন রাশিয়ার সূতাকলের নারী শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘটের সামিল হয়েছিলেন। তাঁরা আহ্বান জানালেন 'মেটাল শ্রমিক'দের কাছে তাঁদের ধর্মঘটকে সমর্থন করতে। শ্রমিকেরা এতদিন পর্যন্ত তাদের সর্বাত্মক বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পাহাড় তৈরি করে যাচ্ছিল। নারী শ্রমিকদের আহ্বানে তারা এক নতুন পথের সন্ধান পেল। প্রায় দশ হাজার নারী-পুরুষ সেদিন এই ধর্মঘটে সামিল হয়। প্রথমে ভাইবরগ জেলার শ্রমিক-অধ্যুষিত অঞ্চলে আন্দোলন শুরু হয়ে ক্রমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পিটার্সবুর্গ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

'রুটি চাই, শান্তি চাই, চাই না স্বৈরতন্ত্র'— এই আওয়াজ শ্রমিক কৃষক নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে অশ্ব ও পদাতিক বাহিনীর কশাক সৈন্যদলের মধ্যেও দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ২৩ ফেব্রুয়ারির নারী দিবসের গর্ভেই সেদিন বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে ছিল। সেদিনের রাশিয়ার নারী শ্রমিকদের এই বৈপ্লবিক চেতনা ও সংগ্রামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে আমেরিকার নারী শ্রমিকেরা ও অন্যান্য দেশের নারীরা গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর ১৯২০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে লেনিন ঘোষণা করেন, 'শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমান অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা। এর প্রধান কাজ সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে তাদের টেনে আনা, তাদের পারিবারিক দাসত্ব থেকে উদ্ধার করা। রান্নাঘর আর আঁতুড় ঘরের অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে তাদের মুক্ত করা।'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নবজাগরণের সূচনা হয় রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দের তৈরি আন্দোলন থেকে। ইংরেজি ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন প্রবর্তিত হয়। ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ আইন সংশোধিত হয়, ১৯৫৬ সালে পতিতাবৃত্তি ব্যবসা নিরোধক আইন, ১৯৬১ সালে পণপ্রথা নিরোধ আইন ও ১৯৭৬ সালে সমান কাজে সমান মজুরি আইন প্রবর্তিত হয়। বিজ্ঞাপনে অশ্লীলভাবে নারীদেহ দেখানো নিষিদ্ধ করার আইন গৃহীত হয় ১৯৮৬ সালে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ে এই আইনের সাহায্য নিতে পারছে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত মহিলাদের জাতীয় পরিকল্পনার খসড়াতে বলা হয়েছে এ দেশে শতকরা ৭৫ ভাগ নারী নিরক্ষর, কর্মরত নারীর সংখ্যা ১৬ শতাংশ মাত্র।

পঞ্চাশের দশক থেকে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন ও বিশ্বনারী সঙ্ঘের সঙ্গে ভারতের নারী আন্দোলন ও সংগঠনগুলির স্থায়ী যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিশ্বনারী সঙ্ঘের আহ্বানে বিভিন্ন সময়ে ভারতের মহিলা প্রতিনিধিরা নানা দেশে গিয়েছেন। তা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা চীন, সোভিয়েত ও ইউরোপ—এশিয়ার অন্যান্য দেশে গিয়েছেন।

১৯৫২ সালের জুন মাসে বার্লিনে বিশ্বশান্তি কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে মহিলা প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিনিধি রেণু চক্রবর্তী।

তখন কোরিয়ার যুদ্ধ, জার্মানি ও জাপানের পুনরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তুলেছিল। তারই বিরুদ্ধে আহুত হয়েছিল এই বিশেষ অধিবেশনটি।

১৯৫২ সালে বেজিংয়ে সারা এশিয়া শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিনিধি হয় মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় ও পঙ্কজ আচার্য যোগ দেন।

১৯৫৩ সালে হেলসিঙ্কিতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে এ রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন পঙ্কজ আচর্য।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভিয়েনায় বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ভারতের মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন এ রাজ্যের গীতা মল্লিক।

তিনি দেশে ফিরে এসে জানালেন, এই সম্মেলনের প্রস্তুতির ব্যাপারে মহিলারাই ছিলেন সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। ফরাসীতে 'মায়েদের দিন' পালন, আমেরিকায় 'আমাদের ছেলেদের বাঁচাও আন্দোলন', ইতালিতে 'ইউজিন নারীদের সভা' ইত্যাদি আন্দোলন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনারী সঙ্ঘের সভানেত্রী মাদাম ইউজিন কোঁতে, চীনের মাদাম সান ইয়াৎ সেন, সোভিয়েতের মাদাম নিনা পোপোভা, ব্রিটেনের মনিকা ফেলটন, হাঙ্গেরির এলিজাবেথ অ্যানাডিক্স, চেকোস্লোভাকিয়ার শ্রীমতী জুলিয়াস ফুচিক প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ।

তবে ১৯৫৩ সালের জুন মাসে কোপেনহেগেনে বিশ্বনারী সম্মেলনের গুরুত্ব অন্য সব অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় ৭০টি দেশ থেকে ১৯৯০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। এই সম্মেলনে গৃহীত অধিকারের সনদে বলা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ নারী বর্তমানে একই কাজের জন্য পুরুষের চেয়ে কম মজুরী পায়। লক্ষ লক্ষ নারী প্রসূতি ছুটি পায় না, আবার অনেককে অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় ছাঁটাই করা হয়। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে নারীর ওপর অনেক বাধানিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। তাই নারীর চাই স্থায়ী কাজের নিশ্চয়তা, যে কোনও কাজ বেছে নেবার অধিকার, সামাজিক জীবনবীমার সমান অধিকার, কারিগরি শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি। সনদে আরও বলা হয়েছে, তাঁরা চান রাষ্ট্রের দ্বারা মা ও শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, বেতনসহ প্রসূতি ছুটি, শিল্পাঞ্চলে ও গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট সংখ্যক প্রসূতি সদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, শিশুদের রক্ষণাগার ও শিশুদের জন্য শিক্ষালয়।

প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য স্তরে একটি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি গৃহীত হয়। সর্বভারতীয় মহিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়িকা হলেন অনুসূয়া বাঈ ও হাজরা বেগম। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়িক হলেন মনিকুন্তলা সেন ও অঞ্জলি মুখার্জি।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মানুষের সামগ্রিক শোষণমুক্তি আন্দোলনের ও সংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে নারীর মুক্তিসংগ্রাম ও আন্দোলন।

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস বলে, নারীর বিশেষ শারীরিক গঠনকে তার শারীরিক দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত করে উৎপাদন ব্যবস্থা ও পদ্ধতি থেকে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার কৌশল শুরু হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থায় অন্যান্য বহুতর ভোগ্য সামগ্রীর সঙ্গে নারীও ভোগ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং তার ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যই শুরু হয়েছে পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন।

নারীমুক্তি আন্দোলন তাই এই শতকে একটি বিশিষ্ট আন্দোলন হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছে।

নারীমুক্তি আন্দোলন

অনিলা দেবী

নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সহজাত প্রাকৃতিক পার্থক্য রয়েছে তারই ভিত্তিতে প্রথম স্বাভাবিক শ্রম বিভাগের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু এর ফলে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার কোনো হেরফের হয়নি। বরং যতদিন পর্যন্ত মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম ছিল ততদিন নারীর স্থান ছিল সমাজের শীর্ষে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পদের উদ্ভব ঘটলো, আর যা ঘটেছিল পশুপালনের স্তরের কোনো এক সময়ে, আবার যার ফলে সামাজিক সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের করায়ত্ত হয়েছিল, সেই যুগেই শুরু হয়েছিল নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার ক্রম অবক্ষয়। তাই এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পদ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'বন্য যোদ্ধা ও শিকারী পুরুষ গৃহে নারীর প্রাধ্যান্য মেনে নিয়ে সেখানে দ্বিতীয় স্থান পেয়েই সন্তুষ্ট ছিল। 'নম্রতর স্বভাবের' পশুপালক সম্পদের অধিকারের স্পর্ধায় নিজেই প্রথম স্থান দখল করে নিল। নারীকে ঠেলে দিল দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু নারী প্রতিবাদ করতে পারেনি। আগে পরিবারের মধ্যকার শ্রমবিভাগের নিরিখে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পদের ভাগাভাগি ঠিক হতো। সেই শ্রমবিভাগ ঠিকই রয়ে গেল, অথচ পরিবারের বাইরের শ্রমবিভাগের পরিবর্তনের ফলে পরিবারের মধ্যকার সম্পর্কে ওলট-পালট ঘটে গেল।'

নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রমবিভাগের স্তরে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের উৎপাদন ও যন্ত্রপাতি এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার ছিল পুরুষের অধিকারে, আর নারীর অধিকারে ছিল গৃহস্থালীর সাজ-সরঞ্জাম। তাই তখন প্রত্যেকেই ছিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রধান। নারী ও পুরুষের মধ্যে ছিল সমানাধিকার। কিন্তু উৎপাদনের উপাদান ও পদ্ধতির উন্নততর বিকাশের ফলে শিকারী ও পশুপালক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম যে সামাজিক শ্রমবিভাগ ঘটে তার ফলে উৎপাদনের উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে, দেখা দেয় উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও বিনিময়, প্রথমে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। এর ফলে পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও অধিকারের পরিধি যায় বেড়ে। সে ক্রমে নতুন নতুন সম্পদের অধিকার পেতে শুরু করে, গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত সম্পদ। কিন্তু নারীর কর্মপরিধি ও অধিকারের ক্ষেত্র অপরিবর্তিত থেকে যায়, ফলে সামাজিক দিক থেকে তার গুরুত্ব কমতে শুরু করে। সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরুষই ক্রমে প্রধান হয়ে ওঠে, আর নারী সেই ক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত হয়ে দূরে সরে গিয়ে গৃহকোণে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এমনকি নিজের ভরণ-পোষণের জন্যও তাকে পুরুষের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। এমনিভাবে সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে নারী সামাজিক মর্যাদা হারাতে থাকে।

ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের সম্পদ বৃদ্ধির ঘটনাটি নারীকে গৃহকোণে ঠেলে দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে নি, সামাজিক রীতিনীতিতেও একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে।

মাতৃবিধি অনুযায়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঠিক হতো মায়ের দিক থেকে বিচার করে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পদে বলীয়ান পুরুষ আর এই ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি নয়। তাই নতুন আচরণবিধি ঠিক হলো—এর পর থেকে পুরুষের দিক থেকে তার সন্তান-সন্ততিরা তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠীতেই থাকবে, আর মেয়েদের তরফের সন্তান-সন্ততিরা তাঁদের বাপেদের গোষ্ঠীভুক্ত হবে। এমনিভাবে মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকারের রীতি বাপের দিক থেকে উত্তরাধিকারের রীতিতে পরিবর্তিত হলো। তাই এঙ্গেলস্ মন্তব্য করেছেন, 'মাতৃবিধির উচ্ছেদের ঘটনাটি নারীজাতির বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়ের ঘটনা। এখন পুরুষ গৃহের বল্গাটিও নিজের হাতে তুলে নিল। আর নারী হলো অধঃপতিত, দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সে হলো পুরুষের কামনার দাস, কেবলমাত্র সন্তান প্রজননের যন্ত্র বিশেষ।' এই পরিবর্তন ক্রমে নারী ও পুরুষের মিলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার যতই দানা বাঁধতে থাকে ততই পুরুষ নিশ্চিন্ত হতে চায় যে তাঁর প্রকৃত ঔরসজাত সন্তান তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছে। নারীকে একমাত্র পুরুষের দৃঢ় কর্তৃত্বের অধীনে রাখতে পারলেই তা সম্ভব। তাই প্রবর্তিত হলো এক পতিত্বের পরিবারের রীতি। সন্তানের পিতৃত্ব প্রশ্নাতীত করার স্বার্থে নারীর সতীত্বের শর্ত অলঙ্ঘনীয় রীতি হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু পুরুষের বহু বিবাহ ও ব্যভিচার বন্ধ করার কোন প্রয়োজন পড়লো না; তাই তা যেমন চলছিল চলতে থাকলো। পরবর্তীকালে ধর্ম, আইন, সামাজিক রীতিনীতি, দেশাচার সবই গড়ে উঠলো একে ভিত্তি করে। নারীকে বন্দী করা হলো সাতপাকের বন্ধনে। সতীত্বের রীতি লঙ্ঘনকারী নারীকে হত্যা করার অধিকারও পুরুষ গ্রহণ করেছিল তারো নজির রয়েছে শিল্প-সাহিত্যে।

এই প্রসঙ্গে সমাজ বিকাশের ইতিহাসে দুটি বৈপ্লবিক ঘটনার ঐতিহাসিক সমকালীনতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঙ্গেলসের ভাষায়, 'ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রথমশ্রেণি দ্বন্দ্বের সূচনা এবং একপাতিত্বের বিবাহ প্রথায় পুরুষ ও নারীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের সূচনা একই সময়ে ঘটেছিল, আবার প্রথম শ্রেণি নির্যাতনের ঘটনার সমসময়ে পুরুষ কর্তৃক নারীকে নির্যাতনের ঘটনারও সূত্রপাত হয়েছিল।' আমরা জানি সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সব কিছু নির্ধারণ করে। আর সেই কাঠামোর ভিত্তি হলো কি কি জিনিস উৎপন্ন হয়, কিভাবে উৎপন্ন হয়, কতটুকু উৎপন্ন হয়, সমাজের বিভিন্ন সত্য উৎপাদন ক্ষেত্রে কিভাবে অংশগ্রহণ করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য কিভাবে বন্টিত হয়। অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মিলিত রূপই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। আবার আমরা এও জানি যে, উৎপাদন শক্তির উন্নততর বিকাশের একস্তরে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে যখন তার বিরোধ শুরু হয়, তখনই দেখা দেয় সমাজ বিপ্লব। ফলে নতুন সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়। আবার সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই ক্রমবিকাশের ব্যাপারটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তাই তো আমরা দেখতে পাই উৎপাদন ব্যবস্থার এক বিশেষ বিকশিত স্তরে পুরুষ নারীর ওপর নিজের কর্তৃত্ব আরোপ করতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু 'নারী প্রতিবাদ করতে পারেনি'। আবার ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে বিকাশের ফলে পরিবারের মধ্যে পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম

হয়েছিল, সেই স্তরেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পথ সামাজিক শ্রেণি ভেদেরও সূচনা হয়েছিল। কারণ সেই স্তরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, কিছু লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারলে অন্যকিছু লোক তাঁদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ওপর বসে খেতে পারে। তাই দেখা দিয়েছিল সমাজব্যবস্থা। ক্রীতদাস শ্রম করে উৎপাদন করে, আর দাস মালিক তার উদ্বৃত্ত উপস্বত্ব ভোগ করে। দাস মালিক শোষক, ক্রীতদাস শোষিত।

শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থা কিন্তু এই স্তরেই থেমে থাকেনি। উৎপাদন শক্তির বিকাশের বিভিন্ন স্তরে তার রূপের পরিবর্তন ঘটেছে, যেমন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মৌল চরিত্র অর্থাৎ শ্রেণিশোষণ, শ্রেণিশাসন অপরিবর্তিত থেকেছে, বরং তার কঠোরতা ও ব্যাপ্তির বৃদ্ধি ঘটেছে। নারীর ওপর শোষণ বঞ্চনার ইতিহাসের এই একই ধারা। দাসব্যবস্থার উদ্ভবের সমসময়ে যার সূচনা হয়েছিল তার কঠোরতা ও ব্যাপ্তির প্রসার সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমানেই এগিয়ে গেছে। তাইতো আমরা দেখতে পাই এক পতিত্বের রীতিকে কঠোর থেকে কঠোরতর করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে অন্দর মহলে। কোথায়ও সে অসূর্যম্পশ্যা, কোথায়ও বোরখার আবরণে আবৃতা, কোথাও বা অবগুণ্ঠনের আড়ালে আবৃত মুখ। এক পতিত্বের রীতির নাম করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর জননীর সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলো।

শ্রেণিদ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা থেকে শোষকশ্রেণি ইতোমধ্যে তাদের শোষণ বঞ্চনাকে আড়াল করার কৌশল আয়ত্ত করেছে। তাই সামন্ত যুগে ভূমিদাসের ওপর কঠোর ও ব্যাপকতর শোষণকে ক্রীতদাসের মুক্তির স্লোগানের আড়ালে ঢেকে রেখেছিল। তেমনি নারীর ওপর কর্তৃত্ব ও লাঞ্ছনাকে আড়াল করার জন্য গড়ে উঠলো সতীত্ব, মাতৃত্ব ইত্যাদির মহিমা কীর্তন করে নানা গাথা নানা উপাখ্যান। সেই সঙ্গে শ্রেণিশোষণের সপক্ষে ধর্মকে কাজে লাগানোর রীতি অনুসরণ করে স্বামী পরিণত হলেন পতিদেবতায়, সতীত্ব হলো সজ্ঞানে স্বর্গে যাওয়ার পবিত্র সোপান, নারীর ক্ষেত্রে পরানুগমন—এমন কি মনে মনে—মহা অধর্ম বলে চিহ্নিত হলো। তারই পাশাপাশি গড়ে উঠলো আইনের অনুশাসন, সামাজিক রীতিনীতি, দেশাচারের এক বিরাট উপরিকাঠামো, যা নারীকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে রইলো।

শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজেও নারীর অধিকারও মর্যাদার—বিশেষ করে বুর্জোয়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীদের—কোনো ইতর বিশেষ হয়েছে ভাবার কোনো হেতু নেই; কারণ নারী পরাধীনতার মৌল বিষয়গুলি এখানে সমানই বর্তমান। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেমন শোষিত শ্রেণিকে সংগঠিত করে শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করার সুযোগ এনে দিয়েছিল, তেমনি নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনাও হয়েছিল এই স্তরেই। আমরা জানি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ের পর্যায়ে বুর্জোয়া শ্রেণি যেমন সামন্ত শোষণে পিষ্ট সমস্ত মানুষকে সমবেত করার চেষ্টা করেছিল, তেমনি তারা জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশ নারীদেরও সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্লোগানের সপক্ষে। কিন্তু ইতিহাস এও বলে যে, বুর্জোয়াশ্রেণি তাদের সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ের স্তরে না নিয়ে সামন্তশ্রেণির সঙ্গে সাময়িক সমঝোতা করে সমাজের ওপর নিজের

কর্তৃত্ব বিস্তারের পথ করে নিয়েছিল, কিন্তু তাঁর সংগ্রামী সাথীদের মুক্তির পথ খুলে দেয়নি। বরং বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের ওপর আরো ব্যাপক ও কঠোরতর শোষণের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। কারণ, তাঁরা জানতো সমাজের গরিষ্ঠতম অংশ শোষিত বঞ্চিতদের আরো এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দেওয়ার অর্থ শ্রেণি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা। নারীমুক্তির প্রতিও তাঁরা একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল।

এতৎসত্ত্বেও বুর্জোয়া ব্যবস্থার একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। আগের দুটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায়—দাস ও সামন্তব্যবস্থায়—নিজের অধিকার সম্পর্কে শোষিত শ্রেণির সচেতনতা ছিল খুবই অপরিপক্ক ও নিম্নমানের। নারীরাও তখন ছিল অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং নানা প্রকার মোহের শিকার। সামন্ত শ্রেণির সঙ্গে লড়াইয়ের যুগে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণিই সমস্ত শোষিত মানুষকে এবং সেই সঙ্গে নারীকেও তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল নিজের স্বার্থে। পরবর্তীকালে শোষিত শ্রেণি কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ ও কাজের মধ্যকার এই দ্বন্দ্বের ফলে উপকৃত হয়েছিল। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ভাষায়, 'বুর্জোয়ারা শুধু তাদের নিজেদের মারণাস্ত্রই তৈরি করে নি, সেই অস্ত্র যারা প্রয়োগ করবে তাদেরও—আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি, প্রলেটারিয়টকেও—জন্ম দিয়েছিল।' বুর্জোয়াপূর্ব যুগে নারী তাঁর অসহায় অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে হয়তো আত্মাহুতি দিয়েছে, নয়তো সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পতিতার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। এই প্রথম নারী সংগঠিত হয়ে তাঁর অধিকার অর্জন করার পথ খুঁজে পেল। এঙ্গেলস্ তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পদ ও রাষ্ট্রের উদ্ভব' গ্রন্থের এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র শ্রেণীদ্বন্দ্ব দূর করে না সত্য তার প্রকারান্তরে সেই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রের যোগান দেয়।'

বুর্জোয়ারা দাবি করে তারা ভূমিদাসকে দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে দিয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা। বুর্জোয়া আইনের চোখে শ্রমিক মালিক উভয়েই সমান, উভয়ই নিজ নিজ স্বার্থ ও ইচ্ছেমতো স্বাধীন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি কি এতই সহজ সরল? শ্রমিক ও মালিকের অর্থনৈতিক ক্ষমতার বাস্তব অসাম্যের মুখে এই স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? উৎপাদনের সমস্ত প্রকার উপায় থেকে বিচ্যুত শ্রমিকশ্রেণি এমন এক অসহায় অবস্থায় রয়েছে যে, সে যদি বেঁচে থাকতে চায় তবে মালিকের শর্তে তার শ্রমণশক্তি বিক্রয় করতে সে বাধ্য। একমাত্র স্বাধীনতা যা তার আছে তা হলো—বাঁচা ও মরা এ'দুটোর মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা।

নারীদের ক্ষেত্রেও বুর্জোয়াশ্রেণি অনুরূপ দাবি করে। তারা বলে, দাস ও সামন্ত যুগে নারীদের কোন অধিকারই ছিল না, তারাই তাদের ভোটাধিকার দিয়েছে, দিয়েছে সামাজিক মর্যাদা। বিবাহ ব্যাপারে নারী পুরুষের আইনী সমানাধিকারের ঘটনাটি তো নারীমুক্তির সর্বপ্রধান হাতিয়ার। যেন নারী-পরাধীনতার মূল কারণই ছিল বিবাহ ব্যাপারে আইনী অসাম্য। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় পূর্ববর্তী যুগের আইনী অসাম্য নারী পরাধীনতার কারণ ছিল না, ছিল তার ফল, কারণ হলো অর্থনৈতিক অসাম্য, অর্থনৈতিক পরাধীনতা। এঙ্গেলস্ তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় দেখিয়েছেন, 'পুরনো যৌথ

পরিবারে—যার মধ্যে একসঙ্গে বসবাস করতো অনেক দম্পতিযুগল এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা—গৃহকাজের বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল নারীদের ওপর এবং পুরুষদের দ্বারা খাবার সংগ্রহ করার কাজটির মতো নারীদের কাজটিও সমান সামাজিক এবং সামাজিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে এসে অবস্থাটি পাল্টে গেল, বিশেষ করে এক পতিপত্নীত্বের স্বতন্ত্র পরিবারে। গৃহকর্ম পরিচালনার কাজটি সামাজিক গুরুত্ব হারালো, ব্যক্তিগত সেবার কাজরূপে পর্যবসিত হলো। স্ত্রী পরিণত হলো প্রথম গৃহভৃত্যে, তাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হলো সামাজিক উৎপাদনে অংশ নেওয়ার কাজ থেকে।' স্ত্রী পুরুষের মিলন ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আইনী সমানাধিকারের বিষয়টি কি সত্য সত্যই শ্রমিকের আইনী স্বাধীনতার মতোই অলীক নয়? এক পতিপত্নী বিবাহের সূচনাতে আমরা দেখেছি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক পুরুষ তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি তাঁর ঔরসজাত সন্তানের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যই নারীকে কঠোর অনুশাসনে আবদ্ধ করেছিল, স্ত্রীর ওপর স্বামীর একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছিল। সেই ব্যক্তিমালিকানার বর্তমান সমাজ কাঠামোতে নারী কি সত্যই স্বাধীনভাবে তাঁর সঙ্গী বেছে নিতে পারে বা প্রয়োজনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে? সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ, নিজের আশ্রয় ও ভরণপোষণের প্রশ্ন প্রভৃতি নানা প্রশ্ন কি তাঁর মিলন ও বিচ্ছেদকে সবসময় প্রভাবিত করে না?

তাই দেখা যাচ্ছে নারীমুক্তির প্রাথমিক দুটি শর্তের একটি হলো—গোটা নারীসমাজকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর অন্যটি হলো—সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসাবে ব্যক্তিমালিকানার স্বতন্ত্র পরিবারের অস্তিত্বের অবসান। আর একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই এই দুটি বিষয় ঘটতে পারে। তাই চূড়ান্ত বিচারে নারীমুক্তি আন্দোলন হলো সমাজ ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের সংগ্রামের একটি অংশ।

আমরা জানি যে, যে কোনো শিল্পোন্নত আধুনিক বুর্জোয়া দেশও তার কর্মক্ষম সমস্ত পুরুষকে সামাজিক উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করতে পারে না। বেকারী বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার নিত্যসঙ্গী। সে ক্ষেত্রে সে তার দেশের গোটা নারীসমাজকে সামাজিক উৎপাদনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে একথা কল্পনাতীত। ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। তাই বুর্জোয়া শ্রেণি নারীসমাজের ততটুকু অংশকেই কাজে লাগাতে রাজি যতটুকু নিয়োগ করলে তার মুনাফার পরিমাণ বাড়বে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশই—যেখানে উৎপাদনের সমস্ত উপায় উপকরণের মালিক গোটা সমাজ, সেখানে সামাজিক উৎপাদন পরিচালিত হয় সমাজের সার্বিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে—পারে পরিকল্পনা মাফিক সমাজের সমস্ত কর্মক্ষম নারী ও পুরুষকে সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করতে।

আবার সমাজতান্ত্রিক সমাজের পত্তন হলেই সমাজের অর্থনৈতিক একক হিসাবে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পরিবারের ব্যবস্থাটিও উবে যাবে, সেই সঙ্গে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের প্রশ্নটিও। কারণ তখন পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না। সুতরাং নিজের ঔরসজাত উত্তরাধিকারীকে সম্পত্তি দিয়ে যাওয়ার স্বার্থে নারীর ওপর

কঠোর কর্তৃত্ব বজায় রাখার মানসিকতাও নষ্ট হয়ে যাবে। যে অর্থনৈতিক কারণে আদিম সমাজের যৌথ পরিবার থেকে স্বতন্ত্র পরিবারের জন্ম হয়েছিল, তার অর্থনৈতিক ভিত্তি চলে যাওয়ায় সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে স্বতন্ত্র পরিবারের অস্তিত্বেরও অবসান ঘটবে।

নারী কর্মসংস্থানের প্রশ্নে প্রথমেই যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো—স্ত্রী পুরুষ উভয়েই যদি সামাজিক উৎপাদন কাজে নিযুক্ত হয়, তবে পরিবার ব্যবস্থাটাই ভেঙ্গে পড়বে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার মূল্য থাকবে না, সন্তান-সন্ততি মায়ের স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের সফলভাবে মানুষ করে তোলা যাবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। বিষয়টিকে প্রথমে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যাক। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত উপায়-উপকরণ যখন সমাজের অধিকারে চলে যাবে, সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনৈতিক একক থাকবে না। সমাজের প্রতিটি সভ্য সে অথর্ব-বৃদ্ধই হোক, কর্মক্ষম যুবক-যুবতী হোক, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরী হোক, আর দুগ্ধপোষ্য নাবালক শিশু সন্তানই হোক—সবার দায়িত্বই সমাজ গ্রহণ করবে। উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত নারী পুরুষের ওপর নির্ভরশীল বৃদ্ধ, কিশোর, শিশুর সাময়িক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গড়ে উঠবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গৃহস্থালী কাজকর্ম যেমন, খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা, পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার করা ইত্যাদি ক্রমে সামাজিক শিল্প হিসাবে গড়ে উঠবে। যারা এইসব শিল্পে নিযুক্ত থাকবেন তারা সামাজিক উৎপাদনের অংশীদার হিসাবেই সামাজিক উৎপাদনের অংশ ভোগ করবেন, সমান মর্যাদা ভোগ করবেন। নিজের বাসগৃহ বা বাগান ইত্যাদি সাজানো ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পরিবারের সভ্যদের সাংস্কৃতিক কাজের অঙ্গে হয়ে উঠবে। এইসব ঘটনা আজ আর অলসকল্পনা নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশে ইতোমধ্যে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

যারা মনে করেন নারী পুরুষ উভয়েই সামাজিক উৎপাদনে নিযুক্ত থাকলে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে তাদের এই ধারণার মূলে যে সংস্কার কাজ করে তা হলো, পুরুষশাসিত সমাজে নারী হলো মজুরিবিহীন ক্রীতদাস, যার প্রতিবাদবিহীন সেবাই হলো পারিবারিক বন্ধনের মূল চাবিকাঠি। তারা একবারও ভেবে দেখেন না যে, মানুষ শুধু খাওয়া পরার জন্যই বেঁচে থাকে না; সাংস্কৃতিক জীবন পারিবারিক জীবনের অন্যতম, বলতে গেলে বৃহত্তম অংশ জুড়ে থাকে। আনন্দ-উচ্ছ্বাস, স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসা এ সবই সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ, আর এতে নারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যে নারী সারাদিন রান্না-বান্না, কাপড় কাচা, বাসন মাজা ইত্যাদি একঘেয়ে বিরক্তিকর গৃহকাজেই ডুবে থাকে, সে কি তাঁর পরিবারের সাংস্কৃতিক জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তোলার সময় ও উৎসাহ পেতে পারে? যারা নারীকে প্রথম ও প্রধান গৃহভৃত্য এবং সন্তান প্রজননের যন্ত্র হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত তাদের একটি কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, বুর্জোয়া পরিবার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এঙ্গেলস সঠিকভাবেই বলেছেন, 'পরিবারের মধ্যে সে (পুরুষ) হলো বুর্জোয়া, আর স্ত্রী হলো প্রলেটারিয়েট'। সুতরাং নারীমুক্তির সংগ্রাম বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের মধ্যেকার শ্রেণীসংগ্রামেরই অংশ।

এবার আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় বিষয়টিকে একটু বিচার করে দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, পুঁজিবাদী বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ইতোমধ্যে দেশের অধিকাংশ পরিবারের স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে। সর্বহারা পরিবার তো তা না করলে নিজের অস্তিত্বই বজায় রাখতে পারে না। যতদূর দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে এমন লক্ষণ নেই বললেই চলে। তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেমপ্রীতি ভালবাসা, সহযোগিতা সহমর্মিতা রয়েছে (তুলনামূলকভাবে হয়তো বেশিই আছে যদি সম্পত্তির লোভের বিষয়টিকে হিসাবের মধ্যে আনা যায়, কারণ সম্পত্তিবান স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা কতটা নিখাদ তা মাপার উপায় এখনো জানা নেই)। সন্তানের প্রতি তাদের স্নেহ-মমতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম নেই। সন্তান-সন্ততিকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যতটুকু অবহেলা দেখা যায় তার দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাঁদের ওপর দেওয়া যায় না, ওটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তমান সমাজব্যবস্থার।

কিন্তু সমস্যাটি হলো প্রধানত বুর্জোয়া পরিবার ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যা। নারী বিনা মজুরিতে গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম করবে, সন্তান প্রসব করবে, তাকে মানুষ করবে, পরিবারের উপায়ক্ষম স্বামী বা পুত্রের সেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে; দীর্ঘ যুগ-যুগান্তরের এই সংস্কার কাটিয়ে উঠে নারী পুরুষে মিলেমিশে যৌথভাবে গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা কঠিন বৈকি? প্রকৃতপক্ষে সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া তা সম্ভব নয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে নারীমুক্তির আন্দোলনের কৌশল ঠিক করতে হবে। বুর্জোয়া পরিবারের ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের সমর্থন পাওয়ার যে বাস্তব অবস্থা রয়েছে তাকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো : সামাজিক উৎপাদনের কোন কোন ক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহণ করবে? মানুষের জীবন ধারণের মূল পেশা যখন ছিল পশু শিকার করা সেই যুগেই নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রম-বিভাগের সূচনা হয়। নারীর স্বাভাবিক শারীরিক গঠন ও প্রকৃতির ফলে গভীর বন জঙ্গলে শিকারের পিছনে দীর্ঘক্ষণ ছোটাছুটি করা সহজসাধ্য ছিল না, বিশেষ করে সে যখন সন্তান বহন করতো। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে সামাজিক উৎপাদন আজ আর বনে জঙ্গলে ছোটাছুটি করে শিকার ধরার মতো শ্রমসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল বিষয় নয়। তাই উৎপাদন ক্ষেত্র নির্বাচনে আজ আর নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজন নেই।

কিছু কিছু প্রগতিবাদী বুর্জোয়া তাত্ত্বিকের মতে নারীকে দিতে হবে এমন কিছু পেশা যা তার মতো দুর্বল কোমলাঙ্গীর পক্ষে করা সম্ভব, যেমন শিক্ষকতা, নার্সের কাজ, করানীর কাজ ইত্যাদি. এ যেন 'কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য' বলে চিহ্নিত করে নারীর প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কিছুটা অংশ ছেড়ে দেওয়া। যেন পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষরাই ঠিক করবে নারী কি করবে, কতটা করবে। এই কপটাচার নরনারীর সমানাধিকারের প্রতি বুর্জোয়া শেণির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক।

আদিমযুগের অবস্থা, সুযোগ ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নারী ও পুরুষের কাজের ভাগাভাগির যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল, পরবর্তী শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কি তা রক্ষিত হয়েছে? দাস যুগে বল, সামন্ত যুগে বল—সব যুগেই শোষিত শ্রেণি নারীদের নিজস্ব পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালন করার পরও ক্ষেতে-খামারে শ্রমসাধ্য কাজ করতে হয়েছে। বর্তমান পুঁজিবাদী যুগে নারীশ্রমিকরা কি কম শ্রমসাধ্য কাজ করে? গ্রাম-গঞ্জে আমরা যে সব শ্রমজীবী নারী দেখতে পাই তারা তো অক্লেশে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে চলেছে। ভিয়েতনাম, চীন প্রভৃতি দেশে মুক্তিসংগ্রামের এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শ্রম করেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তন হওয়ার পর সমানতালে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে অংশ নিয়ে চলেছে। নাৎসী বাহিনীর আক্রমণের মুখে সোভিয়েত রাশিয়ার নারীরাই তো সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁদের সমস্ত সক্ষম পুরুষদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। পুঁজিবাদী দেশেও আজ উদাহরণের অভাব নেই। বিরাট বিরাট পুঁজিবাদী খামারে চাষের কাজে কমবাইন চালানো থেকে শুরু করে এরোপ্লেন চালানো পর্যন্ত কোথায় নারী আজ পিছিয়ে আছে?

বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে দেখা যাক। প্রকৃতিগত কারণে পুরুষের চেয়ে নারীর কিছুটা অসুবিধা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু নারী যখন সমাজেরই অর্ধাংশ সংখ্যার দিক থেকেও তখন সমাজকে অবশ্যই তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশিষ্ট সাংবাদিক ডাইসন কার্টার তাঁর 'ফিউচার অব ফ্রিডম' গ্রন্থের সোভিয়েত রাশিয়ায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়েছেন—সোভিয়েত রাশিয়াতে নারীদের জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে তা হলো, মা হওয়ার সময় তাঁরা দীর্ঘদিন সবেতন ছুটি পান। আর কিছু কিছু এমন শ্রমসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল কাজ আছে, যার সংখ্যা খুবই কম, যেমন, খনির নিচে কাজ, জাহাজের ডকে কাজ ইত্যাদি, সেখানে নারীদের নিয়োগ করা হয় না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মোট কর্মরত লোকের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান সমান, এমনকি কিছু কিছু পেশায় নারীর সংখ্যা পুরুষদের চেয়েও বেশি।

কর্মসংস্থানের প্রশ্নে আরো একটি মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন এসে যায়, শিক্ষার অধিকারের প্রশ্ন। শিক্ষার নিজস্ব সংস্কৃতিগত আবেদন সত্ত্বেও শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োজন খুব বেশি। কারণ জ্ঞানের বেশিরভাগ অংশই সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের অভিজ্ঞতার সমষ্টি। আর সেই অভিজ্ঞতার মূল উপাদান দুটি হলো সামাজিক উৎপাদন শক্তি ও সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কে জ্ঞান। সুতরাং সামাজিক উৎপাদনে সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে হলে শিক্ষা একটি অবশ্য গ্রহণীয় বিষয়।

জ্ঞান মূলত অভিজ্ঞতা নির্ভর। আর সেই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হলো সামাজিক উৎপাদন। তাই প্রথম দিকে মানুষ সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায়। কিন্তু প্রতিটি মানুষের পক্ষে সমস্ত সময় জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে আয়ত্ত করা সম্ভবও নয় এবং তার প্রয়োজন নেই। কারণ আগের মানুষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আয়ত্ত করেছে তা তো অনায়াসে তাদের কাছ থেকে তাদের উত্তরপুরুষেরা পেতে পারে। তাই মানুষ শুরু করলো একটি প্রক্রিয়া যাকে আমরা বলি

শিক্ষা। শিক্ষা হলো জ্ঞান অর্জন, পূর্ব বা পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সাঙ্গীকরণ, এবং বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টায় জ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করা।

আদিম যৌথ সমাজব্যবস্থায় মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু সমাজ নিজের প্রয়োজনেই সেই জ্ঞান তার প্রত্যেকটি সভ্যকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতো। আর শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব বহন করতো সমাজের প্রবীণ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সভ্যরা। শিক্ষা দেওয়া হতো মুখে মুখে ও হাতে কলমে। ক্রমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বাড়তে লাগলো। মুখে মুখে সব জ্ঞান ধরে রাখা ও অবিকৃত অবস্থায় উত্তরপুরুষকে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়লো। লিপি আবিস্কৃত হলো, জ্ঞান সঞ্চিত হতে থাকলো পুথিতে।

কিন্তু যৌথ সমাজব্যবস্থা চিরকাল থাকলো না। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়লো শ্রেণীসমাজে, শোষক ও শোষিত শ্রেণিতে, মালিকশ্রেণি আর শ্রমকারী শ্রেণিতে। সেই জ্ঞানের ওপর আধিপত্যের রূপ পাল্টে গেল। গোটা সমাজ আর জ্ঞানের অধিকারী রইলো না। জ্ঞান প্রধানত মালিকশ্রেণির বিশেষ অধিকারে পরিণত হলো। তাই মার্কস মন্তব্য করেছেন, 'যে শ্রেণি সমাজের বস্তুগত উৎপাদনে উপায়গুলি দখল করে আছে, সেই সুবাদে সে সমাজে মানসিক উৎপাদনের উপায়গুলিও দখল করে রাখে।... যে-সব ব্যক্তি শাসকশ্রেণির সভ্য তারা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অধিকারী হয় এবং সেই সুবাদে চিন্তা-ভাবনার কাজটিও করে।' ফলে সমাজের মধ্যে দুটি ভাগের সৃষ্টি হয়, 'পরিকল্পনাকারী মানুষ' আর 'শ্রমকারী মানুষ'। প্রথমোক্তরা চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করার একচেটিয়া অধিকার দখল করে। শেষোক্তরা কেবল শ্রম করে প্রথমোক্তদের পরিকল্পনার বস্তুগত রূপ দেয় মাত্র। অর্থাৎ বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টি করে। ফলে উৎপন্ন সম্পদ ক্রমে পরিকল্পনাকারীদের সম্পত্তি হয়ে উঠে, আর সেই সুবাদে শ্রমকারী মানুষকে শাসন ও শোষণ করে। কন্‌ফুসিয়াসের অনুগত একজন চৈনিক দার্শনিকের মতে, 'যারা তাদের মন দিয়ে শ্রম করে তারা অপরকে শাসন করে, আর যারা শরীরের বল দিয়ে শ্রম করে তারা অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়।'

আমরা জানি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যুগে যুগে শিক্ষা সংস্কৃতি শাসকশ্রেণির বিশেষ অধিকার হিসেবে থেকেছে। আবার শাসকশ্রেণির ধ্যানধারণাই ছিল সেইসব যুগে আধিপত্যকারী ধ্যান-ধারণা। দাসযুগে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ক্রীতদাসের কোনো অধিকারই ছিলনা। সামন্তযুগে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু জ্ঞান ভূমিদাসকে দেওয়া হতো, যেমন জলবায়ু ঋতুভেদ, মাটি ও জল সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান। কিন্তু তাও দেওয়া হতো ধর্ম বা দেশাচারের সঙ্গে যুক্ত করে, নানা আপ্তবাক্য, ছড়া বা আর্য্যার সাহায্যে। কার্যকারণ সম্পর্কিত যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান তাতে থাকতো না বললেন চলে। শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিল সামন্তশ্রেণি। তারা যেভাবে তা পরিবেশন করতো সাধারণ মানুষকে তাই নিতে হতো। সামন্তযুগের ফরাসী দার্শনিক ডিডেরোর মন্তব্য থেকেই এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়,—'যে কৃষক লিখতে পড়তে জানে. একজন অশিক্ষিত কৃষকের চেয়ে তাকে ঠকানো অপেক্ষাকৃত কঠিন।'

আমরা দেখেছি সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে পড়ার সমসময়ে নারীর ওপর পুরুষদের কর্তৃত্বের সূচনা হয়েছিল। আর তখন থেকেই সমাজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের

সম্পর্ক ছিল শোষিত ও শোষকের মধ্যকার সম্পর্ক। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে তা ভাবার কোনো কারণ নেই। শোষিত শ্রেণির মতো নারী ও প্রধানতই শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত ছিল। তাইতো দেখতে পাই দাস ও সামন্তযুগে নারী ছিল অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, দেশাচার ইত্যাদির নীরব শিকার। পুরুষশাসিত সমাজে নারীশোষণের চরিত্র ও প্রকৃতি আড়াল করার এই ছিল প্রকৃষ্ট পথ।

শ্রেণিবিভক্ত বুর্জোয়া সমাজে নারীর শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে শাসক ও শোষক শ্রেণির ধ্যান-ধারণা মূলত অন্য রকম হতে পারেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও বুর্জোয়া শ্রেণির কাজ ও স্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব নারী শিক্ষার পথ কিছুটা খুলে দিয়েছে তা স্বীকার না করলে অন্যায় করা হবে। সোভিয়েত শিক্ষাবিদ ক্যালিনিন তাঁর 'অন কমিউনিস্ট এডুকেশন' গ্রন্থে বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন, 'পুঁজিপতি চায় শ্রমিক ও কৃষক কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মতো শোষণের সমস্ত বোঝা বহন করবে। এই উদ্দেশ্য থেকে শুরু করলে পুঁজিপতিরা কখনই শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে উদ্যম ও সাহস সঞ্চার করতে চাইতে পারে না, চাইতে পারে না তাদের কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে। কারণ অজ্ঞান ও দুর্দশাগ্রস্ত লোককে বাগে রাখা সহজ। কিন্তু এই সব লোকেদের নিয়ে তো যুদ্ধ জয় করতে পারা যায় না, কারণ প্রাথমিক জ্ঞানবুদ্ধি না থাকলে সেই শ্রমিক তো যন্ত্র ও হাতিয়ার চালাতে পারে না। একদিকে যন্ত্রপাতির উন্নতি, অস্ত্রের জন্য প্রতিযোগিতা এবং অপরদিকে শিক্ষার সুযোগ লাভের জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম বুর্জোয়াশ্রেণিকে বাধ্য করে শ্রমজীবী মানুষকে অন্তত কিছুটা পর্যন্ত জ্ঞান দিতে। আবার লুটেরা যুদ্ধের স্বার্থে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে দৃঢ়তা, সাহস ও অন্যান্য গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতেও তারা বাধ্য হয়, যদিও তা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক। কোনো প্রকার বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থাই এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না।'

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সীমিত সুযোগ বুর্জোয়া ব্যবস্থায় হয়েছে তার কারণও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু আমরা জানি প্রতি যুগে শাসকশ্রেণির ধ্যান-ধারণাই সেই যুগের আদিপত্যকারী ধ্যান-ধারণা। সুতরাং শিক্ষা সংস্কৃতির মর্মবস্তুতে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে তা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং শিক্ষা সংস্কৃতির দাবিদাওয়া সেইমতো সংগঠিত করতে হবে।

আমরা আরো জানি, বুর্জোয়া শ্রেণি নানা ভাঁওতাবাজির আড়ালে তাদের উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে শিক্ষা সস্কৃতি পরিবেশন করে। স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা একই পথ অনুসরণ করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তো আমরা দেখি নারীর কর্মসংস্থান সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ও খণ্ডিত ধারণা থেকে তারা নারী শিক্ষাকে যতটুকু সম্ভব সঙ্কুচিত রাখতে আগ্রহী। তার শিক্ষাকে বিজ্ঞানভিত্তিক কুসংস্কার মুক্ত, যুক্তিবাদী করতে কুণ্ঠিত, কারণ তা হলে নারী তার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়বে এবং বুঝতে পারবে শ্রেণিবিভক্ত পুরুষশাসিত সমাজে তার মুক্তি নেই, আর প্রকৃত মুক্তি হলো শোষণমুক্ত শ্রেণিহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এই প্রাগ্রসর যুগে তাই বুর্জোয়া শ্রেণি নারীদের জন্য শিক্ষার এমন সব শাখা সুপারিশ করে যা তাকে তার রান্নাঘরে

সাজঘরে আটকে রাখবে। খুব বেশি হলে নার্স, কেরানী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার মতো শিক্ষা দিতে রাজি। আমরা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যেমন দাবি করেছি যে, নারী কি করবে কি করবে না তা স্থির করার দায় পুরুষের নয়। সমানাধিকারের ভিত্তিতে নারীই তা ঠিক করবে। তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও দাবি হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রের দ্বারা নারীর জন্য উন্মুক্ত থাকবে। নারী নিজস্ব প্রবণতা ও সামর্থ অনুসারে নিজেই ঠিক করবে কি সে পড়বে।

নারীর সামাজিক অবস্থানের বিবর্তনের আলোচনা থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসক ও শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণির সার্বিক লড়াইয়ের অন্যতম অংশ হিসাবে নারীমুক্তি আন্দোলনের গুরুত্ব ছাড়াও তার আরো একটি অন্য দিক রয়েছে। আমরা দেখেছি আধুনিক বুর্জোয়া সমাজে নারী দুটি অর্থে প্রলেটারিয়েট। প্রথমত গোটা নারীজাতি পারিবারিক জীবনে পুরুষের অধীনতা ও বঞ্চনার শিকার প্রলেটারিয়েট। দ্বিতীয়ত শোষিত বঞ্চিত শ্রেণির পরিবারের নারীরা সর্বহারাদের মতো সাধারণভাবে বুর্জোয়া শ্রেণির সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার সমান অংশীদার প্রলেটারিয়েট। তাই নারীমুক্তির লড়াইয়ের দুটি ফ্রন্ট পরিবার ও সমাজ। একদিকে তাদের লড়তে হয় পারিবারিক পরাধীনতা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে; অন্যদিকে তাদের সমবেত হতে হয় সমাজ পরিবর্তনের বৃহত্তর সংগ্রামের ময়দানে। তাই নারীমুক্তি আন্দোলন কিছুটা জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, কিছুটা কঠিনও বটে।; তবে এর একটা বিরাট ইতিবাচক দিক রয়েছে। কারণ দুই ফ্রন্টের এই আন্দোলনকে সঠিকভাবে সংগঠিত, পরিচালিত এবং সংযুক্ত করতে পারলে তা সমাজ পরিবর্তনের বৃহত্তর আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

আমরা জানি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে স্ত্রীজাতির অংশ হিসাবে প্রতিটি নারী, তা সে সর্বহারা পরিবারেরই হোক, আর বুর্জোয়া পরিবারেরই হোক, পারিবারিক পরাধীনতা এবং নানা প্রকার শোষণ-বঞ্চনার শিকার হতে বাধ্য। ব্যক্তিগত সম্পদের আবির্ভাবের সমসময়ে যার জন্ম, সম্পদের অস্তিত্বের সঙ্গে তার গাঁটছাড়া দৃঢ় হবে এটাই তো স্বাভাবিক। নারীর অধিকার অর্জনের লড়াই যদি সঠিক স্লোগানের ভিত্তিতে সংগঠিত করা যায়, তবে মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণির নারীদের কিছু অংশকে তার পিছনে জমায়েত করা সম্ভব। পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভোট দেওয়া ও নির্বাচন প্রার্থী হওয়া ইত্যাদিতে সমানাধিকারের দাবিগুলি স্বাভাবিকভাবেই নারীজাতির সমস্ত অংশের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে এর ভিত্তিতে যে আন্দোলন গড়ে উঠবে তা হবে যথেষ্ট ব্যাপক ও গণভিত্তিক। আবার সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এর মধ্য দিয়েই নারীজাতি বুঝতে পারবে যে, নারীমুক্তির প্রশ্নটি মূলত সমাজ পরিবর্তনের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি সমাজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, আন্দোলনের প্রাগ্রসর স্তরে শাসক ও শোষক শ্রেণির একটি অংশ আন্দোলনের সপক্ষে চলে যায়, নয়তো নিরপেক্ষ থাকে। পারিবারিক পরাধীনতা থেকে মুক্তির আন্দোলন বুর্জোয়া-নারীদের একটি অংশকে সমাজ পরিবর্তনের চূড়ান্ত সংগ্রামের দিকে টেনে আনতে, নয়ত নীরব সমর্থন জানাতে সফল হবে।

'সর্বহারা শ্রেণিকে নিজের মুক্তি নিজেকেই লড়ে নিতে হয়' এই মার্কসীয় শিক্ষার আলোকে বলতে হয়, 'নারীমুক্তিও নারীকের লড়ে নিতে হবে।' কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, নারীমুক্তি আন্দোলন একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন আন্দোলন। কার্যত নারীমুক্তি আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের বৃহত্তর আন্দোলনেরই একটি অংশ। শ্রেণীবিভক্ত বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের সংগ্রামের পাশাপাশি যুব-ছাত্রের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেমন বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসে সমাজ পরিবর্তনের মূল ধারায় মিশে নিজের সার্থকতার শর্ত হিসাবে মূল ধারাকে ব্যাপক ও বেগবতী করে তোলে, তেমনি নারীমুক্তি আন্দোলনও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে নতুন নতুন শক্তি সমবেত করে সমাজ পরিবর্তনের মূল ধারায় এসে মিশতে বাধ্য। কারণ ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারের শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণিবিভক্ত বর্তমান সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক সমাজের ধ্বংসের ওপর সামাজিক মালিকানার সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নারীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব।'

মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি

কনক মুখোপাধ্যায়

যুগ যুগ ধরে মানবসমাজে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক হীন অবস্থায় রয়েছে। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে নারীর পরাধীনতা বিভিন্ন রূপে চলে এসেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা, নারীর সামাজিক মুক্তি, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নটিও সামনে এগিয়ে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সময় এ প্রশ্নটি খুবই অগ্রাধিকার পেয়েছে। নবজাগরণের যুক্তিবাদের আলোকে নারীর সমানাধিকারের দাবি স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা, স্বাধীনসত্তার বিকাশের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে সঙ্গে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা, স্বাধীনসত্তার স্বীকৃতির প্রশ্নটিও প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই আমাদের দেশেও দেখতে পাই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আন্দোলনের সময় থেকেই স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের আইনত সমান অধিকার—এই সব প্রশ্ন সামনে এগিয়ে এসেছে। নারীর প্রতি অন্যায়, অবিচার, সামাজিক নিপীড়ন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে তাঁর হীন অবমাননা—এ সব দেখে সব সময়ই বহু সহৃদয় ব্যক্তি করুণায় বিগলিত হয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে অনেক চেষ্টাও করেছেন নারীর দুর্দশা দূর করবার। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে কোনো সুচিন্তিত সামাজিক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়নি। কারণ এর আগে মোটামুটিভাবে ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে, নারীজাতি চিরদিনই পুরুষের অধীনে ছিল এবং থাকবে। সুতরাং নারীর সেই দাসত্ব মেনে নিয়ে যতটা সম্ভব তার কষ্ট দুর করার বা পুরুষের যতটা সম্ভব নারীর প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করার প্রশ্নটাই ছিল বড় কথা। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস বলেছেন : 'অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তির সময় থেকে যে-সব অসম্ভব ধ্যান-ধারণা আমাদের সময় পর্যন্ত চলে এসেছে, তার মধ্যে একটা হল এই যে, নারী যেন সমাজের সূচনা থেকেই পুরুষের দাস ছিল।' ('That woman was the slave of man at the commencement of society is one of the most absurd notions that have come down to us from the period of Enlightenment of the eighteenth century')[১] এই রকম অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে নারীর স্বাধীনতার কথা আসতেই পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে, নবজাগরণের যুক্তিবাদই নারীর স্বাতন্ত্রকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সেই অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু কোনো ধনতান্ত্রিক দেশেই কার্যত আনুষ্ঠানিক সামাজিক মুক্তিও হয়নি আর প্রকৃতপক্ষে নারী-পুরুষের সমানাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে মার্কসবাদের আবিষ্কারের পর মার্কস-এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম নারীর দাসত্বের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন এবং একমাত্র শ্রেণিহীন সমাজেই যে নারীর পূর্ণমুক্তি সম্ভব, তা দেখিয়ে দেন। তারপর রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সর্বপ্রথম নারীর পূর্ণমুক্তি ও প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের নারীরাও সেইভাবে পূর্ণমুক্তি লাভ করেন।

মার্কসবাদী তত্ত্ব : দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই তত্ত্ব অনুসারে সমাজে নারীর পরাধীনতার কারণ ও নারী-মুক্তির উপায়ের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। এর আগে নিপীড়িত নারীসমাজের প্রতি সমাজ-সংস্কারকদের যতই দরদ থাকুক, আর তাঁদের জন্য যতই সদিচ্ছা থাকুক, নারীসমাজের প্রতি কোনো বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কেউ তুলে ধরতে পারেননি। আর মার্কসবাদের দ্বারা সে কাজ সম্ভব হয়েছে, কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শীর্ষে এসেই মার্কসবাদীতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন : 'মার্কসবাদী তত্ত্ব হল সর্বশক্তিমান, কারণ মার্কসবাদ হল অভ্রান্ত... ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যে তিনটি শ্রেষ্ঠ জিনিস সৃষ্টি করেছিল, জার্মানির দর্শন, ইংরেজদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি এবং ফরাসীদের সমাজতন্ত্রবাদ—তারই স্বাভাবিক উত্তরাধিকার হল মার্কসবাদ।' ('The Marxian doctrine is omnipotent, because it is true. It is the legitimate successor of the best that was created by humanity in the nineteenth century in the shape of German Philosophy, English Political Economy and French Socialism')[২] এই 'সর্বশক্তিমান' মার্কসবাদী তত্ত্বই সমাজে নারীর অবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, মানবসমাজের সূচনা থেকেই নারী যে পুরুষের পরাধীন ছিল এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রাগৈতিহাসিকযুগে যখন সমাজে মানুষের মধ্যে শোষক-শোষিতের শ্রেণিভাগ হয়নি, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ প্রবর্তন হয়নি, তখন নারী-পুরুষ সকলেই সমান ছিল। নারীর সম্মান অনেক ঊর্ধে ছিল। এমনকি অনেকদিন পর্যন্ত 'মাতৃপ্রধান' সমাজব্যবস্থাও ছিল। তারপর শ্রেণিশোষণের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে নারীজাতির পরাধীনতা ও শোষণ বিভিন্নরূপে চলে এসেছে। একমাত্র সমাজে শ্রেণিশোষণের অবসানের মধ্য দিয়েই নারীর পূর্ণমুক্তি সম্ভব। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজেই নারীর পূর্ণমুক্তি হতে পারে। আর এইখানেই সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির সঙ্গে নারীজাতির মুক্তির সমস্যাটি জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। এই বিষয়টি ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিভাবে স্থাপিত হয়, এবং এই বিষয়ে মার্কসীয় বিশ্লেষণ কি। সেই বিশ্লেষণের আলোকেই মাত্র আমরা দেখতে পাবো কেমন করে সমাজে নারী পরাধীন হল, আর কেমন করেইবা তার সেই পরাধীনতার অবসান হতে পারে।

মানবসমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে মানুষ আজ একটা সভ্যযুগে এসে পৌঁছেছে। এই সমাজের পরিবর্তন বা বিকাশ কিভাবে হয়? আর মানবসমাজটাই বা কি? মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ কিভাবে নির্ধারিত হয়? মার্কস দেখিয়েছেন : 'সামাজিক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যা কিনা মানুষের স্বেচ্ছাধীন নয়। বস্তুগত উৎপাদনের শক্তিগুলির বিকাশের নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী মানুষের সঙ্গে মানুষের উৎপাদন সম্বন্ধও নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই উৎপাদন-সম্বন্ধই সামগ্রিকভাবে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরী করে—যা কিনা সমাজের প্রকৃত ভিত্তি আর যার ওপর গড়ে উঠে আইনকানুন ও রাজনীতির উপরিকাঠামো, এবং যে সামাজিক কাঠামো অনুসারে গড়ে ওঠে কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক চেতনা ('In the social production of their life, men enter into definite relations that are indispensable and independent

of their will, relations of production which correspond to a definite stage of development of their material productive forces. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation on which rises a legal and political super-structure and which correspond definite forms of social consciousness.')[৩] এইভাবে সামাজিক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যে মানুষ পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তারাই আবার সেই পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধ অনুযায়ী নির্ধারিত করে থাকে রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা ও স্তরভেদ ('The same men who establish social relations in conformity with their material productivity, produce also principles, ideas and categories in conformity with their social relations.')[৪]

অর্থাৎ সমাজের ধনসম্পদের কিভাবে উৎপাদন ও বণ্টন হয়, উৎপাদনের উপায়গুলির সঙ্গে কার কি সম্বন্ধ এইটিই হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের মূল কথা। কারা ধনসম্পদ উৎপাদন করছে, কারা বা তার মালিক, উৎপাদনের উপায়গুলি কাদের হাতে, এসব বিষয়গুলি ভাল করে বোঝা দরকার। উৎপাদনের শক্তিগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ক্রমবিকাশ হচ্ছে। আর সেই অনুসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের অনিবার্যভাবেই একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন দাস-প্রভু সম্বন্ধ মালিক-শ্রমিক সম্বন্ধ। এই সামাজিক সম্বন্ধ মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। উৎপাদনের শক্তিগুলির বিকাশের বিভিন্ন স্তরে মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে, শোষক শোষিত মানুষের শ্রেণীগুলি নূতন নূতন রূপে দেখা দিয়েছে। আর সমাজের এই মূল অর্থনৈতিক বুনিয়াদের ওপর গড়ে ওঠে তার উপরিকাঠামো—ন্যায়নীতি, ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য-সংস্কৃতি রাজনীতি প্রভৃতি। এই সব কিছুকে ঘিরে গড়ে ওঠে মানসিক জগত, গড়ে ওঠে তার চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রতিটি মানসিক অভ্যাস।

সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই উৎপাদনসম্বন্ধ থেকেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী-পুরুষের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, তা বুঝতে হবে। কেনোই বা নারী ক্রমশ এমন পুরুষের পরাধীন হয়ে গেল, আর কেনোই বা মানুষ যুগ যুগ ধরে এই ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে গেল যে-নারী যে পুরুষের অধীন থাকবে এ তো স্বাভাবিক কথাই? আর পুরুষের কাছে নারীর বশ্যতাকে স্বাভাবিক ধরে নিয়েই কয়েক শতাব্দী ধরে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে তাদের পরস্পরের প্রতি সেই অনুসারে দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগ, ভালবাসা, আনুগত্য, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি সবকিছু। পুরুষ যেমন নিজেকে প্রভু হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, নারীও তেমনি নিজেকে পুরুষের অধীন ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই অবস্থাটা কেমন করে এল তা বুঝতে হলে আমাদের সেই গোড়ার কথায় আসতে হয়; অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে কার কি সম্বন্ধ সেই ভাবেই মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থির হয়।

ইতিহাসেই দেখা যায় যে, মানব সমাজের আদি যুগে, যখন মানুষের মধ্যে শোষক শোষিতের শ্রেণিভেদ হয়নি তখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত মাতৃপ্রধান সমাজ প্রচলিত ছিল। নারীরাই সমাজের কর্তৃত্ব করত। মানুষ তখন দলবদ্ধভাবে বাস করত। তারা ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত ছিলনা। মানুষের মধ্যে শ্রেণিশোষণ ছিল না। কাজের সুবিধার জন্য নারী-পুরুষের

মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়া হত। সমাজে নারীর প্রাধান্য ছিল, তার কারণ সামাজিক উৎপাদনের ওপর নারীদেরই কর্তৃত্ব ছিল। চাষবাসের কাজের ওপর নারীদের প্রাধান্য ছিল। তারাই চাষবাসের কাজের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করত। আর পুরুষেরা বনে জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত। চাষবাসের প্রাথমিক যুগে এই ভাবে নারী পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ ছিল। 'ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, যে শ্রেণি বা দল সামাজিক উৎপাদনের কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং উৎপাদনের প্রধান কাজ করে, তারাই অবধারিতভাবে এক সময়ে সেই উৎপাদনের ওপর কর্তৃত্ব করে থাকে। মাতৃপ্রধান সমাজে উৎপাদনের ওপর নারীদের কর্তৃত্ব ছিল। কেন ছিল? কারণ, চাষবাসের প্রাথমিক স্তরে নারীদের উৎপাদনের কাজে মুখ্য ভূমিকা ছিল, তারাই প্রধান কাজটা করত। আর পুরুষরা বনে জঙ্গলে শিকারের খোঁজে ঘুরত। তারপর এক সময় এল পিতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা, যখন উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য স্থাপিত হল। এই পরিবর্তন কেন হল? কারণ তখন পশুপালনের যুগ। উৎপাদনের প্রধান যন্ত্রগুলি ছিল বর্শা, দড়ির ফাঁস, তীর-ধনুক আর মুখ্য ভূমিকা ছিল পুরুষদের।' ('History teaches us that the class or social group which plays the principal role in social production and performs the main function in production must, in the course of time, inevitably, take control of that production. There was a time, under the matriarichate when women were regarded as the controllers of production. why was this? Because under the kind of production then prevailing, primitive agriculture, women played the principal role in production, they performed the main functions, while the men roamed the forest in quest of game. Then came the time under the patriarchate, when the predominent position in production passed to men. Why did this change take place? Because under the kind of production prevailing at that time, stock breeding, in which the principal instruments of production were the spear, the lasso, and the bow and arrow, the principal role was played by men.')[৫]

সামাজিক শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে ক্রমশ ক্রমশ মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হল। শ্রেণি সমাজের উৎপত্তি হল। মানুষের মধ্যে প্রভু এবং দাস, শোষক শোষিত শ্রেণিভেদ হল। পশু পালনের যুগে ক্রমশ ক্রমশ সেই পশুদের মালিকানা গোষ্ঠীর হাত থেকে ব্যক্তির হাতে চলে গেল। ঠিক কোন সময় এবং কেমন করে এই পরিবর্তন হল তার সঠিক তথ্য ইতিহাসে বিস্তারিত পাওয়া যায় না। পশুগুলি এবং শিকারের যন্ত্রপাতি এবং অনুরূপ সম্পত্তির ওপর ক্রমশ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। সমাজে যা কিছু ধনসম্পদ, প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন হতে থাকল ক্রমশ সেগুলি সব পুরুষের অধিকারে এল। নারী তার ভোগের অংশ পেত। কিন্তু সেগুলির ওপর নারীর কোনো অধিকার আর রইল না। ক্রমশ এই ভাবে পুরুষকেন্দ্রিক পরিবার গড়ে উঠতে থাকল। তারপর সমাজে ধনসম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং তা ব্যক্তিগত মানুষের অধিকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের স্থান উঁচুতে উঠতে থাকল এবং নারীর স্থান ক্রমশ নিচে নামতে থাকল। পূর্বে মাতৃপ্রধান সমাজে উত্তরাধিকারের নিয়মগুলিও মাতৃবিধি অনুযায়ী ছিল। এখন পুরুষের হাতে সম্পত্তি যাওয়াতে উত্তরাধিকার বিধিরও পরিবর্তনের প্রয়োজন এসে পড়ল। সুতরাং মাতৃবিধির অবসানেরও প্রয়োজন এসে পড়ল।

আর সেই মাতৃবিধির অবসান করানো হল। মাতৃবিধির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে একটা বিপ্লবই সাধিত হয়ে গেল। 'এই বিপ্লব মানবজাতির ইতিহাসের অন্যতম বিপ্লব। এর জন্য কারো কোনো ক্ষতিসাধন হল না, অতি অনায়াসেই এই বিপ্লব সাধিত হল। জননীবিধির অবসান নারীজাতির বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহের কর্তৃত্বও নিয়ে নিল। নারীজাতির স্থান নিচে নামিয়ে দেওয়া হল, তাকে পরাধীন করে রাখা হল। নারী পরিণত হল পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ক্রীতদাসী, এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ'। ('For this revolution one of the most decisive ever experienced by mankind—need not have disturbed one single living member of a gens....The overthrow of mother right was the world-historic defeat of the female sex. The man seized the reigns in the house also; the woman was degraded, enthralled, the slave of the man's lust, a mere instrument for breeding children.')[৬]

সুতরাং নারী যে চিরদিনই পুরুষের অধীন ছিল এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একসময়ে সমাজের ধনসম্পত্তির ওপর পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল, এবং ব্যক্তিগত মালিকানাপ্রথা প্রবর্তিত হল। সেই সময় থেকেই ক্রমশ ক্রমশ নারীজাতি পুরুষের পরাধীন হয়ে গেল এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা কার্যত পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল। এই অবস্থারই চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে পণ্যের বাজারে একসময় নারীদেহ পর্যন্ত বাজারের পণ্যে পরিণত হল। ক্রমশ ব্যবসাগতভাবেই সমাজে নারীর পতিতাবৃত্তি চলতে থাকল অর্থাৎ অনেক নারী তাদের দেহ বিক্রি করে ভরণপোষণের উপায় করতে থাকল। এর চেয়ে নারীজাতির চরম অবমাননা আর কি হতে পারে!

এখন দেখা যাক কি ভাবে ধাপে ধাপে সমাজে নারীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আর সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করতে গেলে আমাদের দেখা দরকার সমাজ বিকাশের ধারার মধ্যে কি ভাবে পরিবার প্রথার বিকাশ হয়েছে, এবং নর-নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধই বা কি ভাবে পরিণতি লাভ করেছে।

এঙ্গেলস্-এর 'অরিজিন অব ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপারটি অ্যান্ড স্টেট' গ্রন্থের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সমাজের বিকাশে তিনটি প্রধান যুগ দেখা যায় : (১) অ-সভ্য যুগ (স্যাভেজারি); (২) বর্বর যুগ ((বারবারিজম্) ও (৩) সভ্যযুগ (সিভিলাইজেশন)। এর মধ্যে প্রথম দুইটি যুগকে আবার মানুষের খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনের উন্নতির পর্যায় অনুযায়ী নিম্নতর, মধ্যস্তর ও উচ্চস্তর এই তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। কারণ মানুষ কিভাবে তার আহার্য উৎপাদন করে, কিভাবে তা বণ্টন করা হয়, এর থেকেই প্রধানত মানুষের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর নির্ণয় করা হয়েছে। অসভ্য যুগের নিম্নস্তরে মানবজাতির শৈশব অবস্থা ছিল। মানুষ বনে জঙ্গলে ফল মূল খেয়ে বেঁচে থাকত। বন্য জন্তুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা তাদের প্রধান সংগ্রাম ছিল। এরপর মানুষের আগুনের ব্যবহার শেখার সময় থেকে এই যুগের মধ্যস্তর শুরু হয় এবং তীর ধনুকের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই অ-সভ্য যুগের উচ্চস্তর শুরু হয়। প্রথম থেকেই মানুষ পল্লীতে পল্লীতে বসবাস করতে শুরু করেছে। এরপর বর্বর যুগের প্রথম স্তরেই মানুষ পশুপালন, প্রজনন ও চাষ আবাদ করতে শেখে। এই যুগের মধ্যস্তরে এসে উপযুক্ত জায়গাগুলিতে পশুপাল গঠনের মধ্য দিয়ে পশুপালকদের জীবন গড়ে ওঠে। এই সময়

থেকেই প্রথমে পশুদের খাদ্যের জন্য এবং পরে মানুষের খাদ্যের জন্যও খাদ্যশস্যের চাষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বর্বর যুগের উচ্চস্তরে এসেই সর্বপ্রথম গরু-মহিষ চালিত লোহার ফলকযুক্ত লাঙ্গলের চাষ দেখতে পাওয়া যায়। এর পর শুরু হয় সভ্যযুগ। এই যুগে মানুষ নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক সম্পদ আরও বাড়াতে শেখে এবং শিল্প ও কলাবিদ্যা আয়ত্ত করে।

এখন দেখা দরকার সমাজের এই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবারপ্রথা কি ভাবে পরিণতি লাভ করেছে। তাহলেই নর-নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধের বিকাশের ধারাটি এবং বিশেষত নর-নারীর মধ্যে যৌনসম্পর্কের ধারাটি আমরা স্পষ্ট করে বুঝতে পারব। মর্গান বলেন : 'পরিবার জিনিসটার মধ্যে একটা সচল নীতি আছে। পরিবারপ্রথা কখনও একই রকম নিশ্চল অবস্থায় থাকে না। সমাজের অবস্থা যেমন—নিচের স্তর থেকে প্রগতির উঁচু স্তরের দিকে এগোয়, পরিবার প্রথাও তার সঙ্গে সঙ্গে নিচের স্তর থেকে ক্রমশ উঁচু স্তরের দিকে এগোয়....'। ('The family,' say Morgan, 'represents an active principle. It is never stationary, but advances from a lower to a higher from as society advances from a lower to a higher condition.)'[৭]

মানুষ যখন আদিমযুগে পশুর পর্যায় থেকে মানুষের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে তখনই ব্যক্তিগতভাবে তাদের আত্মরক্ষার শক্তির অভাব দেখা দিল। সেইজন্য তারা যুথবদ্ধভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকতে শুরু করল। এই সময় নর-নারীর মধ্যে অবাধ যৌনসংসর্গ প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ মানবসমাজে এমন একটা আদিম অবস্থা ছিল যখন এক একটা গোষ্ঠীর মধ্যে অবাধ যৌনসঙ্গম চলত। যেখানে প্রত্যেক পুরুষেরই প্রত্যেক নারীর ওপর যেমন সমান অধিকার ছিল, তেমনি প্রত্যেক নারীরও প্রত্যেক পুরুষের ওপর সমান অধিকার ছিল।

মানবসমাজের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, আদিম মনুষ্য পরিবারগুলির মধ্যে যৌথ বিবাহ প্রথা বা 'গ্রুপ ম্যারেজ' প্রচলিত ছিল। এই ধরনের বিবাহ প্রথায় এক দলের সমস্ত পুরুষ আর সমস্ত নারীর মধ্যে সবার সঙ্গেই সবার স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ছিল। এই ধরনের পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হিংসা ছিল না। পরবর্তী কোনো এক সময়ে এক রকম পরিবারও দেখা গেছে যখন এক নারীর বহু স্বামী থাকত। তখন তো হিংসার কথা ওঠেই না। আদিমযুগের নর-নারীর মধ্যে অবাধ সহজ সরল যৌনসম্পর্ক ছিল। পরে যৌথ বিবাহ প্রথাগুলির মধ্যে ক্রমশ নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে থাকল।

আদিমযুগের নর-নারীর মধ্যে অবাধ যৌনসম্পর্কের সময়ে গোটা উপজাতি জুড়েই ছিল তাদের পরিবার। তারপর ক্রমশ সেই পরিবারের পরিধি সংকুচিত হতে থাকল। যৌন সম্পর্কের আওতা থেকে ক্রমশ জ্ঞাতিগোষ্ঠী, আত্মীয়স্বজনদের বাদ দিতে দিতে একটা সময় এল যখন প্রকৃতপক্ষে দলগত বা যৌথ বিবাহপ্রথা (Group marriage) লোপ পেয়ে গেল। অবশেষে মাত্র এক জোড়া নর-নারীর মধ্যে যৌনসম্পর্কের পরিধি বেঁধে দেওয়া হল। জোড় পরিবার বা 'পেয়ারিং ফ্যামিলি' (Pairing family) প্রথা প্রবর্তিত হল। পরিবার প্রথার গোড়ার দিকে পুরুষের পক্ষে নারী দুর্লভ ছিল না, বরং তারা অনেক সংখ্যক নারীকে পেতে পারত। কিন্তু তারপর নারীর প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। তাই জোড় পরিবারপ্রথার সময় থেকেই

নারীহরণ, নারীবিক্রয় প্রভৃতি দেখা যায়। মনে রাখা দরকার যে, এই জোড় পরিবারব্যবস্থার মধ্যে বা পরবর্তীকালে একবিবাহ প্রথার উৎপত্তির মধ্যে যাকে বলা হয় ব্যক্তিগত বা স্বাধীন প্রেম তার সম্পর্ক খুবই কম। আর জোড় পরিবার জিনিসটাই ছিল এত দুর্বল ও অস্থায়ী যে তখন স্বতন্ত্রভাবে সংসার পাতার প্রয়োজনও বোঝা যায়নি। কাজেই এই প্রথা মোটেই আগেকার যৌথ পরিবারপ্রথাকে বিলোপ করতে পারেনি। আর যৌথ পরিবারের মধ্যে ছিল নারীর প্রাধান্য। কারণ সেখানে মায়ের নামেই সন্তানকে পরিচিত হতে হত। এক নারীর বহু স্বামী থাকার দরুন কে যে সন্তানের পিতা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হত না। কিন্তু মাকে চিনতে কোনোমতেই ভুল হত না। উক্ত পরিবারগুলির মধ্যে নারীর প্রাধান্য ছিল। সমাজের উৎপাদনের কাজেও নারীর কর্তৃত্ব ছিল। এমনকি উত্তরাধিকার বিধিগুলিও তাই মাতৃবিধি অনুযায়ী স্থির হয়েছিল।

সুতরাং আধুনিক সভ্যসমাজে যে একটা ধারণা আছে যে, নারীজাতি দুর্বল বলে চিরদিনই তারা পুরুষের পরাধীন ছিল এবং থাকবে, সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইতিহাসই তার প্রমাণ দেয়। সমাজের অ-সভ্য যুগের সমস্ত স্তরে, এবং বর্বর যুগের নিম্ন ও মধ্যস্তরে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের মধ্যেও নারীদের স্বাধীনতা তো ছিলই বরং সমাজে তাদের উচ্চ সম্মানের স্থান ছিল। যৌথ পরিবারগুলির অধিকাংশ অথবা সমস্ত নারীই একটি মাত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকত, আর পুরুষরা আসত নানা গোষ্ঠী থেকে। এই হল নারীর প্রাধান্যের বাস্তব ভিত্তি। একই গোষ্ঠীতে স্থায়ী থাকত বলে নারীদের হাতেই পরিবারের কর্তৃত্ব এবং উৎপাদনের কর্তৃত্বও থাকত। আর অ-সভ্য ও বর্বর যুগে তাই নারীদের ওপর কাজের চাপও থাকত অনেক বেশি। তখন নারীর সম্মানও ছিল বেশি। এখন স্পষ্টই দেখা যায় যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ নারীর সামাজিক মর্যাদা অনুসারে হয়নি। আর সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক সমাজে যে ধারণা প্রচলিত আছে যে, কায়িক শ্রম যারা করে তাদের সামাজিক মর্যাদা কম, সে ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। বুর্জোয়া সমাজের অভিজাত শ্রেণির নারীরা যারা কোনো কাজই করে না, তাদেরই সবচেয়ে সামাজিক মর্যাদা বেশি বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। ধনিক-জমিদার রাজা রাজড়াদের পরিবারের নারীরা দাসদাসী পরিবৃত হয়ে থাকে। ঘর সংসারের কাজও করে না। সামাজিক উৎপাদনের কাজেও তাদের কোনো ভূমিকা নেই। প্রকৃতপক্ষে তারা একরকমের পরগাছার জীবন যাপন করে। আর তাদেরই নাকি সম্মান বেশি! এঁরাই হলেন সভ্যসমাজের 'লেডি' বা 'ভদ্রমহিলাগণ'! এঁরাই ভুলে থাকেন পুরুষের মিথ্যে স্তব স্তুতিতে, আর প্রকৃতপক্ষে নিজেরা হয়ে থাকেন পুরুষের হাতের পুতুল, তাদের ভোগ বিলাসের সম্পত্তিমাত্র। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা কিন্তু বর্বর যুগের কঠোর পরিশ্রমী নারীদের চেয়ে সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক হীন অবস্থায় থাকে। 'বর্বর যুগের লোকেরা তাদের নারীদের প্রকৃতই 'লেডি' বা কর্ত্রী মনে করত এবং মর্যাদার দিক থেকেও তাঁরা ছিল তার উপযুক্ত' ('The social status of the lady of civilization, surrounded by sham homage and estranged from all real work is socially infinitely lower than that of the hard working woman of barbarism, who was regarded among her people as a real lady (lady, frawa, Frau-mistress (Herein) and was such by the nature of her position')[৮]

বর্বর যুগের পর সভ্য যুগ (civilisation)। যুগের বৈশিষ্ট্য হল একনিষ্ঠ বিবাহ বা মনোগমি (monogamy)। তাহলে দেখা গেল যে, সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে মানুষের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক এবং নর-নারীর যৌনসম্পর্কের রূপ বিভিন্ন রকমের হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে একেবারে আদিম অবস্থায় ছিল নর-নারীর মধ্যে অবাধ যৌনসম্পর্ক। অ-সভ্য (savagery) যুগে ছিল যৌথ বিবাহ (Group marriage)। বর্বর যুগে (Barbarism) ছিল জোড় পরিবার (Pairing family) এবং সভ্যযুগে (civilization) হল একনিষ্ঠ বিবাহ (monogamy)।

এখন দেখা যাক অবাধ যৌনসংসর্গের অবস্থা থেকে ক্রমশ এই এক বিবাহ বা 'মনোগমি' প্রথার প্রবর্তন কিভাবে হল। একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, আগে মানুষ বড় অসভ্য ছিল, তাই তারা অনেক বিয়ে করত; আর এখন মানুষ সভ্য ভদ্র হয়েছে তাই তারা একবিবাহ করে। ব্যাপারটা অত সহজ নয়। একবিবাহ প্রথার মধ্যে মানবসভ্যতার অগ্রগতির সূচনা নিঃসন্দেহেই আছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, নর-নারীর মধ্যে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই একবিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। নারীজাতির বশ্যতার, অবমাননার একটা চরম অবস্থার প্রকাশই এই একবিবাহরে সূচনার মধ্যে দেখা যায়। আগেই বলেছি যে, সমাজে নারীর স্থান কিভাবে ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে তা বুঝতে হলে আমাদের 'ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের' বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই বুঝতে হবে। সমাজের প্রতিটি স্তরই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করছে। নর-নারীর যৌনসম্পর্ক বা বিবাহপ্রথারও কোনো না কোনো দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে রূপান্তর হচ্ছে।

জননীবিধির অবসানের পর সমাজে যে পুরুষের একাধিপত্য স্থাপিত হল, তারই ফল দেখা গেল পুরুষপ্রধান পরিবারগুলির মধ্যে। আর প্রথম থেকেই চাষ-আবাদের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবারপ্রথা যুক্ত রয়েছে। পরবর্তী যুগে সমাজে ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্ত বিরোধ ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে, সেগুলি সবই প্রাথমিক আকারে এই সব পরিবারগুলির মধ্যে দেখা গেছে। জননীবিধির অবসানের পর পুরুষশাসিত পরিবারব্যবস্থার সময় থেকে আমরা লিখিত ইতিহাসের যুগে প্রবেশ করি। বর্বরযুগের মধ্যস্তর থেকে উচ্চস্তরে পৌঁছাবার সময় থেকেই একবিবাহ প্রথার প্রবর্তন হল। বর্বর যুগের জোড় পরিবারে একটা নতুন জিনিস দেখা গেল। যেহেতু একই সময়ে একজোড়া নর-নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক ছিল, সেই হেতু সন্তানের স্বাভাবিক মাতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক পিতারও পরিচয় পাওয়া যেত। (বলা বাহুল্য এই জোড় পরিবারের বন্ধন খুবই শিথিল ছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ অনায়াসেই হতে পারত।) পরিবারের মধ্যে শ্রমবিভাগ অনুযায়ী পুরুষ খাবারদাবারের জোগাড় করত ও তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জোগাড় করত। আর সেই সব যন্ত্রপাতির ওপর পুরুষের মালিকানা থাকত। নারীর অধিকার ছিল ঘরকন্নার জিনিসের ওপর। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে পুরুষ সেই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে যেত, আর নারী তার ঘরকন্নার জিনিসপত্র রেখে দিত। সেই যুগের আহার্য সংগ্রহের নতুন উপায়, পশুদের ওপর এবং শ্রমশক্তির নতুন উপায় ক্রীতদাসদের ওপরও পুরুষের মালিকানা ছিল। কিন্তু উত্তরাধিকারের নিয়ম জননীবিধি অনুসারে থাকার জন্য সন্তান তার পিতার সম্পত্তি পেত না। মৃত ব্যক্তির গোষ্ঠীর লোকরাই তা পেত।

আর তার সন্তানরা ছিল তাদের মাতৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এইখানেই দ্বন্দ্ব দেখা দিল। নানা দিক থেকে সমাজে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সমাজে ধনসম্পদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের মর্যাদা বাড়তে থাকল, আর তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের সম্পত্তি লাভ করতে পারে, এই জন্য প্রয়োজন হল উত্তরাধিকারপ্রথা পরিবর্তন করবার। জনকবিধি প্রবর্তনের মধ্যদিয়ে তখন সমাজে আবার একটা নতুন শৃঙ্খলা আনা হল। মার্কসও বলেছেন : 'মোটামুটিভাবে এই পরিবর্তনই স্বাভাবিক ছিল বলে মনে হয়।' ('This appears altogether to be the most natural transition')[১] সুতরাং জননীবিধির অবসানের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ এঙ্গেলস্ যাকে বলেছেন নারীজাতির বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়' (World historic defeat of the female sex')-এর মধ্য দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন হল। একটা দ্বন্দ্বের অবসানের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। কিন্তু নারী-পুরুষের মধ্যে প্রভু ও ক্রীতদাসীর সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় আবার একটা নূতন দ্বন্দ্ব দেখা দিল। পুরুষ যখন সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার এবং পরিবারের কর্তৃত্ব পেল তখন ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন হল তার নারীর ওপর পুরোপুরি অধিকারের। জোড় পরিবারের বিবাহবন্ধন অনেকটা শিথিল ছিল। নারী বা পুরুষ যখন ইচ্ছা বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করতে পারত। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পিতৃবিধি প্রবর্তিত হবার পর সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে থাকল। তারপরই প্রয়োজন হয়ে পড়ল সন্তানের পিতৃত্ব যাতে অবিসংবাদিত হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন হয়ে পড়ল নারীর, যৌনসংসর্গের বেলায় কড়াকড়ি নিয়ম করার, নারী যাতে একজন পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক না রাখতে পারে। এর থেকেই একবিবাহপ্রথা বা মনোগমির উৎপত্তি হল। এখন নিয়ম হল এই যে, কেবলমাত্র পুরুষই ইচ্ছে করলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করতে পারে, স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে। পুরুষের বেলায় স্ত্রী ছাড়া অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও সমাজের চোখে তা কিছু দোষের নয়। পুরুষ দাম্পত্যজীবনে ব্যভিচার যত ইচ্ছা করতে পারে, কিন্তু নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ করা বা স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক রাখা কোনোমতেই চলবে না। এরই নাম তথাকথিত একবিবাহ বা একনিষ্ঠ বিবাহ (monogamy)। অর্থাৎ একবিবাহ ব্যাপারটা কার্যত শুধু নারীর বেলায় প্রয়োজ্য হল, পুরুষের বেলায় নয়। নারীর গোলামি, পুরুষের কাছে তার বশ্যতা, পরাধীনতার একটা চরম প্রকাশই হল একবিবাহ প্রথার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন যুগের সব চেয়ে সভ্য ও উন্নত জাতিগুলির ইতিহাস থেকেই একবিবাহপ্রথা প্রবর্তনের বিষয়ে এই বাস্তব সত্য দেখা যায়। অর্থাৎ মানবসমাজে একবিবাহ প্রথাটা যে ব্যক্তিগত আবেগ, প্রেম ভালবাসার ফল তা মোটেই নয়। সম্পত্তির ওপর পুরুষের ব্যক্তিগত অধিকার, নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্যের রূপ হিসেবে একবিবাহপ্রথা দেখা দিয়েছে। এই প্রথা নর-নারীর ব্যক্তিগত অনুরাগ ও মিলনের আকাঙ্ক্ষার ফল নয় বরং একবিবাহপ্রথা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের ঘোষণা করে, যে দ্বন্দ্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগে—যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাপ্রথা ছিল না—তখন ছিল না। কিন্তু এই একবিবাহপ্রথার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে আবার সমাজের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় ও সভ্যযুগের সূচনা হয়। বলা বাহুল্য যে, একবিবাহপ্রথাই সবচেয়ে উন্নত বিবাহপ্রথা—কিন্তু তা প্রকৃতই একবিবাহপ্রথা হওয়া চাই। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া চাই। নারী-পুরুষের সম্পূর্ণ

সমান অধিকারের ওপরে ভিত্তি করে যে এক বিবাহ্ প্রথা কেবল মাত্র তার মধ্য দিয়েই নর-নারীর দাম্পত্যজীবন উন্নত স্তরে উঠতে পারে। কিন্তু এই প্রথার সূচনায় তা হয়নি। নারী জাতিকে দমন করবার জন্য তাদের ওপর পুরুষের প্রাধান্যকে সম্পূর্ণ করবার জন্যই এই 'একপেশে' একবিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। এই বিষয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন : 'একবিবাহ প্রথা... এই প্রথার চরম সফলতা সভ্যযুগের সূচনায় অন্যতম লক্ষণ বিশেষ।... পুরুষের প্রাধান্য এই প্রথার ভিত্তি। এই প্রথা ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের ফলে হয়নি। আর ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের সঙ্গে এর একেবারেই কোন সম্বন্ধ নেই, কারণ বিবাহপ্রথা ব্যাপারটা আগের মত এখনও সুবিধা অনুযায়ীই নির্ধারিত হল। সুতরাং ইতিহাসে একবিবাহ্ প্রথা ব্যাপারটা স্ত্রী-পুরুষের সম্প্রীতির মধ্য থেকে উদ্ভুত হয়নি, আর স্ত্রী ও পুরুষের সম্প্রীতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিসেবেও একবিবাহপ্রথাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। অপরপক্ষে নারীর ওপর পুরুষের প্রাধান্যের রূপ হিসাবেই এই প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই একবিবাহ্ প্রথার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ঘোষণাই দেখতে পাওয়া যায়—যে দ্বন্দ্ব কিনা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।' ('The Monogamian Family. ...its final victory being one of the signs of the beginning of civilization;... It is based on the supremacy of man;... It was not in any way the fruit of individual sex love. With which it had absolutely nothing in common, for the marriages remained marriages of convenience, as before. Thus monogamy does not by any means make its appearance in history as the reconciliation of man and woman, still less as the highest form of such a reconciliation. On the contrary it appears as the subjection of one sex by the other, as the proclamation of a confict between sexs entirely unknown hitherto in prehistoric times')[১০]

তারপর এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সমাজে যে সময়ে শ্রেণিদ্বন্দ্ব এবং শ্রেণিশোষণ শুরু হল, ঠিক সেই সময় থেকেই একবিবাহপ্রথা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে নর-নারীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বও শুরু হল, আর পুরুষের দ্বারা নারীর শোষণও শুরু হল। অর্থাৎ শ্রেণিসমাজের উদ্ভব ও শ্রেণিশোষণের সঙ্গে নারীজাতির বশ্যতা ও তাদের ওপর শোষণ নিপীড়নের সম্বন্ধ ঐতিহাসিকভাবেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে। এই সূত্র থেকেই মার্কসবাদী তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী নারীজাতির মুক্তির এই পথ নির্দেশ পাওয়া যায় যে, সমাজে শ্রেণি শোষণের অবসান না হলে নারী সমাজের পূর্ণমুক্তি কখনই সম্ভব নয়। সামন্ততান্ত্রিক—ধনতান্ত্রিক শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নারীজাতির প্রতি সামাজিক শোষণের অবসান কখনই হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণিশোষণের মূলত অবসান হয়ে যায়। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা (যে সমাজকে কমিউনিস্ট সমাজেরই প্রথম স্তর বলা হয়েছে) হলে তবেই নারী-সমাজের পূর্ণমুক্তি সম্ভব। আর ঠিক এইখানেই শোষিত সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির সঙ্গে শোষিত নারীজাতির মুক্তির অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ।

এঙ্গেলস একবিবাহপ্রথা সম্বন্ধে লিকেছেন : '১৮৪৬ সালে আমার ও মার্কস এর লেখা একটি পুরনা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল : নারী ও পুরুষের মধ্যে সন্তান জননের ক্ষেত্রে যে শ্রমবিভাগ হয় সেই হল সর্বপ্রথম শ্রমবিভাগ, তার সঙ্গে এখন আরো এই কথা

যোগ করতে পারি যে, এক বিবাহ প্রথার মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও ইতিহাসে শ্রেণি দ্বন্দ্ব ঠিক একই সময়ে দেখা দেয় আর এক শ্রেণির দ্বারা এক শ্রেণির শোষণ এবং পুরুষের দ্বারা নারীর শোষণও ঠিক ঐ একই সময়ে দেখা দেয়। একবিবাহপ্রথা ও একই সময়ে দাসত্ব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা যুগের সূচনা হয় যে যুগ আরও পর্যন্ত চলেছে, যখন কিনা প্রত্যেকটি অগ্রগতিই আপেক্ষিকভাবে আর একটি পশ্চাৎগতির সূচনা করে। একটি দলের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত অন্য একটি দলের দুঃখ কষ্ট ও নিগ্রহের ভিতর দিয়ে। সভ্য সমাজের এই হয়, প্রাথমিক স্তরে এমন সব বিরোধ ও দ্বন্দ্বের রূপ দেখতে পাওয়া যায় যা কিনা পরবর্তী যুগে পুরোপুরিভাবে বিকাশ লাভ করেছে।' ('In an old, unpublished manuscript, the work of Marx and myself in 1846 I find the following : 'The first division of labour is that between man and woman for child breeding.' And today I can add : The first class antagonism which appears in history coincides with the development of the antagonism between man and woman in monogamain marriage, and the first class oppression with that of the female sex by the male. Monogamy was a great historical advance. But at the same time it inaugurated, along with slavery and private wealth that epoch, lasting until today, which every advance is likewise a relative regression in which the well-being and development of the one group are attained by the misery and repression of the other. It is the cellular from of civilized society, in which we can already study the nature of the antagonism and contradictions which develop fully in the later.')[১১]

এখন দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দাসত্বের সঙ্গে সঙ্গে যে শ্রেণিসমাজের দ্বন্দ্ব শুরু হল, তা ক্রমশ পরবর্তী যুগে আরো একটি ভাবে প্রকাশ পেতে থাকল। আর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, যতদিন পর্যন্ত এমন কিছু নতুন ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না যা কিনা সব দিক থেকেই ভাল। একটা ভাল করতে গেলে তার পরিপূরক হিসেবে আর একটা মন্দ এসে হাজির হচ্ছে। একবিবাহপ্রথার মধ্য দিয়ে যেটুকু অগ্রগতি হল, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার পশ্চাৎ গতিও হল। সমাজে একটা আপাতশৃঙ্খলা এল বটে কিন্তু শুরু হল নারী সমাজের হীন দাসত্ব। একবিবাহপ্রথার ফাঁক দিয়ে সমাজে পতিতাবৃত্তির প্রসার হতে থাকল। একদিকে একবিবাহপ্রথা (monogamy), অন্যদিকে হেতেরেপ্রথা (hataerism), আর তারই চরমরূপ পতিতাবৃত্তির প্রসারের মধ্য দিয়ে আবার নূতন একটা দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠল। স্ত্রীর উপপতি এবং ব্যভিচারী স্বামী—এ দু'টি জিনিসই একবিবাহপ্রথার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে স্থায়ী হয়ে উঠল। পুরুষের প্রভুত্বে নিয়ন্ত্রিত এই একবিবাহপ্রথার মধ্যে নারীর ওপর কড়াকড়ি নিয়মকানুন, দমন পীড়ন সবই চলল, কিন্তু নরনারীর মধ্যে উচ্চস্তরের দাম্পত্যপ্রেম বিকশিত হবার সুযোগ বিশেষ রইল না। পুরুষ হল সর্বময় কর্তা, আর নারী হল তার শ্রীচরণের দাসী, তার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ তার সর্বমুখী পরাধীনতা সম্পূর্ণ হল। ফলে ক্রমশ তার মানসিক প্রস্তুতিও সেইমত দাসীসুলভভাবে গড়ে উঠতে থাকল, আর পুরুষের মানসিক প্রস্তুতি হতে থাকল প্রভু হিসাবে। বলা বাহুল্য এই প্রভু ও দাস সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কখনও স্বাধীন মুক্ত সুন্দর দাম্পত্যপ্রেম গড়ে উঠতে

পারে না। একমাত্র পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র স্বার্থশূন্য সমানাধিকারের ভিত্তিতে, মুক্ত চেতনার আলোকেই গড়ে উঠতে পারে নর-নারীর মধ্যে সেই উচ্চস্তরের দাম্পত্যপ্রেম।

সমাজে ধনসম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানাব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ হল, তখনই জোড় পরিবার (pairing family) প্রথার থেকে একবিবাহমূলক (monogamy) পরিবারপ্রথা প্রবর্তিত হল। জোড় পরিবারব্যবস্থার সময় একটি যৌথ পরিবারের মধ্যে অনেকগুলি পরিবার থাকত। তার মধ্যে আবার কোনো কোনো গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকত। সাধারণত মেয়েরাই পরিবারের কর্তৃত্ব করত। খাওয়াদাওয়ার জিনিসপত্র সব একসঙ্গেই থাকত। পরিবারের মধ্যে মেয়েদের কাজকর্মের তখন সামাজিক মূল্য ছিল। নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ হিসাবে নারী ঘরকন্নার কাজ করত। জোড় পরিবার থেকে একবিবাহমূলক পরিবারপ্রথার প্রবর্তন হল। তখন যৌথ পরিবারের বদলে ব্যক্তিগত পরিবারপ্রথা প্রবর্তিত হল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, একবিবাহপ্রথা, ব্যক্তিগত পরিবারপ্রথা—এগুলি সবই পরস্পরের পরিপূরক। সুতরাং একবিবাহপ্রথার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ব্যক্তিগত পরিবারপ্রথার প্রবর্তন হল এবং সেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলিই সমাজের অর্থনৈতিক অনুকেন্দ্র বা 'economic unit of society' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল। আর এইসব ব্যক্তিগত পরিবারের মধ্যে নারীরা যখন পুরুষের অধীনে ঘরকন্নার কাজে রত হল, তখন তাদের সেই ঘরকন্নার কাজের আর কোনো সামাজিক মূল্য বা মর্যাদা রইল না। এই কাজ তখন পুরুষের কাছে নারীর দাসত্বের কাজে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এর কোনো অর্থকরী মূল্য রইল না বা সামাজিক শ্রমবিভাগের আওতার মধ্যেও পড়ল না। ঘরকন্নার কাজগুলি ব্যক্তিগত দাসত্বের কাজ হয়ে গেল। নারীর পক্ষেও যেমন পরাধীন দাসত্বের জীবন শুরু হল, পুরুষের পক্ষেও তেমন একদিক থেকে প্রভুত্ব করা, আবার অন্য দিক থেকে গোটা পরিবারের ভরণপোষণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও এসে পড়ল। সামাজিক উৎপাদনের কাজ থেকে নারীসমাজকে সরিয়ে দেওয়া হল। রান্নাঘর আর আঁতুরঘরের একঘেয়ে দাসত্বের জীবন শুরু হল তাদের। তারপর ক্রমশ নারীসমাজ বঞ্চিত হতে থাকল বাইরের জগতের আলো থেকে—শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানসিক চিন্তাধারার বিকাশের সব সুযোগ থেকে। ক্রমশ নারী-পুরুষের এই প্রভু-দাস সম্বন্ধের ওপর গড়ে উঠতে থাকল শ্রেণি বিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণির অনুকূলে ভাবনা চিন্তা, জীবন দর্শন। নারীর তথাকথিত 'আত্মনিগ্রহ', 'আত্মত্যাগ', 'সতীত্ব' ইত্যাদির ওপর নানারকম 'মহিমা'ও আরোপিত হতে থাকল। ক্রমশ নারী নিজেকে পরাধীন দাসী ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, এমন কি তাতে সে 'গৌরব'ও বোধ করতে থাকল। আর আগেই বলা হয়েছে যে, ঠিক এই সময় থেকেই সমাজের মানুষের মধ্যে প্রভু-দাস শোষক-শোষিতের শ্রেণিভেদ হল। সুতরাং পুরুষের কাছে নারীর দাসত্ব, আর বিত্তবান প্রভুদের কাছে বিত্তহীন শোষিত মানুষের দাসত্ব একই সময় শুরু হল। তখন মানুষের মানবিক মূল্যবোধ : ধ্যান ধারণা সবই তদনুরূপে বদলাতে থাকল। এইভাবেই সমাজের মূল অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বদলে গেল তার উপরিকাঠামো। শ্রেণি বিভক্ত সমাজের ধ্যান-ধারণা, আবেগ অনুভূতি, আশাআকাঙ্খা সব কিছুই শোষক হয়ে থাকে। 'একথা কি বুঝতে অসুবিধা হয় যে, মানুষের ধ্যান-ধারণা, এক কথায় মানুষের চেতনা তার বাস্তব অস্তিত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তার সামাজিক সম্বন্ধ এবং সামাজিক জীবনের

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়? মানুষের ধ্যান-ধারণার ইতিহাস এ ছাড়া আর কি প্রমাণ করে যে, বস্তু জগতের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা জগতের সৃষ্টির পরিবর্তন হয়? প্রত্যেক যুগের মুখ্য ধ্যান-ধারণাই হল সেই যুগের শাসকশ্রেণির ধ্যান-ধারণা ('Does it require deep intution to comprehend that man's ideas, views and conceptions in one word, man's consciousness, changes with every change in the conditions of his material existence, in his social relations and in his social life? What else does the history of ideas prove, than that intellectual production changes its chareter in proportion as material production is changed? The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class')[১২]

মানবসমাজে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণিশোষণের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সামাজিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপের শোষণ চলে আসছে। আর এই শ্রেণি দ্বন্দ্বের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই শাসক শ্রেণি তার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণিকে দাবিয়ে রাখে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে রাষ্ট্রব্যবস্থাও তাই শাসকশ্রেণির স্বার্থেই কাজ করে আসছে। সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রেণিবিভক্ত সমাজের রাষ্ট্রব্যবস্থাও স্বভাবতই পরাধীন শোষিত নারী সমাজের মুক্তির অনুকূলে না হয়ে তাদের ওপর শোষণ ব্যবস্থা চাপিয়ে রাখার ব্যবস্থার অনুকূলেই হয়ে এসেছে। সমাজে শ্রেণিশোষণের বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে—দাসত্ব (slavery), ভূমি দাসত্ব (serfdom) এবং পুঁজিতন্ত্রে মজুরের দাসত্বের (Wage labour) অবস্থায় নারীরাও বিভিন্নরূপে শোষিত হয়ে এসেছে। দাসত্ব বা 'slavery'-ই হল শোষণের প্রথম রূপ। ভূমিহীন পরাজিত মানুষের দলকে ভূমির এবং অন্যান্য সম্পত্তির মালিকরা দাস করে রাখতে শুরু করল। তারপর ক্রমে মানুষ পর্যন্ত বাজারের পণ্যে পরিণত হল। মধ্যযুগে শোষিত মানুষের দাসত্ব ভূমিদাসত্বের রূপে দেখা ছিল। তারপর আধুনিক যুগে শুরু হল মজুরের শোষণ। সভ্যযুগের শোষণের এই বিভিন্ন স্তরে শোষিত শ্রেণির সঙ্গে সঙ্গে নারী-সমাজও শোষিত হয়ে আসছে বিভিন্নরূপে। 'সভ্যযুগে দেখা দিল একবিবাহমূলক পরিবার প্রথা, নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব, এবং সমাজের অর্থনৈতিক অনুকেন্দ্র হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবারগুলি। শোষিতদের দমন করে রাখবার জন্য হল রাষ্ট্রশক্তি, যে শক্তি কিনা সর্বদাই শাসকশ্রেণির স্বার্থে কাজ করে এবং নিপীড়িত শোষিতদের দমন করে রাখবার কাজে লাগে।' ('The form of the family corresponding to civilization and under it becoming the definitely prevailing form is monogamy, the supremacy of the man over the woman, and the individual family as the economic unit of society. The cohesive force of civilized society is the state, which in all typical periods is exclusively the state of the ruling class, and in all cases remains essentially a machine for keeping down the oppressed, the exploited class')[১৩]

এরপর আমরা আধুনিক যুগে অর্থাৎ ধনতন্ত্রের যুগে এসে নারী সমাজের অবস্থার একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখতে পাই। আধুনিক বড় বড় কলকারখানা খোলার পর (বিশেষ করে ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবের পর) দেখা গেছে যে, নারী সমাজের একটা বড় অংশ (প্রধানত গরিবদের মধ্য থেকেই) সেই কলকারখানায় কাজ শুরু করেছে। এই সময় থেকেই মেয়েদের

আবার সামাজিক উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করবার পথ খুলে গেল। নারীর সামাজিক মুক্তির পথের ইঙ্গিত দেখা গেল। ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রধানত কেবল সর্বহারা শ্রেণির নারীরাই কলকারখানায় কাজ শুরু করল, তবুও নারীসমাজের অন্তত একটা বড় অংশও শুধুমাত্র পারিবারিক দাসত্বের আওতা থেকে বেরিয়ে এল। তাদের কাজের সামাজিক মূল্য স্বীকৃত হল। তারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে পা বাড়াল। কিন্তু এখানেও আবার নতুন দ্বন্দ্ব দেখা দিল। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা একদিক থেকে যেমন নারীসমাজের একাংশকে সামাজিক উৎপাদনের কাজে ফিরিয়ে এনে তাদের মুক্তির পথ খুলে দিল, অন্যদিক থেকে আবার সেই শ্রমিক শ্রেণির পরিবারগুলিকে প্রকৃত পক্ষে ভেঙ্গে দিল। কারণ শ্রমিক পরিবারের মেয়েরা যখন কারখানার কাজে যোগ দিতে থাকল, তখন তাদের ঘরকন্না ও সন্তানদের দেখাশুনা করার কোনো ব্যবস্থা রইল না। নারী ও শিশু শ্রমিকদের অনেক কম মজুরি দিয়ে পাওয়া গেল। সেই জন্য নারী ও শিশুদের ওপর অমানুষিক শোষণ শুরু হল। কালমার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এ এ বিষয়ে বিশেষভাবে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে 'ইংলন্ডে অনেক সময় নৌকো টানবার কাজে ঘোড়ার বদলে নারীদের ব্যবহার করা হত, কারণ ঘোড়া ও মেশিনের দামের তবু একটা মান আছে কিন্তু উদ্বৃত্ত মানুষদের মধ্যে নারীদের পাওয়া যেত একেবারেই সস্তায়' ('In England women are still occasionally used instead of horses for hauling canal boats, because the labour required to produce horses and machines is an accurately known quantity, while that required to maintain the women of the surplus population is below all calculation')[১৪] মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শ্রমিক নারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও কী অমানুযিকভাবে শোষণ করা হয়েছে। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, এইভাবে কলকারখানার কাজে নারী ও শিশু শ্রমের শোষণ শুরু হওয়ায় গতানুগতিক পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে গেল। ('The force of facts, however, compelled it at last to acknowledge that modern industry, in overturning the economic foundation on which was based the traditional family, and the family labour corresponding to it, had also unloosened all traditional family ties')[১৫]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইংলন্ডের শ্রমিকদের অবস্থার বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস লিখেছেন : 'স্ত্রীদের কাজে নিয়োগের ফলে স্বভাবতই পরিবারগুলি ভেঙ্গে পড়েছে। আর আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থাই হল পরিবারভিত্তিক। ফলে বাপ মা ও ছেলেমেয়েদের ওপর তার নৈতিক প্রভাবও খুবই গুরুতর হয়ে পড়েছে'। ('The employment of the wife dissolves the family utterly and of necessity, and this dissolution, in our present society, which is based upon the family, brings the most demoralising consequences for parents, as well as children...')[১৬]

কিন্তু আবার দেখা গেল যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় গরিব নারী ও শিশুদের শোষণ যতই অমানুষিক হোক না কেন, আর পূর্বের গতানুগতিক পরিবারের ভিত্তি যতই ভেঙ্গে পড়ুক না কেন, এরই মাধ্যমে আবার নারীরা শুধু ঘরকন্নার কাজের আওতা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সামাজিক উৎপাদনের কাজে এগিয়ে এল। ছেলে মেয়েরও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন উপার্জনের

কাজে এগিয়ে এল। ফলে তৈরী হল উন্নততর পরিবারের ভিত্তি, তৈরী হল নরনারীর মধ্যে উন্নততর সম্বন্ধ স্থাপনের ভিত্তি। ('However terrible and disgusting the dissolution, under the capitalist system, of the old family ties may appear, nevertheless modern industry, by assignning as it does an important part in the process of production, outside the domestic sphere, to woman to young persons, and to children of both sexes, creates a new economical foundation for a higher form of the family and of the relations between the sexes')[১৭]

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জননীবিধির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নারীর পরাধীনতার সূচনা হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, একবিবাহপ্রথা ও ব্যক্তিগত পরিবারপ্রথার মধ্য দিয়ে নারীর পরাধীনতা সম্পূর্ণ হয়। নারীকে সামাজিক উৎপাদনের কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে পারিবারিক দাসীতে পরিণত করা হয়। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, 'আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবারগুলি প্রকাশ্যেই হোক আর প্রচ্ছন্নভাবেই হোক মেয়েদের দাসত্বের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর বর্তমান সমাজটাই হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুকেন্দ্র স্বরূপ ব্যক্তিগত পরিবারের সমষ্টি..., নারীর মুক্তিলাভের প্রথম শর্তই হল এই যে, সমগ্র নারী সমাজকে আবার সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করতে হবে। আর তারই ফলে বর্তমানে যে ধরনের ব্যক্তিগত পরিবারগুলি সমাজের অর্থনৈতিক অনুকেন্দ্র হিসাবে রয়েছে সেগুলি তার পূর্বেকার বৈশিষ্ট্য হারাবে'। ('The modern individual family is based on the open or disguised domestic enslavement of the women... that the first premise for the emancipation of women is the re-introduction of the entire female sex into public industry, and that this again demands that the quality possessed by the individual family of being the economic unit of society be abolised')[১৮]

আমরা দেখতে পাই যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নবজাগরণের যুগ। দেশে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার লাভ করতে থাকল। গতানুগতিক মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অচল অনড় প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে যেতে লাগল। দেখা দিল নতুন যুক্তিবাদ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নতুন চিন্তাধারা ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি দিল। ফরাসী বিপ্লবের মতন আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সারা বিশ্বে নূতন বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিল। ক্রীতদাস প্রথা বা ভূমিদাস প্রথা সভ্যসমাজে পরিত্যক্ত হল। এ এক নতুন ধরণের মুক্তির যুগ। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধতার ওপর প্রচণ্ড আঘাত এল। ধর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ চ্যালেঞ্জ জানাল। উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের সময়ই খেটে খাওয়া শ্রমিক শ্রেণিরও এক ধরনের মুক্তি এল। তারা আর মালিকদের হাতে ক্রীতদাস বা ভূমিদাসের মত বাঁধা রইল না। তারা স্বাধীন ব্যক্তিমানুষ বলে স্বীকৃত হল। বুর্জোয়া আইনে তাদের মানুষ হিসাবে সমানাধিকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হল। কিন্তু তাতে আবার নতুন দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শ্রমিকের হাতে যেমন তার কাজ নেওয়া বা ছেড়ে দেবার অধিকার রইল, মালিকের হাতেও তেমনি অধিকার রইল শ্রমিক নিয়োগ করা না করার। অন্যায়ভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করলে সেই শ্রমিকের আইনগত আনুষ্ঠানিক অধিকার আছে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার। কিন্তু সর্বহারা শ্রমিক নিঃসম্বল, তাদের পয়সা নেই যে মালিকের সঙ্গে মামলা লড়বে।

সুতরাং 'আইনের' ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমানাধিকারের ফাঁক দিয়ে আবার ধনতান্ত্রিক পর্যায়ে নতুন রূপে শোষিত মানুষদের শোষণ নিপীড়নের পথ করে দেওয়া হল। ফলে ভূমিদাসদের যে সামান্যতম নিরাপত্তা ছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকদের তাও রইল না। শ্রমিকরা হল বাঁধাবাঁধি সমাজের দাসত্ব থেকে মুক্ত, আবার মালিকরাও তাদের দায় দায়িত্ব থেকে হল মুক্ত। এই ভাবেই শ্রেণিসমাজের এক একটা পর্যায়ে এক ধাপ অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আর এক ধাপ পশ্চাৎগতি হয়ে আসছে। সমাজে নতুন নতুন দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থাও হল এই রকম পরস্পরবিরোধী। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া আইনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সমানাধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হল, এবং বুর্জোয়ারা বলে বেড়াতে লাগল আমরা মেয়েদের মুক্তি দিয়েছি, সমানাধিকার দিয়েছি। তাদের শিক্ষার অধিকার দিয়েছি, কাজের অধিকার দিয়েছি। নারীদের সমানাধিকারের এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও নিঃসন্দেহে অনেকখানি অগ্রগতি। আর তারই ফলে আমরা দেখতে পেলাম যে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা গৃহের অভ্যন্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। শিক্ষার আলো পেতে শুরু করেছে। শুধু শ্রমিক নারীরাই নয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েরাও উপার্জনের কাজে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ সর্বস্তরের নারীসমাজেরই একটা অংশ সামাজিক উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছে। যদিও বলা বাহুল্য যে, সমগ্র নারীসমাজের অতি নগন্য অংশই ধনতান্ত্রিক সমাজে উপার্জনের সুযোগ পেয়েছে। নারীসমাজের অধিকাংশই রয়ে গেছে শুধু সেই পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর পরিবারের ঘরকন্নার কাজ নিয়ে। প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার জন্য আইনগত অধিকারগুলিরও মেয়েদের পক্ষে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হল না। এর দ্বারা নারীদের ওপর নির্মম শোষণ আরো বেশী প্রকট হয়ে পড়ল। বুর্জোয়া বিবাহ ব্যবস্থায়ও নারী পুরুষের সমান অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নেওয়া হল। স্বাধীনভাবে বিবাহে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বা প্রয়োজনবোধে বিবাহবিচ্ছেদ করার আইনগত অধিকার উভয়েরই আছে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন নারী তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক যেমন শ্রমিক ও মালিকস্বাধীন ভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে, অথচ মালিক সেই চুক্তি ভঙ্গ করলে শ্রমিকের এমন অবস্থা নেই, অর্থ নেই, যে সে তার আইনগত অধিকারকে কাজে লাগতে পারে। তেমনিই নারীরাও তাদের বাস্তব অবস্থা প্রতিকূল থাকার জন্য তাদের আনুষ্ঠানিক আইনের অধিকারগুলি কাজে লাগাতে পারে না। আর পরিবারের মধ্যে অর্থ উপার্জনের কাজটা পুরুষরাই করে বলে তাদের প্রাধান্য থেকেই যায়। এই প্রসঙ্গেই এঙ্গেলস বলেছেন : 'আজকের দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্তত বিত্তশালীদের মধ্যে পুরুষকেই রোজগার করতে হয়, আর এই কারণেই পুরুষরা স্বভাবতই পরিবারের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে থাকে। এর জন্য আর তাদের আইনগত বিশেষ সুবিধার প্রয়োজনও হয় না। পরিবারের মধ্যে পুরুষ হচ্ছে বুর্জোয়া আর তার স্ত্রী হচ্ছে সর্বহারা।' ('To day in the great majority of cases the man has to be the earner... the breadwinner of the family, at least among the propertied clasess, and this gives him a dominating position which requires no special legal privilages. In the family, he is the bourgeoise, the wife represents the proletariat.')[১৯]

তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে নারীরা যখন আইনত সমান অধিকার পেয়েও প্রকৃত পক্ষে তারা কোনো সুবিধা ভোগ করতে পারে না, তখন তাদের ওপর শোষণব্যবস্থার রূপ আরো তীব্র হয়ে ফুটে ওঠে। এইভাবেই বাস্তবক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের শঠতা ধরা পড়ে। তারা মুখে এক কথা বলে আর কাজের বেলায় হয় অন্য রকম। বুর্জোয়ারা এইভাবেই গর্ব করে থাকে তাদের আইন কানুনের, গর্ব করে থাকে তাদের পারিবারিক ব্যবস্থার ও সমাজব্যবস্থার। বুর্জোয়ারা কমিউনিষ্টদের ওপর দোষারোপ করে বলে থাকে যে, তারা নাকি পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে দিয়ে মেয়েদের ঘরছাড়া করবার মন্ত্র দিয়ে থাকে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক উল্টো। পুঁজির রাজত্বে মানুষকে পণ্যে পরিণত করে। মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান গরিমা সব কিছুকেই পণ্যে পরিণত করে। সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে পরিণত করে নিছক টাকা আনার সম্পর্কে। ঠিক তেমনিই বুর্জোয়াব্যবস্থাতেই পারিবারিক স্নেহ মমতার বন্ধন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। 'তারা পারিবারিক বন্ধনকে শুধু টাকা আনার সম্বন্ধে পরিণত করেছে।' ('The bourgeois has taken away from the family its sentimental veil, and has reduced the family relation to a mere money relation.')[২০]

এই প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে আরো বলেছেন যে, বুর্জোয়ারা যখন শোনে যে কমিউনিষ্টরা সমস্ত উৎপাদনের যন্ত্রের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন বুর্জোয়ারা চিৎকার করে বলতে থাকে তোমরা কমিউনিস্টরা নারীদের সর্বজনভোগ্যাতে পরিণত করতে চাও। অর্থাৎ বুর্জোয়ারা তাদের স্ত্রীদেরও উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ বলে মনে করে। বুর্জোয়ারা শুধু নিজেদের স্ত্রীদের নিয়ে বা তাদের আওতার মধ্যেকার শ্রমিকশ্রেণির মেয়েদের নিয়ে বা বেশ্যাদের নিয়েই সুখী থাকে না, তারা পরস্পরের স্ত্রীদের সঙ্গেও বাস করে থাকে। বুর্জোয়া বিবাহটাও এই রকম একটা বাজে ব্যাপার। ('But you communists would introduce community of women, screams the whole bourgeoise in chorus... The bourgeois sees in his wife a mere instrument of production. He hears that the instruments of production are to be exploited in common, and naturally can come to no other conclusion than that the lot of being common to all will likewise fall to the women. Our bourgeois, not content with having the wives and daughters of their proletrains at their disposal, not to speak of common prostitutes, take the greatest pleasure in seducing each others wives. Bourgeois marriage is in reality a system of wives in common.')[২১]

সুতরাং দেখা গেল যে, বুর্জোয়ারা যে একবিবাহপ্রথা নিয়ে ও একবিবাহভিত্তিক ব্যক্তিগত পরিবারপ্রথা নিয়ে বড়াই করে তা কতদূর ফাঁক। আর মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এও দেখা গেল যে, মেয়েরা যতদিন না সামগ্রিকভাবে সামাজিক উৎপাদনের কাজে পুনঃপ্রবেশ করবে, ততদিন তাদের সমানাধিকারও হতে পারে না। আবার মেয়েরা বাইরের কাজে এলে ঘরকন্নার কাজ বা তাদের শিশু সন্তানদের মানুষ করবার কাজ কে করবে? এই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে, নারীরা যদি সামাজিক মূল্যহীন ঘরকন্নার দাসত্বের কাজ থেকে মুক্তি হয়ে যায় তবে ধরণের পরিবারগুলির ভিত্তিও নড়ে যায়। কারণ এই ধরণের পরিবারগুলির

ভিত্তিই হল নারীর পারিবারিক দাস শ্রমের ওপর। বর্তমান যুগের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একবিবাহ প্রথার অনেক উন্নতি হয়েছে সত্য। কিন্তু মূলত নারীর দাসত্বের অবস্থা দূর হয় নি। এই জন্যই মার্কস-এঙ্গেলস্ বলেছেন যে, পুঁজিতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে বর্তমান ধরনের একবিবাহমূলক পরিবারপ্রথার কতগুলি বৈশিষ্ট্য আর থাকবে না। অর্থাৎ নারী-পুরুষ দুজনেই যদি প্রকৃত সমানাধিকার ভোগ করে, দুজনেই সামাজিক উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করে, তাদের দাম্পত্যসম্বন্ধ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন, সমানাধিকারের ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক দাসত্বমুক্ত হয়, তবে বর্তমানে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রভু-দাস সম্বন্ধের অস্তিত্ব থাকবে না। তাহলে এর পরবর্তী যুগের পরিবারগুলি কেমন হবে? এ বিষয়ে এঙ্গেলস্ 'মর্গানের' উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন : পরিবার প্রথা ইতিমধ্যেই পরপর চারবার পরিবর্তিত হয়েছে, এখন তার পঞ্চম পর্যায় চলছে। তাহলেই প্রশ্ন আসে পরিবারের বর্তমান রূপ কেমন করেই বা স্থায়ী থাকতে পারে? সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারপ্রথারও অগ্রগতি হয়ে চলেছে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—ঠিক যেমন পূর্বেও হয়েছে। পরিবারপ্রথা সমাজব্যবস্থারই সৃষ্টি, সামাজিক সভ্যতা কৃষ্টির প্রতিফলন এই প্রথার মধ্যে পড়ে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একবিবাহমূলক পরিবারপ্রথা অনেক উন্নতিলাভ করেছে—আধুনিককালে বিশেষভাবেই উন্নতিলাভ করেছে, এবং আরও উন্নতি লাভ করতে পারে—যতদিন না নারী-পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার স্থাপিত হয়। ভবিষ্যতে যদি এক বিবাহমূলক পরিবারপ্রথা সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী না হতে পারে, তবে তখন পরিবারগুলি ঠিক কি রকম হবে আগে থেকেই তা বলা অসম্ভব। ('When the fact is accepted that the family has passed through four successive forms, and is now in a fifth, the question at once arises whether this form can be permanent in the future. The only answer that can be given is that it must advance as society advances, and change as society changes, even as it has done in the past. It is the creation of the social system, and will reflect the culture. As the monogamion family has inproved greatly since the commencement of civilization and very sensibly, in modern times, it is at least supposable that it is capable of still further improvement until the equality of the sexes is attained. Should the monogamin family in the distant future fail to answer the requirements of society, it is impossible to predict the nature of its successor')[২২]

এখন দেখা গেল যে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যসমাজে এক বিবাহের নিয়ম-কানুন প্রচলিত প্রথার যদিও অনেকখানি উন্নতি হয়েছে, তবুও নারীসমাজ মূলত পরাধীনই রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষিত শ্রমজীবী ও সর্বহারাশ্রেণির শোষণের সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের ওপর শোষণও বেড়ে চলেছে। আর শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ব্যাপক নারীসমাজ শোষিত হচ্ছে দ্বিগুণভাবে। প্রথমত তারা শোষিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বলে শোষিত পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও সমাজের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা সুখ স্বাচ্ছন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সমাজে ধনিক শ্রেণির দ্বারা শ্রমিক শ্রেণির ওপর শোষণের শিকার হচ্ছে, তারপর আবার পরিবারের মধ্যেও তারা পুরুষদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। এই ভাবে যুগ যুগ ধরে দ্বিগুণ শোষণের জাঁতাকলে

নিষ্পিষ্ট হতে হতে নারী তার নিজের স্বাধীন মুক্ত চিন্তাধারা ব্যক্তিত্ব ও নিজস্ব যোগ্যতা বিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে বহুক্ষেত্রেই প্রায় ভারবাহী জীবের মত সংসারের ঘানি টেনে যাচ্ছে। নিজেকে পুরুষের অধীন, হীনতার জীব মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নারীসমাজের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা—ধর্মীয় কুসংস্কারগুলি, বদ্ধমূল হয়ে গেছে। নারীসমাজকে দাবিয়ে রাখার পক্ষে শ্রেণিসমাজে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সেই অনুসারে গড়ে উঠেছে সভ্যতা সংস্কৃতির উপরিকাঠামো। তাই বাস্তবসমাজে নারীর অবস্থা যেমন হেয় হয়েছে, মানুষের মানসিক জগতেও তাকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই মানুষের মনে নারীজাতির ওপর করুণার উদ্রেক হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উচ্চ আসন স্থাপিত হয় নি। এ কারও ব্যক্তিগত দোষগুণের কথা নয়, বাস্তব অবস্থার প্রতিফলনেই এমনি হয়েছে। সুতরাং শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নারীপুরুষের মধ্যে যে অসাম্য যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তা যুগ যুগ ধরে পরিবারের মধ্যে সমাজের মধ্যে, মানুষের ধ্যান-ধারণা, আবেগ অনুভূতি, সভ্যতা কৃষ্টির মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেঁথে গেছে। এমনকি কাব্যে সঙ্গীতে সাহিত্যের ভাবধারায় নারীর বশ্যতা ও পুরুষের প্রাধান্যের 'মহিমা' নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই গতানুগতিক চিন্তাধারাই আবার নারীর হীন অবস্থাকে বজায় রাখার পক্ষে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজের বুর্জোয়া মধ্যে আমরা তাই দেখতে পাই যে, ওপর নারীপুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতির আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে নারী সমাজের ওপর কদর্য শোষণ-পীড়ন। একদিকে যেমন কিছু কিছু শ্রেণির নারীদের খুব 'হিরোইন' করে তুলে ধরা হয়, ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা কৃষ্টির ক্ষেত্রে কৃতী কিছু কিছু মহিলাকে দেখিয়ে বলা হয়, ঐ তো নারীসমাজ কত এগিয়ে যাচ্ছে, তারা কত স্বাধীন, কত যোগ্য, অন্যদিকে তেমনি দেখা যায় শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত ঘরের ব্যাপক নারীসমাজের মর্মান্তিক দুঃখ কষ্ট, গ্লানি ও বঞ্চনা, দেখা যায় পতিতাবৃত্তির অবাধ প্রসার। ধনতন্ত্রের আমলেই ব্যাপকভাবে নারীর পতিতাবৃত্তি দেখা দেয়। আর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার মুখে এর বিরুদ্ধে বলে, আনুষ্ঠানিকভাবে পতিতাবৃত্তির বিরোধীতা করে, কিন্তু কার্যত এই হীনব্যবসাকে সংগঠিত করার জন্যই পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণির ঐশ্বর্যের পাহাড়ের নীচে পুঞ্জীভূত হয় দারিদ্র, বেকারী, অনাহার এবং তারই ফলে চরম নৈতিক অধঃপতন ভয়ঙ্করভাবে দেখা দেয়। ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের জন্যই এরকম হয়ে থাকে। এই কথাই এঙ্গেলস্ বলেছেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, দাসত্ব ও একবিবাহপ্রথার সঙ্গে সঙ্গে এমনই একটা যুগের সূচনা হয় তখন কিনা প্রত্যেকটা অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে আর একটি পশ্চাতগতি হয়ে থাকে। এমনই সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্বের ফল। আর এই ভাবেই শ্রেণি বিভক্ত সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শোষিতশ্রেণির সঙ্গে নারীসমাজও শোষিত হয়ে আসছে বিভিন্ন রূপে। মার্কসীয় বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে এই শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিশোষণের সঙ্গে ঐতিহাসিক ভাবেই নারীর ওপর শোষণের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে, এইখানেই সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির সঙ্গে শোষিত নারীসমাজের মুক্তির প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। মার্কস এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে, পুঁজির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের মধ্যে রয়েছে শ্রেণিশোষণের অবসান আর

সেই শ্রেণিশোষণের অবসানের মধ্য দিয়েই হবে নারীসমাজের ওপর শোষণের অবসান। সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের অবসানও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলে তবেই শোষিত নারীসমাজের পূর্ণ মুক্তি সম্ভব।

শোষিত নারীসমাজের পূর্ণমুক্তির রূপ আমরা প্রথম দেখলাম রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে। লেনিন গোড়া থেকেই সর্বহারার মুক্তির সঙ্গে নারীমুক্তির প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। লেনিনের অবদান সম্বন্ধে স্তালিন বলেছেন : 'লেনিনবাদের মধ্যে আসলে মার্কসবাদই আরো সম্প্রসারিত হয়েছে... লেনিনবাদ হল সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ।' ('Leninism is the further development of Marxism ...Leninism is Marxism of the era of imperilism and of the proletarian revolution.')[২৩] লেনিনের অবদান ও শিক্ষা সম্বন্ধে স্টালিনের বিশ্লেষণের সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণই হচ্ছে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সফল বিপ্লব, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মার্কস এঙ্গেলস্ যে বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেছেন লেনিন তা প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। মার্কস এঙ্গেলস্ ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে যতদিন সমাজে শ্রেণিশোষণ বজায় থাকবে, ততদিন শোষিত নারীসমাজের মুক্তি নাই। আর শোষিত নারীসমাজের মুক্তির প্রথম শর্তই হল তাদের নিছক ঘরকন্নার কাজের পরিধির বাইরে আবার ব্যাপকভাবে সামাজিক উৎপাদনের কাজে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এই তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়েছে লেনিনের নেতৃত্বে সংগঠিত রাশিয়ার বিপ্লবের মাধ্যমে। রাশিয়ার বিপ্লব সংগঠিত করার কাজের সূচনা থেকেই তিনি শ্রমিকশ্রেণি ও বিপ্লবী জনগণকে এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন যে, ব্যাপক নারীসমাজকে সংগঠিত করে বিপ্লবের কাজে নিয়ে আসা শ্রমিকশ্রেণির একটি প্রধান দায়িত্ব। লেনিন ঘোষণা করেছিলেন : 'যতক্ষণ না নারীদের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করছে, ততক্ষণ সর্বহারা তার পূর্ণস্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না।' ('The proletariat cannot achieve complete freedom, unless it achieves complete freedom for women.')[২৪] লেনিন বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক সমাজে নারীর ওপর শোষণ নিপীড়ন ও বিবাহ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহুদিকে নারীস্বাধীনতার নামে, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের নামে কদর্য বুর্জোয়া শঠতার বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত করেন। মার্কস এঙ্গেলসের সূত্র ধরেই লেনিন তাঁর 'রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশ' ('The Development of Capitalism in Russia') গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে মালিক গোয়ালারা চাষী মেয়েদের মেহনত শোষণ করে, কি ভাবে পাইকাররা শোষণ করে সূচীশিল্পে নিযুক্ত মেয়েদের, কি ভাবে বৃহৎ শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একদিক থেকে নারীর ওপর শোষণ দ্বিগুণ হয়, আবার অন্য দিক থেকে সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে তাদের টেনে আনার দরুন নারীর মুক্তির পথ খুলে যায়, তাদের সর্বহারার শ্রেণিসংগ্রামে সামিল করে দেয়।

নির্বাসনে বসে যখন লেনিন পার্টির কর্মসূচী রচনা করেন তখনই তিনি পুরুষের সঙ্গে নারীর পরিপূর্ণ সমতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। লেনিনের স্ত্রী এন ক্রুপস্কায়া লিখেছেন, '১৯১৩ সালে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের বিচার ও বুর্জোয়াদের ভণ্ডামী উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে লেনিন নারীদের গণিকাবৃত্তির সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন

যে, বুর্জোয়ারা কিভাবে নারীদের নিয়ে ব্যবসায় উৎসাহ দেয়, অবলা নাবালিকাদের ওপর, উপনিবেশের মেয়েদের ওপর ধর্ষণ চালিয়ে যায়, আবার একই সঙ্গে ভণ্ডামী করে, ভাব করে যেন তারা গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়ছে।'

লেনিন দেখিয়েছেন : 'যদি আমরা নারীদের বাইরের কাজের মধ্যে, সামরিক বাহিনীর ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যে না টানতে পারি, যদি আমরা তাদের ঘরকন্না ও রান্নাঘরের প্রাণহীন আবহাওয়া থেকে ছাড়িয়ে না আনি তাহলে প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব, আর সমাজতন্ত্রের কথা দূরে থাকুক, প্রকৃত গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।' ('If we do not draw women into public activity, into the milita, into political life, if we do not tear women away from the deadening atmosphere of household and kitchen, then it is impossible to secure real freedom, it is impossible even to build democracy; let alone socialism.')[২৫] এই ভাবে লেনিন নারীমুক্তির সমস্যাটিকে সর্বহারা বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করে গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন। আর আমরা প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাই যে, রাশিয়ার বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ও সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার নারীসমাজের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব হয়েছে এবং পরবর্তীকালে চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও নারীসমাজ প্রকৃত সমানাধিকার লাভ করেছে। অর্থাৎ পুঁজির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে নারীসমাজেরও মুক্তিলাভ হয়েছে। সেখানে সামাজিক উৎপাদনের কাজে পুরুসের সঙ্গে সঙ্গে নারীরাও সমান ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামো বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিদ্বন্দ্বের মূলত অবসান হয়েছে। সমাজতন্ত্রই হল সাম্যবাদের প্রথম স্তর। সমাজতন্ত্রের স্তরেই সর্বহারাও যেমন মূলত মুক্তিলাভ হয়, নারী সমাজেরও তেমন মূলত মুক্তিলাভ হয়। অর্থাৎ সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান হয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণি শোষণের ভিত্তি ভেঙ্গে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় রাষ্ট্রের কাঠামোও। অবশেষে শ্রেণি বিরোধের শেষ চিহ্নগুলির অবসান হলে সর্বহারার সঙ্গে সঙ্গে নারীসমাজের মুক্তিও নিশ্চিত ও স্থায়ী হয়ে যাবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যযুগের শ্রেণিশোষণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অধ্যায়ের অবসান হবে। 'যেহেতু এক শ্রেণির দ্বারা অপর এক শ্রেণির শোষণই হল এই সভ্যযুগের ভিত্তি এর সমগ্র অগ্রগতিই পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চলে, উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিটি অগ্রগতি শোষিত শ্রেণির ওপর, যারা কিনা সমাজের অধিকাংশ মানুষ, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। একের পক্ষে যা আশীর্বাদ, অন্যের পক্ষে তা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়, একশ্রেণির নতুন মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্য শ্রেণির ওপর নুতন শোষণ কায়েম হয়।' ('Since the exploitation of one class by another is the basis of civilization, its whole development moves in a continuous contradiction. Every advance in production is at the same time a retrogretion in the condition of the oppressed class that is of the great majority. What is a boon for one is necessarily a bane for the other, each new emancipation of one class always means a new oppression of another class.')[২৬] সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় এই শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়। মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মধ্যে একাত্মতা

প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিবারগুলিও সমাজের অর্থনৈতিক অনুকেন্দ্র হিসাবে থাকে না। নারী পুরুষ উভয়েই অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন, স্বাবলম্বী হতে পারে, ফলে তাদের মধ্যে দাম্পত্যসম্বন্ধ বা পরিবারের সন্তান সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই পারস্পরিক সম্বন্ধগুলি টাকা আনার সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চতর মানবিক সম্বন্ধে পরিণত হতে পারে। আর অর্থনৈতিক মুক্তি আসবার সঙ্গে নারীসমাজও তাদের আইনগত বা অন্যান্য সামাজিক ও পারিবারিক অধিকারগুলি কাজে লাগাতে পারে। অর্থাৎ নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রকৃত বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য আমরা দেখেছি যে, সোভিয়েতে নভেম্বর বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণির হাতে ক্ষমতা আসার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণিসমাজে নারীর ওপর যত রকম অন্যায় অবিচার শোষণ চলে এসেছে তার অবসান হয়। আর নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পূর্ণ সমানাধিকার, শুধু সোভিয়েতের গঠনতন্ত্রের নয়, বাস্তবক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণিসমাজের আনুষঙ্গিক অবমাননাকর বিবাহপ্রথা, নানারূপ সামাজিক কুপ্রথা পতিতাবৃত্তির মত কদর্য জিনিসগুলিও দূর হয়ে গেছে। ১৯১৯ সালে লেনিন ঘোষণা করেছেন : 'ক্ষমতা হাতে পাবার প্রথম বছরেই আমরা মেয়েদের বিষয়ে যতখানি করেছি, পৃথিবীতে এমন একটি গণতান্ত্রিক দেশও নেই যে দেশ বছরের পর বছর ধরে তার শতাংশের একাংশও করতে সক্ষম হয়েছে।' ('Take the position of women. Not a single democratic country, in the world, not even in the most advanced Bourgeois Republic, has done in tens of years of hundredth part of what we did in the very first year we were in power...')[২৭]

লেনিন দেখিয়েছেন যে, মেয়েদের সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে টেনে আনা নারীমুক্তির প্রথম শর্ত বটে, কিন্তু শুধুমাত্র তার দ্বারাই পারিবারিক দাসত্ব থেকে মেয়েদের মুক্তি দেওয়া যাবে না। ঘরকন্নার একঘেয়ে পীড়াদায়ক খাটুনি থেকে মেয়েদের মুক্তি দিতে হবে। এই জন্যই তিনি বলেছেন : 'নারীর মুক্তি, প্রকৃত কমিউনিজম কেবলমাত্র তখনই শুরু হবে যখন ক্ষুদ্র পারিবারিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (যে সর্বহারার হাতে ক্ষমতা এসেছে তাদের নেতৃত্বে) এক বিরাট সংগ্রাম শুরু হবে, অর্থাৎ যখন এই ব্যবস্থা ব্যাপক আকারে পরিবর্তিত হয়ে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত হবে।' ('The real *emanicipation of women,* real Communism, will begin only when a mass struggle (led by the proletariat which i, in power) Is started against this petty domestic economy, or rather when it *transformed on a mass scale* into large scale socialist economy.')[২৮] এই জন্যই লেনিন সোভিয়েতের সাধারণ ভোজনালয়, শিশুরক্ষণাগার শিশুদের বিদ্যালয়— এইগুলিকে বলেছেন কমউনিজমের 'নতুন কিশলয়' বা 'Young Shoot of Communism,' কারণ এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য নিয়েই মেয়েদের পারিবারিক কাজগুলিতে সামাজিক দায়িত্বের কাজের মধ্যে নিয়ে আস যায়, আর তখনই মেয়েরা পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নারীসমাজকে শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্ত করবার ভিত্তি হিসেবে একদিক থেকে তাদের সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে, আবার অন্যদিক উৎপাদনের কাজে পরিণত করে। এই প্রসঙ্গেই এঙ্গেলসের কথা আবার উদ্ধৃত করছি : 'নারীদের মুক্তি শুধু তখনই সম্ভব যখন তারা ব্যাপক সামাজিক উৎপাদনের

কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং যখন তাদের ঘরকন্নার কাজের প্রতি খুবই সামান্য মনোযোগ দিলেই চলে। আধুনিক বৃহৎ শিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছে যে নারীরা ব্যাপকভাবে উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। আর তার জন্য আরও প্রয়োজনও হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত ঘরকন্নার কাজগুলিকেও সামাজিক উৎপাদনের কাজে পরিণত করার।' ('The emanicipation of women becomes possible only when women are enabled to take part in production on a large, social scale, and when domestic duties require their attention only to a minor degree. And this has become possible only as a result of modern large-scale industry, which not only permits of the participation of women in production in large numbers, but actually calls for it and, moreover, strives to convert privee domestic work also into a public industry.')[২১]

এই ভাবেই সোভিয়েত, চীন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে শোষিত নারী সমাজের মুক্তি সম্ভব হয়েছে। বাস্তব অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে উপরিকাঠামো বা 'Superstructure'; বদলে গেছে সামাজিক চেতনার রূপ। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সর্বত্র—নারী পুরুষের জীবন প্রকৃতই সমানাধিকারের ভিত্তিতে, পূর্ণ সম্মানে, মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নরনারীর দাম্পত্য জীবন মুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধন থেকে। শ্রেণিশোষণহীন সমাজে মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা, আবেগ অনুভূতি তার মানসিক জগতেও শুরু হয় অনুরূপ পরিবর্তন। যুগ যুগ ধরে পুরুষের প্রভুত্ব করবার ও নারীর দাসত্ব করবার অভ্যাস থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্য আবার প্রয়োজন হয় সক্রিয় প্রচেষ্টার, ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত উন্নত সামাজিক চিন্তাধারার, প্রয়োজন হয় শোষণমুক্ত সমাজের জীবনদর্শনে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলবার। বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হলেও বহুযুগের বদ্ধমূল মানসিক অভ্যাস, সংস্কার সহজে বদলায় না। তাই নভেম্বর বিপ্লবের পরও লেনিনের প্রয়োজন হয়েছিল মেয়েদের সম্বন্ধে পূর্বের মনোভাব, বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার জন্য সকলকে শিক্ষিত করে তোলার। লেনিনের রচনার মধ্যে, কর্মপদ্ধতি ও শিক্ষার মধ্যে গভীর দরদের সঙ্গে তিনি নারীমুক্তির এই বাস্তব দিকটা তুলে ধরেছেন। এইভাবে মার্কসবাদী তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী সমাজে নারীর স্থান ও নারীমুক্তির যে তথ্য ও পথ আমরা দেখতে পাই তার সত্যতা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ায়। তারপর সেই পথেই চীন ও অন্যান সমাজতান্ত্রিক দেশে শোষিত নারীসমাজের মুক্তি এসেছে, এবং একদিন সারাবিশ্বের সমস্ত দেশেই সর্বহারার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নারীসমাজের মুক্তিও আসবেই, কারণ মার্কসবাদ অভ্রান্ত। ১৯১৮ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শেষ ভাষণে সেই ঘোষণাই লেনিন করে গেছেন : '... আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিক মেয়েদের অসংখ্য মিটিং-এ সোভিয়েত রাশিয়াকে অভিনন্দিত করা হবে। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া শুরু করেছে এক অভূতপূর্ব কঠিন ও কষ্টসাধ্য কিন্তু মহান—সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে জনগণের মুক্তি, ধনতন্ত্রের কবল থেকে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের মুক্তি এগিয়ে চলেছে দুর্নিবার গতিতে। লক্ষ্যের পথে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারী শ্রমিক, পুরুষ ও নারী কৃষক। তাই দুনিয়াময় ধনিকের কবল থেকে শ্রমিকের মুক্তিসংগ্রামের জয় অনিবার্য।'

('On International Women's Day, in all countries in the world, at innumerable meetings of working women, greetings will be sent to Soviet Russia, which has on unprecedentedly difficult and arduous, but great, universally great, and really liberating work.... The ice has broken in all parts of the world. The emancipation of the peoples from the yoke of imperialism; the emaneipation of the workers, men and women, from the yoke of Capital is moving irresistibly forward. This cause is being advanced by scores and hundreds of millions of working men and women and peasant men and women. This is why the emancipation of labour from the yoke of Capital will be achieved the world over.')[৩০]

পাদটীকা

১. Engels : Origin of Family, Private Property and State.
২. Lenin; Vol. I
৩. Marx : Preface to a contribution to the Critique of Political Economy
৪. Marx : The Poverty of Philosophy.
৫. Stalin : Anarchism or Socialism.
৬. (১); (৭) ঐ; (৮) ঐ; (৯) ঐ; (১০) ঐ; (১১) ঐ
১২. Communist Manifesto : Marx & Engels
১৩. (১)
১৪. Marx : Capital-2
১৫. ঐ (৯)
১৬. Engels : Condition of the working class in England in 1844.
১৭. (১৪); (১৮) (২); (১৯) ঐ; (২০) (১২); (২১) (১২); (২২) (১)
২৩. Stalin : Problems of Leninism
২৪. Lenin : February 21 1920
২৫. Lenin : Letters from Afar, Letter III
২৬. (১)
২৭. Lenin : A great Beginning 1919
২৮. ঐ; (২৯) (১)
৩০. Lenin : International Womens Day, 1918

বাংলার নারীপ্রগতির ধারা

গোলাম মুরশিদ

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গদেশে নারীদের সামাজিক মর্যাদা যে উন্নত ছিল না, এ বিষয়ে একটা অস্পষ্ট ধারণা সবারই আছে। কিন্তু নারীদের মর্যাদা কতটা নিচুতে ছিল, সে বিষয়ে সবার জ্ঞান সমান নয়। তখনকার অত্যাচারিত কোনো মহিলা এ সম্পর্কে কোনো লিখিত প্রমাণ রেখে না গেলেও, পুরুষদের রচনা থেকেও মহিলাদের হীনাবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট জানা যায়। ১৮১৯ সালে রামমোহন রায়ের মতো আধুনিক মানুষ যেমন সমাজে মহিলাদের অতি নিম্ন মর্যাদার উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি লিখেছিলেন :

> বিবাহের সময়ে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্রমার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে,....

রামমোহন আরও উল্লেখ করেন যে, এসব সত্ত্বেও, স্ত্রীর ওপর স্বামী নানা ধরনের অত্যাচার করেন। প্রাত্যহিক জীবনে মহিলাদের ক্রীতদাসীর মতো দৈহিক শ্রম করতে হয়—কেবল এ কথা বলেই রামমোহন তখনকার পুরুষ সমাজের সমালোচনা করেননি। মহিলাদের মানসিক ক্ষমতা সম্পর্কেও পুরুষ সমাজে যে নিতান্ত নিচু ধারণা ছিল, তিনি তারও সমালোচনা করেন। মেয়েদের মনন শক্তি অথবা মেধা নেই— এটাই ছিল সেকালের জনপ্রিয় বিশ্বাস। কিন্তু নতুন যুগের শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি আঠারো শতকের ইংল্যান্ডীয় যুক্তিবাদ এবং উদারনৈতিকতার মূল্যবোধ আয়ত্ত করেছিলেন। সে জন্যে তাঁর পক্ষে মহিলাদের সম্পর্কে প্রচলিত পুরোনো মূল্যবোধ মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই এই জনপ্রিয় বিশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই চ্যালেঞ্জ জানালেন তিনি। প্রশ্ন করলেন : স্ত্রীলোকের মেধা আছে কিনা তা কি কোনো দিন পরীক্ষা করে দেখেছেন? সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের এ রচনা অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী। ব্যাতিক্রমধর্মী, কেননা তখনকার পুরুষসমাজ নারীদের হীনদশা সম্পর্কে সজাগ অথবা সহানুভূতিশীল ছিলেন না। অপরপক্ষে, নবলব্ধ উদারতা এবং যুক্তিবাদের পথ ধরেই হয়তো রামমোহন এবং তাঁর বন্ধুরা মেয়েদের দুর্গতি সম্পর্কে কমবেশি সচেতন হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে যে জিনিসগুলো রামমোহন লক্ষ্য করেছিলেন, স্বদেশের তুলনায় সে দেশে মহিলাদের তুলনামূলক উন্নত অবস্থা তাদের অন্যতম।

মেয়েদের বিষয়ে তাঁর মূল্যবোধ যে বদলে গিয়েছিল, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যেখানটাতে সন্দেহ জাগে, সে তাঁর বিশ্বাস আর বাস্তব জীবনের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য ছিল, সে ব্যাপারে। সমাজে এবং সংসারে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তিনি কি নিজের ঘরে কোনো রকমের সংস্কার করতে

পেরেছিলেন? অথবা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা, সুখদুঃখ ভাগ করে নিতে পেরেছিলেন? পারেননি, সেটা বোধ হয় প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়। এবং সেই লোকসান কি তাঁকে কম হতাশ করেছে?

বস্তুত, রামমোহন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলেন না। এ ছিল সেকালের সদ্যশিক্ষিত সমাজেরই স্ববিরোধ। এই হতাশা এবং দুঃখবোধ থেকেই বস্তুত গত শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে ভদ্রলোক সমাজ অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। কেবল যে রামমোহন অথবা তাঁর প্রগতিশীল বন্ধুরা—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখের মতো প্রগতিশীল লোকেরাই এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন, তাই নয়; রাধাকান্ত দেবের মতো রক্ষণশীল মানুষও স্ত্রীশিক্ষার ভালো দিকগুলো সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। রাধাকান্ত দেবের নির্দেশ এবং আনুকূল্যেই গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার *স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক* পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন ১৮১৯ সালে।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তরুণদের মধ্যে এই সচেতনতা ছিলো প্রবলতর। ১৮৩০-এর দশকে যে তরুণরা হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শিখেছিলেন, অথবা ঐ কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীতে বঙ্গদেশের তথাকথিত নবজাগরণ অথবা রেনেসাঁসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু গোড়াতে তাঁরা প্রবল ঘৃণা এবং প্রতিবাদী মনোভাব দেখিয়েছিলেন ধর্মীয় আচার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং চিরাচরিত বহু মূল্যবোধের প্রতি। বিবাহ ছিল এমনি একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁদের কারো পক্ষেই, অভিভাবকের কথা অনুযায়ী আট/নয় বছরের একটি বালিকাকে বিয়ে করা সহজ কাজ ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত দোওয়া যাক। হিন্দু কলেজের ১৮ বছর বয়স্ক একটি উজ্জ্বল তরুণের সঙ্গে তাঁর পিতা অপূর্ব সুন্দরী একটি জমিদার কন্যার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন ১৮৪২ সালের শেষ দিকে। সনাতন সমাজের অন্য সবার মতোই তাতে সে তরুণের খুশি হবারই কথা ছিল। কিন্তু নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত, রোমান্টিক চিন্তায় উদ্দীপ্ত এই তরুণ খুশি হওয়া তো দূরের কথা, কোথায় পালিয়ে এই *ভয়ানক* অবস্থা থেকে রক্ষা পাবেন, তাই বুঝতে পারছিলেন না। সত্যি বলতে কি, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং ভীত হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, কলকাতার কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই ঘটনা ঘটার আগেই তিনি একটি রচনা লিখেও মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নতুন মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। মেয়েদের অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে একটা জাতি যে উন্নতির পথে যেতে পারে না, সেটাই তাঁর প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। কিন্তু যা তখন লেখেননি, অথচ অতো বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রমাণ করলেন, তা হলো : নিজে শিক্ষিত একটি মেয়েকে পছন্দ না করে তিনি বিয়ে করতে পারেন না। এই তরুণ— মধুসূদন দত্তের মধ্যে এই যে পরিবর্তন এসেছিল, সেটা কেবল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এমনটা মনে করার কারণ নেই। ধর্ম ত্যাগ করার মতো সাহস না হলেও, বিবাহ এবং স্ত্রী সম্পর্কে এ-চেতনাই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি পুরুষের মনে দানা বেঁধেছিল।

এই যে মেয়েদের সম্পর্কে, স্ত্রী সম্পর্কে নতুন সচেতনতার উন্মেষ এই অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা সমসাময়িক পত্রপত্রিকা অথবা রচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৮৩৮ সালের *সমাচার*

দর্পণে একটি লেখায় নব্য শিক্ষিতদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> পুরুষদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহারদের সম্প্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের যে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। ঐ স্ত্রীর নিকটে তিনি কি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্তা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

অন্য একজন লেখক আরও স্পষ্ট ভাষায় কমবেশি একই মনোভাব প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন : শিক্ষিত সম্প্রদায় একটি বিষয়ে খুব অসুখী—এঁরা ঘরে গিয়ে স্ত্রীর কাছে সুখ এবং মানসিক শান্তি পান না। যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য করে *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকা লিখেছিল : ছেলেদের শিক্ষা দিও না, তা হলে মেয়েদের শিক্ষা দেবারও দরকার হবে না। এর অর্ধ শতাব্দী পরেও, সমাজের কোনো কোনো অংশে অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি এবং তার ফলে সংসারে যে অশান্তি দেখা দিয়েছিলো, জুতসই উপমা দিয়ে তিনি তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : একটা গাড়ি দুটো চাকা সমান না হলে সে গাড়ি যেমন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না, পুরুষ এবং মহিলাদের অসমান অগ্রগতির ফলেও সংসারে তেমনি অনাসৃষ্টি হয়েছে। কৌতুক এবং বিদ্রূপে শাণিত ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে অশিক্ষিত স্ত্রীর মানসিক ব্যবধান কত দুস্তর। এবং তার ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক কী দারুণ অসুখের উৎস হয়ে পড়েছে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজের এক অংশে সচেতনতা জেগে উঠলেও, মহিলাদের শিক্ষা এবং আধুনিকতা সম্পর্কে সেকালের ঐতিহ্যিক সমাজের বিরোধিতা ছিল সুতীব্র। বিশেষ করে রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী আর বেগম রোকেয়ার বেলায় দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে ঐতিহ্যিক সমাজের বিরোধিতা কী প্রচণ্ড এবং ব্যাপক ছিল। সে জন্যেই, সরকারী আনুকূল্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বেথুন স্কুল দীর্ঘ দিন পর্যন্ত খুব সীমিত সাফল্যই লাভ করেছিল। হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের মত যাঁরা সে স্কুলে কন্যা দিয়েছিলেন, সম্ভাব্য অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁদের কেউ কেউ পুলিশ ডাকতেও বাধ্য হয়েছিলেন। যে ঈশ্বর গুপ্ত ভুসি পেলেই খুশি হবেন, ঘুসি খেলে বাঁচবেন না বলে অংশত ব্যঙ্গ করে, অংশত গুরুত্বের সঙ্গে অনুগত ব্রিটিশ প্রজার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, তিনিও বেথুন স্কুল চালু হবার পর তার প্রতি বিরোধিতা প্রকাশ না করে পারেননি। এ থেকেও প্রমাণ মেলে, যাঁরা ইংরেজ আমলের এবং ইংরেজি শিক্ষার সুফলভোগী হয়েছিলেন, তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার নামে কী বিচলিত বোধ করতেন। তা ছাড়া, সচেতনতা ছড়িয়ে পড়লেও, গত শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথ আদৌ প্রশস্ত ছিল না। সে অবকাঠামোই তখনো তৈরি হয়নি। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং তা পরিচালনা করা অত্যন্ত শক্ত কাজ ছিল। সে স্কুলের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা জোগাড় করাও ছিল দুঃসাধ্য। মোট কথা, স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন করতে এবং মহিলাদের পক্ষে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে লাভবান হতে অনেকটা সময়ই লেগে গিয়েছিলো।

২

স্ত্রীশিক্ষা বিকাশের তখন যেসব অন্তরায় ছিল, ঐতিহ্যিক সমাজের প্রতিকূল মনোভাবকেই

বোধ হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল বলে গণ্য করা যায়। তবে মেয়েরা যে চিরকাল অন্তঃপুরে বন্দী থাকতেন, তাঁদের যে কোথাও যাবার অনুমতি ছিল না; দিনের বেলায় কোনো পুরুষের, এমনকি, স্বামীর সঙ্গেও দেখা করার রীতি ছিল না—এও স্ত্রীশিক্ষা বিকাশের প্রতি কিছু কম বাধা ছিল না। বস্তুত, স্ত্রীশিক্ষা এবং মেয়েদের অবরোধ মোচনের প্রশ্নদুটি ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেকালে অবরোধ অথবা পর্দাপ্রথা বলতে কী বোঝা যেত, রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং বেগম রোকেয়া তার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। মেয়েদের তখন কেবল পুরুষদের সঙ্গেই নয়, পর্দা পালন করতে হত শাশুড়ি এবং এ জাতীয় অন্য মহিলাদের সঙ্গেও। হিন্দু সমাজে মেয়েদের অবরোধ পালন করতে হতো সাত/আট বছরের সময়ে বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকেই। আর মুসলমানদের মধ্যে মেয়েদের বন্দিত্ব আরম্ভ হতো তারও আগে থেকে। ফলে, যদি ধরেও নিই যে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের অন্যান্য সুযোগ ছিল, তবু এত অল্প বয়স থেকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হবার ফলে তেমন পরিবারের মেয়েদেরও বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখার কোনো উপায় ছিল না। বস্তুত, মেয়েদের শিক্ষা, উন্নতি এবং আধুনিকতার পূর্বশর্ত হিসেবে প্রথমেই প্রয়োজন ছিল তাঁদের অবরোধ মোচনের। এবং গোড়ার দিকে অবরোধ মোচনকেই মেয়েদের স্বাধীনতা বলে গণ্য করা হত। যদিও অবরোধ মোচন করলেই, একজন মহিলা স্বাধীনতা লাভ করেন না—স্বাধীনতা অবরোধ মোচনের তুলনায় অনেক ব্যাপক একটা ধারণা, এটা তখনকার চিন্তকরা খুব তলিয়ে দেখেননি। তাঁরা আসলে অবরোধ মোচনকেই স্বাধীনতার সঙ্গে এক করে দেখেছিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা যতই সীমিত হোক, এই তথাকথিত 'স্বাধীনতা'র ধারণা ঠিক কখন বাঙালি সমাজে দানা বাঁধতে থাকে? নিচের আলোচনায় আমরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

স্ত্রীস্বাধীনতা, নারীমুক্তি ইত্যাদি শব্দ এবং নারীদের অগ্রগতি সম্পর্কিত ধারণা মোটেই এদেশের মাটিতে প্রোথিত ছিল না। বস্তুত, এসব শব্দ এবং ধারণা বাংলা ভাষায় গত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে আদৌ ছিল না। ধারণা হিসেবে 'স্ত্রীস্বাধীনতা' বঙ্গদেশে ঠিক কখন অঙ্কুরিত হয়, এবং *স্ত্রীস্বাধীনতা* জাতীয় শব্দাদি ঠিক কখন প্রথম ব্যবহৃত হয়, তা গবেষণার বিষয়। তা ছাড়া, মহিলারা ঠিক কোন সময়ে এ ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হন এবং *স্ত্রীস্বাধীনতা* বলতে প্রথম দিকের মহিলারা নিজেরা ঠিক কী বুঝতেন, তাও তলিয়ে দেখার বিষয়। তবে মহিলাদের নিজেদের লেখা তেমন বেশি না থাকায়, সমাজের ওপর তলার বিচ্ছিন্ন কিছু মহিলার চিন্তাভাবনার কথা অস্পষ্টভাবে জানতে পারলেও, এ বিষয়ে ব্যাপক ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করা এখন প্রায় অসম্ভব। বস্তুত, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের বিষয়ে গের্ড লার্নার ভাষায়, এখন কিছু 'কম্পেনসেটরি' ইতিহাস লেখা হলেও, স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে গোড়ার দিকের মহিলাদের বিশেষ করে বৃহত্তর সমাজের মহিলাদের ধারণা কী ছিলো, তা আমাদের প্রায় অজ্ঞাত।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ১৮৩০-এর দশকে ইয়ং বেঙ্গলদের অনেকে সমাজে মহিলাদের অত্যন্ত নিচু অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁরা *জ্ঞানান্বেষণের* পাতায় যখন মহিলাদের সমানাধিকারের কথা লেখেন, তখন ধারণা হিসেবে তা ছিল নিতান্তই অভিনব। এ ধারণার

দ্বারা সে সময়ে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁদের হাতে গোণা যেতো। বৃহত্তর সমাজ এই যুবকদের রচনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। তবে তাঁদের এসব রচনা যে কারো চোখে পড়েনি, তা নয়। অক্ষয়কুমার দত্তের সমকালীন একটি রচনা (১৮৪২) থেকে দেখা যায়, তিনি অন্তত তরুণদের বক্তব্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি লেখেন, 'ইদানীং অনেকেই ইচ্ছা করেন, যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় স্বাধীনা হউন...।' 'স্বাধীনা হউন' কথাটার ব্যাখ্যা দিয়ে, তিনি বলেন, 'অর্থাৎ সর্বত্র ভোজন, সর্বত্র গমন, সকলের সহিত কথোপকথন করুন।' তরুণরা এটা চাইলেও, অক্ষয় দত্ত নিজে এর সঙ্গে একমত হতে পারেননি। পরের বাক্যেই তিনি তাই লিখেছেন, এ ধরনের স্বাধীনতার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তাই বলে যুক্তিবাদী অক্ষয় দত্ত মহিলাদের চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখতে চাননি। তাঁদের স্বাধীনতা দেবার পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি বরং তাঁদের অন্তঃকরণে জ্ঞানের বীজ রোপন করতে চান।

কয়েক বছর পরে, ১৮৪৬ সালে, তিনি যখন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* নারীদের অবস্থাকে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ এবং দাসীদের সঙ্গে তুলনা করেন, তখনো *স্ত্রীস্বাধীনতা* শব্দটি তিনি চিন্তা করেননি। বস্তুত, *বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (১৮৫১—৫২) এবং *ধর্মনীতিতেও* (১৮৫৬)এ শব্দের ব্যবহার অনুপস্থিত। মনে হয় নারীদের প্রতি সে যুগের তুলনায় তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি থাকলেও, এবং তাঁদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি সচেতন হলেও, 'স্ত্রীস্বাধীনতা' সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না।

অক্ষয় দত্তের সমকালে আরও কেউ কেউ সীমিত অর্থে মহিলাদের স্বাধীনতার কথা লিখেছিলেন। *দুর্জনদমনমহানবমী* পত্রিকার রক্ষণশীল সম্পাদক মহিলাদের *স্বাধীনা* হবার কথা লিখেছেন বিদ্রূপ করে (১৮৪৭)। *সম্বাদ ভাস্কর* পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 'হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান' শীর্ষক এক সংবাদে এ শব্দের ব্যবহার করেন ১৮৪৯ সালে। এ সংবাদ তিনি প্রকাশ করেন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে এবং মহিলাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েই। তবে সমাসবদ্ধ *স্ত্রীস্বাধীনতা* পদ তিনি ব্যবহার করেননি। কয়েক বছর পরে (১৮৫৭) রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন এবং সমকালীন মহিলাদের তুলনা প্রসঙ্গে 'স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা ও বিদ্যাশিক্ষার আধিক্য' বিষয়ে লেখেন। সেকালে বিদ্যাসাগরের মতো নারীদরদী সমাজসংস্কারক বাঙালি সমাজে কেউই ছিলেন না। ১৮৫০-এর দশকে নারীদের বিষয়ে একাধিক রচনা প্রকাশ করলেও, কোথাও তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার কথা লেখেননি। মহিলাদের প্রতি সহমর্মিতা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার ধারণা যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নয়, এ থেকে তা বেশ বোঝা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাও এই মন্তব্যের যথার্থ্য প্রমাণ করে। তিনিও নারীদরদী ছিলেন, কিন্তু ধারণা হিসেবে স্ত্রীস্বাধীনতার সামর্থন করতে পারেননি।

বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালের আগস্ট মাসে। গোড়া থেকেই এ পত্রিকায় মেয়েদের অগ্রগতির জন্যে জোরালো যুক্তি দেখানো হয়। বস্তুত, এ পত্রিকার উদ্দেশ্যই ছিল বামাগণের উন্নতি। এতে বলা হয় যে, এ দেশের নারীরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, অশিক্ষিত এবং পুরোপুরি পুরুষদের মুখাপেক্ষী। সমাজের অগ্রগতি এবং নারীজীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে নারীদের কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা আবশ্যক, এ দাবি এ পত্রিকায় বারবার উত্থাপিত হয়। সম্ভবত এ পত্রিকাতেই প্রথম বারের মতো *স্ত্রীস্বাধীনতা* শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৮৬৬ সালে *ধর্মতত্ত্বে* প্রকাশিত একটি রচনায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ দশকের শেষে *স্ত্রীস্বাধীনতা* নামক পুস্তিকায় মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নারীমুক্তির আহ্বান জানান।

স্ত্রীস্বাধীনতা সমাসবদ্ধ পদের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় ১৮৭২ সাল থেকে। উপাসনার সময়ে মহিলারা পর্দার আড়ালে বসবেন, না পর্দার বাইরে পুরুষদের সঙ্গে বসবেন, এ নিয়ে এ বছরের গোড়রা দিকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের দুই উপদলের মধ্যে কোন্দল আরম্ভ হয়। এই কোন্দলকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকায় যে রচনাগুলো প্রকাশিত হয়, তাতে *স্ত্রীস্বাধীনতা* পদটি বারবার ব্যবহৃত হয়। 'প্রগতিশীল' ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের *ধর্মতত্ত্ব* এবং *বামাবোধিনী পত্রিকায়ই* নয়, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, মধ্যস্থ* ইত্যাদি পত্রিকায়ও এ সময়ে এই পদটি ব্যবহৃত হতে থাকে। দুর্গামোহন দাস, অন্নদাচরণ খাস্তগির, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যেহেতু মেয়েদের পর্দার বাইরে বসার দাবিকে সমর্থন করেন, সে কারণে তাঁদের দলের জনপ্রিয় নাম হয় *স্ত্রীস্বাধীনতা দল*। (অবশ্য *হালিসহর পত্রিকা* ব্যঙ্গ করে কেশব সেনের দলকে *বক্তৃতামূলক* এবং দুর্গামোহন দাশের দলকে *স্ত্রীসর্বস্ব* বলে ব্যঙ্গ করে। *মধ্যস্থ* এদের নাম দেয় যথাক্রমে *উন্নতিশীল* ও *বেড়ে উন্নতিশীল*।)

কিন্তু নাম যাই হোক, ধারণা হিসেবে স্ত্রীস্বাধীনতা তখন অত্যন্ত সীমিত অর্থে প্রচলিত ছিল। অবরোধ মোচন করে প্রকাশ্য স্থানে গমন, পুরুষদের সঙ্গে কথোপকথন, শিক্ষা দান, স্বাধীনভাবে ধর্মপালন ইত্যাদিকে তখন স্বাধীনতা বলে গণ্য করা হতো। ১৮৬৬ সালে মেরি কার্পেন্টারের সংবর্ধনা সভায় নব্যশিক্ষিত এবং *প্রগতিশীল* ব্রাহ্মরা তাঁদের স্ত্রীদের স্বাধীনতার যে মহড়া দেন, তা থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের মনে এক ধরনের ধারণা দানা বাঁধছিল। সেই সংবর্ধনা সভায় তাঁরা তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং আলাপ করতে উৎসাহিত করেন। মহিলাদের সম্বোধন করে তাঁদের একজন বলেন,

> ভগিনীগণ! আপনাদের স্বামীরা যদি আপনাদের মঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে ভীত হয়েন, আপনারা সাহসী হউন, অগ্রসর হউন, তাঁহাদের নীচতাকে অতিক্রম করুন এবং আপনাদের যে ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতার হার তাহা কণ্ঠদেশে পুনর্বার পরিধান করুন।

অন্য একজন বলেন,

> আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে প্রকার নীচ অপবিত্র লজ্জার ভাব আছে, তাহা অদ্য হইতে তোমরা দূর কর। তোমরা জড় বস্তু নও, পশু নও যে, স্বামী যাহা বলিবে তাহাই করিবে। ...আমাদিগের ন্যায় তোমাদিগেরও চিন্তা ও কার্য্যসকল বিষয়ে তুল্য স্বাধীনতা আছে। ...আমরা তোমাদিগের মত চলিতে পারি না এবং তোমরাও শুদ্ধ আমাদিগের আদেশে চলিতে পার না।

এই উভয় উক্তি থেকে পুরুষদের আন্তরিকতা এবং মহিলাদের প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় সহানুভূতি প্রকাশ পেলেও, স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে তাঁরা কী বোঝাচ্ছিলেন, তা ঠিক পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দেন, তা আরও অস্পষ্ট। তিনি বলেন,

> যাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিতেছেন তাঁহাদিগের জানা কর্তব্য যে, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন হওয়া অর্থাৎ ধর্ম্মপথে চলাই স্বাধীনতা। স্বীয় ইচ্ছা অর্থাৎ স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিলে স্বেচ্ছাচারী হওয়া হয়, ...কেহ যেন স্বাধীনতা লইতে গিয়া স্বেচ্ছাচারিতা গ্রহণ না করেন।

এখানে স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রায় হেয়ালি বললেই চলে। ধর্মভাবনায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৈপ্লবিক হলেও, মহিলাদের স্বাধীনতার দেবার প্রশ্নে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন বলে ওপরের মন্তব্য থেকে অন্তত মনে করা শক্ত। বরং এখানে তাঁর যে সতর্কতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে প্রায় স্বাধীনতা বিরোধী বলেই মনে হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্মীয় নেতা কেশব সেনও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অনুরূপ সতর্কতা এবং স্ববিরোধ প্রকাশ করেছিলেন।

তবে দ্বিধা, বিতর্ক এবং সংশয়ের মধ্যেও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রগতিবাদীদের ধারণা বেশি কাল ধোঁয়াটে ছিল না। কৈলাসবাসিনী দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁর *বিশ্বশোভা* গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে *অবোধবন্ধু* পত্রিকা পুরুষ এবং মহিলাদের মননশীলতায় তারতম্য না করার জন্যে যুক্তি দেখিয়েছিল :

> আজিকালি ইউরোপ ও আমেরিকাতে স্ত্রীজাতি ও পুরষজাতির সমকক্ষতা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিতেছে, আমরা সে সম্পর্কে সমকক্ষতার দলভুক্ত। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সভ্যতার উন্নতি সহকারে স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে সর্বাংশে একরূপ হইয়া উঠিবেক, কেবল সন্তানকে গর্ভধারণ এই বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকুক। আমরা মনে করি যে, অন্যান্য বৈলক্ষণ্য কৃত্রিম, অনিত্য, আগন্তুক এবং উভয়ের সুখের ব্যাঘাতক।

পত্রিকার সম্পাদক সেকালের বিচারে এতো প্রগতিশীল বক্তব্য রেখেছিলেন যে, তিনি এ কথা বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, নাকি গুরুত্বের সঙ্গে বলেছিলেন, সে বিষয়েই সন্দেহ দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমরা দেখি *অবোধবন্ধু পত্রিকা* প্রকাশিত হয়েছিল কৈলাসবাসিনী দেবীর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তের প্রেস থেকে এবং সম্ভবত তাঁর অর্থানুকূল্যে। সুতরাং এ যে বিদ্রূপ করে বলা নয়, সেটা এক রকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কেবল তাই নয়, এক শতাব্দীর ব্যবধানে তাঁর মন্তব্য বাংলাদেশ অথবা পশ্চিমবঙ্গের সমাজে এখনো পুরোপুরি সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের সমাজে প্রায় দৈববাণীর মতো সত্য বলে প্রমাণিত হতে যাচ্ছে।

স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে পুরুষদেব মধ্যে প্রথমে যে নীহারিকাবৎ এবং খণ্ডিত সংজ্ঞা ছিল, তা যখন ধীরে ধীরে স্পষ্টতর রূপ নিতে আরম্ভ করে, তখন মহিলাদের নিজেদের মধ্যেও স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। তবে সে ধারণা যে পুরোপুরি নিজস্ব, তা নয়। সত্যি বলতে কি, পুরুষপ্রধান এবং পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের চিন্তাও পুরুষ প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা যদি অপ্রচলিত এবং অপ্রতুল হয়। এ জন্যেই, অত্যাচার যতই মর্মান্তিক হোক এবং সামাজিক মর্যাদা যতই নগণ্য হোক, সেকালের বাঙালি মহিলারা তাকেই স্বাভাবিক মনে করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের অনেকের মধ্যেই হয়তো ক্ষোভ ছিল, যদিও তার কোনো লিখিত প্রমাণ তাঁরা রেখে যাননি। তবে এ বিষয়ে সরাসরি সাক্ষ্য রেখে না-গেলেও, স্ত্রীশিক্ষার সামান্য বিকাশ এবং নগরায়ণসহ অন্যান্য সামাজিক

পরিবর্তনের প্রভাবে বাঙালি মহিলারা গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীনতা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতনতা লাভ করতে আরম্ভ করেছিলেন—সেটা তাঁদের রচনায় পরোক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে (১৮৬৫) এ সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, কমবয়সী বাঙালি মহিলাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের একটা আকাংক্ষা যেন জেগে উঠেছে। নিজে এটা সমর্থন না করলেও, তিনি উল্লেখ করেন যে, নব্যশিক্ষিত মহিলারা তখন যুক্তি দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই এক বিধাতার সৃষ্টি এবং সে কারণে উভয়ের অধিকার সমান, এবং তাঁদের অধিকার সমান বলে সংসারের কাজও পুরুষ এবং মহিলাদের সমান ভাগ করে নেওয়া উচিত।

কৈলাসবাসিনীর এই মন্তব্য থেকে এ সাক্ষ্য পেলেও, তিনি যাঁদের সমালোচনা করেছিলেন, সেই তথাকথিত নব্যমহিলারা নিজেরা এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। সংসারে নারীর ভূমিকা কী— সে সম্পর্কেও তাঁদের মতামত জানার উপায় নেই। বরং তখন যাঁদের রচনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেসব লেখা থেকে যাঁদের মতামত জানা যায়, তাঁদের মোটেই কৈলাসবাসিনীর বিবরণ অনুযায়ী সমানাধিকারবাদী বলে মনে হয় না। তবে তাঁরা আগের তুলনায় নিজেদের অধিকার সম্পর্কে খানিকটা সচেতন হয়েছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁদের মধ্যে বোধ হয় লক্ষ্মীমণি দেবীই সবার আগে সরাসরি স্ত্রীস্বাধীনতার সপক্ষে একটি রচনা প্রকাশ করেন। ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত এই লেখাটির নাম 'পরাধীনতা কি কষ্ট'। এতে তিনি যা বলেন, সংক্ষেপে তা হলো : পরাধীন স্ত্রীর দুঃখ ও যাতনা অপরিসীম। তাকে জীবন যাপন করতে হয় পশুর মতো। স্বামী তথা পুরুষদের তোষামোদ করে বেঁচে থাকা যথার্থই কষ্টকর। মেয়েদের হীনদশার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, দেশাচারই এর জন্যে সবচেয়ে বেশি দায়ী। লক্ষ্মীমণির এই প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অবরুদ্ধ এবং স্বামীর মুখাপেক্ষী স্ত্রীর দুঃখ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ থেকে যা স্পষ্ট বোঝা যায় না, তা হলো, স্বাধীনতা বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চান।

এ বিষয়ে 'বোয়ালিয়াস্থ কোন ভদ্রমহিলা'র বক্তব্য (১৮৭১) বরং তুলনায় খানিকটা পরিষ্কার। হয়তো শিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের স্ত্রী হিসেবেই তাঁর এ সম্পর্কে ধারণা অতটা স্পষ্টতা লাভ করেছিল। তিনি বলেন, দেশাচার এমন পক্ষপাতদুষ্ট যে, ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে গিয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে এক সঙ্গে উপাসনা করারও উপায় নেই। এমনকি, বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখলে, তাও দোষ বলে গণ্য হয়। অথচ, তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, স্বাধীনতা না-থাকায় বঙ্গমহিলারা জড় পদার্থের মতো। তাঁরা না কোনো ভালো স্থান দেখতে পান, না শুনতে পান কোনো সাধুজনের বাণী। তাঁর মতে, ইংরেজ মহিলাদের তুলনায় দেশীয় মহিলাদের যে এক শতাংশও গুণ নেই, তার কারণ স্বাধীনতার অভাব। বোঝা যায়, বোয়ালিয়ার এই মহিলা বাইরে গমন, সবার সঙ্গে উপাসনায় মিলিত হওয়া, অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ, আরও বেশি অধিকার ইত্যাদিকেই স্ত্রীস্বাধীনতার অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

মহিলাদের বাইরে যাবার অধিকার না-থাকার প্রশ্নটি সমকালীন অন্য একজন লেখিকা উত্থাপন করেছিলেন অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে। তিনি লিখেছিলেন (১৮৭৫) :

> স্ত্রীলোকের কিছুই দেখিবার হুকুম নাই। কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণ হইল, লোকে কত তাহার প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শুনাই সার হইল, একদিনও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারিলাম না।

গঙ্গার ওপর সেতু নির্মাণের পর মহিলারা যে তা দেখতে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন, অন্তত আরও দুজন মহিলার লেখা থেকে তার প্রমাণ পেয়েছি। কৈলাসবাসিনী এর উল্লেখ করেছিলেন। আর অন্যজন এই সেতু দেখতে না-পাওয়ার জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে যা বিশেষ নজরে পড়ে, তা হলো : সেতু দেখতে না পাওয়ার চেয়েও, মহিলা হওয়ার ফলেই যে তিনি সেতু দেখতে পাননি—এটাই তাঁর বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। এবং এ থেকে বোঝা যায়, নির্যাতিত নারীসমাজের সদস্য হিসেবে তিনি নিজে খানিকটা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন।

আসলে প্রাত্যহিক জীবনের যেসব সীমাবদ্ধতা নব্যশিক্ষিত তরুণীদের সবচেয়ে বেশি পীড়িত করেছিল, সে সম্পর্কেই তাঁদের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্ণতর সংজ্ঞা তাঁদের তেমন ভাবিত করেনি। তা ছাড়া, যে ধরনের শিক্ষা থাকলে এ বিষয়ে তাঁরা ভাবতে পারতেন, তাও তাঁদের তেমন ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের মাধ্যমে হোক, অথবা পাশ্চত্য জীবনধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হেতু হোক, যাঁদের মনে স্বাধীনতা সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা তৈরি হবার মতো অনুকূল অবস্থা ছিল, ১৮৭০-এর দশকে, এমনকি, তার পরের দশকে, এ বিষয়ে তাঁরা কেউ তেমন কিছু লিখেছেন বলে আমার চোখে পড়েনি। তরু এবং অরু দত্ত দু বোন ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁরা স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো কিছু ভেবে থাকলেও, তেমন কিছু লেখেননি। ১৮৭১ সালে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ইংল্যান্ডে গিয়ে আট মাস কাটিয়ে আসেন। সেখানে প্রধানত ইউনিটারিয়ানদের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ঘটে। তাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর স্বামীও তরুণ ব্রাহ্মদের স্ত্রীস্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে কোথাও কিছু লিখেছিলেন বলে আমার জানা নেই।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ইংরেজ মহিলাদের এবং তাঁর স্বামীর কাছ থেকে উচ্চশিক্ষা না হলেও, সে যুগের তুলনায় খুব ভালো শিক্ষা, বিশেষ করে বিদগ্ধ হয়ে ওঠার শিক্ষা পেয়েছিলেন। নিজে তিনি ইংরেজি এবং বাংলা বহু বই পড়েন। তা ছাড়া, স্বামীর উৎসাহে তিনি স্বাধীনভাবে ভাবতে এবং স্বাধীনতার কথা ভাবতে শেখেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সন্তানদের নিয়ে ইংল্যান্ডে যান এবং বছর আড়াই ইংল্যান্ডে আর কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে দেশে ফিরে আসেন। সেকালের একজন ইংরেজি শিক্ষিত অত্যাধুনিক মহিলা স্বাধীনতা সম্পর্কে কী ভাবতেন, তাঁর রচনা থেকে হয়তো তা জানা যেত। এবং তিনি লিখতেনও—১৮৭১ সালে তাঁর প্রথম রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ বিষয়ে কিছু লেখেননি। স্ত্রীস্বাধীনতা এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আদি ব্রাহ্ম সমাজের যে ঐতিহ্যিক মনোভাব ছিল, অসম্ভব নয় যে, তাই হয়তো তাঁরও মনে দৃঢ়মূল ছিল। ১৮৮০ এবং ১৮৯০-এর দশকে প্রকাশিত তাঁর কোনো কোনো লেখা থেকে সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তাঁর রক্ষণশীলতাই বরং প্রকাশ পেয়েছে।

১৮৮০-র দশকে ইংরেজি শিক্ষিত মহিলা হিসেবে যাঁরা তখনকার সমাজে রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিলেন—চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, কামিনী সেন, কুমুদিনী খাস্তগির প্রমুখ, তাঁরা ছিলেন হয় প্রগতিশীল সাধারণ ব্রাহ্ম নয়তো ধর্মের বন্ধন-কাটানো দেশীয় খ্রিস্টান। আশ্চর্যের বিষয়, এঁরাও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করেননি। আসলে পুঁথিগত বিদ্যা থাকা সত্ত্বেও এবং সেই সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতিতে অনৈতিহ্যিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত স্বাধীনতার ধারণা হয়তো তাঁদের ছিল না। অথবা এমনও হতে পারে যে, ঐতিহ্যিক সমাজকে চটিয়ে দেবার ভয়ে তা লেখার মতো সাহসও তাঁদের হয়নি। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখতে পাবো, কৃষ্ণভাবিনী দাসই প্রথম ইংল্যান্ডে বসে লেখা তাঁর একটি বই-এ স্ত্রীস্বাধীনতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা অতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল সম্ভবত প্রায় এক দশক ইংল্যান্ডে বাস করার ফলে।

৩

স্ত্রীস্বাধীনতা ঠিক কী বস্তু—এ সম্পর্কে গত শতাব্দীর মহিলাদের ধারণা সুস্পষ্ট চেহারা নিতে পারেনি। তাঁরা কী করার স্বাধীনতা চান, অথবা কিসের হাত থেকে স্বাধীনতা চান— এ বিষয়ে তাঁরা নিজেরাই খুব নিশ্চিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে তা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের শেষে এসে বাঙালি মহিলারা স্বাধীনতা বললে কিছু একটা বুঝতেন— লেখাপড়ার অধিকার, সীমিত অবরোধ, বিয়ের ব্যাপারে খানিকটা নিজেদের মতামত দেবার অধিকার, সংসার পরিচালনায় বর্ধিত অধিকার ইত্যাদি হয়তো এসবের মধ্যে ছিল। বিয়ের ব্যাপারে সেকালে মহিলাদের সামান্যতম অধিকারও ছিল না। তা ছাড়া, তাঁদের বিয়ে হতো এত কম বয়সে যে, তাঁদের মতামত নেবারও কোনো অর্থ হতো না। পরবর্তীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার শিকার হতে হতো মহিলাদেরই। যে মহিলারা তখন নারীদের উন্নতির কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন, তাঁরা এটা মেনে নিতে পারছিলেন না। সে জন্যে সেকালের মহিলা-সমাজ সংস্কারকরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের সংস্কার দরকার, এটা অনুভব করেছিলেন এবং বার বার তা উল্লেখও করেছিলেন।

মেয়েদের আর-একটা বড়ো দুঃখের কারণ ছিল স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে। অনেক সময়েই একান্নবর্তী পরিবারে শাশুড়ি, ননদ এবং জাদের সঙ্গে সম্পর্ক সুখের হতো না। এই সমস্যা নিয়ে মহিলাদের মধ্যে অনেকেই তখন লিখেছিলেন। রাসসুন্দরী দেবী আর কৈলাসবাসিনী দেবী এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। অন্যরাও এ ব্যাপারে একমত এবং এ সমস্যার কমবেশি উল্লেখ করেছেন।

তবে মহিলাদের কর্ম এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা কী হবে, তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে অনেক বেশি। স্ত্রীশিক্ষা চেয়েছিলেন, সেটা পেয়েছেন; অবরোধ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, সীমিত পরিমাণে তাও পেয়েছেন; এর পরে কী? —এটা শিক্ষিত এবং 'স্বাধীন' অনেক মহিলাকেই ভাবিত করেছিল। তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন চাকুরিবাকরি করেছেন অথবা চাকুরি করা উচিত বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। কামিনী সেন অথবা সরলা দেবী জেদ করে চাকুরি করার অনুমতি আদায় করেছিলেন তাঁদের অভিভাবকদের কাছ থেকে। কিন্তু অনেকেই

স্বামী অথবা পিতার অনুমতি পানওনি। এ সত্ত্বেও, চিন্তাধারা কোথাও থেমে থাকেনি। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে বেগম রোকেয়ার মতো তরুণীকে দেখতে পাই, যিনি মেয়েদের উপার্জন করার অধিকার আছে, এ কথাই বলেননি, বরং মেয়েদের উপার্জন করা দরকার বলে অভিমত দিয়েছিলেন। মোট কথা, উনিশশতকের গোড়াতে বাঙালি সমাজে মহিলাদের যে অবস্থান ছিল, আর শতাব্দীর শেষে তাঁরা যেখানে গিয়ে উপনীত হন, তার মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক না হোক, দুস্তর ব্যবধান ছিল।

মার্কস-এর কল্যাণে সমাজ পরিবর্তনের যেকোনো ঘটনাকে এখন আমরা সে সময়ের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে অভ্যস্ত। উনিশশতকের বাঙালি সমাজে মহিলাদের মধ্যে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল, তার সঙ্গে সে সময়কার সমাজ পরিবর্তনের সত্যি সত্যি গভীর যোগাযোগ রয়েছে। যে পরিবেশে কৈলাসবাসিনী বড়ো হয়েছিলেন অথবা যে ধরনের পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, তেমন দৃষ্টান্ত সে যুগে ভুরি ভুরি না থাকলেও নিশ্চয়ই আরও ছিল। কেশব সেন কি শিবনাথ শাস্ত্রী কি তাঁদের স্ত্রীদের ভালো শিক্ষা দেবার জন্যে দুর্গাচরণ গুপ্তের চেয়ে কম চেষ্টা করেছিলেন? অথবা তাঁরা কি দুর্গাচরণের চেয়ে কম প্রগতিশীল ছিলেন? কিন্তু তা সত্ত্বেও কৈলাসবাসিনী দেবী সেকালে অনেকজন তৈরি হননি। রাসসুন্দরী দেবীর দৃষ্টান্ত আরও প্রাসঙ্গিক। যে রকমের ঐতিহ্যিক পরিবারের সন্তান এবং বধূ ছিলেন তিনি, তাতে তাঁর পক্ষে প্রথম বাংলা আত্মজীবনী লিখতে পারা, অতি অসাধারণ—প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু কার্যকালে সেটাই ঘটেছিল। তাঁর চেয়ে বেশি উদার হাওয়ায় যাঁরা মানুষ হয়েছিলেন অথবা বিয়ের পরে বাকি জীবন বাস করেছিলেন, তাঁরা কেউ প্রথম আত্মজীবনী লেখার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেননি।

বস্তুত, ব্যক্তির ভূমিকা গত শতাব্দীর নারী জাগরণের ইতিহাসে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো। যে কালে মহিলাদের বাইরে যাবার কোনো নিয়ম ছিলো না, তাঁর যেতে পারতেন কেবল তাঁদের পিতৃগৃহে, সেই সময়ে কেশব সেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে এলেন। সমাজ তার নিন্দা করলো, তাঁর আত্মীয়রা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। কিন্তু এ ঘটনা একেবারে ব্যর্থ হলো না। পরবর্তীতে অন্য কেউ তাঁর স্ত্রীকে যখন বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, এ ঘটনা তাঁকে কেবল অনুপ্রাণিত করেনি; তিনি এ থেকে সাহস এবং দৃষ্টান্ত উভয়ই পেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃগৃহ থেকে স্ত্রীকে কর্মস্থানে নিয়ে যাবার যে ধারণা পেয়েছিলেন, তার অনেকটাই হয়তো ইংরেজ সমাজে তার বসবাসের ফল। কিন্তু তাতে কেশব সেনের আদৌ প্রভাব ছিল না, তা বলা যায় না। কেশব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুরবাড়িতেই উঠেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত যাবার আগে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সাত-আট দশক কলকাতা ছিল নিতান্তই পুরুষদের শহর। যাঁরা লেখাপড়া শিখতে কলকাতায় আসতেন এবং পরে চাকুরি করার জন্যে কলকাতায় থেকে যেতেন, স্ত্রী এবং সন্তানদের তাঁরা রেখে আসতেন গ্রামে পৈতৃক বাড়িতেই। বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারমুক্ত মানুষও স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করেননি। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তরুণদের অনেকেই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহ থেকে স্ত্রীদের নিয়ে যাচ্ছিলেন কর্মস্থানে। গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাঁর পরিবার এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ, মনোমোহন ঘোষ

এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের স্ত্রীদের বিলেত নিয়ে না-গেলে কৃষ্ণভাবিনী দেবীর পক্ষে বিলেত যাওয়া হয়তো অসম্ভবই হতো। বস্তুত, রাসসুন্দরী দেবী থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণভাবিনী দাস পর্যন্ত সনাতন মূল্যবোধ অস্বীকার করার এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর নতুন ঐতিহ্য গড়ে না-উঠলে, তা নির্মিত না হলে, যে-বেগম রোকেয়াকে প্রথম সত্যিকার নারীবাদী বলে আখ্যায়িত করছি, তাঁর জন্ম সম্ভব হতো না। বাঙালি নারীমুক্তির ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা যথার্থই অসাধারণ অবদান রেখেছিল।

৪

গত শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাজে মহিলাদের যে শোচনীয় অবস্থা ছিল, রোকেয়া তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কেবল স্ত্রীশিক্ষার তীব্র বিরোধিতা এবং কঠোর অবরোধ প্রথার নয়, সব কিছুতেই পুরুষদের তুলনায় সমাজে মহিলাদের অধিকার কত কম ছিল, তারই বিবরণ এবং বিশ্লেষণ পাই তাঁর লেখা থেকে। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করি তিনি মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে কিভাবে অন্তহীন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু রোকেয়ার জন্মের এক দশক আগে রাসসুন্দরী দেবী যখন তাঁর আত্মজীবনী লেখেন, তখনই তিনি বলেছিলেন যে, সমাজে মেয়েদের স্থান তাঁর বাল্যকালের তুলনায় অনেকটা উন্নত হয়েছিল। তাঁর বিবেচনায়, মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সমাজের মনোভাবে তখন কোনো বিরোধিতা নাকি আর লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো না। রাসসুন্দরী আর রোকেয়ার মধ্যে কার কথাকে তা হলে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করবো?

আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও, আসলে তাঁদের দুজনের কথাই সমান বিশ্বাসযোগ্য। কারণ তাঁরা যা বলেছেন তা আপেক্ষিক। রাসসুন্দরী যাকে দেখে বলেছেন ভালো অবস্থা, রোকেয়ার দৃষ্টিতে তাই অতি শোচনীয়। এর কারণ নিহিত আছে তাঁদের পরিবর্তিত সামাজিক পটভূমিতে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজে মেয়েদের যে-অধিকার ছিল, দ্বিতীয়ভাগে তুলনামূলকভাবে তা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। রাসসুন্দরীর বাল্যকালে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে যে তীব্র বিরোধিতার মনোভাব প্রচলিত ছিল, তা শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে নমনীয় হয়ে ওঠে। এবং স্ত্রীশিক্ষা সীমিত পরিমাণে বিস্তারও লাভ করে। সে জন্যেই, রাসসুন্দরী তাঁর বাল্য এবং যৌবনকালের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বৃদ্ধ বয়সের অবস্থাকে অনেক সুখের বলে বিবেচনা করেন। অপর পক্ষে, রোকেয়া যখন জন্ম গ্রহণ করেন, ততো দিনে সমাজের এবং মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছিল। কেবল যে সমাজের একটা বড়ো অংশে স্ত্রীশিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হচ্ছিলো, তাই নয়; অবরোধ, বিবাহ, মেয়েদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা ইত্যাদির ব্যাপারেও রক্ষণশীলতা কমে গিয়ে মনোভাব খানিকটা উদার হতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু নতুন যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে রোকেয়া এই উদারতাকে যথেষ্ট বলে মেনে নিতে পারেননি। সুতরাং রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীর যে ইতিহাস তা মনোভাব পরিবর্তনের এবং উদারীকরণের ইতিহাস। এবং তাঁদের রচনার বিষয়বস্তুতেই নয়, তাঁদের মুখ্য বক্তব্য এবং রচনার ভঙ্গিতেও এই পার্থক্য সুস্পষ্ট।

রাসসুন্দরী দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে মেয়েদের সকরুণ অবস্থার বর্ণনা দেন নিজের কথা

বলতে গিয়ে। মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিল তা তুলে ধরার, অথবা তার মাধ্যমে মহিলাদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সমাজ বিবেককে সচেতন করে তোলার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। এমনকি, তিনি যখন তাঁর নিজের দুঃখের বর্ণনা দিয়েছেন, তখনো তার মধ্যে কোনো অভিযোগ অথবা তিক্ততা প্রকাশ পায়নি। প্রায় কৌতুকের সঙ্গেই সে বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রামের প্রায় অশিক্ষিত গৃহবধূ হয়েও তিনি আত্মজীবনী লেখার ধারণা এবং অনুপ্রেরণা কোথায় পান, তা বলা শক্ত। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মজীবনী সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে অথবা তাঁর সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনার লক্ষ্য নিয়ে লেখেননি— সেটা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এক শতাব্দীতে বাঙালি মহিলাদের যে উন্নতি এবং অগ্রগতি হয়েছিল, বর্তমান বই-এর ছ জন নারীর জীবন থেকে বস্তুত তার একটা ধারাবাহিক এবং ঘনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়।

রাসসুন্দরী দেবীর বাল্য এবং যৌবনে মহিলাদের অবরোধ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা নিয়ে তেমন বিতর্ক দেখা দেয়নি। তখন অনেক বেশি জরুরী বলে মনে করা হয়েছে মেয়েদের আদৌ লেখাপড়া শেখানো হবে কিনা, এই প্রশ্ন। বালিকাবধূ হিসেবে তিনি অসহায় বোধ করেছিলেন, তা না হলে বিবাহিত জীবন তাঁর সুখের ছিল। অংশত এ জন্যে এবং অংশত বিবাহের ফলে সেকালের নারীদের যে ভোগান্তি হতো, সে সম্পর্কে সচেতনতার অভাব থেকে রাসসুন্দরী বিবাহ সমস্যা নিয়ে কোনো আলোচনা করেনি। অবরোধ মোচন অথবা পরবর্তীকালে ব্যাপকতর যে দাবি ওঠে স্বাধীনতার, সে সম্পর্কে তাঁর রচনায় কোনো ক্ষোভ অথবা অভিযোগ প্রকাশ পায়নি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট করে জানা যায়, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সে সময়ে সমাজের বিরোধিতা কতটা প্রবল ছিল, সে বিষয়ে। তা ছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মহিলারা স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে কী ভাবতেন, তারও সরাসরি বিবরণ মেলে তাঁর রচনা থেকে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সমাজের মনোভাব নমনীয় হতে থাকলেও, তা যে মোটেই লোপ পায়নি, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কৈলাসবাসিনী দেবীর রচনা থাকে। তাঁর জন্ম রাসসুন্দরীর তিন দশক পরে এবং কলকাতা নগরীতে অথবা তার কাছাকাছি। নগরায়ণ এবং সমাজ পরিবর্তনের ফলে তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রতি প্রতিকূলতা খানিকটা কম লক্ষ্য করতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাই, রাসসুন্দরী যে ধরনের বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কৈলসবাসিনীও সেই একই ধরনের বিরোধিতা দেখতে পেয়েছিলেন। এই বিরোধিতা যে কেবল বাইরের, তা নয়, এটা প্রকৃতপক্ষে সমাজের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ছিল। সে জন্যেই, কৈলাসবাসিনী নিজেও স্ত্রীশিক্ষাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এই আন্তরিক ঘৃণা সত্ত্বেও তিনি যে শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া শেখেন, সেটা নিতান্তই তাঁর ইংরেজি শিক্ষিত স্বামীর জেদের মুখে। এখানটায় রাসসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর একটা মস্ত বড়ো পার্থক্য লক্ষ্য করি— রাসসুন্দরীর স্বামী তাঁকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেননি, এমন কি তিনি যে গোপনে গোপনে লেখাপড়া শিখছিলেন, সে খবরও তিনি রাখতেন না। কিন্তু পরের প্রজন্মের একজন ইংরেজি শিক্ষিত স্বামী কী করতেন অথবা করতে পারতেন, কৈলাসবাসিনীর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্তের নজির থেকে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

রাসসুন্দরীর তুলনায় কৈলাসবাসিনী দৃষ্টিপাতও করেছিলেন অনেক ব্যাপক একটা এলাকার দিকে। এক অর্থে রাসসুন্দরী ছিলেন কূপমণ্ডুকের মতো। নিজের সংসারের বাইরে বলতে গেলে তাকানইনি। বৃহত্তর সমাজ তাঁর রচনায় একেবারে অনুপস্থিত। অপরপক্ষে, কৈলাসবাসিনী নিজের সংসার নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারেননি। অথবা কেবল শিক্ষা নিয়েও নয়। তাঁর মধ্যে যে সমাজসচেতনতা লক্ষ্য করি, তা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ। হতে পারে, ১৮৫০-এর দশকে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত থেকে শুরু করে অনেকেই যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নসহ যে সচেতনতা দেখা দিয়েছিল, কৈলাসবাসিনী তা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে প্রভাবটা যেখান থেকেই আসুক, সমাজের নানা ব্যাধির স্বরূপ যথেষ্ট স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। নিজে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ কেন, কুলীন কায়স্থ না হওয়া সত্ত্বেও কৌলীন্য যে সমাজের একটা অংশকে ক্যান্সারের মতো একেবারে জীর্ণ করে দিচ্ছিল, তিনি তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাদের সমস্যা নিয়েও তিনি বিচার-বিবেচনা করেন। অবরোধ প্রথাকে তিনি এতই মন্দ বলে গণ্য করেছেন যে, একে তিনি আদৌ হিন্দুদের প্রচলিত বলে জ্ঞান করতে পারেননি। এর জন্যে, কোনো প্রমাণ ছাড়াই, দায়ী করেছেন মুসলমান রাজত্বকে। বালিকাবধূদের প্রতি সহানুভূতি বর্জিত আচরণ, বধূর সঙ্গে স্বামীর আত্মীয়স্বজনের, বিশেষ করে শাশুড়ি-ননদের আচরণ ইত্যাদি অনেক কিছুর দিকেই তিনি নজর দিয়েছিলেন।

কৈলাসবাসিনীর সীমাবদ্ধতা অবশ্য সহজেই চোখে পড়ে। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, অবরোধের কঠোরতা মোচন এবং বিবাহের ফলে মেয়েদের অনেক ক্ষেত্রেই যে দুর্ভোগের শিকার হতে হয়— সেসব বিষয়ে যেধরনের সংস্কার আবশ্যক, তিনি তার দাবি করলেও জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য মেয়েদের যে অন্তঃপুরের চার দেয়ালের বাইরে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনের দরকার রয়েছে, এ কথা তিনি চিন্তা করেননি।

অন্তঃপুরের বাইরে যাবার তাগিদ লক্ষ্য করি জ্ঞানদানন্দিনীর দেবীর মধ্যে। কৈলাসবাসিনীর স্বামী যেমন কৈলাসবাসিনীকে নিজে যত্ন করে, জেদ করে, লেগে থেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, জ্ঞানদার স্বামীও তেমনি জ্ঞানদাকে হাতে ধরে আলোর পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে দুর্গাচরণ গুপ্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য তেমন না থাকলেও মাত্রাগত পার্থক্য লক্ষ্য করি। দুর্গাচরণ ইংরেজি শিখেছিলেন সম্ভবত হিন্দু কলেজে। কলকাতায় তখন পর্যন্ত যেসব পাশ্চাত্য ভাবধারার ঢেউ এসে লেগেছিল, তিনি তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার বেশি নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ লেখাপড়া শিখেছিলেন বিলেতে। তিনি জেমস এবং জন মিলের আদর্শ দিয়ে প্রভাবিত। যাঁরা বলেছিলেন : একটা জাতি কতটা উন্নত তা বোঝা যায় সে জাতির মহিলাদের অবস্থা থেকে। সত্যেন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েদের তুলনামূলকভাবে উন্নত অবস্থা এবং মর্যাদা লক্ষ্য করে। অতঃপর সারা জীবন তিনি তাঁর এই বিশ্বসেরই প্রমাণ দিয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁকে স্বামী হিসেবে পেয়েছিলেন।

ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত না-হলে কৈলাসবাসিনী দেবীর মতো মহিলার জন্ম তখন বঙ্গদেশে অসম্ভব ছিল, এটা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। রাসসুন্দরী দেবীর তুলনায় তিনি

নিশ্চয়ই অনেক আধুনিক ছিলেন, কিন্তু *গোরার* মতো উপন্যাসে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের যে মহিলাদের দেখতে পাই, তাঁকে আদৌ তেমন মহিলা বলে আখ্যায়িত করতে পারিনে। পোশাক ও পরিচ্ছদ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এবং আচার ও আচরণের দিক দিয়ে যাকে আমরা আধুনিকা বলে বিবেচনা করি, কৈলাসবাসিনীকে তার একজন বলে শনাক্ত করা যায় না। কৈলাসবাসিনী দেবীর পরবর্তী যে প্রজন্মে বাঙালি মহিলারা অনেকটা আধুনিক বলে পরিচিত হয়েছিলেন, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সেই প্রজন্মের অগ্রদূত এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অবরোধ মোচন করে তিনি মুম্বাই যান ১৮৬৪ সালে। সদ্য শিকল কাটা পাখির মতো তখন তাঁর পক্ষে বাইরের সে সমাজে চলাফেরা করা সহজ হয়নি। কিন্তু সবই তিনি শিখেছিলেন। এবং দ্রুত আধুনিকা বলে পরিচিত হয়েছিলেন। মেরি কার্পেন্টার তাঁকে খুব কেতাদুরস্ত বলে বর্ণনা করেছিলেন। গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে বাঙালি মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বিলেত এবং ফ্রান্স ঘুরে এসে তিনি রীতিমতো তখনকার কলকাতার অত্যাধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মধ্যমণি হয়ে বসেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও তার প্রমাণ রয়েছে।

সমসাময়িক নারীদের অনুকরণ এবং অনুসরণের জন্যে আধুনিকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি নগণ্য কোনো অবদান রাখেননি। তবে বঙ্গদেশের নারী প্রগতির ইতিহাসে তার চেয়েও বড়ো অবদান তাঁর ছিল। বাঙালি মহিলারা যাতে একটা ভদ্র পোশাক পরে বাইরে যেতে পারেন, তিনি তার ব্যবস্থা করেছিলেন। শাড়ি পরার স্টাইলই নয়, শাড়ির সঙ্গে পেটিকোট এবং ব্লাউজ পরার যে রীতি তিনি প্রবর্তন করেন, পরবর্তীতে তা-ই বাঙালি মহিলাদের প্রামাণ্য পোশাকে পরিণত হয়। সেকালে স্ত্রীশিক্ষা এবং অবরোধ মোচনের প্রশ্ন দুটি ভদ্র পোশাকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। একটা ভদ্র পোশাক প্রবর্তন ছাড়া, মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেওয়া অথবা অন্তঃপুর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দেওয়া—কোনোটাই সম্ভব ছিল না। সমাজ সংস্কার চেতনাও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মধ্যে কৈলাসবাসিনী দেবীর চেয়ে কম ছিল না—যদিও তিনি কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে কৈলাসবাসিনীর মতো বই লেখেননি। বস্তুত, অবরোধ মোচন, পত্রিকা সম্পাদনা, মহিলাদের সংগঠন স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বাঙালি মহিলাদের কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন।

বঙ্গদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সর্বত্র সমান অথবা একই সময়ে হয়নি। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেই সেটা প্রথম দিকে সীমিত ছিল। মুসলমান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিলেন অনেকটা পেছনে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের কোনো ঢেউ তাঁদের মধ্যে একেবারে লাগেনি, তা নয়। তারই প্রমাণ মেলে তাহেরন নেসার মধ্য দিয়ে। তাঁর পরিচয় অথবা পটভূমির কথা কিছুই আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁর একটি রচনা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে একটা ল্যান্ডমার্ক হিসেবে রয়ে গেছে। তখন যে মুসলমানরা, এমনকি, ব্যতিক্রম হিসেবে, দু-একজন মুসলমান মহিলাও, ধীরে ধীরে শিক্ষার দিকে সসংকোচে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তারই একটি বিরল দৃষ্টান্ত তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে রেখে গেছেন। বঙ্গদেশের দুটি প্রায় সমান সম্প্রদায়—হিন্দু এবং মুসলমান। কিন্তু মুসলমানদের নামে প্রকাশিত কোনো রচনা তখনকার পত্রপত্রিকায় অতিদুর্লভ। মুসলমান নামে সেকালের বঙ্গদেশে একটা সম্প্রদায় ছিল

অথবা মুসলমানদের মধ্যে মহিলাও ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়াই বস্তুত শক্ত। তাহেরন নেসার মতো দু-একটি দৃষ্টান্ত না থাকলে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকরা যদি বলতেন, বঙ্গদেশে মুসলমান মহিলাদের আবির্ভাব ঘটে বিংশ শতাব্দীতে, তা হলে তাঁদের খুব দায়ী করা যেতো না। তাহেরন নেসা নামটির সে জনেই বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে একটু আগেই যে লক্ষ্য করেছি, তিনি যতটা আধুনিকা ছিলেন, ততোটা সমাজ সচেতন ছিলেন না। তিনি ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে প্রায় তিন বছর থেকে এসেছিলেন, কিন্তু সে দেশের সমাজে তিনি কী দেখে এসেছিলেন, বিশেষ করে নারীপ্রগতির বিষয়ে, সে সম্পর্কে স্বদেশের পুরুষ অথবা মহিলাদের অবহিত করার কোনো তাগিদ তিনি নিজের অন্তরে অনুভব করেননি। তাঁর স্মৃতিকথা পড়লেই বোঝা যায়, সে দেশের সমাজের সঙ্গে সারাক্ষণ তিনি নিজের দেশের সমাজের তুলনা করেননি, অথবা সে দেশের সমাজের ভালো জিনিসগুলো দিয়ে স্বদেশের মন্দ জিনিসগুলোর সংস্কারও করতে ব্যাগ্র হননি। এ ব্যাপারে তাঁর একেবারে উল্টো কোটিতে যাঁর অবস্থান দেখি, তিনি হলেন কৃষ্ণভাবিনী দেবী। জ্ঞানদা দেবীর মতো তাঁর পটভূমি অতো অনুকূল ছিল না। জন্মেছিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে। বিয়ে হয়েছিল আধুনিক ব্রাহ্ম পরিবারে নয়— শিক্ষিত কিন্তু এক ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারে। এমনকি, তাঁর স্বামী খুব আধুনিক হলেও, নারীপ্রগতির দিক দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অতোটা আধুনিক ছিলেন কিনা, হলপ করে তাও বলতে পারিনে।

বিয়ের পরে স্বামীর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণভাবিনী ইংরেজি এবং বাংলা উভয়ই যত্নের সঙ্গে শিখেছিলেন। কিন্তু স্বামী দীর্ঘ দিনের জন্যে ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ায় তাঁর শিক্ষা কতোটা এগিয়েছিল, বলা শক্ত। তিনি সত্যিকার শিক্ষা লাভ করেন স্বামীর সঙ্গে ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানে প্রায় এক দশক বাস করার সময়ে। এ সময়ে আর স্বামীর কাছ থেকেই নয়, তিনি নিজেই প্রচুর অধ্যয়ন করেন। তা ছাড়া, তাঁর লেখা পড়ে মনে হয় তাঁর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। *ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা* গ্রন্থে সমাজ সম্পর্কে তাঁর যে সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে, সেটা সেকালের কোনো নারীর জন্যে কেন পুরুষের জন্যেও শ্লাঘার বিষয় হতে পারতো। কৃষ্ণভাবিনীর আগে অথবা তাঁর সমকালে যে বাঙালিরা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছিলেন। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ থেকে লেখা চিঠিপত্র ছাড়া অন্য কোনো রচনায় কৃষ্ণভাবিনীর মতো অতোটা সমাজ সচেতনতা, বিশেষ করে নারীসমাজ সম্পর্কে অতোটা পর্যবেক্ষণ দুর্লক্ষ্য। ইংল্যান্ডের রাজনীতি এবং সমাজ সম্পর্কে এ বই-এ তিনি মূল্যবান বহু তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে প্রশংসা করেছিলেন সে দেশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর সমাজ ও পরিবারে নারীর স্থান সম্পর্কে। তিনি উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দিয়েছেন, সে দেশের পরিবারে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কতোটা বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সম্মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, সন্তানদের সঙ্গে পিতামাতার এবং ভাইবোনদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কতো ঘনিষ্ঠ তিনি তারও বর্ণনা দিয়েছেন। বিলেতের সমাজের যে জিনিসগুলো তাঁর খারাপ লেগেছে, তার সমালোচনা করতে তিনি আদৌ কুণ্ঠিত বোধ করেননি, কিন্তু তাঁর রচনার আগাগোড়া যে ভাবটি প্রকাশিত তা হলো বিলেতের সমাজের ভালো জিনিসগুলো দিয়ে তাঁর নিজের সমাজের সংস্কার করে

নেওয়া। *ক্যালকাটা রিভিয়ু* পত্রিকা যথার্থই তাঁর এ বই সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল (১৮৮৬) যে, এটি হলো বাংলা ভাষায় এ ধরনের বইগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

দেশে ফিরে কৃষ্ণভাবিনী আর পূর্ণাঙ্গ কোনো বই লেখেননি। কিন্তু বেশ কয়েকটি সাময়িকপত্রে অনেকগুলো রচনা প্রকাশ করেন। সবগুলোরই লক্ষ্য এক—স্ত্রীশিক্ষা এবং নারীদের অধিকার বৃদ্ধি। য়ুরোপে সভ্যতার যে উন্নতি হয়েছে, নারীদের অবস্থার উন্নতি তাতে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং ভারতবর্ষকেও উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হলে তার মহিলাদের অবস্থা উন্নত করতে হবে— বার বার তিনি এ কথাটা তাঁর পাঠকদের মনে করিয়ে দেন। তা ছাড়া, বাস্তব জীবনে— তাঁর স্বামী এবং পুত্র আকস্মিকভাবে মারা যাবার পর তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসার এবং বিধবাদের দুর্দশা মোচনের জন্যে হাতে-কলমে যে কাজ আরম্ভ করেন, তাও প্রমাণ করে নারীমুক্তির প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি কতো আন্তরিক ছিল। তবে এসব সত্ত্বেও, তিনি মেয়েদের উন্নতি এবং তাঁদের মুক্তির যে সংজ্ঞা দেন, তা মোটেই বৈপ্লবিক ছিল না। বস্তুত, তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোশ করার একটা মনোভাব অনুপস্থিত নয়। মেয়েরা লেখাপড়া শিখে ভালো গৃহিণী হয়ে উঠবেন, ভালোভাবে সন্তান লালন করবেন, পুরুষদের উন্নততর সঙ্গ দেবেন ইত্যাদি তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হলেও, ভদ্রঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে চাকুরিবাকরি করে কোনো অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করবেন, এটাকে তিনি বাঞ্ছনীয় বলে ভাবতে পারেননি। ইংল্যান্ডের সমাজে মহিলাদের যে স্বাধীনতা দেখে তিনি অমন প্রশংসা করেছিলেন, তা আংশিক অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছাড়া আসতে পারতো কিনা, বোঝাই যাচ্ছে, তিনি তা খতিয়ে দেখেননি।

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ছাড়া নারীমুক্তি অসম্ভব—এ কথা বলার জন্যে আরও এক প্রজন্ম অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলেছিলেন বেগম রোকেয়া। আশ্চর্যের বিষয়, তুলনামূলকভাবে অনেক অনগ্রসর মুসলমান সমাজের একজন মহিলা এ কথা বলেছিলেন। তিনিও কৈলাসবাসিনী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো প্রধানত স্বামীর কাছে সত্যিকার লেখাপড়া শেখেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দেবেন্দ্রনাথ দাসের মতো রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেনও বিলেতে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে রোকেয়ার পরিবেশে রক্ষণশীলতা আরও কঠোর ছিল বলেই ধারণা করি। তার মধ্যে তিনি কোথা থেকে এমন ঔদার্য এবং সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে এমন বৈপ্লবিক চিন্তাধারা স্বীকরণ করেছিলেন, সেটা অনুমানই করতে পারি, তার সঠিক উত্তর আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা এবং মূল্যবোধ তিনি যেখান থেকেই পেয়ে থাকুন না কেন, নারীমুক্তি সম্পর্কে তিনি যে ধারণা দিলেন, সেটা ছিল তখনও পর্যন্ত সবচেয়ে আধুনিক।

তিনি মেয়েদের অবস্থার উন্নতি চেয়েছেন, কিন্তু কতোটা? এক কথায় তিনি তার উত্তর দিয়ে বলেছেন, একেবারে পুরুষের সমান। তিনি বলেছেন, উন্নতির মাত্রা কারো সঙ্গে তুলনা করে দেখাতে হবে। সে জন্যেই তিনি পুরুষদের সঙ্গে তুলনা করছেন, নয়তো বলতেন অ্যাবসোলিউট উন্নতি। মেয়েদের কর্ম ভূমিকা সম্পর্কে তিনি ছিলেন ঐতিহ্যিক ধারণা থেকে একেবারে যোজন যোজন দূরে। তাঁর মতে, এমন কোনো কাজ নেই, যা মেয়েরা করতে পারে

না বা করবে না। পুরুষরা ব্যবসা করতে পারলে মেয়েরাও ব্যবসা করতে পারবেন। পুরুষরা ব্যারিস্টার হতে পারলে মেয়েরাও নিশ্চয় ব্যারিস্টার হতে পারবেন। এমনকি, জমিতে গিয়ে মহিলারা চাষাবাদের কাজই বা করবেন না কেন? তাঁর বিবেচনায়, যেকোনো কাজে মহিলারা পুরুষদের সমান তো বটেই, এমনকি, এমন দিনও আসতে পারে যখন মেয়েরাই পুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম বলে বিবেচিত হতে পারেন। তাঁর কল্পনার নারীস্থানের নারীরা তাই যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে চিরকাল পুরুষরা যে কাজগুলো করে এসেছেন সেই কাজগুলো করেন, আর পুরুষরা বাড়িতে বসে ঘরের কাজ করেন।

রোকেয়া উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, মেয়েরা অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করে স্বাবলম্বী হতে না পারলে সত্যিকার অর্থে কখনোই স্বাধীন হতে পারবেন না। সে জন্যে, তিনি তাঁদের অর্থনৈতিক ভূমিকার ওপর অতো জোর দিয়েছেন। এখানটাতে তাঁর পূর্ববর্তী মহিলাদের সঙ্গে তাঁর মিল নেই। তাঁর আগের মহিলারা লেখাপড়া শিখে আরও ভালো স্ত্রী হবার প্রতি যতোটা ঝোঁক দিয়েছেন, তাঁদের স্বাধীনতার দিকে ততোটা নজর দেননি।

রোকেয়ার সঙ্গে আগেকার নারী প্রগতির পথিকৃৎদের আর-একটি পার্থক্য তাঁর নারীদের উন্নতির কথা বললেও, নারী এবং পুরুষের একেবারে সমান অধিকারের কথা বলেননি। বলেননি, বিবাহিত শরিক নারীর স্বামী অর্থাৎ প্রভু নন, তাঁর জীবনসঙ্গী মাত্র। তিনি অর্ধাঙ্গিনী হলে, তথাকথিত 'স্বামী' তাঁর অর্ধাঙ্গ, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বর্তমানে যাকে ফ্যামিনিজম বা নারীবাদ বলা হয়, তার মূল কথাটা প্রোলেটারিয়েটদের মতো নারীদের একটা নির্যাতিত এবং শোষিত শ্রেণি হিসেবে গণ্য কর। এই শতাব্দীর একেবারে গোড়াতে, তার মানে প্রায় এক শতাব্দী আগে লিখলেও তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, পুরুষরা কিভাবে কতোগুলো সনাতন ভূমিকার সঙ্গে নারীদের শনাক্ত করে এবং অলৌকিকত্বের দোহাই দিয়ে ধর্মীয় বিধান রচনার মাধ্যমে নারীদের চিরকাল শোষণ করে এসেছেন। রোকেয়ার মধ্যে সেই শোষিত শ্রেণি সচেতনতা লক্ষ্য করি। যদ্দুর জানি, তাঁর আগে অন্য কোনো বাঙালি মহিলা—এবং ভারতীয় মহিলা—এমন স্পষ্ট করে এই শ্রেণি শোষণের কথা বলেননি। সে দিক দিয়ে রোকেয়াই প্রথম বাঙালি ফেমিনিস্ট। এবং সত্যি বলতে কি, তাঁর প্রায় এক শতাব্দী পরেও, তিনি যে সচেতনতার মাত্রা তাঁর রচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, বাঙালি মহিলারা তার থেকে বেশি দূরে এগিয়ে যেতে পারেননি।

মহিলা হিসেবে রোকেয়ার আরও একটা অবদান তাঁর স্বরূপ নির্দেশে। তিনি যে কালে নিজেকে কেবল বাঙালি নয়, প্রাদেশিকতা এবং ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে একজন ভারতীয় বলে পরিচয় দেন, তখন অন্য কোনো মহিলা দূরে থাক, রবীন্দ্রনাথও সেই ঔদার্য প্রকাশ করতে পারেননি। রোকেয়ার আগেকার যে নারীদের কেউ তাঁদের স্বসম্প্রদায়ের বাইরে তাঁদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে সমর্থ হননি। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা প্রত্যাশিতও ছিল না। কিন্তু রোকেয়া তা পেরেছিলেন এবং সে কারণে সেকালের বাঙালি-নারীপ্রগতির ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে প্রাগ্রসর চিন্তক।

অবশ্য এই পথিকৃৎ নারীদের অবদানের মূল্যায়ন করার সময়ে তাঁদের বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পটভূমিতে স্থাপন না-করলে তাঁদের মূল্যায়ন যথার্থ হবে না। সেকালের বঙ্গদেশের নারীপ্রগতি

আন্দোলনের ধারণা এসেছিল পাশ্চাত্য থেকে। সুতরাং আমাদের চিন্তকদের বক্তব্য কতোটা তাঁদের পড়া বই থেকে পাওয়া, কতোটা সত্যিকার উপলব্ধিজনিত তা বিবেচনা করা দরকার। কতোগুলো ব্যাপারে বঙ্গদেশের তুলনায় ইংল্যান্ডে নারীপ্রগতির পথ অনেক সহজ ছিল, বিশেষ করে লোকাচারের কথাই এখানে মনে করছি। রেনেসাঁস পরবর্তী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ এবং উদারনৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করা সেদেশে শক্ত ছিল না। কিন্তু সেখানে প্রধান বাধাটা এসেছিল রাজনৈতিক এবং চার্চের তরফ থেকে। ভারতবর্ষ এবং তখনকার অন্যান্য ইংরেজ উপনিবেশে সরকারী সংস্কার করা এ জন্যে তুলনায় সহজ হয়েছিল। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অধিকার, ভোটাধিকার ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। অপরপক্ষে, বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষে প্রধান বাধা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসেনি, তা এসেছিল ধর্মীয় সংস্কার এবং লোকাচার থেকে। আর সেই সঙ্গে আমাদের চিন্তকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বদলে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতার প্রতি অধিকতর প্রতিশ্রুতির ফলে। কে কতোটা সে বাধা অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন, তার ওপর তাঁদের প্রগতির মাত্রা নির্ভর করছিল। স্বামীর ঔদার্য এবং আর্থিক/সামাজিক মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাসবাসিনী সেটা সীমিত মাত্রায় পেরেছিলেন। কিন্তু আইসিএস-এর স্ত্রীহেসেবে জ্ঞানদা দেবী তার পুরো সুযোগ নিতে পেরেছিলেন। উচ্চশিক্ষিত, বিলেতফেরত এবং বিত্তের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ এবং সাখাওয়াতের স্ত্রীরাও অংশত তার ফল লাভ করেছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাও এ ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নারীপ্রগতি

যুদ্ধ না হলেও, ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ঘটনা পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলা উভয়কেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে এ প্রভাবের স্বরূপ আলাদা, মাত্রাও সম্ভবত। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে, তেমন কিছু পশ্চিমবঙ্গে হয়নি। বাংলাদেশে অন্য একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটেছিল তার আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে। ১৯৪৭ সালে বাংলাভাষী মুসলমানরা ধর্মীয় পরিচয়কেই একমাত্র পরিচয় ধরে নিয়ে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন দেড় হাজার মাইল দূরবর্তী আলাদা একটা জাতির সঙ্গে। কিন্তু পরবর্তী দু দশকের মধ্যে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়কে প্রায় ভুলে গিয়ে ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক পরিচয়কে মুখ্য করে তাঁরা জন্ম দিয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের। এত অল্পসময়ের মধ্যে কেনো একটা জাতির স্বরূপের এমন আমূল এবং ব্যাপক পরিবর্তন একেবারে অভূতপূর্ব কিনা জানিনে, কিন্তু নিঃসন্দেহে অসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গে আলোচ্য সময়ে অসাম্প্রদায়িকতার ধার কমেছে, ভারতীয় হিসেবে নিজেদর স্বরূপ সম্পর্কে সচেতনা বেড়েছে, কিন্তু এ রকমের যুগান্তর ঘটেনি।

বাংলাদেশে দ্বিতীয় দফা পরিবর্তনের স্রোত এলো ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে। এই যুদ্ধে ন মাসের মধ্যে থেকে গেলেও, তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সেই প্রভাব পড়েছে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

এক শো বছর আগে বাঙালি মহিলাদের যে অবস্থা ছিল, সে সম্পর্কে আমরা সবাই অল্পবিস্তর অবগত। গত শতাব্দীর সমাজ সংস্কারকদের এবং কোনো কোনো মহিলার রচনা থেকে তাঁদের সামাজিক অবস্থানের বেশ ঘনিষ্ঠ চিত্র দেখতে পাই। গৃহপালিত জন্তুদের সঙ্গে তখনকার মহিলাদের একটা বড়ো পার্থক্য চোখে পড়ে—গৃহপালিত জন্তুদের বিচরণের ক্ষেত্র মহিলাদের অন্তঃপুরের তুলনায় কিছুটা বিস্তৃত ছিল। রাসসুন্দরী দেবী অথবা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখনকার পর্দাপ্রথার যে উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে মনে হতে পারে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পর্দা প্রথার কঠোরতা কমবেশি একই রকমের ছিল। কিন্তু বেগম রোকেয়ার অবরোধবাসিনী পড়লে মুসলমানদের পর্দাকে আরও কঠোর বলেই মনে হয়। সত্যি বলতে কি, বিধবাদের কৃচ্ছ্রসাধনার কথা বাদ দিলে মুসলমান মহিলাদের অবস্থা হিন্দু মহিলাদের তুলনায় আরও শোচনীয় ছিল বলেই আমার ধারণা।

তবে এ বিষয়ে যদি বা কিছু সন্দেহ থাকে, তাঁদের খাঁচা খোলার কাল সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে, বিশেষ করে উদারপন্থী ব্রাহ্মদের মধ্যে, মহিলাদের অবস্থা গত শতাব্দী শেষ হবার আগেই উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হতে থাকে। এবং একবার সমাজের ওপর তলায় এ উন্নতি দেখা দেবার পর ধীরে ধীরে তা নিচের দিকে চুইয়ে নামতে খুব একটা সময় লাগেনি। ঘরের পাশের বাঙালি মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা লাভের মতোই এ ক্ষেত্রেও বেশ কয়েক দশক পিছিয়ে ছিলেন।

১৯৪৭ সালে যখন দেশ বিভক্ত হয়, তখন মুসলমান মহিলাদের শিক্ষার হার ছিল খুবই সামান্য। ইংরেজি শিক্ষার কথা ধরলে শিক্ষিত মুসলমান মহিলাদের সংখ্যা তখন হাতে গোণা যেতো। সারা পূর্ব বাংলায় কজন মুসলমান মহিলা সেকালে চাকুরি করতেন, সে সংখ্যা আমার সঠিক জানা নেই; কিন্তু ছোটোবড়ো চাকুরি মিলে সেটা নিশ্চিতভাবে কয়েক শোর বেশি ছিল না।

এছাড়া, পর্দাপ্রথা তখন প্রায় সার্বজনিক ছিল। তবে দেশ বিভাগের পরে পর্দাপ্রথার কঠোরতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। যদিও বোরখার প্রচলন তখনও চলতে থাকলো। অবশ্য মহিলারা বোরখা পরলেও, অবিবাহিত মেয়েরা অনেকে বোরখা পরতেন না। আবার অনেক সময়ে দেখা যেতো, মহিলারা বাইরে বোরখা না পরলেও, বাড়িতে কোনো অতিথি অথবা আত্মীয়স্বজন এলে তাঁদের সামনে তাঁরা পর্দা পালন করতেন। গ্রামে শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার তুলনায় অনেক কম ছিল। এবং সাধারণ পরিবারের মধ্যে পর্দার চলন শহরের মতো অতোটা ব্যাপক অথবা কঠোর ছিল না। প্রসঙ্গত গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার একজন ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্টের মন্তব্যের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, গ্রামের কোনো মুসলমানের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে প্রথমেই সে যা করতো, তা হলো বাড়িতে একটা পায়খানা তৈরি করতো আর মহিলাদের যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়, তার জন্যে বাড়ির কোনো কোনো জায়গায় বেড়া দেবার ব্যবস্থা করতো। অর্থাৎ জাতে ওঠার জন্যে পর্দা ছিল আবশ্যিক। বস্তুত, এটা ছিল শ্রীনিবাস কথিত সংস্কৃতায়নের একটা প্রক্রিয়া। তা না হলে গ্রামের সাধারণ পরিবারের মেয়েরা নানা অর্থনৈতিক কাজকর্মে অংশ নিতেন এবং সে জন্যেই তাঁদের পর্দা করার মতো বিলাসিতা অথবা উপায় ছিল না।

দেশ বিভাগের পর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না থাকায় এবং সুযোগসুবিধা অনেকটা বেড়ে যাওয়ায়, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৌলিক শিক্ষা, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। সমান্তরালভাবে নগরায়ণ, পাশ্চাত্যায়ণ, আধুনিকায়ণ—এসব প্রক্রিয়াও চলতে থাকে মোটামুটি একই তালে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন এই পরিপ্রেক্ষিতেই অনুভূত হয়। এবং স্ত্রীশিক্ষা দেবার অনুকূল পরিবেশও তৈরি হয় এ সময়ে। স্ত্রীশিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পর্দাপ্রথার জোরও কমতে আরম্ভ করে। এমনকি, শিক্ষিত মহিলাদের কেউ কেউ চাকুরিবাকরিও নিতে থাকেন। যদিও প্রথম দিকে শিক্ষকতা আর ডাক্তারির মতো গুটিকয়েক ঐতিহ্যিক পেশার কথাই তাঁরা ভাবতে পারতেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা যুদ্ধের আগে পর্যন্ত অনেকেই এম এ, বি এ পাশ করেছেন; কিন্তু খুব কমই চাকুরি নিয়েছেন। পাশ করার কারণ দ্বিবিধ—স্ত্রী চাকুরি না করলেও পাশ করা স্ত্রী থাকাই তখন ধীরে ধীরে মর্যাদার প্রতীক এবং ফ্যাশনে পরিণত হচ্ছিলো। আর বিয়ের বয়স বৃদ্ধি পাওয়ায়, মেয়েদের জন্যে কলেজ এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো সম্মানজনক পথ খোলা ছিল না। এর ফলে কেবল যে বিয়ের আগেকার প্রতীক্ষাকালীন কটা বছর সেখানে নির্বিঘ্নে এবং বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে কাটানো যেতো, তাই নয়; অনেক সময়ে আবার সেখানেই বিয়ের পাত্রও জুটে যেতো। মোট কথা, যুদ্ধের আগে পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় মেয়েদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে ঠিকই, তবে তা হয়েছে খুব ধীর গতিতে। উন্নতি সম্পর্কে মেয়েদের অভিভাবকদের, এমন কি, তাদের নিজেদের মনোভাব ছিল নিতান্তই রক্ষণশীল। ফলে সেই পরিবেশে সত্যিকার নারীমুক্তি ছিলো সুদূরপরাহত।

কিন্তু ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময়ে পূর্ব বাংলার লোকেরা বহু অসাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন। এক দিকে, এ সময়ে ধর্ষণ থেকে আরম্ভ করে মাইলের পর মাইল হাঁটা, দরকার বোধে দৌড়ে পালানো, গ্রামের দরিদ্র বাড়িতে অথবা সীমান্ত এলাকায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে দিনের পর দিন সেখানে বাস করা, খাদ্য-অখাদ্য খাওয়া, ন্যূনতম কাপড়চোপড় পরা, অন্যায় এবং অযৌক্তিক আচরণ সহ্য করা ইত্যাদি নানা রকমের কৃচ্ছ্র সাধনাই মেয়েদের এবং তাঁদের পুরুষ আত্মীয়দের গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ন মাসের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার আগে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পুরুষরা, এমনকি, মহিলারা নিজেরা ভাবতে পারতেন না, বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত এবং নরমশরম মহিলারা এসব করতে অথবা সহ্য করতে পারেন।

অন্য দিকে, শরণার্থী হয়ে যাঁরা ভারতে গিয়েছিলেন, সেই মহিলা ও পুরুষরা পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের এমনসব ভূমিকা পালন করতে দেখেছিলেন, যা দেখতে আগে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন না। কলকাতায় মেয়েরা যে অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন অথবা যেভাবে বাজার এবং অন্যান্য সামাজিক কাজকর্ম করতেন, তার চেয়েও বড়ো কথা যেভাবে তাঁরা পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাসে-ট্রামে অথবা প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেন, এক কথায়, টিকে থাকতেন, সে আদর্শ বাংলাদেশের মহিলা এবং পুরুষদের সবারই চোখ খুলে দিয়েছিল। তখনকার কলকাতার মহিলাদের পোশাকপরিচ্ছদও শরণার্থীদের রক্ষণশীলতায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল বলে মনে হয়। অতঃপর স্বদেশে ফিরে বাংলাদেশের মহিলারা একই ধরনের ব্লাউজ আর

শাড়ি মোটামুটি একই ভঙ্গিতে পরেছিলেন। বস্তুত, যুদ্ধের ফলে আমাদের ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ দারুণ চোট খেয়েছিল। সে কারণে যুদ্ধের পর বাংলাদেশের মহিলাদের নিজেদের মধ্যে এবং তাঁদের পুরুষ অভিভাবকদের মধ্যে নতুন কিছু করার—পরীক্ষানিরীক্ষা করার অনেক সাহস বেড়েছিল।

তদুপরি যুদ্ধের পরে এমন অর্থনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হলো, যা মহিলাদের পরিবর্তনে বিপুলভাবে সহায়তা করেছে। যুদ্ধের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া ছাড়াও, একটা মস্ত বড়ো ক্ষতি হয়েছিল বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি এবং বন্টন ব্যবস্থার। ন মাসের যুদ্ধের সময়ে দেশ থেকে ভোগ্যপণ্য ধীরে ধীরে বলতে গেলে নিঃশেষিত হয়েছিল। যুদ্ধের পরেই টুথপেস্ট থেকে আরম্ভ করে কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসই বাজার থেকে উধাও হয়েছিল। হন্যে হয়ে খুঁজেও ক্রেতারা তখন তাঁদের পুরোনো ব্র্যান্ডগুলো বাজারে পেলেন না। তার বদলে পেলেন বাড়ির পাশের ভারত থেকে আনা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল কিছু মালামাল। এগুলোর কিছু এসেছিল সরকারী পথে, কিন্তু বেশির ভাগই এসেছিল চোরাই পথে। ভারতের এইসব মালামাল ছিল গুণগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের ক্রেতাদের পরিচিত পশ্চিমা, জাপানী অথবা চীনা পণ্যের তুলনায় নিম্ন মানের। তা সত্ত্বেও, এসব মালামালের দামই একেবারে আকাশ ছুঁয়েছিল। সেই সঙ্গে চাল-ডাল থেকে আরম্ভ করে স্বদেশে উৎপাদিত মালামালের দামও। প্রকৃতপক্ষে, অসাধারণ মুদ্রাস্ফীতির দরুণ ঠিকাদার, ব্যবসায়ী এবং বণ্টনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নব্য ধনীরা ছাড়া সবাই কমবেশি বেকায়দায় পড়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছিলেন শিক্ষিত চাকুরিজীবীরা। তাঁদের বেতন যতটা বেড়েছিল, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল তার চেয়ে অনেক গুণ।

এই অবস্থায়ই শিক্ষিত পরিবারের মহিলারা বাড়ি থেকে বের হন চাকুরি করতে। এ সময়ে মুজিব সরকার শতকরা দশ ভাগ চাকুরি মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত করেন। জানিনে এ ব্যাপারে আমলারা নিজেদের স্ত্রীদের তথা নিজেদের সুবিধে হবে—এই কথাটাই বিবেচনা করেছিলেন কিনা। কিন্তু যাঁদের অনুকূল্যেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাক, বাংলাদেশের নারীদের চার দেয়ালের বন্দীত্ব ঘোচানোয় এ সিদ্ধান্ত অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার ঠিক পরেই বিভিন্ন সরকারী অফিসে পিওন থেকে আরম্ভ করে বহু সাধারণ চাকুরিতে মহিলারা ঢুকে পড়েন। এ ছাড়া, যে মহিলাদের আগে থেকেই ডিগ্রি ছিল, প্রতিযোগিতার অভাবে তাঁরা সহজেই ভালো চাকুরি পেলেন। এবং বাড়তি আয় দিয়ে অবিলম্বে সংসারে খানিকটা সাশ্রয়ও নিয়ে এলেন।

যে মহিলাদের ডিগ্রি ছিল না এবং অফিসের অতি সাধারণ চাকুরি নিতে যাঁরা তৈরি ছিলেন না, সেই তিরিশ-চল্লিশ-পশ্চাশ বছরের মহিলারা সংসার ফেলে বের হলেন ডিগ্রির হরিণ খুঁজতে। এবং সেই অন্বেষণে তাঁদের বেশি সাধনাও করতে হয়নি। ১৯৭২ সাল থেকেই দেশে নজিরবিহীন মাত্রায় নকল চালু হয়েছিল। (যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্ররা এটাকে তাদের ন্যায্য অধিকার বলেই বিবেচনা করেছিল। ৭১-এর কলকাতার নকল নৈরাজ্যের দৃষ্টান্তও হয়তো এ ক্ষেত্রে কাজ করেছিল।) সেই নকলের ভরসায় এবং চাকরির লোভেই বহু কাল আগে বিবাহিত এই মহিলারা লেখাপড়ার নতুন রাস্তায় নেমেছিলেন। বলাই বাহুল্য, অনেকেই

এ রকমের ছিলেন না। বরং নিজের সুপ্ত ক্ষমতা উস্কে দিয়েই তাঁরা সাফল্য লাভ করেছিলেন।

মোট কথা, গোড়ার দিকে খানিকটা পৃষ্ঠপোষণার দরকার হলেও, মহিলারা ১৯৯০-এর দশকে এসে নিজেদের যোগ্যতা দিয়েই পুরুষদের সঙ্গে চাকুরি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছেন। প্রাশাসনিক এবং বিচার বিভাগের বহু উচ্চ পদে এখন তাঁরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং এসব চাকুরি পাওয়ার জন্যে তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছে। দু তিন দশক আগে এ ধরনের চাকুরিতে অথবা, ধরা যাক, পেশাদার আইনজীবীর ভূমিকায় মহিলাদের কল্পনা করা যেতো না। কিন্তু এখন এ ধরনের পদে এবং পেশায় মহিলাদের দেখে দেখে মহিলাদের ক্ষমতা সম্পর্কে পুরুষদের এবং মহিলাদের নিজেদের ধারণা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

সরকারী চাকুরি ছাড়াও, বেসরকারী খাতে মহিলাদের জন্যে, বিশেষ করে সামান্য লেখাপড়া জানা অথবা অশিক্ষিত মহিলাদের জন্যে একটা মস্তো বড়ো সুযোগ এসেছে পোশাকশিল্পের প্রসার ঘটায়। এসব শিল্পের মালিকরা মহিলাদের নির্ঝঞ্ঝাট শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এখন এই শিল্পের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি কর্মী হলেন মহিলা এবং এতে কয়েক লাখ মহিলা নিয়োজিত আছেন। নিয়মিত আয় করতে আরম্ভ করে এই মহিলারা রাতারাতি তাঁদের পরিবারে নতুন মর্যাদা লাভ করেছেন। তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, এঁরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে দ্রুত সচেতন হয়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের নারীপ্রগতিতে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির অবদান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ, ব্যাঙের পা রপ্তানি, তাঁত শিল্প এবং হস্ত শিল্পের সঙ্গেও হাজার হাজার মহিলা যুক্ত আছেন। গ্রামের বহু দরিদ্র মহিলা স্বাবলম্বী হবার পথে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা পেয়েছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে গত দু দশকে, সে শুধু দারিদ্র্যের নয়, সেই সঙ্গে অযোগ্যতা এবং দুর্নীতির। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংক একটি অসাধারণ ব্যতিক্রম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন পর্যন্ত এই অসাধারণ ব্যাংকের সাফল্য লক্ষ্য না করে পারেননি। তাঁর মতে, এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মহাম্মদ ইউনুসের নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত।

গ্রামের অশিক্ষিত এবং শ্রমিক হিসেবে অদক্ষ মহিলারাও ঘরে বসে থাকলেন না। ১৯৭৩ সাল নাগাদ যখন দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়তে আরম্ভ করলো এবং তারপর ১৯৭৪ সালে যখন সত্যি সত্যি দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো, তখন তাঁরা এমন ধরনের কাজ আরম্ভ করলেন বাংলাদেশের মহিলাদের যা কোনো কালে করতে দেখিনি। এ সময়ে ঢাকা থেকে আরিচা যাবার পথে দেখা যেতো পথের ধারে অসংখ্য মহিলা ইট ভেঙ্গে সুরকি করছেন অথবা মাটি কেটে রাস্তা তৈরী করছেন। হয়তো এই মহিলাদের অনেকের স্বামীরাও একই সঙ্গে এক মজুরিতে ঐ একই কাজ করছিলেন। বলা বাহুল্য, এটা কেবল ঐ রাস্তার দু ধারেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বাংলাদেশের অন্যত্রও কমবেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথাও কোথাও তাঁরা খাল খননের কাজও করেন। এভাবে এতো কাল পুরুষ এবং মহিলাদের শ্রমের যে বিভাগ ছিল প্রতিকূল পরিবেশের মুখে সেটা ভেঙ্গে পড়ল। অবশ্য যেসব ভূমিকা চিরকাল পুরুষদের জন্যেই নির্ধারিত ছিল, এখন মহিলারা সেসব পালন করতে আরম্ভ করায় এবং পরিবারের অর্থনীতিতে তাঁরা সরাসরি নগদ অর্থ নিয়ে আসায় পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়েছিল, আমার জানা নেই।

তবে অনুমান করি, স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক রূপান্তরের আর একটা সুযোগ এসেছিল প্রাতিষ্ঠানিক পথে। এবং সেটা বোধ হয় একেবারে গোড়ার দিকে শুরু হয় বীরাঙ্গনা মহিলাদের অর্থাৎ যুদ্ধের সময়ে ধর্ষিতা মহিলাদের নাম করে। বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক বহু সংস্থা এই অসহায় মহিলাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল। এই মহিলাদের অনেকেই স্বামী অথবা অভিভাবক হারিয়েছিলেন। তার চেয়েও শোচনীয়, অনেক পরিবার এঁদের ফিরিয়ে নিতে চাইছিল না লজ্জায় এবং সামাজিক কেলেঙ্কারীর ভয়ে। সুতরাং অবিলম্বে তাঁদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন ছিল। তাঁদের পুনর্বাসন মানে তখনকার মতো খাদ্য এবং আশ্রয় আর ভবিষ্যতের জন্যে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তোলা। এই মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁদের জন্যে নানা রকমের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। বস্তুত, এভাবেই স্বাবলম্বী নারীর দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। পরে কেবল বীরাঙ্গনারাই নন, অন্য মহিলারাও এর দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন।

আলোচ্য কালে বাংলাদেশের মহিলাদের আরও একটা পরিবর্তন এসেছিল—নিতান্তই চাপের মুখে। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি এবং এঁদের শতকরা কুড়ি ভাগ ছিলেন হিন্দু। এই হিন্দুদের একটা প্রধান অংশই এক-একটা দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দেন। তা ছাড়া, যুদ্ধের পরে হিন্দু শরণার্থীদের অনেকে ভারত থেকে ফিরেও আসেননি। তা সত্ত্বেও, মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়। যুদ্ধের ঠিক পরে বাংলাদেশের নেতারা এই বিশাল সমস্যা সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। সে জন্যেই বোধ হয়, লন্ডনে অস্ত্রোপচারের কদিন পরে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবর রহমানকে যখন এই সমস্যা সম্পর্কে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তিনি তার জবাবে বলেছিলেন : আমাকে আমার জনগণ ভালোবাসেন, আমি যখনই তাঁদের বলবো থামুন, তখনই তাঁরা থামবেন। কিন্তু কার্যকালে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের প্রিয়নেতার কথা মনে করে সন্তান উৎপাদনে বিরতি দেননি। বরং দেখা গেল অল্পকালের মধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা তিন ছাড়িয়ে গেল। আন্তর্জাতিক অনেকগুলো সংস্থাই এই পরিবেশে জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশকে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে নানা ধরনের সাহায্য দিতে আরম্ভ করে।

পূর্ব বাংলায় সরকারী উদ্যোগে জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু হয়েছিল সম্ভবত ১৯৬৫ সালে। কিন্তু তখন শহরের মুষ্টিমেয় পরিবার ছাড়া এই সুবিধের সুযোগ কেউই বড়ো একটা নেননি। কিন্তু যুদ্ধের পরে দারুণ অর্থনৈতিক অভাবের মুখে গ্রামের মহিলাসহ বহু মহিলাই পরিবারের আকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের নারীমুক্তির ইতিহাসে এই সচেতনতা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পর্দাপ্রথার মতো অনেকগুলো সন্তান ধারণ এবং তাদের লালন যে মহিলাদের শারীরিকভাবেই কার্যত দাসীত্বে পরিণত করে— আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরও সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা ছিল না—হয়তো এখনো নেই। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কালের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতি এবং সেই সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক

সহায়তা এই উভয়ের অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটায় বাংলাদেশের লাখ লাখ মহিলা পরিবারের আকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পান।

বাংলাদেশে এখনো প্রায়ই পত্রপত্রিকায় স্ত্রীহত্যার এবং নির্যাতনের খবর দেখা যায়। অনেক সময়ে স্ত্রীর পিতামাতার প্রতিশ্রুত পণ বাবদে একটা বাইসাইকেল অথবা একটা রেডিও কি টেলিভিশন কি কয়েক শো টাকা আদায় না হওয়ার জন্যেই হয়তো এসব খুনের অথবা নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অনেক সময়ে আরও তুচ্ছ কারণে। তবে এসব ঘটনা ঘটে সাধারণত গ্রামে। এবং সে কারণে ধরে নিচ্ছি, অশিক্ষিত এবং অভাবী পরিবারে। কিন্তু গ্রামের অশিক্ষিত পরিবারে এ ধরনের ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই আমার ধারণা। সেই সচেতনতা প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছে। বিশেষ করে শহরের পরিবারে যুদ্ধের পরে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা থেকে হয়তো অধিকার সচেতনতা এবং তার ফলে পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন বৃদ্ধিরই পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যুদ্ধের আগে বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামে, বহুবিবাহ একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বহুবিবাহ কার্যত লোপ পেয়েছে। হয়তো আর্থিক অস্বচ্ছলতাই তার কারণ। কিন্তু মহিলাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারের পারিবারিক আইন এর পেছনে থাকতে পারে।

প্রসঙ্গত আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে মনে পড়ছে। যুদ্ধের পরে নারীর অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে একাধিক আইন প্রণীত হয়েছে। তা ছাড়া, মহিলারা নিজেরাই এ সম্পর্কে একাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া, উইমেন ফর উইমেনের মতো বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মহিলাদের প্রতিষ্ঠানও এখন বাংলাদেশে কাজ করছে। গণস্বাস্থ্য, ব্র্যাক, বাঁচতে শেখা, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নামও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে। এ ধরনের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আবার নারীকল্যাণের অঙ্গ হিসেবে পরিবার পরিকল্পনার কাজও করে। এবং সেই সুবাদে বিদেশী সংস্থার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পায়। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা এবং এদের তরফ থেকে বইপত্র প্রকাশ করা সহজ হয়।

বইপত্রের প্রসঙ্গে আর একটা কথা এখানেই বলে নেওয়া ভালো—বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে আগের তুলনায় অনেক বেশি মহিলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। কেবল সংখ্যা দিয়েই এর গুরুত্ব বোঝানো যাবে না। যদিও বর্ধিত সংখ্যাও বর্ধিত সচেতনতার একটা প্রমাণ। কিন্তু সত্যিকার সচেতনতার প্রমাণ মিলছে এখন যে মহিলারা সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসছেন, তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু এবং গুণগত মান থেকে। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত যে মহিলারা সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের সবারই পরিচয় দিতে গিয়ে মহিলা কবি কি সাহিত্যিক বলতে হতো। দু চারটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা ছাড়া তাঁদের সাহিত্যও ছিল ভিন্ন স্বাদের এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপরিণত। আমার ধারণা, এই মহিলা সাহিত্যিকরা নিজেরাও নিজেদের মহিলা সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। কিন্তু যুদ্ধের পরে এখন কোনো কোনো মহিলা সাহিত্যিক নিজেদের সাহিত্যিক হিসেবেই পরিচয় দিতে চান, মহিলা হিসেবে নয়। কেবল তাই নয়, এঁদের রচনা পড়লে তাকে বিশেষ করে মহিলাদের রচনা বলেও মনে হয় না। প্রসঙ্গত সেলিনা হোসেনের নাম এখানে মনে

পড়ছে। তসলিমা নাসরিনের নামও বলতে পারতাম। কিন্তু না বলার কারণ তিনি নারীবাদী হিসেবে সারাক্ষণই মহিলাদের প্রতি পুরুষরা কতো অত্যাচার করছে এ কথা বলেন, সুতরাং তিনি যে নারী এবং নির্যাতিত নারীদের প্রতিনিধি এ কথাটা তিনি নিজেও ভোলেন না, অন্যদেরও তা ভুলতে দেন না। অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী লেখিকা হলেও তাঁর শাড়ি (হতে পারে সে শাড়ি বিদ্রোহের পতাকা) আমাদের চোখে না পড়ে পারে না। সেলিনা আর নাসরিনের মধ্যে আর একটা পার্থক্য সেলিনা সাহিত্যিক, নাসরিন মাঝেমধ্যে কবিতা লিখলেও মূলত নারীবাদী লেখিকা।

তবে মনে করার কারণ নেই, নাসরিনের ক্ষমতাকে আমি ছোট করে দেখছি। বস্তুত, আমার ধারণা, বেগম রোকেয়ার পরে তিনিই সবচেয়ে সাহসী লেখিকা। তাই বা কেন, আমি বলবো, তিনি রোকেয়ার চেয়েও একদিক দিয়ে বেশি সাহসী। কারণ ধর্মের নাম করে রোকেয়া নারীদের প্রতি পুরুষদের নির্যাতনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার কথা পর্যন্ত বলেছেন। নাসরিন সমান অধিকার এবং ধর্মের নামে নির্যাতন ছাড়াও, পুরুষ ও নারীর যৌনবিষয়ক দ্বৈত মানের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি যৌনবিষয়ে যেসব কথা লিখেছেন একজন মহিলার কাছ থেকে তো দূরের কথা, পুরুষদের কাছ থেকেও পাঠকসমাজ সেটা প্রত্যাশা করেন না। ডাক্তার হিসেবে তিনি পাঠকপাঠিকাদের হয়তো একটা শক ট্রিটমেন্ট দিতে চান। সেটা যদি তাঁর অভিপ্রায় হয়ে থাকে তা হলে তিনি সফল হয়েছেন ষোলো আনা। তাঁর রূঢ় আঘাতে মেয়েদের সম্পর্কে মেয়ে পুরুষ সবার ধারণাই বদলে যাবে, অনুমান করি।

বাংলাদেশের মহিলারা এখন বিভিন্ন কারণেই আত্মবিশ্বাস এবং সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। তার মধ্যে একটা কারণকে ইংরেজিতে bizarre বলা যেতে পারে। রাজনীতিতে প্রথমে শেখ হাসিনার এবং পরে বেগম জিয়ার আবির্ভাব এবং সাফল্য প্রায় কাকতালীয় ব্যাপার। এক দল দেশদ্রোহীর হাতে শেখ মুজিব নিহত না হলে হাসিনা কি জাতীয় রাজনীতিতে নামতেন? তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি। সুতরাং তাঁর উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু ১৯৯০ সালের পয়লা জানুয়ারি আমি বেগম জিয়াকে এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি গৃহবধু হয়ে রাজনীতিতে নামলেন কেন। তার উত্তরে বেগম জিয়া যেটা সবাই মনে করেন সেটাই বলেছিলেন— জিয়া নিহত হওয়ায় দলের স্বার্থে তাঁকে নামতে হয়েছে। আমার বিশ্বাস, শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হলে শেখ হাসিনা নেতা হতে পারতেন না। আবার বড়ো মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও, জিয়াউর রহমান স্বাভাবিকভাবে মারা গেলে বেগম খালেদা জিয়া নেতা হতে পারতেন না। অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্যে উভয় আত্মীয়ই জনগণের এবং দলীয় কর্মীদের আন্তরিক সহানুভূতি পেয়ে নেতা হয়েছেন। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হলেও এবং রাজনীতিতে কোনো রকমের অভিজ্ঞতা না থাকলেও, তাঁরা দ্রুত দেশের সবচেয়ে বড়ো দুটি দলের নেতায় পরিণত হয়েছেন। এবং তাঁদের নেতৃত্ব দেশবাসী মেনেও নিয়েছেন। এই সাফল্য কেবল তাঁদের নিজেদের সাফল্য নয়। বস্তুত, এটা গোটা দেশের মহিলাদেরই সাফল্যের প্রতীক। চার দেয়ালের বন্ধন কাটিয়ে এবং নিজেদের সনাতন ভূমিকা অংশত অস্বীকার করে পুরুষদের বিদ্রূপ, প্রতিকূলতা, এবং প্রতিযোগিতা মেনে নিয়ে মহিলারা যে ঘোমটা খুলে প্রাকাশ্যে বেরিয়ে এলেন, এই পথে শেখ হাসিনা এবং

খালেদা জিয়ার সাফল্য একটা তাৎপর্যপূর্ণ অনুপ্রেরণা হিসেবে নিশ্চয়ই কাজ করেছে এবং অসামান্য আত্মবিশ্বাস দিয়েছে।

তবে এই সাফল্য সত্ত্বে, বাংলাদেশের মহিলাদের অগ্রগতির পথকে একেবারে নিষ্কন্টক বলে মনে হয় না। যে দেশের শিক্ষার হার এখনো শতকরা মাত্র ২৫, জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ যে দেশে বাস করেন গ্রামে এবং অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর, সে দেশে নারীমুক্তির ধারণা বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, এ কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। তা ছাড়া, ১৪ শো বছর আগেকার আরব দেশের পটভূমিতে ইসলামে নারীর যথেষ্ট অধিকার এবং মর্যাদা স্বীকৃত হলেও, বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দশকে সেটাকে আদৌ যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা শক্ত। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করাই সঙ্গত। এই প্রসঙ্গেই একটা কথা মনে করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানে মেয়েদের অধিকার তত্ত্বত পুরুষদের সমান। তদুপরি ১৯৮০ সাল থেকে পণপ্রথা বিরোধী আইন, মহিলাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিরোধক আইন এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ইত্যাদির মাধ্যমে মহিলাদের অধিকার আরও জোরদার করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এসব আইনের বিরোধী সংস্থানও সংবিধানেই রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম এখন ইসলাম। এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী সম্পত্তি, বিবাহ, সাক্ষ্যদানসহ বহু ব্যাপারেই নারী ও পুরুষের অধিকার অসমান।

সত্যি বলতে কি, বাংলাদেশে নারীমুক্তির আন্দোলনে বড়ো একটা প্রাতিষ্ঠানিক বাধা আসে তাবলিগীদের অর্থাৎ মৌলবাদীদের তরফ থেকে। ১৯৬০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরখা পরা ছাত্রী কখনো দেখিনি বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু সেটা ছিল খুবই ব্যাতীক্রমধর্মী ঘটনা। তারপর স্ত্রীশিক্ষার এতটা প্রসারের পরে এখন নতুন করে বোরখা—এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দামী এবং ফ্যাশনওয়ালা বোরখা পরা আবার বেশ চালু হয়েছে। তার মানে যে মহিলারা নিজেদের শারীরিকভাবে অন্তত বেশ খানিকটা মুক্ত করতে পেরেছিলেন, তাঁদের আবার বন্দী করার ধর্মীয় দোহাই দেওয়া হচ্ছে। তবে আশার কথা এই যে, একবার চার দেয়ালের বাইরে বের হবার স্বাদ পেলে, তাঁদের আর সহজে খাঁচায় পোরা যায় না। সে জন্যে অনেকেই বোরখা পরলেও অন্তঃপুরের বন্দীত্ব আর মেনে নিচ্ছেন না। অনেকে বোরখা নিয়ে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন, অনেকেই চাকুরি করছেন বোরখা পরে। তা ছাড়া, শিক্ষিতদের মধ্যে বোরখার পাশাপাশি স্কার্ট, জিনস ইত্যাদি পরা এবং ওড়না না পরার দৃষ্টান্তও দেখা যাচ্ছে এন্তার।

যে মহিলারা প্রগতির দিকে এগিয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন, তাঁদের অনেক সময়েই যথেষ্ট প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। রাস্তাঘাটে পুরুষদের বিদ্রূপ এবং লোভের দৃষ্টি ছাড়াও, মাঝেমধ্যেই রাহাজানি এবং রূঢ় ভাষণ সহ্য করতে হয়। অফিস-আদালতের বড়ো কর্তারা অনেক সময়ে ধরেই নেন যে, তাঁদের অধস্তন মহিলা কর্মকর্তারা অযোগ্য এবং বুদ্ধি বিবেচনার দিক দিয়ে তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের। এই বাইরের হামলা যদি বা কোনো মতে সহ্য করা সম্ভব হয়, নিজের পরিবারের কাছ থেকে তাঁরা যে বিরোধিতার সম্মুখীন হন, তা আরও প্রবলতর। স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়স্বজন থেকে আরম্ভ করে সন্তানরা পর্যন্ত এই পথে এক এক সময়ে অযৌক্তিক এবং দুস্তর বাধার সৃষ্টি করেন। তবে স্ত্রীর আয় করা টাকাটা ফেলতে পারেন না

কেউই। তা ছাড়া, যে মহিলা কর্মের জগতে ঢুকে একবার মুক্ত জীবনের স্বাদ পেয়েছেন, শত প্রতিকূলতার মুখেও তাঁরা তাঁদের জেহাদ চালিয়ে যাবেন বলেই মনে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে একটা বাড়তি অনুপ্রেরণা পাওয়াও অসম্ভব নয়—একজন মহিলা দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায়। বাংলাদেশ সরকার চাকুরিতে মহিলাদের নিযুক্ত করার ব্যাপারে এক সময়ে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলো, পুরুষআমলা এবং রাজনীতিকদের বিরোধিতার মুখেই হয়তো এ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এখন মহিলা প্রধানমন্ত্রী থাকায় তা বাস্তবায়িত হবার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। যদি তা হয়, তা হলে প্রাইমারি স্কুলের চাকুরিগুলোর অর্ধেক, গেজেটেড কর্মকর্তাদের শতকরা পনেরো ভাগ এবং অন্যান্য খাতে মহিলাদের জন্যে বেশ একটা ন্যায্য হিসসার চাকুরি সংরক্ষিত থাকবে। এবং নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তা হবে একটা বড়ো পদক্ষেপ।

একটা ঐতিহ্যিক সমাজে যতোটা দ্রুত গতিতে মহিলাদের অগ্রগতি হওয়া সম্ভব বাংলাদেশে তার চেয়ে কম হয় নি। বরং কার্যকারণে কোনো কোনো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুকূল ঘটনা ঘটায় মহিলাদের পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজে এতটা পথ এগিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। এক মাত্র যে পথে এই অগ্রগতি বন্ধ হতে পারে, সে হলো মৌলবাদীদের ক্ষমতা দখল—ধরা যাক, ইরানে যেমনটা হয়েছে। অন্যথায়, প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বাঙালি মহিলারা এখন নষ্ট সময়ের অনেকটাই ক্ষতি পূরণ করেছেন।

নারীর অধিকার ও আইন

রণজিৎ সাহা

কোনো দেশের আইনকে অবশ্যই সেই দেশের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, নইলে তা অসাংবিধানিক বা 'Ultra vires' বলে পরিগণিত হবে এবং বাতিল হ'তে বাধ্য। সুতরাং নারী সংক্রান্ত প্রচলিত সব আইনই ভারতীয় সংবিধান সংক্রান্ত।

গোদা বাংলায় অধিকার বিষয়টি Civil right. কিন্তু মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্যও আইনের প্রয়োজন আছে এবং সেই আইন ভঙ্গকারীর কাজ Criminal Offence হিসেবেই বিবেচিত হবে। সুতরাং নারীর অধিকার রক্ষার জন্য একই সঙ্গে দেওয়ানি বিধান ও ফৌজদারী বিধান ভারতবর্ষের আইনে রয়েছে।

অনেকেই জানেন বা মনে করেন ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নারী-পুরুষ ইত্যাদি নির্বিশেষে ভারতে সকল মানুষের সমান অধিকার বিদ্যমান; কিন্তু বাস্তবে ভারতীয় সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যে সাম্যের অধিকার দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, 'Equality before the law means that among the equals law shall be equal and shall be equally administered'. —অর্থাৎ সমপর্যায়ের নাগরিকদের জন্য সমব্যবস্থা ও আইন এবং তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই ভারতীয় সংবিধানের ১৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'Nothing in this Article shall prevent the state from making any special provision for women and children.' সুতরাং নারী সংক্রান্ত আমাদের আইন ভারতীয় সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নারীর অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য তাই সংবিধান অনুযায়ী নানাবিধ আইন আমাদের দেশে প্রযুক্ত ও প্রচলিত।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ ধারায় বিবাহিত ও অবিবাহিত নির্বিশেষে অবহেলিত নারীদের খোরপোষের অধিকার দেয়া হয়েছে। উক্ত ধারায় অবশ্যই উপার্জনে অক্ষম, অবহেলিত পিতা বা পুত্রসন্তানদেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পুত্র সেখানে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হলেই খোরপোষের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কন্যা কিন্তু সেক্ষেত্রে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পিতা-এর কাছ থেকে খোরপোষ পেতে আইনত হকদার, নারীর খোরপোষ-এর অধিকারের মধ্যে মায়ের খোরপোষের অধিকারও পড়ে। বিবাহিত অথচ অবহেলিত নারী নিজের ভরণপোষণে অক্ষম হলেই স্বামীর কাছ থেকে আইনত খোরপোষ পাবার অধিকারী। স্বামী শারীরিকভাবে সক্ষম হলেই খোরপোষ দিতে বাধ্য। অবশ্য কোনো স্ত্রী যদি ব্যাভিচারী জীবনযাপনে রত থাকেন, অথবা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত স্বামীর সঙ্গে বসবাসে অসম্মত হন বা আপোষে স্বামীর থেকে আলাদা থাকেন—তা হ'লে তিনি খোরপোষ পাবেন না। স্বাধীনতার পর থেকে সব ভারতীয়দের জন্যই এই আইন ছিলো; কিন্তু বিখ্যাত শাহবানু মামলার পরে মুসলমান নারীদের জন্য আলাদা আইন 'Muslim Women (Protection of

Rights on Divorce) Act, 1986' কার্যকর হয়েছে। তাতে তাঁদের আসলে উপকারের বদলে অপকারই হয়েছে।

বিবাহিত নারীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারার ও ৩০৪বি ধারার প্রচলন হয়েছে। ৪৯৮এ ধারায় কোনো বিবাহিত নারী যদি তার স্বামী অথবা স্বামীর আত্মীয়-এর কোনো ইচ্ছাকৃত ব্যবহারে আত্মহত্যার পথে চালিত হন অথবা যদি শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে গুরুতর আঘাত পান বা তাতে তাঁর জীবনহানির আশঙ্কা থাকে অথবা স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় বা আত্মীয়রা যদি অবৈধ দাবীদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিবাহিতা নারীকে হয়রানি করে— তবে তা জামিন অযোগ্য দণ্ডনীয় অপরাধ। দোষী ব্যক্তিদের তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হ'তে পারে।

৩০৪বি ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো বিবাহিতা নারীর বিয়ের সাত বছরের মধ্যে আগুনে পুড়ে অথবা শারীরিক আঘাতে মৃত্যু হয় এবং দেখা যায় সেই মৃত্যু স্বাভাবিকতা-বহির্ভূত ও দেখা যায় ঐ ধরণের মৃত্যুর কিছু আগে পণের দাবীতে তাঁর ওপর শারীরিক কিংবা মানসিক নির্যাতন হয়েছে বা তাকে হয়রানি করা হয়েছে, তবে তা জামিন-অযোগ্য গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ। তাতে দোষীর যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান আছে এবং দোষী ব্যক্তিকে কোনোক্রমেই সাত বছরের নীচে কারাদণ্ড দেয়া যাবে না। ভারতীয় দণ্ডবিধির বর্তমানে বহুল পরিচিত ৩০৬ ধারা মূলত 'সতীদাহ' প্রথা বন্ধ করার জন্যই সৃষ্ট।

ভারতীয় আইনে নারীর সম্মান ও মর্যাদাকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র নারীদের স্বার্থ, শালীনতা, ইজ্জত, অবৈধ উদ্দেশ্যে তাঁদের অপহরণ, নারকীয় পেশার হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করার জন্য। আইন-ভঙ্গকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধারায় কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। দোষীরা অপরাধ অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৩৬৬, ৩৬৬এ, ৩৬৬বি, ৩৭৩, ৩৭৬, ৩৭৬এ ৩৭৬বি, ৩৭৬সি, ৩৭৬ডি, ৪৯৩, ৪৯৭, ৪৯৮ ধারায় দণ্ড পেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে তা দু' বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মধ্যেও পড়তে পারে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় Penal Code-ও ইদানিং Personal Law-এর প্রবক্তাদের Challange-এর সম্মুখীন। তার জ্বলন্ত উদাহরণ উত্তরপ্রদেশের চারথাওয়ালের ইমরানা বিবি; অসমের নওগাঁর রানীবেগম প্রমুখেরা। পুত্রবধূর ওপর পাশবিক অত্যাচার করার জন্য শ্বশুররা ধর্ষণের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারার আসামী তো নয়ই বরং পুত্রবধূরা স্বামী ও সংসার হতে বিতাড়িত। মৌলবাদের রবরবা আবার না একটা নতুন আইনের সৃষ্টি করে শাহাবানু মামলার মত!

ভারতীয় নারীর নিজ নিজ ধর্মীয় আইন মোতাবেক উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আছে। তাঁরা পিতা, স্বামী বা পুত্র অথবা অবিবাহিত কন্যাসন্তানের মৃত্যুর পরে তাঁদের ত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার বা অধিকারিনী—তবে তা যার যার নিজস্ব ধর্মীয় আইন অনুযায়ী। এতেও অবশ্য বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়—এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৫৮ বছর এবং ভারতের সংবিধানের বয়সও ৫৫ অতিক্রান্ত। তার অনেক সংশোধনীই এযাবৎ হয়েছে— কিন্তু সকলের জন্য সমান আইন কী দেওয়ানী কী ফৌজদারী আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি—যা শুধু বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের

মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ-এরই সৃষ্টি করছে না বরং সংবিধানের প্রণেতাদের স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নারীর অধিকার নিয়ে মুখে প্রায় সকলেই সরব---তা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করার 'Quota' থেকে শুরু করে যে কোনো নারীর, এমনকি দেশের সবচেয়ে ধনী নারীর বিনা পয়সার আইনি সাহায্য পাওয়া পর্যন্ত ব্যাপৃত, কিন্তু শাহবানু বা ইমরানাদের জন্য আমরা প্রায় দায়মুক্ত! আমাদের শিক্ষা, সচেতনতা ও বিবেকের (যদি তা আদৌ থাকে) সঙ্গে তা মানানসই তো? আজ প্রয়োজন এসেছে আমাদের এ বিষয়ে সক্রিয় হবার। প্রয়োজনীয় আন্দোলন গড়ে তুলবার। নইলে ভবিষ্যত প্রজন্মর কাছ থেকে আমরা উপযুক্ত সম্মান পাব না। প্রকৃতপক্ষে পেতেও পারিনা। আমরা বড়জোর তাদের কাছে তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিক হিসেবেই গণ্য হব, কখনো সমাজসংস্কারক হিসেবে পরিগণিত হব না।

নারীর জন্য আইন : মুক্তি না বন্ধন?

মালিনী ভট্টাচার্য

১৮৯১ সালে মেয়েদের ন্যূনতম স্বামীসহবাসের সময় বাড়িয়ে বারো করা হল 'সম্মতির বয়সসংক্রান্ত আইন' (Age of Consent Act) মোতাবেক। কিছু নারীবাদী সমালোচক বলেছেন, স্বামীসহবাসে সম্মতি সংক্রান্ত এই বিতর্কে মেয়েদের কোনো সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটেনি; বিতর্কটি ছিল নিতান্ত পুংকেন্দ্রিক। নতুন ইংরেজি শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সমাজের পুরুষদের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে চাহিদা বদলাচ্ছিল। নিতান্ত বালিকার চাইতে তুলনায় পরিণত তরুণী স্ত্রীর উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনীর ভাবমূর্তিটির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারবেন, পুরুষের এই নব প্রত্যাশাই 'Age of Consent' সংক্রান্ত বিতর্কের ভিত্তিভূমি। ফলে সহবাসের ন্যূনতম বয়স বাড়লেও মেয়েরা পুরুষ-রচিত ভাবমূর্তির লক্ষণের গণ্ডির মধ্যেই রয়ে গেলেন। এক ধরনের বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হলেন আরেক ধবনের বন্ধনে। এই আইন ছাড়াও সহমরণ নিরোধ আইন বা বিধবাবিবাহ আইন প্রভৃতি যেগুলি উনিশশতকী সমাজসংস্কারের আন্দোলন থেকে উঠে এসেছিল তার সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রশ্ন তুলেছেন এই সমালোচকরা। শুধু তাই নয়, এ থেকে কেউ কেউ এরকম সিদ্ধান্তেও আসছেন যে যেহেতু পিতৃতন্ত্র সমাজ-শরীরের মজ্জাগত, এবং সমাজে কাদের আধিপত্য তাই দিয়েই নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের চরিত্র, প্রশাসন, পুলিশি ব্যবস্থা ও আইন তাদেরই স্বার্থ সিদ্ধ করে— সেই কারণেই আইন করে লিঙ্গসমতা আনার প্রচেষ্টা ফুটো পাত্রে জল ঢালার সামিল; সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও আইন শক্তিমানের ইচ্ছাপূরণ করারই একটি হাতিয়ার মাত্র।

বস্তুত, আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাতেও আমরা দেখি যে প্রগতিশীল আইনও অনেক সময়ে মেয়েদের কাজে লাগে না। এর কারণ শুধু এই নয় যে আইনের গতি শ্লথ ও দীর্ঘমেয়াদী, তাছাড়াও সমাজ-শরীরের মধ্যে যে পিছুটান থাকে তা আইনের ধারাতেই শুধু নয় বিচারপদ্ধতির মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এইসব পিছুটান কেবল লিঙ্গ-ঘটিত নয়, শ্রেণিঘটিতও বটে। আমাদের দেশে ধর্ষণ ও যৌননির্যাতনের ঘটনায় উৎপীড়িত নারীদের মধ্যে একটা বিরাট অংশই শ্রমজীবী, দলিত ও আদিবাসী। এইসব ঘটনা অনেক সময়ে পুলিশ পর্যন্ত পৌঁছয় না, প্রাথমিক তদন্তের পর চার্জশিট তৈরি হয়ে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হবার আগেই অনেক ঘটনা হারিয়ে যায়, যদি বা বিচার হয় বেকসুর খালাসের সংখ্যা এত বেশি যে আইনের ফাঁকফোকরগুলি বড় প্রকট হয়ে পড়ে। সত্তরের দশকের গোড়ায় মথুরা ধর্ষণ মামলায় উচ্চতম আদালত থেকে অভিযুক্ত পুলিশরা বেকসুর খালাস পায়; কেন না আদিবাসী মেয়ে মথুরা তাঁর অসম্মতি জানানোর জন্য আক্রমণকারীদের যথাসাধ্য প্রতিরোধ করেছিল কি না তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে যৌনসংসর্গ তাঁর অনিচ্ছায় ঘটেছিল, এমন কোনো সাবুদ না থাকায় আদালতের চোখে ধর্ষণ প্রমাণিত হয়নি। এই রায়ের প্রতিবাদে সারা দেশের নারী আন্দোলন থেকে তীব্র ধিক্কার ওঠে, তার ফলেই ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন কিছুটা পালটেছিল। কিন্তু তা

সত্ত্বেও পারারিয়া, উজান ময়দানের হতদরিদ্র মেয়েরা এবং মাত্র ক'বছর আগেও রাজস্থানের দলিত গ্রামকর্মী ভানওয়ারি দেবী সুবিচার পাননি। বরং আদালত থেকে 'নিচুজাতের' মেয়েরা ধর্ষিত হতে পারেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

যেখানে লাঞ্ছিত বা অত্যাচারিত মেয়েদের কিছুটা আর্থিক সঙ্গতি বা পৃষ্ঠবল আছে, সেখানে আমরা ধরে নিই তাঁরা আইনের সুযোগ কিছুটা নিতে পারে। কিন্তু আশির দশকে দেবযানী বণিক হত্যা মামলা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল পণের জন্য বধূনির্যাতন, এমনকি বধূহত্যা সমাজে কতটা ব্যাপক। দেবযানীর বাড়ির লোকেরা সে অত্যাচারিতা হচ্ছে জেনেও তাকে বারবার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তবে তার নৃশংস হত্যা আবিষ্কৃত হবার পরে তাঁদের সমস্ত অর্থবল এবং প্রভাব তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন দোষীদের শাস্তিবিধানের জন্য। দোষীদের এক্ষেত্রে শাস্তি হয়েওছিল, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান দিয়েছিল সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। মৃত্যুদণ্ড ভালো কি খারাপ সে প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে এক্ষেত্রে শুধু এইটুকুই মনে রাখা যেতে পারে যে অনুরূপ অপরাধে অন্য সাধারণ লোকের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই হয়তো মিলত না; অর্থ ও প্রভাব থাকার ফলেই যেন দোষীরা চরম শাস্তি এড়িয়ে গেল। অর্থাৎ দেবযানী বণিকের মামলায় বিচার হল, শাস্তি হল—যদিও চরম শাস্তি নয়, কিন্তু আইন কাজে লাগল হত্যাটি ঘটে যাবার পর। অথচ পণপ্রথা নিরোধ আইন তখন ছিল, পণের দাবি শুরু হওয়া মাত্রই অভিযোগ করলে সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবেই গণ্য হত। কিন্তু একটি উচ্চবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের লোকেরা মেয়েকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য ঐ আইনের সাহায্য নেননি, কেন না পণ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় তো তাঁরা নিজেরাই ছিলেন জড়িত। তাই আর্থিক বা সামাজিক সক্ষমতা থাকলেও মজ্জাগত সংস্কার আইনের প্রয়োগে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তদুপরি দেখা যাচ্ছে ময়দানের মেয়েদের মতোই আইনকে কাজে লাগাতে অক্ষম। শ্রেণিগত কারণ না থাকলেও নিছক মেয়ে হওয়াটাই আইনি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে; কারণ স্বশ্রেণির মধ্যে পারিবারিক গণ্ডির ভিতর তার অবস্থান যে পুরুষের তুলনায় দুর্বল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিগত তিন দশকে নারী আন্দোলনের চাপে আইন ও বিচার পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪(খ) ধারা অনুযায়ী বিয়ের সাত বছরের মধ্যে কোনো মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তার স্বামীর পরিবারের বিরুদ্ধে আগে থেকে পণের জন্য অত্যাচারের অভিযোগ থাকলেই সেই মৃত্যুকে পণ-জনিত মৃত্যু বলে ধরে নেওয়া হবে। ৪৯৮(ক) ধারায় কোনো মহিলা তার স্বামী বা কোনো আত্মীয়ের বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের অভিযোগ করলে তার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দুটি আইনই পরিস্থিতি একটা চরম অবস্থায় পৌঁছনোর পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন সূচিত করে। অর্থাৎ পণ দেওয়া নেওয়া একটা পারিবারিক/সামাজিক ব্যাপারই থেকে যাচ্ছে; একমাত্র মেয়েটির অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে তবেই পণের জেরে তা হল কি না তা দেখার দায় প্রশাসনের ওপর বর্তাচ্ছে। ৪৯৮(ক) ধারাটিও একটা চূড়ান্ত অবস্থাকেই ধরে নেয়, মেয়েটি যখন অভিযোগ করতে আসে তখন থানার আধিকারিকরা বারবার এটাই যাচাই করার চেষ্টা করেন যে সে অবস্থা এসেছে কি না; কারণ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা

মানেই পরিবারের একান্তে প্রশাসনের অনুপ্রবেশ। একবার তা করলে মেয়েটির আশ্রয়ের প্রশ্নও এসে যায়। সে দায় প্রশাসন নিতেও চায় না, তার সাধ্যও নেই। সমস্যার মূলে গিয়ে পৌঁছতে পারছে না বলেই, এবং পরিবারের মধ্যে মেয়েদের অবমূল্যায়নকে একটা ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে বলেই এই আইনগুলির প্রয়োগও খুবই সীমিত।

আমাদের পারিবারিক আইনগুলির মধ্যে একজন নারীকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা তিনি একজন ব্যক্তি এই ধারণার ভিত্তিতে নয়, পরিবারের প্রধানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ভিত্তিতে। অর্থাৎ তিনি কারুর মা, কারুর স্ত্রী, কারুর কন্যা এই হিসেবেই পারিবারিক কতগুলি অধিকার তিনি পেয়ে থাকেন। আইনের যে নতুন ধারাগুলির কথা বললাম, তাই এই মূল চিন্তাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ঐ কাঠামোর মধ্যেই অত্যাচারের বাড়াবাড়িকে একটা সীমানায় বেঁধে দিতে চায়। সুতরাং সঠিকভাবেই বলা হয় যে সমাজের একপেশেমির প্রতিফলন ঘটে এই আইনগুলিতে। নারীর অস্মিতা (Subjectivity) আইনের মধ্যে তখনই রূপ নিতে পারে, যখন তা পরিবারে এবং সমাজে স্বীকৃত সত্য। যখন শুধু সে মাতা, স্ত্রী বা কন্যা হিসাবে চিহ্নিত হবে না, পরিবারের অন্যদের সে তার পিতা, স্বামী বা পুত্র বলে পরিচয় দিতে পারবে, কেবল তখনই পরিবারের বৃত্তে তার অস্মিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ জিনিস যখন সমাজে গৃহীত হবে, তখন তো সমাজে আলাদা করে মেয়েদের জন্য এইসব আইনের দরকার হবে না। তাই মনে হয় নারীবাদী সমালোচকদের এই যুক্তিতে একটা অসম্পূর্ণতা আছে; এই যুক্তিতে একমাত্র সেই পরিবেশেই নারীর অনুকূল আইন সম্ভব যেখানে তেমন আইনের প্রয়োজন মিটে গেছে। তাছাড়া এই যুক্তি নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অস্তিত্বকে এড়িয়ে তার ব্যক্তিক এবং গোষ্ঠীগত সম্পর্কগুলির টানাপোড়েনের বাইরে তার কোনো শুদ্ধ ব্যক্তিসত্তার নির্মাণ সম্ভব এবং যেন আইন ও প্রশাসনের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে এই শুদ্ধ ব্যক্তিসত্তাকেই তারা স্বাতন্ত্র্য ও নিরাপত্তা দেবে। বস্তুত এটা সেই ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের থেকে উদ্ভুত ধারণারই রকমফের যে ব্যক্তিসত্তা আচোট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি একক এবং সভ্যসমাজের ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তাকে সবরকমে সুরক্ষিত করা। গত দুশো-তিনশো বছরে এই ধারণার অন্তর্গত স্ববিরোধ যখন ঐতিহাসিক নির্মিতি হিসেবে স্বীকৃত তখন মেয়েদের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিসত্তার স্বয়ম্ভরতা সম্বন্ধে এই মোহ আমাদের রাখতে হবে কেন, তাও ভাবা উচিত।

নারীর পক্ষে আইন সংশোধনের যদি কোনো কার্যকারিতা থাকে, তাহলে তা তার ব্যক্তিসত্তার সংরক্ষণে নয়, মানবসম্পর্কের যে ঠাসবুনোটে সমাজশরীর গঠিত হয়, তাঁকে কিছুটা আলগা করে দেওয়াতে। অবশ্যই তাতে ব্যক্তিহিসেবে নারী ঐ পরিসরের মধ্যে কিছুটা নড়াচড়ার জায়গা পায়। কিন্তু এর প্রকৃত কার্যকারিতা এই যে সাধারণত সংস্কারমূলক আইন সচেতনভাবে লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কের বলয়ে কোনো ঝড় তুলতে না চাইলেও তা অনেক সময়েই সূচিত করে সেই সম্পর্কের মধ্যেই রদবদলের বাস্তব সম্ভাবনা। সংস্কারমূলক আইন যদি শুধু আপসের মাধ্যমে হত, প্রথাগত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর নতুন রক্ষাকবচ হিসেবেই যদি শুধু তাকে দেখা যেত, তাহলে সমাজের মধ্যে তা নিয়ে এত বিতর্ক উঠবে কেন? বিধবা বিবাহ আইন চালু হবার ফলে হিন্দু সমাজে ব্যাপকভাবে বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটেনি, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় যে নারীর অস্মিতার ওপর এই আইনের কোনো প্রভাব ছিল না? বস্তুত, 'অন্যপূর্বা নারীর

পক্ষে আবার স্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব' বিধবা আইনের এই ঘোষণা দাম্পত্যজীবনের বা নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণাতেই একটা আলোড়ন এনেছিল, নারী ও পুরুষ উভয়েরই লিঙ্গভিত্তিক চেতনার পরিসরকে কিছুটা পরিবর্তিত করেছিল। তা না হলে তা নিয়ে এত তীব্র রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া দেখা যেত না।

ইদানিং ৪৯৮(ক) ধারাটি নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, তারও প্রেক্ষাপট কিছুটা অনুরূপ। দেখা গেছে আইনটি চালু হবার পর থেকেই এই ধারায় অভিযোগের সংখ্যা অতিদ্রুত বেড়েছে—বিধবা বিবাহ আইনের ধারার তুলনায় এই ধারাটি অনেক বেশি ব্যবহৃত। এর হয়তো কিছু অপব্যবহারও হচ্ছে। কিন্তু এই ধারণাটিও বিধবা বিবাহ আইনের মতোই দাম্পত্য সম্পর্কের ধারণায় কতগুলো নতুন মাত্রা বহন করে আনছে। 'গার্হস্থ্য অত্যাচারও একটি সমাজবিরোধী কাজ, এবং যে কোনো সমাজবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে যেমন, এই ব্যাপারেও তেমন রাষ্ট্র এবং প্রশাসনকে হস্তক্ষেপ করতে বলা যায়'— ৪৯৮(ক)-এর অন্তর্গত এই সূচনাই নারী-পুরুষের 'ব্যক্তিগত' সম্পর্কের ঠাসাবুনোটের মধ্যে তৈরি করছে নতুন উদ্বেগ ও প্রত্যাশা। ধারাটি গার্হস্থ্য অত্যাচারের সমস্যার সমাধান করছে না, কিন্তু গার্হস্থ্য অত্যাচারকে গৃহের চার দেওয়ালের বাইরে টেনে আনার সম্ভাবনা তৈরি করছে, তার ফলেই এই আইনটির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এত তীব্র। ব্যক্তি হিসাবে একজন নারীর অত্যাচারিত না হবার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এখানে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে, যদিও আমরা জানি যে রাষ্ট্র ও প্রশাসন শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাবানের আধিপত্য মেনেই চলে। আসলে ব্যক্তিক অধিকারের লড়াইও কোনো বিশুদ্ধ পরিমণ্ডলে সাদাকালোর পরিষ্কার বিভাজনে ঘটে না। রাষ্ট্রের ঘোষণা ও কাজের মধ্যে যে ফারাক থাকে তাকে ব্যবহার করেও কখনও কখনও আইন তথাকথিত নিম্নবর্গের কাজে লেগে যায়। ক্ষমতাবানের ইচ্ছাপূরণের বদলে কোনো বিকল্প প্রবণতাও তার মধ্যে ফুটে ওঠে। বর্তমানে ৮১তম সংবিধান সংশোধনের অর্থাৎ সংসদে নারীর আসন সংরক্ষণের যে প্রস্তাবটি নিয়ে এত ঝড় উঠেছে তার মধ্যেও একটি বিকল্প সামাজিক প্রবণতার ছবি নিহিত রয়েছে। পুরুষদের একাংশকে আসন হারাতে হবে বলেই শুধু নয়, সমাজে লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কের মধ্যে কিছু রদবদলের সম্ভাবনা তৈরি করছে বলেই তা নিয়ে এত প্রতিক্রিয়া। সংরক্ষণের যদি শুধু প্রতীকী মূল্যই থাকত তবে তা মেনে নিতে রক্ষণশীলদেরও এত আপত্তি হত না। জাতপাতের মাতব্বররা বলছেন তাঁদের জাতের মেয়েদের আলাদা সংরক্ষণ না হলে তাঁরা এ প্রস্তাব মানবেন না। এটা সেই মেয়েদের প্রতি সহানুভূতির চিহ্ন নয়, তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখারই চেষ্টা। বর্তমান প্রস্তাবে ওবিসি মেয়েরা ওবিসি পুরুষদের একচেটিয়া অসংরক্ষিত আসনগুলির একাংশ নিয়ে নেবেন, এটা ঐ মাতব্বরেরা হতে দিতে চান না। তাঁদের স্বতন্ত্র সংরক্ষণের লড়াইটা তাই লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কে স্থিতাবস্থার জন্য লড়াই।

পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে কি না, এ নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের। পারিবারিক আইনগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতীয় সংবিধানের ২৫তম ও ২৯তম ধারায় যথাক্রমে একজন নাগরিকের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক আচার নিয়ম পালনের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। পারিবারিক আইনগুলিকে ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের

অন্তর্ভুক্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের একটা পরিষ্কার, লিখিত রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ, বিধিনিষেধ—যথা বিবাহ-সংক্রান্ত আচার-আচরণ—দেশকাল ও ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বহু ও বিভিন্নরূপে বর্তমান। একই সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বিবাহের আচার-নিয়মগুলি ভিন্ন-ভিন্নভাবে পালন করে, তেমনি আবার প্রতিবেশী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার-আচরণের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পারিবারিক আইনের লিখিত রূপে এইসব বৈচিত্র্য ও নমনীয়তার চিহ্ন থাকে না। এবং একেই ধর্মীয় অনুশাসনের অবশ্যপালনীয় অঙ্গ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। 'হিন্দু বিবাহ' বলে আইনে যা প্রচলিত, তা দেশের বিভিন্ন অংশে হিন্দুদের দ্বারা পালিত বৈবাহিক আচারের একটা সীমিত ভগ্নাংশ মাত্র। অন্যান্য বিবাহসংক্রান্ত আইন সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। এর ফলে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথাগতভাবে যেসব দাম্পত্য অসাম্য বৈবাহিক আচারে প্রতিফলিত হয়, তা বাদ দিয়েও রাষ্ট্রের দ্বারা নথিভুক্ত আইনে অসাম্যের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। যেমন আইনগত অর্থে কাকে 'বিবাহ' বলা হবে তার সংজ্ঞা এতই কঠোর যে আইনি বিবাহ প্রমাণ করা খুব কঠিন, বিশেষত হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে এবং বিবাহের বৈধতা প্রমাণ করতে বেশি ভোগেন মেয়েরাই। লিপিবদ্ধ আইন যখন ছিল না, তখন অনেক বিভিন্ন পদ্ধতির বিবাহ বৈধ বলে গণ্য হত। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একদিক থেকে বৈধ স্ত্রীর অধিকার সুনিশ্চিত করেও অন্যদিকে মেয়েদের অসুবিধাই সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই অসুবিধার দিকটা একমাত্র নয়। কিছু সুবিধাও আছে। অলিখিত সংস্কারের পরিবর্তন চাইলেই করা যায় না, একমাত্র সময়ের প্রভাবেই তা হতে পারে। কিন্তু লিপিবদ্ধ আইনকে প্রয়োজন মনে হলে সংশোধন করা সম্ভব। সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারার তৃতীয় উপধারাতেও সমাজকল্যাণ ও সমাজসংস্কারের স্বার্থে রাষ্ট্রকে এমন আইন প্রণয়ণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সংবিধানের চালিকা নীতি বা 'ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল্'-এর মধ্যে সারা দেশে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার প্রয়াস করা হবে, এমন ঘোষণাও করা হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠেছে যে রাষ্ট্র এমন পদক্ষেপ নিলে তা ধর্মসম্প্রদায়গুলির স্বয়ম্ভরতার ওপর আঘাত নিয়ে আসবে।

'হিন্দুত্ব'বাদীদের গোষ্ঠী এই বিতর্কটিকে নিজেদের মতো ঘুরিয়ে নেবার জন্য আসরে নেমেছেন। একদিকে তাঁরা বলেন বিলম্ব না করে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা উচিত; অন্যদিকে তাঁরা বলেন এই বিধি প্রণীত হলেও হিন্দু পারিবারিক আইন যেমন তেমনই থেকে যাবে, কেন না অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে যা যা থাকার কথা হিন্দু পারিবারিক আইনে ইতোমধ্যেই তা আছে। তাঁদের ঘোষণা অনুযায়ী কেবলমাত্র বহুবিবাহ রদ করাই হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির উদ্দেশ্য। চলতি হিন্দু আইনে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব ও সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারাগুলিতে নারীপুরুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে যে অসাম্য এখনও বিদ্যমান, তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেই তাঁরা নিজেদের মতো করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অন্যদিকে সংখ্যালঘু, বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল নেতারা 'হিন্দুত্ব'-এর সিংহনাদের প্রতিক্রিয়ায় পারিবারিক আইনের সমস্তরকম সংস্কারের প্রস্তাবকেই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থূল হস্তাবলেপের লক্ষণ বলে তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রগতিশীল

আইন বলে সাড়ম্বরে ঢাক পেটাচ্ছেন। একসময় তাঁরাই কিন্তু দাঁতে নখে এর বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এই ঢক্কানিনাদের আড়ালে যে তথ্যটি চাপা পড়ে যাচ্ছে তা এই যে, হিন্দুদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এখনই একাধিক বিবাহের ঘটনা মুসলিমদের চাইতে হিন্দুদের মধ্যে বরং ঈষৎ বেশি। শুধু তাই নয়, মুসলিম আইনে দ্বিতীয় স্ত্রীও ভরণপোষণের অধিকারী; কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ অসিদ্ধ বলে দ্বিতীয়া বড়জোর তাঁকে ঠকানো হয়েছে বলে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর কোনো অধিকার কখনই তিনি পাবেন না।

এখানেও দেখা যাচ্ছে বহুবিবাহবিরোধী ধারাটি একটি প্রগতিশীল আইন হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু মেয়েদের বিবাহিত জীবনে প্রার্থিত নিরাপত্তা আশানুরূপভাবে দিতে পারছে না। কিন্তু তা হলে কি আমরা বলব যে আইনে কোনো কাজ হচ্ছে না, ফলে আইনের পাট তুলে দিয়ে বিলম্বিত সমাজসংস্কারের জন্যই আমাদের অপেক্ষা করে যেতে হবে? বহুবিবাহবিরোধী আইন হিন্দু মেয়েদের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিতে পারেনি, কিন্তু পারিবারিক সংস্কারের বিকল্প হিসেবে তা তো আইনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার লিপিবদ্ধ আকারটিও যে সংশোধিত হতে পারে, এই সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এইখানেই তার প্রয়োজন। কিন্তু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মানে শুধু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা নয়। বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়াও অভিভাকত্ব ও সম্পত্তির প্রশ্নও এর আওতার মধ্যে পড়ে। এবং এই সব বিষয়কে দেওয়ানি বিধির মধ্যে নিয়ে আসার অর্থ, পারিবারিক সম্পর্কগুলি যে ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাপার নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, তারই পরোক্ষ ঘোষণা। নারীর ব্যক্তিসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন থেকেই এই দাবি ওঠে। এবং যেহেতু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কও কোনো বিশুদ্ধ, নির্মায়িক পরিবেশে গড়ে ওঠে না, তাই দেওয়ানি বিধির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠার এই প্রকল্পেও জড়িয়ে যায় পণ্যপ্রধান সমাজের মূল্যবোধ। ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্তি পেলেও পণ্যায়িত হবার বিড়ম্বনা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। তাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দিকে অগ্রসর হতে হবে এ কথা ধরে নিয়েই যে ধর্মীয় অনুশাসন আধিপত্যের অন্যতম রূপ মাত্র, তার থেকে বেরোনো মানেই মুক্তি নয়, কিন্তু তবু মানব সম্পর্কের আদল পাল্টানোর এক সূচনা হিসেবেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির জন্য আন্দোলনকে দেখতে হবে।

বস্তুত হিন্দুত্ববাদীদের 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি'র জিগির সম্পূর্ণ অবাস্তব, কারণ তা পারিবারিক সম্পর্ককে আরো বেশি করে ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে সমস্ত বিবাহের বাধ্যতামূলক পঞ্জিকরণ, দেওয়ানি বিধির ১২৫নং ধারা অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছিন্না, উপার্জনহীন সমস্ত পত্নীর ধর্ম নির্বিশেষে খোরপোষ পাবার অধিকার নিশ্চিত করা, অভিভাবকত্ব আইনের সংশোধন করে মা ও বাবার সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কতকগুলি পদক্ষেপের মধ্যে দিয়েই এই পরিসর সৃষ্টি করতে পারে। এখানে বলা যায় ইদানীং উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কতগুলি নির্দেশ খোরপোষের প্রশ্নে এবং অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে নারীর এই অধিকারগুলিকে একটা স্বীকৃতি দিচ্ছে। এই সব আইনগত ধাপগুলিকে গড়ার মধ্য দিয়েই শুধু অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারি। রাষ্ট্রের মধ্যস্থতা এখানে প্রয়োজন এই ধাপগুলি গড়ার জন্যই, তাতে ব্যক্তিসত্তার সংরক্ষণ হয়তো ঘটবে না, মেয়েরা হয়তো ব্যক্তি হিসেবে আরো অনেক

বেশি টানাপোড়েনের মধ্যে পড়বে, প্রতিক্রিয়া আরো তীব্র হবে, কিন্তু তা হবে ব্যক্তিসম্পর্কের মধ্যে রদবদলেরই লক্ষণ।

'বিশ্বায়নে'র প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান দুনিয়ায় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে ক্রমশ কমিয়ে আনা হচ্ছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মরীচিকাই যে শুধু উবে গেছে তাই নয়, পণ্যপ্রধান সমাজে রাষ্ট্রকে ব্যক্তি অধিকারের অপহারক হিসেবেই মূলত দেখা হচ্ছে। রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজগুলির যেভাবে বিনাশ ঘটানো হচ্ছে, তাতে হয়তো একটা সময় আসবে যখন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পরিচালনাই রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইনের অপব্যবহার এবং শক্তিমানের স্বার্থে তার প্রয়োগ ঠেকানোর জন্য যখন আইনকেই তুলে দেবার কথা বলা হয়, তখন তাতে নির্যাতিত মেয়েদের স্বার্থ রক্ষা হতে পারে কিনা তা ভালো করে খতিয়ে দেখা দরকার।

আমাদের দেশে বা সব দেশেই যে মেয়েরা বেশ্যা বা যৌনকর্মীর পেশায় আছেন তাঁরা সর্বাধিক নির্যাতিতদের দলে পড়েন। অসংগঠিত ক্ষেত্রে যেসব মেয়েরা ন্যূনতম বেতন বা নিরাপত্তার অধিকার ছাড়াই ঘরে বসে প্রায় বন্ধুয়া শ্রমিকের মতো বিড়ি বা আগরবাতি বা বাজি উৎপাদন করে যান, কিন্তু কিছু দালাল ছাড়া কোন্ বৃহৎ মুনাফার শক্তি তাঁদের শোষণ করছে তা চোখেও দেখতে পান না, এঁরাও সেই দলেই পড়েন। এক অদৃশ্যচক্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ দালাল বা বাড়িউলি তাঁদের এই ব্যবসায় নিয়ে আসে এবং সেই অদৃশ্য চক্রটি ছাড়াও মধ্যস্বত্বভোগীরা, বাবুরা এবং পুলিশ প্রশাসন তাদের ছিঁড়ে খায়। এদের পরিবারের লোকরা হয়তো কখনও কখনও নিরূপায় হয়েই—এদের অর্জিত অর্থে পেট চালান। যৌবন অতিক্রান্ত শেষ হলে এরা হয় ব্যবসা গোটাতে বাধ্য হন, বা নিজেরা বাড়িউলি হয়ে বসেন। পুলিশ এদের ওপর অত্যাচার করে প্রধানত 'পিটা' বা প্রিভেন্সান অফ ইমমর্টাল ট্রাফিক অ্যাক্ট-এর ধারাগুলি ব্যবহার করে। এই অত্যাচার বন্ধ হোক, দালাল মস্তানদের উৎপাত থেকে এরা রক্ষা পান, এদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার থাকুক, সংক্রামক যৌনরোগ থেকে এরা বাঁচুক, পুনর্বাসনের সুযোগ প্রসারিত হোক—এইসব ন্যায্য দাবি নিয়ে যৌনকর্মীরা আজ নিজেরাই এগিয়ে আসছেন। কিন্তু 'পিটা' আইনটি তুলে দিলেই কি তাদের এই সব সমস্যার সমাধান হবে, না যে বৃহৎ নারীপাচারচক্রগুলি সারা দেশে কাজ করছে তারা এবার প্রকাশ্যে ব্যবসা চালানোর সুবিধা পাবে? দারিদ্র্য, পারিবারিক অবদমন, মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেঁয়েমি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা—এই সবের সুযোগ নিয়ে আরো বহু মেয়েকে বিক্রি করে মুনাফা হয় তাহলে তো খোলাখুলিই করা যাবে। রাষ্ট্রের অবদমনমূলক ভূমিকা থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা কি খোলা বাজারে নারীমাংস থেকে যারা মুনাফা লোটে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া?

নারী ও তাঁর ক্ষমতায়ন

উত্তম বিশ্বাস

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন—'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবারে/কেন নাহি দিবে অধিকার/হে বিধাতা!' লক্ষনীয় রবীন্দ্রনাথ লাইনটির শেষে বিধাতার কাছে আর্জি জানিয়েছেন, কিন্তু কোনো বিধাতাই নারীর ক্ষমতার পথকে সুগমও করেননি, সাহায্যও করেন নি, তবে কেন তিনি বিধাতার কাছে হাজির হলেন? বিধাতা কি নারীর ক্ষমতায়নের হোতা? যাই হোক রবীন্দ্রনাথ বিধাতার কাছেই যান বা অন্য কোথাও তবু তিনি নারীর অধিকারের কথা বলেছেন।

মানুষের লিঙ্গভেদের শ্রেণিবিভাজনে যে দুটি জাতি আছে, তারা হল নারী ও পুরুষ। এই দুটি জাতির বিরোধের অন্ত নেই, কেননা মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে একে অন্যকে ছেড়ে দেওয়ার বিন্দুমাত্র অবসরও পায় না। প্রাচীনকাল থেকেই এই বিরোধ—বয়ে চলে আসছে। পুরুষ তাঁর আপন ক্ষমতাবলে নারীকে দমিয়ে রেখে দম্ভের চূড়ান্ত সীমাকে অতিক্রম করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে পুরুষ ছেড়ে কথা বলেননি সমাজে অবস্থানকারী যে কোন নারীকে৷ যদি একটু প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি—তবে লক্ষ্য করব বৈদিক যুগে নারী সমাজে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কন্যা সন্তানকে—কখনোই অবহেলা করা হত না। তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হত৷ তাঁরা বেদ পাঠের অধিকার পেতেন, উপনয়ণপ্রথাও প্রচলিত ছিল। অধ্যাপনা করতে পারতেন। সহধর্মিনী মানে সে ছিল সহকর্মীও। ঘোষ, অপলা, বিশ্ববারা, মমতা, লোপামুদ্রা প্রমুখ নারী সে যুগে উচ্চ স্তরে পৌঁছে ছিলেন। সে যুগে সতীদাহ বা বাল্যবিবাহের মতো প্রথা প্রচলিত ছিল না। পতি নির্বাচনে মেয়েরা স্বাধীনতা পেতেন। সব চাইতে বড়ো কথা নারীর নৈতিকতার মান ছিল সর্বোচ্চ শিখরে উড্ডীন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৈদিক-পরবর্তী যুগ থেকেই নারীর জন্য উল্লিখিত সমস্ত অধিকারই নারী পুরুষের মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধি বলে হাতছাড়া করে ফেলেন, যা আজও পুরোপুরি অর্জন করা হয়ে ওঠেনি।

নারীর এই দুর্বিসহ অত্যাচারিত অবস্থার জন্য শাস্ত্র কতখানি দায়ী, সেটা একটু অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। স্মৃতি শাস্ত্রের প্রধান বক্তা মনু বলেছেন :

'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যেমর্জতি।'

স্ত্রীলোককে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে। স্ত্রীলোক কখনও স্বাতন্ত্রলাভের যোগ্য নয়। শাস্ত্রীয় বিধান-এ নারী-পুরুষের বৈষম্য শুরু হয় জন্ম মুহূর্ত থেকে। হিন্দু ধর্মের আকরগ্রন্থ বেদ-এ পুত্র-পৌত্রের জন্য শত সহস্রবার প্রার্থনা আছে। কিন্তু কন্যা সন্তানের জন্য কোথাও কোনো প্রার্থনা নেই। অসংখ্য অবাঞ্ছিত কন্যাকে জন্মানোর অধিকার থেকেই বঞ্চনা করা হয়। এমনকি কন্যাভ্রূণকে হত্যা করা হয়। স্ত্রীজাতিকে বলা

হয়েছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'। একমাত্র পুত্রসন্তান প্রসব করাই নারীর জীবনের একমাত্র সত্য, ব্রত। ধর্মমতে কন্যাসন্তানের সারাজীবনের তাই পুত্র সন্তানের জন্ম দেবার যে কুচক্রী রাজনীতি কাজ করে, তার কারণ হল ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং বংশরক্ষার জন্য পুত্রের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটি ছোটো প্রশ্ন তাই উঁকি মারে, সত্যি বংশরক্ষার জন্য কন্যার কোনো ভূমিকা নেই? এই হ'ল ভারতবর্ষীয় মনুবাদী সমাজ-ব্যবস্থা।

আধুনিকমনস্ক নারী তাই মাথায় হাত বোলানো এই প্রক্রিয়াকে মেনে নেন নি। নিজের অধিকার নিজেই প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন। সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতে নারীর স্বাতন্ত্র্য বা ক্ষমতা অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষরা এই ব্যাপারে সেইভাবে এগিয়ে আসেননি। আধুনিক নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন তাই বলেন, আমরা মেয়েরা চাই নারী-পুরুষের সমানাধিকার। যদি বলি সমাজে কোনো আল (সীমা) থাকবে না মেনে নেবে এই সমাজ? এই রকম প্রতিবাদী স্পৃহা থেকেই সে ধীরে ধীরে সমস্ত অধিকার তথা ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। নারীরা অনুভব করেছেন পুরুষের পদানত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে তাঁকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণতান্ত্রিক অধিকার, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্ত অধিকারকেই তাঁর ক্ষমতায়নের মধ্যে রাখতে হবে। বিপ্লব জাতির ঐতিহ্যের অঙ্গ। নারী সেই ক্ষমতার অঙ্গকেও অর্জন করেছেন, তা কেউ তাঁকে পাইয়ে দেয়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে উচ্চবিত্তের মেয়েরা অগ্রাধিকার পেলেও সাধারণের ক্ষেত্রে এ ঘটনা অপ্রতুল ছিল। কিংবা বাড়িতে পণ্ডিত ডেকে নিজেরাই স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন। কিন্তু যখন থেকে নারীরাও পর্দার আড়ালে থেকেও শিক্ষিত হতে শুরু করলেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্জন করতে থাকলেন, সেই থেকে তাঁরা খেলা-ধূলা, শিক্ষার সমস্ত স্তরে পৌঁছতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্তরে তাঁরা আপন মেধার বলে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। এছাড়া সমস্ত সরকারী, বেসরকারী প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে তাঁরা স্ব-মহিমায় কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাঁদের এই সন্তোষজনক উপস্থিতি লক্ষিত হলেও তাঁদের অধিকার ও ক্ষমতাকে সর্বোতভাবে কুক্ষিগত করতে হলে আরও বেশি তৎপর হয়ে উঠতে হবে এবং সে প্রক্রিয়ায় এখন তাঁরা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেই যাঁদের এই ধরনের নানারকম প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে তাঁদের ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে আরও বড় ধরনের বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হয়। কিন্তু নানাবিধ প্রতিক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা নারীজাতিকে দ্রুত অগ্রগতির জন্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে নামতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-এর কারণে নারীকে যেভাবে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে, তার থেকে নিস্তার পেতে তাকে আরও বেশি সচেতন হতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে এখন যে তাকে অনেক বেশি প্রতিযোগী-সম্পন্ন মনে হচ্ছে, তার প্রধান কারণ নারীর শিক্ষা তথা প্রভাববিস্তারকারী মানসিকতার জোর। নারী এখন পণ করেছেন পুরুষের যেমন স্বাধীকার ইচ্ছা আছে, নারীকেও তা দিতে হবে। জন্মানোর পরে তাঁরা যেসমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করেন অন্যান্য দেশে, এদেশেও তা পাবেন না কেন? এসব দাবি নিয়ে তারা সোচ্চার। সব চাইতে বড় কথা, দেশের তথা

পৃথিবীর সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীসমাজের মতো বৃহত্তর এক জনসমষ্টি এগিয়ে আসছেন, এটা এখন আশার কথা। ক্ষমতায়নের একটু বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে নারী আর্জন করেছেন তাঁর ভোটাধিকার। ১৯১৭ সালে ডরোথি জিনারাসার-এর নেতৃত্বে চেন্নাই-এ প্রতিষ্ঠিত হয় 'Women's Indian Association' (WIA) নামে একটি মহিলা সংগঠন। এই সংগঠন ভারতে মহিলারা ভোটের দাবিতে তীব্রকণ্ঠ হয়ে ওঠেন। শেষপর্যন্ত ১৯১৯ সালের আইন অনুসারে (Government of India Act, 1919) ভারতীয় নারীরা তাঁদের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার অর্থাৎ ভোটাধিকার অর্জন করেন। এই অধিকার পেতে নারীকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। তদানীন্তন State for India-এর সচিব সরোজিনী নাইডু ১৪ জনের মহিলা প্রতিনিধিদল নিয়ে ১৮ ডিসেম্বর মন্টেগু চেমসফোর্ড-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভোটাধিকারের ব্যাপারে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এই স্মারকলিপিতে উদ্বেগ উল্লিখিত ছিল যে, ভোটাধিকারে পুরুষজাতি নারীজাতির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে। এবং তাঁদের এই রাজনৈতিক দাবির স্মারকলিপি লিখেছেলেন Women's in Indian Association-এর সচিব আইরিশ মহিলা মার্গারেট কু জিনস, যিনি অনেক আগেই আয়ার্ল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকারের অন্দোলনে জড়িত ছিলেন। এর পর দেখা গেছে যে, ১৯৩৫ সালের Indian Act অনুসারে মহিলা সংগঠনগুলি পুনরায় ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য আইন সভায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠছেন। বিশেষ করে আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব নিয়েই বেশি শোরগোল উঠেছিল। ভোটাধিকার অর্জনের অনতিকাল পরেই ভারতীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনে, বিশেষ করে পঞ্চায়েতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এছাড়া লোকসভা, বিধান সভাতেও নারীরা ক্ষমতার দাবীতে সামিল হয়েছেন।

পঞ্চায়েতে ক্ষমতায়ন নারীর অধিকারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে বিপুল সাড়া জাগালেও সেই তুলনায় মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, হরিয়ানা, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে পঞ্চায়েতের স্বাধিকার অর্জনে তাঁরা সক্ষম হন। ১৯৯২ সালে ৭৩তম সংশোধনীতে আইন অনুসারে পঞ্চায়েত রাজের তিনটি স্তর (গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক বা সমিতি স্তর, জেলা পরিষদ) থাকা বাধ্যতামূলক হয়। এই আইনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন বিষয় হ'ল তপশিলী জাতি/উপজাতি নারী সমাজের অনগ্রসর নারীদের জন্য সংরক্ষণবিষয়ক বেশ কিছু নতুন ধারার সংযোজন। এসব ধারা অনুযায়ী—

ক. প্রত্যেক স্তরে মোট আসনের ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ (তপশিলী জাতি/উপজাতি সহ) সংরক্ষিত করা হয়।

খ. কোনো এলাকায় মোট সংখ্যার মধ্যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতির জনসংখ্যা অনুপাতে এদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং সংরক্ষিত আসনের ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট থাকে নারীদের জন্য।

গ. অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি রাজ্য সরকারের ওপর ন্যস্ত করে বিধান দেওয়া হয় যে, রাজ্যসরকার বাঞ্ছনীয় মনে করলে এঁদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

ঘ. প্রত্যেক স্তরের পঞ্চায়েত প্রধানের মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য

(তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীসহ) সংরক্ষিত থাকবে, এই আসনগুলি বিভিন্ন নির্বাচন এলাকায় আবর্তিত হবে।

৬. গ্রাম ও ব্লকস্তরে সাধারণ সদস্য এবং প্রধানের আসন সংরক্ষণের বাইরেও নির্বাচনে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার স্বীকৃত হয়।

এই আইন অনুসারে ১৯৯২ সালের পরে যে সমস্ত রাজ্যে ত্রিস্তরী পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হয়, সেখানে উপরি উল্লিখিত আইনগুলি প্রণীত হয়। বিশেষ করে কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র তাদের সাংবিধানিক আইন বলবৎ করে নারীদের জন্য পঞ্চায়েতে সংরক্ষণের নিয়ম চালু করে। যদিও উঁচু শ্রেণি বা উচ্চবিত্তরা এই ব্যাপারে বেশী সুযোগ নিয়েছিল। তপশিলী জাতি/উপজাতির অস্তিত্ব ছিল প্রতীক মাত্র। এই মূল্য নারীর পক্ষে কম গুরুত্বের নয়। তবে বলে রাখা ভালো এছাড়া অন্য আরও যে সমস্ত রাজ্য ছিল তার মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, ওড়িশা, হরিয়ানা-তে ১৯৯২ সালের ঐ আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এখানে বিশেষভাবেই প্রগতিশীল ছিল। ১৯৯৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনটি স্তরে নারী এবং অন্যান্য শ্রেণির সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত আসনের চিত্র তুলে ধরা যাক :

১. গ্রামপঞ্চায়েতে মোট আসনের ৩৫.২২ শতাংশ।

২. ব্লকস্তরে ৩৩.৬৬ শতাংশ।

৩. জেলাপরিষদে ৩৪.১৪ শতাংশ।

তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দুর্গতিপূর্ণ বলা যায় না।

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত লোকসভায় নারী-সংসদের শতাংশ হিসেব করলে যে-ক্রমবর্ধমান চিত্রটি পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ :

১৯৭৭	সালে	৩.৬০	শতাংশ
১৯৮০	”	৫.১৬	”
১৯৮৪	”	৭.৯০	”
১৯৮৯	”	৫.১০	”
১৯৯১	”	৭.১০	”
১৯৯৬	”	৭.৩৬	”
১৯৯৮	”	৭.৯২	”

১৯৫২ সাল থেকে বিধানসভার পরিসংখ্যান ত্বরণ, মন্দনে দোলায়িত। তার একটি গড় হিসেব করলে দেখা যায় :

১৯৫২	সালে	১.৮	শতাংশ	বিধায়ক
১৯৫৭	”	৬.৩	”	”
১৯৬০	”	৪.৯	”	”
১৯৬৭	”	২.৯	”	”
১৯৭০	”	৪.৪	”	”
১৯৭৭	”	২.৮	”	”

১৯৭৯	”	৩.৮		
১৯৮৪	”	৫.৩		
১৯৮৯	”	৪.৫		
১৯৯৩	”	৪.০		
১৯৯৮	”	৬.০	”	”

নারীর এই সংসদীয় ক্ষমতায়ন হয়তো আরো দূর অগ্রসর হবে। সেই প্রতীক্ষায় তাঁদের কর্মসূচী দিন দিন অগ্রসর হয়ে চলেছে।

১৯৩৫ সাল থেকেই প্রথম মহিলাদের সংরক্ষণের প্রশ্নটি ওঠে। সেই সময় জাতীয় কংগ্রেস তথা গান্ধিজীর সহায়তায় মহিলা নেতৃবৃন্দ 'মহিলাদের একতা' এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠলেও সাফল্য পাননি। কিন্তু সাতের দশকে নারীমুক্তিতে এক বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের সূচনা হয়। রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৫—৮৫ সাল নারীদশক হিসেবে পালন করে। চিরাচরিত পর্দাসীন প্রথা থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অন্যদিকে পঞ্চায়েত থেকে পৌরসভা প্রভৃতি স্থানে নারীসমাজ তাঁদের স্বাধিকারের তথা ক্ষমতার অধিকারের সলতেটাতে শুভ দীপের উদ্বোধন করে এগিয়ে চলেছেন। একদিন তাঁরা পৌছে যাবেন পৃথিবীর সর্বত্র, সমান অধিকার এবং ক্ষমতার পূর্ণতায়।

সহায়ক গ্রন্থ

১. রাজনীতি ও নারীমুক্তি—ক্ষমতায়নের নবদিগন্ত : কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র. প্র. ২০০২, ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

২. নারীর চেতনা ও চিন্তা, লেখা দে সম্পাদিত, দশম-একাদশ বর্ষ, ৩৭-৪১তম সংখ্যা, মার্চ-১৯৯৩।

৩. নারীর ক্ষমতায়ন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাবিভাগ।

৪. Rabindra Bharati University Journal, R.B.U. Pol-Science Dept.

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

মঞ্জুরী গুপ্ত

আমাদের দেশে নারীরা বহুকাল ধরে নানারূপ দুর্গতি ভোগ করে আসছেন। স্বাধীনতার পর ভারতের নারীরা আশা করেছিলেন যে, তাঁরা সব দুর্গতি থেকে মুক্ত হতে পারবেন। আমরা দেখছি, নারীদের সেই আশা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে নি। আজ মাঝে মাঝেই সংবাদপত্রে দেশের নানা অংশ থেকে নানারূপ নারী নির্যাতনের সংবাদ যখন আমরা দেখতে পাই তখন আমরা আতঙ্কে, ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে শিউরে উঠি। আমরা বুঝতে পারি, যদিও আজকের দিনে অনেক নারী শিক্ষার দিকে অনেক এগিয়ে গেছেন, অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তবুও আমরা বিগত দিনের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

নারী-নির্যাতনের ঘটনা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে রাজস্থানের একটি সতীদাহের কাহিনী। সতীদাহের রোমহর্ষক ছবিও বের হলো সংবাদপত্রে। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দেখা যায়, নারী হত্যার মর্মন্তুদ কাহিনী। অনেক সময় আবার প্রকাশিত হয় আত্মহত্যার কাহিনী। এই সব হত্যা বা আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এ সব হঠাৎ হয় না। পণ বা অন্য কোনো কারণে—যার সঙ্গে অর্থলাভের প্রশ্ন জড়িত—এই সব কারণে মেয়েটির ওপর শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার চলতে চলতে, অবশেষে তা চরমে ওঠে। তখন হয় সে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, না হয় তাকে হত্যা করে 'মেয়েটি আত্মহত্যা করেছে' বলে প্রচার করার চেষ্টা হয়। মাঝে মাঝে শোনা যায় নারীর ওপর বলাৎকারের কাহিনী। কখনো বা পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য, কখনো বা প্রতিহিংসা নেবার জন্য দলবদ্ধ বলাৎকারের কাহিনীও শোনা যায়। তবে এই সব কাহিনী বা ঘটনা ঘটে উচ্চবিত্ত ও প্রভূত অর্থের মালিক পরিবারেই বেশি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না এমন সব ঘটনাও বহু আছে। এই ধরনের ঘটনা সমাজের উচ্চবিত্ত স্তরেই বেশি ঘটে। শ্রমিক-খেতমজুর-গরিব চাষীর ঘরে এ ধরনের ঘটনা ঘটে সাধারণত কম। তাঁরা সবাই কাজ করে, খেটে খায়। অবশ্য নিজেদের ভিতর তারা ঝগড়াও করে, আবার নিজেরাই মিটিয়ে ফেলে। এই বিশেষ বিষয়টি আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। তবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নানাবিধ কতো যন্ত্রণা নারীরা ভোগ করেন, তার সংবাদ কে রাখে?

অপরাধীদের শাস্তি হয় না কেন?

যখন এই সব ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন স্বভাবতই আমরা অত্যন্ত মানসিক

যন্ত্রণা ও উদ্বেগ বোধ করি এবং অপরাধী যাতে সমুচিত শাস্তি পায় সে জন্য চেষ্টা করি। কারণ আমরা জানি, যদিও অপরাধীদের শাস্তি দেবার মতো আইন রয়েছে, তবুও যাদের ওপর এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয় তারা দুর্বল এবং অপরদিকে অধিকাংশ অপরাধী বিত্তবান পরিবারের লোক বলে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ এবং ক্ষমতাবান লোকেদের সহায়তায় তারা পার পেয়ে যায়। লেনিন তাই বলেছিলেন : বুর্জোয়ারা মুখে সবই বলে, আইনও করে, কিন্তু অত্যাচার-অবিচার বন্ধ করতে হলে সমাজ ব্যবস্থারই আমুল পরিবর্তন প্রয়োজন। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের গভীর অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, এই অপরাধগুলোর মূল কোথায় এবং কেমন করে, কী ভাবে এর প্রতিকার করা যায়।

প্রত্যেকটি নারীহত্যার ঘটনা তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এগুলোর জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী বর্তমান সমাজব্যবস্থা। আমাদের দেশে নারীদের প্রতি পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব তো রয়ে গেছেই, তার ওপর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরানো দিনের সমস্ত শোষণ-নিপীড়ন সর্বরকম আবরণ ত্যাগ করে একেবারে উলঙ্গভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীকে ভোগ্যবস্তুর মতো দেখা হতো, আজ ধনতান্ত্রিক সমাজে নারী হয়ে গেছে পুরোপুরি পণ্যবস্তু। কার্লমার্কস কমিউনিস্ট ইশতেহারে এই কথাই বলে গেছেন।

সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব কী ভাবে আমাদের দেশে বেঁচে রয়েছে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাজস্থানের সতীদাহের ঘটনা। এ রকম ঘটনা যা হঠাৎ করে যদি কখনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তবে তা পরিষ্কার বলে দেয়, আমাদের দেশে এখনো নারীর স্বাধীনসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তার সত্তা জড়িয়ে আছে তার স্বামীর সত্তার সঙ্গে। এবং ধর্মীয় অনুশাসন বা সংস্কারের মাধ্যমে এটা প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। সংবাদটি যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তখন ঐ সংবাদের অন্য একটা জঘন্য ও ঘৃণিত দিকও ফুটে বের হয়। সেটা হলো, মেয়েটিকে যাতে সম্পত্তির ভাগ কিছু দিতে না হয় এবং তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে না হয়, সে যেন কিছু গোলমাল করতে না পারে তার জন্য তাকে সরিয়ে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ এবং এই সরিয়ে দেয়ার চমৎকার উপায় সতীধর্মের নামে মেয়েটিকে আত্মবলিদানে প্ররোচিত করা। তাই মার্কসবাদ বলে : নারীদের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে টেনে আনতে না পারলে, সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম উৎপাদনে তাঁরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ না পেলে নারীর সমানাধিকার শুধু কথার কথা থেকে যায়। পণের কারণে বধূহত্যা—এও আজকের সমাজে অপরাধের তালিকায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডগুলোর একটা বিচিত্র চরিত্র আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উভয়পক্ষই বেশ অবস্থাপন্ন ঘর, অর্থাৎ দুটো পরিবারই অবস্থাপন্ন, কন্যার পিতা সাধ্যমতো পণ দিয়েছে, সেখানেও পণের অঙ্ক আশানুরূপ হয়নি বলে বা বিবাহের পর নানাভাবে অর্থ আদায়ের জন্য বা ব্যবসায়িক কারণে বধুর পিতার কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য মেয়েটির ওপর অত্যাচার চলে এবং শেষকালে হত্যা বা আত্মহত্যায় তার পরিণতি ঘটে। এমনও আছে, মেয়েটি শিক্ষিত এবং চাকুরি করে তবুও যথেষ্ট পণ দেওয়া হয় নি বলে তার ওপর ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চলতে থাকে মেয়েটির বাপের বাড়ি থেকে আরও কিছু আদায়ের জন্য। অবশেষে বিফল হয়ে

স্বামী এবং স্বামীর পরিবারের লোকেরা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সব ক্ষেত্রেই মেয়েটি যখন নির্যাতন সহ্য করতে থাকে, তখন সে ভরসা করে নির্যাতন থেকে বেরিয়ে আসার, সাহস পায় না, তার পিতামাতাও তাকে বের করে নিয়ে আসতে সাহস পায় না। এ সবই ঘটে সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কারের ফলে এবং নিজেদের আত্মবিশ্বাসের অভাবে। সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই ঘটনা বেড়েই চলেছে। এ কথা প্রতিটি নির্যাতনের ঘটনায় প্রমাণিত হয়ে যায়।

মূল উৎস উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন

এই সমাজে নারীর শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় তার স্বামীর আর্থিক সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে এবং এর পেছনেই মেয়ের মা বাবা এবং মেয়েরা নিজেরাও পাগলের মতো ছোটে। সমাজে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সর্বত্র মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে, বিয়ের ব্যাপারেও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিফলন ঘটছে। বিয়ের পরে কোনো মতে গরমিল দেখা দিলে ভবিষ্যতে গোলমাল বাধবার খুবই আশঙ্কা থাকে। এর মধ্যে আরো একটি দিক হচ্ছে, সামাজিক মনোভাব। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই বিয়ের মধ্য দিয়ে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। মেয়েরা সক্ষম থাকলেও নানা সামাজিক বাধা-বিপত্তির জন্য এবং পুরানো সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাসের জন্য আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে অত্যাচার থেকে জোর করে বেরিয়ে আসতে ভরসা পায় না। অর্থনৈতিক পরাধীনতাই এ সব কিছুর মূলে রয়েছে। প্রেম-ভালবাসায় ভরা স্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্য জীবনের মূলে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের ব্যবস্থা। মার্কসবাদ তাই বলে : সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ব্যতীত নারীর পূর্ণ মুক্তি অসম্ভব। এই চেতনার অভাবেই মেয়েরা সান্ত্বনা খোঁজে নানা পূজা-অর্চনা, ব্রত-নিয়ম, সন্তোষী মা ইত্যাদি ধরনের অন্যান্য মা-আরাধনার মধ্যে। অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কাছে নিজেকে বলি দেওয়া, সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণায় মনকে আচ্ছন্ন করে রাখা এবং কুসংস্কার আর দেবতার পায়ে মাথা কুটে মুক্তি খোঁজা— এ সব আজকের দিনের সামাজিক অবক্ষয়ের একটা অংশ। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই সব সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামেরই এটা একটা প্রধান অঙ্গ। নারীদের ওপর এই নির্যাতন, এই সামাজিক অপরাধ কলুষের অবসানের সংগ্রাম জনগণের সামগ্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই অঙ্গ—সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এই জন্যেই নারী-নির্যাতনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবাদ হওয়া দরকার। এর মূল উৎসের অবসানের জন্য অবিরাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবাদ আন্দোলনে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।

দেখতে হবে, আমাদের মূল বক্তব্যটি সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথাটির পিছনে পড়ে না যায়।

গণতান্ত্রিক পরিবেশে এই নির্যাতন কমে যায়

যেখানে যেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী, যেখানেই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি প্রবল,

যেখানে সেই শক্তি রাজ্য সরকার পরিচালনা করে সেখানে নারীর সম্মান ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা ও কেরালায় তা প্রমাণিত হয়েছে। এ কথা সব সময় স্মরণে রাখতে হবে, কায়েমীস্বার্থের বিরুদ্ধে, জমিদার-জোতদার শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সংগ্রাম যখন উদ্বেল হয়ে ওঠে, তখন তাদের দমন করার জন্য ক্ষমতাবান শোষক রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে ও ইঙ্গিতে শোষিত মানুষের ঘরের মা-বোনদের ওপরে চলে নানা ধরনের উৎপীড়ন, নিপীড়ন। তাদের হত্যা করা হয়, তাদের পারিবারিক জীবন ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়, তাদের অপমান করা হয়, স্বামীকে হত্যা করে হত্যাকারীরা পৈশাচিক উল্লাসে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। একদা কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে রাজ্যে হরিজনদের ওপর অত্যাচার, হরিজন নারীদের ওপর নির্যাতন এই সত্য উদ্‌ঘাটন করে। উত্তরপ্রদেশের শিশোরা গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হেরে গিয়ে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গরিব গ্রামবাসী, যারা তাকে ভোট না দেবার 'স্পর্ধা' দেখিয়েছিল, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, তাদের ঘরের মেয়ে-বৌদের নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছে। এ রকম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ঘটনা বহু আছে।

সমাজে নারী নির্যাতন দূর করার আন্দোলন ও সংগ্রামকে হতে হবে সামাজিক ও সাংস্কৃতি অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ও সমাজ বদলের সংগ্রামের অঙ্গ হচ্ছে একদিকে বর্তমানের শোষণভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজ বদল করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম, সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক অবক্ষয়ী সংস্কৃতি, মানসিকতার বিরুদ্ধে সুস্থ সামাজিক চিন্তাধারা বিকাশের সংগ্রাম। এই সুস্থ সামাজিক চিন্তাধারার ভিত্তি হলো সমাজে নারীর নতুন মূল্যায়ন, নারী সম্পর্কে নতুন মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। নারী সেবাদাসীও নয়, পণ্যও নয়, সে সহযোদ্ধা, সে সমাজের উৎপাদনের অংশীদার। আজকের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-লড়াই শুরু হয়েছে সমস্ত শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সেই গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের শিবিরে নারী হচ্ছে পুরুষের সহযোদ্ধা কমরেড।

আমাদের কর্তব্য

আমরা গোটা ভারতের দিকে তাকালে দেখতে পাই দুটি চেহারা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ যেখানে ঘটছে, সেখানে অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা ও কেরালায় এক রূপ, আর গণতান্ত্রক আন্দোলন যেখানে এখনও নিম্নস্তরে, সেখানে অন্য রূপ। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি, শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য নারী-নির্যাতনের রূপ। আর সেই প্রচেষ্টা যখন প্রতিহত হলো, তখন আমরা দেখছি, নারীদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সর্বব্যাপী প্রচেষ্টার রূপ। পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার নারীকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করছে। নারীর শিক্ষার, স্বাবলম্বনের প্রচেষ্টা করছে, তাদের নানাবিধ দায়িত্বের মধ্যে টেনে আনার প্রচেষ্টা করছে, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বিকাশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। এই পার্থক্য বোঝার জন্য নারী নিপীড়নের একটি হিসাব দিচ্ছি :

নারী ধর্ষণের ঘটনা, ১৯৮১

১।	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৭
২।	বিহার	৪৯
৩।	মধ্যপ্রদেশ	৭৪
৪।	মহারাষ্ট্র	৩১
৫।	পাঞ্জাব	৯
৬।	রাজস্থান	৫৭
৭।	উত্তরপ্রদেশ	১৩৮
৮।	পশ্চিমবঙ্গ	৬

[উৎস : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রিপোর্ট]

হরিজন নারী ধর্ষণের ঘটনা, ১৯৮২ সালের প্রথম ১০ মাস

১।	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৬
২।	বিহার	৭৯
৩।	কর্ণাটক	৬
৪।	হরিয়ানা	২৭
৫।	মধ্যপ্রদেশ	১৩৩
৬।	মহারাষ্ট্র	৪২
৭।	পাঞ্জাব	৭
৮।	ওড়িশা	১০
৯।	রাজস্থান	৫৮
১০।	তামিলনাড়ু	৯
১১।	উত্তরপ্রদেশ	১৫২
১২।	পশ্চিমবঙ্গ	৩
১৩।	ত্রিপুরা	২

[উৎস : রাজ্যসভা প্রশ্নোত্তর, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩]

১৯৮২ সালে প্রথম ১০ মাসে সারাদেশে ৫৫৬টি হরিজন নারী-ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এই মোট সংখ্যায় পশ্চিবঙ্গের অংশ মাত্র ৩।

নারীসমাজ যতো বেশি বেশি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংগঠিত হবে, ততোই তাদের শক্তি বেড়ে যাবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি বাড়বে। শ্রমিক কৃষক কর্মচারীদের আন্দোলনের সাথে নারীরা যেমন একত্রে লড়বে, তেমনি তাদের নিজেদের সংগঠনও গড়ে তুলবে এই লড়াইয়ের জন্য। নারীর মর্যাদার জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য, সমান অধিকারের জন্য তাদের লড়াই সমগ্র সমাজের লড়াই।

পরিশেষে আবার বলি, নারীদের ওপর অত্যাচারের যে সমস্যা, সে সমস্যা শুধু নারীদের

সমস্যা নয়, সে সমস্যা সমস্ত সমাজের সমস্যা। বহুমুখী এই সমস্যাকে সঠিকভাবে প্রতিহত করতে সমস্ত স্তরের মানুষের মিলনপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই মিলিত প্রচেষ্টা অর্থাৎ সামগ্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরো ব্যাপক বিস্তৃত করে তুলতে হবে। নারীদের এটা একটা পৃথক আন্দোলন নয়, এটা সমগ্র সমাজের আন্দোলন। নারীসমাজের মধ্যে আমাদের অবশ্যই অবিরাম প্রচার চালিয়ে যেতে হবে আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। আলোচনা সভা, সেমিনার ও বৈঠকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই নারী-নির্যাতন অবসানের জন্য আমাদের অবিচল নিষ্ঠায় কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বামপন্থী মহিলা সংগঠন ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনকেও সঙ্গে নিয়ে ব্যাপকভাবে নারীসমাজের মধ্যে আমাদের এই প্রচার ছড়িয়ে দিতে হবে। এ সব সমস্যার মৌলিক সমাধান করার প্রচেষ্টার সাথে সাথে প্রতিটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রচার অব্যাহত থাকবে।

বধূনির্যাতন, পণপ্রথা ও পণপ্রথাবিরোধী রবীন্দ্রচেতনা

প্রথমা রায়মণ্ডল

১

ভারতীয় উপমহাদেশের নারীসমাজ পণপ্রথার মত একটি বিষাক্ত সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে দীর্ঘকাল থেকে। এবং ক্রমে ক্রমে এর ভয়াবহতা ব্যাপকহারে বেড়ে পণের দায়ে ফাঁসির যূপকাষ্ঠে বলি হতে হচ্ছে অসহায় নিরীহ মেয়েদের। গণতান্ত্রিক দেশে এই অগণতান্ত্রিক ব্যাধি নির্মূল করার জন্য আইন তৈরি করতে হচ্ছে সকলকে। রবীন্দ্রনাথ পণপ্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি একে 'লজ্জাজনক এবং অপমানকজনক' প্রথা বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারে তিনি সোচ্চার হয়েছেন : 'পণপ্রথার ন্যায় লজ্জাজনক ও অপমানজনক প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সহিত নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দর-দাম করিতে থাকা, এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই'।

তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে দরদাম করার মত ব্যবসায়িক মানসিকতাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন। আমাদের দেশে সরকারী আইন পণপ্রথাকে রদ করতে পারছে না বলেই এত বধূহত্যা, নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান দিন দিন বাড়ছে। পণপ্রথা-বিরোধী রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ বর্ণনার আগে পণপ্রথার মত সামাজিক ব্যাধি নিয়ে উপক্রমণিকা হিসেবে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে।

বরপণ দেবার সূত্রপাতটি সেই মধ্যযুগে যখন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তখন কে জানতো, সেই হাসতে হাসতে বরপণের খেলা একদিন জীবন খেলার মারণযন্ত্রে রূপান্তরিত হবে। মহাভারতের শল্য-পর্বে বৃদ্ধা রূপহীনা কন্যা সুভ্রুর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, সমর্থবান পিতা একদিন তাঁর কুরুপা মেয়েকে নির্ভরযোগ্য পাত্রের হাতে তুলে দেবার জন্য, বরং বলা যায় কিছুটা পাত্রের সন্তুষ্টিকরণ-ভেটের মতই একসময় কিছু অর্থ সম্পদ বা শুল্ক তুলে দিয়েছিলেন বর-এর হাতে। সেই অনায়াসে তুলে দেয়া ব্যক্তিগত ধনসম্পদই কালের বিবর্তনে সামাজিক প্রথায় রূপ পেল; ভয়াবহ আকারে ডালপালা বিস্তার করে মেয়ের বাবার সামর্থ্য পাওনাদারের রোলার দণ্ডে রূপান্তরিত হলো। সুস্থ সমাজ জীবনে যা সারাক্ষণ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মনে অশুভ করাল ছায়ার ন্যায় আগ্রাসী হাতের স্পর্শ লাগার মতই আতংকের সৃষ্টি করছে। দিন দিন আমরা কৃত্রিম সভ্য হচ্ছি, প্রগতির রথে এগিয়ে যাচ্ছি, পৃথিবীর বুকে ভারতের আসন শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত হোক এই কামনা করছি, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলছি, মানবিক তথা নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলছি এবং ঢাক ঢোল

পিটিয়ে নারী-উন্নয়ন দশক পালন করেছি। অথচ ভেতরে ভেতরে বংশপরম্পরায় রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা পণপ্রথাকে মনের অজান্তেই, উর্বরতা দেবার জন্য লালন করছি; পণ নেবার ব্যাপারে ঔদার্য দেখাচ্ছি। সেই মুহূর্তে একবারও ভাবছি না এই অবচেতন মনের সযত্নলালিত পণপ্রথার উর্বর শক্তিশালী আঘাতে একদিন আমিও চূর্ণবিচূর্ণ হতে পারি। একবারও সচেতন মন নিয়ে ভাবছি না যে, এটি একটি অবচেতন প্রতিশোধস্পৃহাজাত বিষাক্ত সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি মানুষের মনুষ্যত্বকে হেয় করে—স্ত্রী সহধর্মিনী, সহকর্মিনী, সহমর্মিনী না হয়ে, হয়ে যায় দাসী, পরিচারিকা কিংবা বাজার থেকে কিনে আনা পণ্যবস্তু। সেই স্ত্রী স্বামীর কথায় কাঁদে, হাসে, স্বামীর মনমতো 'সোসাইটিতে' মেশে এবং সভ্যতার চাপে অতি সুখী দম্পতির সুনিপুণ অভিনয়ও করে। কিন্তু পণের চাপে বাবাকে নিঃস্ব করে আসা মেয়ের মনের গভীরে যে ক্ষত দিনে দিনে বেড়ে উঠতে থাকে; সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের খবর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তব্যপরায়ণ স্বামী কোনদিনই রাখেন না কিংবা স্ত্রীর মনের নাগাল কোনদিনই পান না। নিজের মা-বাবা ভাই-বোন, পরিচিত আবেষ্টনী ছেড়ে স্বামীর আপনজনকে নিজের বলে মেনে নিতে হয়। শ্বশুরবাড়ির ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যোগ দিয়ে নিজের অনিচ্ছাকেও ইচ্ছায় পরিণত করতে হয়। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই কিংবা নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেই দেখা দেবে সংঘাত—তার চরিত্রে লেপে দেয়া হবে কলংকের তিলক এবং পরিণাম হয়তো হবে আরো ভয়ংকর। আর যারা নীরবে আঘাত হজম করেন, তাদের মনের ভেতরে যন্ত্রণা হয় আরো গভীর। এই যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সব দিকে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়েই অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে পারিবারিক সুখের রশিটি টেনে রাখার দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই মেয়েদেরকে বিশেষণ নিতে হয় ছলনাময়ী বলে; শুনতে হয় 'নারীর মন দেবতারও অগোচর।'

একটি মেয়েকে জন্ম নেবার পর থেকেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তোমার স্থান ভাইয়ের পরে, আগে নয়। আর একটু বড় হলে তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় সে মেয়ে, এ ঘর তার নয়। তাকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে পরকে আপন করার; স্বামীর ঘরই হবে তার স্থায়ী বাসস্থান। তাই বাবার ঘর থেকে তার স্থান হয় শ্বশুরের কিংবা স্বামীর ঘরে। হায়রে ভারতের দুর্ভাগা নারী! নিজের ঘর আর তার হয় না কখনো। তাই ব্যক্তিইচ্ছার মৃত্যু ঘটাতে না পারলে সমাজে কোনো নারী হয় ভয়ংকরী, কেউ ছলনাময়ী, কেউবা আবার কলহপরায়না। আর যে নারী ইচ্ছার সম্পূর্ণ অপমৃত্যু না ঘটিয়ে সংসারে শান্তি চায়, তাকে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হয়তো একদিন ঢলে পড়তে হয় মৃত্যুর কোলে। এই দৃষ্টান্ত অব্যাহত গতিতে বেড়েই চলেছে আজো। আসলে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীকে সম্পদ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এ এক বিচিত্র প্রক্রিয়া। যুগ যুগ ধরে শোষণের এই কূট-কৌশল সমাজে শিকড় গেড়ে বসে আছে। এই প্রথা সমাজে বিদ্যমান বলেই পণের বলি এবং বধূনির্যাতনের পরিসংখ্যান দিনদিন বেড়েই চলেছে।

২

পণপ্রথাকে কেন্দ্র করে বেড়ে ওঠা নারীর যন্ত্রণাকে রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর 'গল্পগুচ্ছে'র প্রথম খণ্ডে লেখা 'দেনাপাওনা' গল্পটির মধ্য দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার বরং

বলা ভাল পণদায়গ্রস্ত দেনাদার পিতা এবং সেই দেনার দায়ে বিবাহিতা কন্যার জীবনের ভয়ংকর পরিণতিকে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সংবেদনশীল মন নিয়ে পণের কবলে পতিতা কন্যার মর্মবেদনার সার্থক ভাষাচিত্র এ গল্পে নির্মান করেছেন।

'দেনাপাওনা' নামকরণের মধ্য দিয়েই পণপ্রথার প্রতি রবীন্দ্রনাথের তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। গল্পটি এরকম : মেয়ের বাবা রামসুন্দর একজন সাধারণ মানুষ। পাঁচ ছেলের পর একটি মেয়ের জন্ম হল তাঁর। বড় আদরের সে মেয়ে, নাম নিরুপমা। যথাসময় মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হলেন বাপ। তাঁর একমাত্র কন্যার জন্য তিনি যে পাত্র খুঁজে আনলেন, সে ক্ষয়িষ্ণু রায়বাহাদুরের পুত্র, যার বাজারদর নিরুপমার বাবার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মিলিয়েও নাগাল পাবার মত নয়। অর্থাৎ পাত্র ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। তবু দরিদ্র পিতা তাঁর একমাত্র মেয়েকে সুখী দেখার জন্য অর্থাৎ আর্থিক ক্লেশমুক্ত ঐশ্বর্যময়ী রূপে দেখার জন্য একটি নামী দামী ঘরে বিয়ে দিতে চেয়েছেন। ঐ বর কিনতে হলে দশ হাজার টাকা লাগবে এবং বহু দান সামগ্রী। কিন্তু 'কিছুতেই টাকার যোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া অনেক চেষ্টাতেও ছয় সাত হাজার বাকি রহিল।' [১] এ অবস্থায় বরের পিতা রায়বাহাদুর মহাশয়, তাঁর পক্ষে যা-ই বলা স্বাভাবিক তাই বললেন : 'টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।' [২] এই দৃষ্টান্ত আজো চোখে পড়ে। এখনও পনের টাকা হাতে না পেলে বরকে বিয়ের পিড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

শুধুমাত্র তাই সংকটপন্ন অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বরকে অতিমাত্রায় প্রতিবাদী করে তুলেছেন। দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রাপ্তির ব্যাপারে এযুগের বরেরাও এ ধরণের কথা বলে না, বরং বাবার বাধ্য ছেলে সেজে বিয়ের পিড়ি ছেড়ে উঠে যায়। নিরুপমার বর তার রায়বাহাদুর বাবাকে বলে বসলো : 'কেনা বেচা দর-দামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইবো।' [৩] অতএব রায়বাহাদুরের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর ছেলের সঙ্গে নিরুপমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হলো বটে কিন্তু দেনা-পাওনার সম্পর্কটা ঘুচে গেল না। একমাত্র আদরের নিরুপমা; রামসুন্দর মেয়েকে না দেখে থাকতে পারেন না। মেয়েকে তিনি তার শ্বশুর বাড়িতে দেখতে যায় বটে 'কিন্তু বেয়াই বাড়িতে তার কোন প্রতিপত্তি নাই, চাকরগুলো পর্যন্ত তাহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনদিন বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনদিন বা দেখিতে পান না।' [৪] এতো গেল মেয়ের বাপের অবস্থা। মেয়ের অবস্থাও ততোধিক শোচনীয়। উঠতে বসতে নিরুকে টাকার জন্য খোঁটা খেতে হয়, বিনাদোষে কুৎসিত মন্তব্য শুনতে হয়। মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত নিরুপমা, বাপের অবস্থাটা আঁচ করতে পেরে দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ি যেতে চেয়েছে। কিন্তু নিরুপায় রামসুন্দর নিস্ফল যন্ত্রণায় মাথা কুটেছেন : 'নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমনকি কন্যার দর্শন সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময় বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।' [৫] সেই বাবা মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাবে কোন সাহসে, কোন যোগ্যতায়?

মেয়েকে বাপের বাড়ি আনার জন্য, গঞ্জনার হাত থেকে একটু রেহাই দেবার জন্য শেষ

পর্যন্ত রামসুন্দর বহু অপমান, বহু ক্ষতি স্বীকার করে, বহু কষ্টে তিন হাজার টাকা যোগাড় করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মেয়েকে সুখে রাখার যে কল্পিত আকাংক্ষা পিতার মনে দানা বেঁধেছিল ইতোমধ্যেই তা মিটে গেছে। টাকাটা চাদরের কোণে বেঁধে নিয়ে রামসুন্দর সহাস্যমুখে বেয়াইর কাছে গেলেন বটে কিন্তু 'পঞ্জরের তিন খানি অস্থির মত ঐ তিন খানি নোট'[৬] তিনি বেয়াইর সামনে তুলে ধরলেন। এত কষ্টে সংগৃহীত হলেও টাকাটা যেহেতু পুরো পাওনা শোধ নয় (বাকি ছিল ৭০০০ টাকা), তাই ঐ সামান্য টাকা নিয়ে বেয়াইমশাই আর 'হাত দুর্গন্ধ' করতে চাইলেন না। কাজেই মেয়েকে বাড়ি নিতে পারার অনুমতিও মিললো না। 'রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিত হস্তে নোট কয়খানি চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন। ততদিন আর বেহাই বাড়ি যাইবেন না।'[৭] কিন্তু কোনোভাবেই যখন পুরো টাকাটা যোগাড় করতে পারলেন না রামসুন্দর, তখন ছেলেদের অজ্ঞাতে তিনি বসতবাড়ি বিক্রি করে বসলেন বরপণের দেনা শোধ করার জন্য—যাতে করে বিয়ের অপরাধে আসামী মেয়ের ওপর থেকে ওয়ারেন্ট তুলে নিয়ে তাকে জামিনে ঘোরাফরা করার মত একটু সুযোগ করে দেয়া যায়। কিন্তু সেই ন্যূনতম অধিকারটুকু ফিরিয়ে দিতেও কত বাধা। যখন টাকা নিয়ে মেয়ের কাছে গেলেন রামসুন্দর, খবর জানতে পেরে তাঁর ছেলে ও নাতিরা হাজির হলো সেখানে। ছেলে বললো : 'বাবা আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?'[৮] নিরুপমা সব বুঝতে পারলো। সার্বিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ওর স্বাধিকার বোধ ও ব্যক্তি মর্যাদাবোধ তীব্র হলো। ও বাবাকে বললো : 'টাকাটা যদি দাও, তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই। আমি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না। তাছাড়া আমার স্বামীতো এ টাকা চান না।'[৯] স্বামীকে এখানে উদার করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে রবীন্দ্রনাথ চান 'স্বামীরা' এমনি উদার মানসিকতারই হোক। কিন্তু আজকের সমাজেও শ্বশুরবাড়ির প্রাপ্তি গ্রহণে কুণ্ঠিত, এমন অনুদার স্বামী বড় একটা চোখে পড়ে না। মেয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের কাছে পরাভূত হয়ে রামসুন্দর এবারও কম্পিত হস্তে টাকাগুলো নিয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা গোপন রইলো না। 'ডেপুটি মেজিস্ট্রেট' স্বামীর অনুপস্থিতিতে অত্যাচারিতা নিরুপমার পক্ষে শ্বশুরবাড়ি ক্রমে ক্রমে 'শরশয্যা' হয়ে উঠলো। এবং 'কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না—যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইলো, সেই দিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেই দিনই ডাক্তারের দেখা দেশ হইলো।'[১০]

রায়বাহাদুর বাড়ির বড় বৌ-এর শ্রাদ্ধ খুব ঘটা করেই হলো। রামসুন্দরের কাছে সান্ত্বনাবাণী পৌঁছলো, কত সমারোহে তাঁর মেয়ের শ্রাদ্ধ হয়েছে। তাঁর অন্তরের ঘা বাইরে বেরুবার সুযোগ পেল না কোনোদিন। স্ত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে, এতবড় উদারস্বামী, যিনি পুরো পণের টাকা না পেয়েও স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছিলেন, তিনি এতসব ঘটনার কিছুই জানলেন না। তিনি এতদিন বাদে তাঁর স্ত্রীকে নিজের কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন। তাঁর মা জবাব দিলেন : 'বাবা তোমার জন্য আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি। অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।'[১১] এবার পণের অংক দ্বিগুণ : 'বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।'[১২]

রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় :

ক. বরের পিতা-মাতার পণের টাকার খাই প্রচণ্ড। এবং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায়ও ঐ একই চিত্র বিদ্যমান।

খ. পণের টাকা মেটানোর জন্য পিতাকে সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়। এই চিত্র এখনও এতটুকু ম্লান হয়নি। সমাজে তা এখনও বিদ্যমান।

গ. এখনও নিরুপমার মত পণের টাকা পরিশোধ না করতে পারায় কনেকে বাপের বাড়িতে যেতে দেয়া হয় না।

ঘ. পণের টাকা না দিতে পারায় নিরুপমার ওপর যে নির্যাতন, এখনও তা সমাজে বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

ঙ. পণের শেষ পরিণতি বধূর মৃত্যু। এর নাম কি পক্ষান্তরে আত্মহত্যার পথে প্ররোচিত করা নয়?

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের মধ্য দিয়ে পণপ্রথার পরিণতির চিত্র তেমন দেখিয়েছেন, তেমনি অর্থগৃধ্নুতার দৃশ্যপটও নির্মাণ করেছেন। কিন্তু এই গল্পে 'পরিণতি'-এর প্রতিকার নেই। অবশ্য এখনও ময়নাতদন্ত ছাড়াই এমনিভাবে বহু বধূকে নীরবে পণের বলি হতে হয়, যেখানে আইনের ফাঁস দিয়ে বধূ-মৃত্যুর নায়কদের সোপর্দ করা যায় না। পণপ্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সোচ্চার-মানসিকতা আজকের দিনের মানুষের প্রতিবাদের মন্ত্র হওয়া উচিত।

রবীন্দ্র-গল্পগুচ্ছের তৃতীয় পর্বের গল্প 'হৈমন্তী'। স্বভাবতই এ গল্পের প্রকাশভঙ্গীতে ঋজুতা এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও বিচিত্রমুখীনতা ঝরে পড়েছে। এটি একটি স্মৃতিচারণমূলক গল্প। এখানেও শ্বশুরের অর্থগৃধ্নুতার স্বীকার হয়েছে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তী। স্বামীর রস-সমৃদ্ধ ভালবাসা পেয়ে হৈমন্তী শ্বশুরকূলের নির্লজ্জ অর্থগৃধ্নুতার প্রতিবাদে আত্মঅবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে তাঁর করুণ পরিণতিকে আরো দ্রুততর করেছে মাত্র।

এ গল্পের পণগ্রহীতা, হৈমন্তীর শ্বশুরমশাই-এর অর্থ-পৈশাচিকতা প্রত্যক্ষ পণপ্রথার ভয়াবহতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। শুধু বিয়ের আসরে চুক্তিবদ্ধ পণের টাকা পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি—তাঁর লোভের শিকড় আরো গভীরে লুক্কায়িত ছিল। নিজের কল্পিত আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন এবং হৈমন্তীর প্রতি সেই যন্ত্রণার বিষ অযথা বর্ষণ করে তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। গল্পটি এরূপ : গল্পের নায়ক তথা পাত্র অপূর্ব। কনে হৈমন্তী। কলেজে পড়া যুবক অপূর্বর বিয়ে ঠিক হলো পশ্চিমের এক পাহাড়ের কোনো এক রাজার অধীনে চাকুরীরত গৌরীশংকরবাবুর একমাত্র কন্যা হৈমন্তীর সঙ্গে। হৈমন্তীর বয়স ষোল। তবে 'সে স্বভাবের ষোল, সমাজের ষোল নহে।' [১৩] বিদুষী সংযত সহজ অনাড়ম্বর অথচ প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী হৈমন্তী। ছেলের বাবা গৌরীদানের পক্ষপাতী হলেও হৈম'র ষোল/সতের বছর বয়সকে মেনে নিতে আপত্তি নেই। 'মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনও তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।' [১৪] অর্থাৎ পণের অংক পনের হাজার এবং পাঁচ হাজার টাকার গহনা। যা দেবার কথা সবটাই গৌরীশংকরবাবু দিয়েছেন, চড়া সুদে টাকা ধার করে; বইপ্রেমী, ধীর, শান্ত,

সংযমী মানুষ তিনি, একথা কাউকে বুঝতে দেন নি। অপূব'র বাবা-মা কল্পনা করে নিয়েছিলেন বেয়াই বুঝি রাজার অধীনে মন্ত্রীগোছের একটা বড় চাকুরী করেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর অবসরের পর একমাত্র জামাই অপূর্ব ঐ পদে স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে; ব্যাঙ্কেও কমপক্ষে লাখখানেক আছে যার উত্তরাধিকারী পরোক্ষে অপূর্ব-ই। কিন্তু সত্যভাষী গৌরীশংকরবাবু কখনই কাউকে বলেননি, তিনি মন্ত্রীর চাকুরী করেন কিংবা ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক টাকা সঞ্চিত আছে। অতএব ভবিষ্যতে প্রাপ্তির লোভে অনুমাননির্ভর 'মন্ত্রীগোছের বেয়াই'র মেয়েকে যথাযথ বৌ-র মর্যাদা দিতে প্রথম অবস্থায় ওরা কার্পণ্য করেনি। কিন্তু যেদিন ছেলের বাবার স্বপ্নভঙ্গ হলো, তারপর থেকে শুরু হলো হৈমন্তীর ওপর মানসিক অত্যাচার। অপূর্ব'র ভাষায় : 'যদিও আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পরিমাণ সম্বন্ধে আমার বাবার সঙ্গে তাঁহার কোনদিন কোন আলোচনাই হয় নাই, তবু বাবা জানিনা কোন যুক্তিতে ঠিক করিলেন, তাহার বেয়াই তাহাকে ইচ্ছাপূর্বক প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।' [১৫] হৈমর প্রতি অত্যাচারের সঙ্গে মিথ্যে ভাষণ যখন যুক্ত হলো, ওর ঋষিতুল্য বাবাকে যখন 'ঋষিবাবা' বলে ব্যঙ্গ করতে শুরু করলো, হৈমন্তীর আঘাত মরমে গভীরভাবে প্রবেশ করলো তখন থেকেই। মনের যন্ত্রণাকে শিক্ষা, রুচি ও সংযম দিয়ে ঢেকে রাখতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গন ধরেছে ভয়ংকরভাবে। একদিন হৈমর বাবা এলেন, হৈম কাঙালের মত হাহাকার করে উঠলো বাবার সঙ্গে যাবার জন্য। বাবা মেয়েকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হলেন, কিন্তু বইপ্রেমী আপনভোলা মানুষটি বুঝতে পারলেন না, বেয়াইবাড়িতে আগের মত যত্ন তাঁর নেই; বাপের সঙ্গে মেয়ের যাবার অনুমোদনেও বাঁধা পড়বে। বিয়ের শর্তানুযায়ী ষোল আনা যৌতুক দিয়েও তাঁর অপরাধ তিনি মন্ত্রীগোছের চাকরি করেন না; তাঁর অপরাধ, তাঁর নামে ব্যাঙ্কে লক্ষাধিক টাকা সঞ্চিত নেই। তাই ডাক্তার এনে মেয়েকে দেখানোর পর ডাক্তারের মুখ থেকে মেয়ের রোগের ভয়াবহতা যখন শুনেছে, তখন পাল্টাভাবে তাকে এ ব্যঙ্গও শুনতে হয়েছে, 'অমন ঢের ডাক্তার দেখিয়াছি। দক্ষিণার জোরে সকল পণ্ডিতের-ই কাছে সব বিধান মেলে এবং সকল ডাক্তারের কাছে সব রোগের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।' [১৬] যে ভয়াবহ পরিণাম 'দেনা পাওনায়' দেখা গেল অনুরূপভাবে এ গল্পেও নায়ককে 'বুকের রক্ত দিয়ে দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনী' [১৭] লিখতে হলো। সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে, 'দেনা পাওনার' চেয়ে 'হৈমন্তী' গল্পের পণগ্রহীতার চাহিদা আরো বেশি অনমনীয়; আরো বেশি সাংঘাতিক লোভের দৃষ্টি এদের। তাহলে দেখা যাচ্ছে পণপ্রাপ্তির ভয়ঙ্কর লালসা ছাড়াও বিয়ের পরবর্তী আরো একটি 'পণতুল্য' ঘৃণ্য আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী জীবনকেও বিষময় করে তুলতে পারে। 'হৈমন্তী' গল্প তার প্রমাণ।

প্রাগুক্ত গল্পদুটিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে পণপ্রথার কবলে পতিত ভারতবর্ষেব বিশেষত বাংলার মেয়েদের জীবনের শোচনীয় পরিণামকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু গভীর প্রত্যয়ী আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ এর পাশাপাশি পণগ্রাহকদের হীনমন্যতার বিরুদ্ধে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এবং বিবাহলগ্না কন্যাকেও বিদ্রোহী করে তুলেছেন তাঁর 'অপরিচিতা' গল্পে। এটি নিঃসন্দেহে পণপ্রথার তথা বরপক্ষের দুষ্টলোভের বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গল্পটির রচনাকাল ১৩২১ সালের কার্তিক মাস। অর্থাৎ আজ থেকে ৯১ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ, মা ষষ্ঠীর

কৃপায় পুত্রসন্তানলাভকারী হীনলোভী শোষনেচ্ছু পিতাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে কনে তথা কনের পিতাদের ব্যক্তিমর্যাদা নিয়ে গর্জে ওঠার মন্ত্র শুনিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন এই 'অপরিচিতা' গল্পটিতে।

এ গল্পের বক্তা পাত্র অনুপম স্বয়ং। তিনি এম. এ. পাশ কিন্তু অভিভাবক (মামা) হীন চলার যোগ্যতা তাঁর হয় নি আজো। যথাসময়ে অনুপমের বিয়ের খোঁজখবর করা শুরু হলো। ছেলে বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকমামা রীতিমত শোষক এবং প্রভু-অভিভাবক সেজে বসলেন। 'ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তার অস্থিমজ্জায় জড়িত। তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহাকে শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাধা হুকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না.... মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাহার কাছে গুরুতর।' [১৮]

এ ক্ষেত্রেও মেয়ের বয়স পনের। বয়সটা আপত্তিকর হলেও টাকার অঙ্ক গহনার ভরি-ওজন ও দর সব পাওয়ানা এককথায় মিটে যাওয়ায় এবং মেয়ের বাবা শম্ভুনাথ সেনকে স্বল্পভাষী চুপচাপ দেখে তাকে নির্জীব তেজহীন ভেবে নিয়ে বয়সের আপত্তিটি শিথিল হয়ে গেল। ধূমধাম করে গায়ে হলুদের পর্ব সমাধা করলেন ছেলের মামা, মেয়ের বাবাকে নাজেহাল করার জন্য। বিয়ের আসর সাজানো হয়েছে মাঝারী ধরনের, মামার তা মনোপুত হলো না। বিয়ের কাজ শুরু হবার আগেই মামা কনের গয়নাগুলোর গুণাগুণ এবং ওজন যাচাই করে নিতে চাইলেন। আর এর জন্য তিনি বাড়ির স্যাঁকরাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মেয়ের বাবা তা শুনে মনোক্ষুণ্ণ হলেও বাইরে তিনি স্থির অবিচল। বিয়ের বরকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি তারও স্যাঁকরা দিয়ে গয়না যাচাই করার অভিমত কিনা? বলা বাহুল্য পাত্র অনুপমের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। সে মামার ভাষায়ই সম্মতি জানায়। মেয়ের গা থেকে সব গয়না খুলে আনার পর মামা একটা নোট বুক নিয়ে একে একে সব গয়নার হিসেব টুকে নিলেন। গয়নাগুলোর গুণাগুণ এবং ওজন যাচাই করে জানা গেল, সেগুলো সর্বাংশে খাঁটি এবং তার ওজন বরপক্ষের চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। অবশেষে একজোড়া 'এয়ারিং' এনে শম্ভুবাবু স্যাঁকরাকে দিয়ে তার গুণাগুণ যাচাই করতে বললেন। স্যাঁকরা জানালো ঐটি সমস্ত গয়নার মধ্যে গুণমানে নিকৃষ্টতম। অর্থাৎ প্রচুর ভেজালযুক্ত সোনা। মামার মুখ লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়। কারণ ঐ ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট গয়নাটি দিয়েই মামা কনের আশীর্বাদ-পর্ব সমাধা করেছিলেন। এরপরের অংশটি চমকপ্রদ। মামা ঘনঘন তাড়া দিচ্ছেন বিয়ের কাজ শুরু করার জন্য, লগ্ন যে বয়ে যায়! কিন্তু শম্ভুবাবু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও না করে সকল বরযাত্রীদের অত্যন্ত যত্নসহকারে খাইয়ে দাইয়ে খুব শান্তভাবে বললেন : 'তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দি।' [১৯] মামা অবাক হচ্ছেন, ঠাট্টা নয় তো! শম্ভুবাবু জানালেন : 'আমার কন্যার গহনা চুরি করিব, একথা যারা মনে করেন, তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।' [২০] চরম অপমানিত হয়ে দাম্ভিক মামাকে পাত্রকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হলো। এ প্রসঙ্গে অনুপমের ক্ষেদোক্তি : 'সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাবা বিবাহের

আসর হইতে ফিরাইয়া দিয়াছে।' [২১] বরযাত্রীরা বলাবলি করিল : 'বিবাহ হইল' না, অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল। পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নশুদ্ধ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আপশোস মিটিত।' [২২]

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এর কিছুদিন পর অনুপম মামাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে গেছে। পথিমধ্যে ট্রেনের একই কামরায় দেখা হয়েছে এক অপরূপা সুন্দরী শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী-সরলা যুবতীর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে। এই যুবতী ট্রেনে চলাকালীন কয়েকবার বিভিন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে সহযাত্রী হিসেবে অনুপমকে রক্ষা করেছে। অনুপম মুগ্ধ, মোহিত। পরিচয় নিয়ে সে জানলো, এই যুবতীর নাম কল্যাণী (বাবা শম্ভুনাথ সেন, কানপুরের একজন বড় ডাক্তার), যার সঙ্গে অনুপমের বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। অনুপম পুনরায় কল্যাণী এবং ওঁর বাবার কাছে অনুশোচনা প্রকাশ করে বিয়ে করার বাসনা প্রকাশ করলো। কিন্তু এবারও তাকে বিফল হতে হলো। কল্যানীর বাবা একটু নরম হলেও কল্যানী নিজেই বিয়ে করতে কিছুতেই রাজি হলো না। সেই বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই ও মেয়েদের শিক্ষারব্রত গ্রহণ করেছে। মেয়েরাও যে মানুষ, পুরুষ শাসিত সমাজের দেনা পাওনার ঊর্ধ্বেও যে নারীর ব্যক্তিত্বশালিনী পরিচয় আছে, নারী যে পুরুষের কাছে দুর্লভ, পুরুষের একান্ত সাধনার ধন হতে পারে—এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ 'অপরিচিতা' গল্পে আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিলেন। আমাদের মস্তিষ্ককোষ তা কতটুকু ধরে রাখতে পারবে, সেইটেই ভাববার।

এই গল্প লেখার ৯১ বছর পরের আমরা আরো আধুনিক, আরো যুক্তিবাদী হয়েও মেয়ে-বিয়ের বেলায় ছেলের বাবার কাংক্ষিত পণ-যৌতুকের কাছে জোড়হাত হয়ে দণ্ডায়মাণ হই অনুগত ভৃত্যের মত। 'লগ্নভ্রষ্টা মেয়ের' বিয়ে হবে না--- এই ভয়ে এখনও পাত্রপক্ষের অন্যায় আবদার আমরা মাথা পেতে নিই। সাহস করে প্রতিবাদ করি না, যদি আমার ঘরের মেয়েটিই লগ্নভ্রষ্টা হয়ে যায়! পাত্রপক্ষের অপরিমিত দাবি মেটাতে না পারায় বা না মেটালে ঘরে ঘরে লগ্নভ্রষ্টা মেয়ের সংখ্যা কতটা বাড়ে এবং পরবর্তীতে এদের সত্যি সত্যি অনূঢ়া হয়ে থাকতে হয় কি না, আর থাকলেও তাদের জীবনটাও যে ব্যর্থ হয়ে যায় না, সেটা যাচাই করার পরীক্ষা করার সময় এসেছে। আমরা সম্ভবত সবাই চাই এই অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া প্রথার বিলোপ হোক। কিন্তু ঝুঁকি নিতে চাইনা কেউ। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে! মুসকিলটা এখানেই।

৩

ক্রীতদাস প্রথা সব ধনতান্ত্রিক দেশ থেকেই প্রায় উঠে গেছে। ক্রীতদাস প্রথার নামে আমরা আতঙ্কিত হই। অথচ একটু গভীরভাবে তলিয়ে ভাবলে পণপ্রথার ভয়াবহতাকে ক্রীতদাস প্রথা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে ভাবা যায় না। উভয়ের উদ্দেশ্যই ব্যক্তিমর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা। পার্থক্য এই পণপ্রথার শোষণটি রোমান্টিক—দাসীবৃত্তিত্বে তাই নিজেরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাই, আর ক্রীতদাস প্রথাটি মন ও শরীর উভয়দিক থেকেই নির্মম, তাই আতঙ্ক এতবেশি।

পণপ্রথার মত ঘৃণ্য একটা প্রথা তাই আজও আমাদের সমাজে টিকে আছে। মেয়ের

বাবার কাছ থেকে যে-যত বেশি পণ নিতে পারেন, সেই পাত্র নিজকে ততবেশি যোগ্যপাত্র মনে করেন। একবারও কি তারা ভেবে দেখেন তাতে করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, মানবিক মূল্যবোধ কোথায় উবে যায়! ভাবেন না। প্রতিটি ব্যক্তি একথা তলিয়ে ভাবেন না। ভাবলে পণপ্রথা বিরোধী আইন এ-ভাবে ব্যর্থ হতো না। আইনত পণ দেয়া-নেয়া নিষিদ্ধ হলেও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পণ দেয়া নেয়াটা দিনদিন জ্যামিতিক হারে এভাবে বেড়েই চলতো না।

অতিরিক্ত পণের চাপে আজকাল 'যৌতুক' ও 'পণ' একাকার হয়ে গেছে। আজকাল যৌতুক বলতে আর শুধু মেয়ের বাবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উপহার দেয়াকেই বোঝায় না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে বর পক্ষের বাধ্যবাধকতা।

অথচ পণ আদান-প্রদাণের মত একটি ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার। প্রতিদিন যে হারে পণের দায়ে গৃহবধূর জীবন নাশ হচ্ছে, তাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের নিজেদের কীর্তির চেয়ে অপকীর্তির দৃষ্টান্তই উজ্জ্বলতর হবে। ১৯৮৪-৮৬'র মার্চ পর্যন্ত পণের দায়ে বলি হয়েছেন ১৫৬২ জন নারী। ১৯৮০-৮৬-তে শুধু দিল্লীতেই পণের দায়ে মৃত্যু হয়েছে ২১৩৭ জনের। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য এধরনের ঘটনায় গৃহবধূ-মৃত্যুর সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম।

১৯৬১ সালে সংসদে পণপ্রথা-বিরোধী আইন পাশ হয়। ১৯৮৪ সালে ঐ আইন সংশোধিত হয়। ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট রাজ্যসভায় উত্থাপিত সংশোধিত পণপ্রথায় ভারতীয় দণ্ডবিধিতে 'পণপ্রথা সংক্রান্ত মৃত্যু' নামে একটি নতুন অপরাধ যুক্ত করা হয়েছে। পণগ্রহণকারীদের পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইন কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

কিন্তু দীর্ঘকালের অস্থিমজ্জায় চেপেবসা পণপ্রথার উচ্ছেদ ঘটানো শুধুই আইন করে সম্ভব নয়, এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আনুষঙ্গিক আরো কিছু সমস্যার সমাধান দরকার।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মেয়েই কোনো না কোনোভাবে পিতা কিংবা স্বামী অথবা অন্য যেকোনো পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক দিক থেকে নির্ভরশীল। এই অর্থনৈতিক পরাধীনতা মানসিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙ্গে দেয়। ভরণপোষণ-দাতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের সকলের কথামত চলতে গিয়ে একসময় নিজের ইচ্ছেমত কথা বলতেই তারা ভুলে যায়। কোনো নারীকে স্বাধীনভাবে চলতে দেখলে অভ্যাসের বশে তাকে উচ্ছৃঙ্খল বলে মনে হয়। মনের ওপর বশ্যতা স্বীকারের এই পর্দাটি থাকে কিংবা না-থেকে উপায় নেই বলেই পুরুষদের হাতের পুতুল হয়ে তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে। তাঁদের নির্যাতন সইতে হচ্ছে নিয়তির বিধান বলে অসহায়ভাবে মেনে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিত আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হচ্ছে। আসলে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ছাড়া নারীমুক্তি নেই, কোনো মতেই নয়। অক্ষমতা আর নির্ভরতা থেকে জন্ম হয় শোষণের বিভিন্ন কলাকৌশল। তাই পণপ্রথার ভয়াবহতা থেকে মেয়েদের রক্ষা করতে হলে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। একথা বলছি না যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এলেই পণপ্রথার ভয়াবহ পরিনাম সমূলে নিশ্চিহ্ন হবে, তবে অত্যাচার অনেকাংশে বন্ধ

হবে, একথা নিশ্চিত। অত্যাচারীরা তাদের প্রাপ্তির স্বার্থেই অত্যাচার বন্ধ করবেন। আর যদি তাতেও অত্যাচার বন্ধ না হয়, তাহলে বিকল্প পথ খুঁজে নেবার সুযোগ মেয়েদের নিজের অধিকারে। কাজেই পণপ্রথার করুণ পরিণতিকে ঠেকাতে হলে চাই পুরুষের পাশাপাশি নারীদের প্রায় সমস্ত ধরনের কাজে (যা তাঁর শারীরিক দিক দিয়ে অসুবিধেজনক, কেবলমাত্র সে সব বাদে) অংশ গ্রহণের সমান অধিকার। একজন নিরক্ষর পুরুষের যদি কর্মসংস্থান হতে পারে, তাহলে একজন নিরক্ষর নারীর কর্মসংস্থান হতে পারবে না কেন? কাজ পাবার ব্যাপারে মেয়েরা, বিশেষত গ্রামের মেয়েরা, এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, পিছিয়ে থাকতে হচ্ছে। কৃষক পরিবারের মেয়েদের এখনও স্বাভাবিকভাবে জমিতে কাজ করতে দেয়া হয় না। তাদের শারীরিক অক্ষমতাকে বড় করে দেখা হয়। অথচ এই শস্য উৎপাদন নারীর মৌলিক সৃষ্টি। জমির সব কাজই লাঙ্গল ঠেলার মত কঠিন নয়। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও লালন-পালনের মত কঠিন ধৈর্যের ও কষ্টের কাজটি যদি নারীদের দ্বারা অনায়াসে সম্পাদিত হতে পারে, তাহলে জননীতুল্য জমির সন্তানদের যত্ন নিতে নারীরা পারবে না, একথা কোন্ যুক্তিতে মেনে নিই? মেয়েরা জমিতে ফসল ফলানোর কাজে পুরুষদের সাহায্য করতে পারে না, কারণ তাতে পুরুষদের কর্তৃত্ব খর্ব হয়। এখানে কর্ম-নিয়োগের ক্ষেত্রে বড় বাধা শোষণের আর একরকম প্রক্রিয়া। কয়লা-ভাঙা বা ইটভাঙা প্রভৃতির কাজেও মজুরী নির্ধারিত হয় স্ত্রী এবং পুরুষ হিসেবে আলাদা আলাদা ভাবে। কোনো মেয়ের কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে তাকে পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। যোগ্যতা শ্রেণীকরণের চাপে তলিয়ে যায়। এসব দিক ব্যাপকভাবে ভাববার দরকার। অবশ্য বলতে দ্বিধা নেই, সব মহিলাই কাজে নিযুক্ত হতে চান না। পুরুষের ওপর নির্ভর করে করে পরনির্ভরতাই কারো কারো কাছে সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাদের ধারণা হয়েছে স্বামীদেবতার ঘাড়ে চেপে বসে খাওয়াটা যেন তাদের বৈবাহিক অধিকার। পরিশ্রমবিমুখ থেকে থেকে স্বনির্ভরতার কথা শুনলে ভেতরে ভেতরে তাঁরা আঁতকে উঠেন। এমন দৃষ্টান্তও সমাজে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের মগজ ধোলাই-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য সংখ্যার বিচারে এরা এতই নগন্য যে এদিকটাকে এক্ষেত্রে মুখ্য করে না ভাবলেও চলে।

এছাড়া, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য এবং মহিলাদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। নিজেকে সচেতন করার জন্য শিক্ষা মানুষকে সঠিক পথ দেখায় একথা বহুল প্রচলিত।

বর্তমানে পুরুষ বেকার সমস্যার আধিক্য 'পণপ্রথাকে' বিলোপ করার পেছনে একটা বড় অন্তরায়। যেহেতু হাজার হাজার যুবকই এখন বেকার, তাই বিয়ের মাধ্যমে শ্বশুরের কাছ থেকে পণ নিয়ে তাদের অনেকেই চান ঐ টাকা দিয়ে ছোটোখাটো কিছু একটা কাজের ব্যবস্থা করে বেকারত্বের দুর্বিসহ জ্বালা ঘোঁচাতে, সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল হতে। এদিকটি ভাববারও প্রয়োজন আছে। সরকারী আইন করেও পণপ্রথার মত একটা ঘৃণ্যপ্রথাকে বন্ধ করা যে যাচ্ছে না তার পেছনে ক্রমবর্ধমান যুব-বেকার সমস্যাও বেশ কিছুটা দায়ী।

সর্বস্তরের নারীসমাজকে পণপ্রথার কুফল সম্বন্ধে সচেতন করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমগুলিরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। অবশ্য প্রচার যদি একেবারেই প্রচারধর্মিতায়

রূপ নেয়, (যেমন খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিতে পরিবেশিত খবর বা তাত্ত্বিক আলোচনা) তাহলে তা সর্বসাধারণের মানসিকতাকে আলোড়িত না-ও করতে পারে। রেডিও-টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, কিংবা নাটকাকারে যদি পণপ্রথার ভয়াবহতা, অধিকার সচেতনতাবোধ, স্বনির্ভরতার উপযোগিতা প্রভৃতি আরো বেশি করে তুলে ধরা যায়, তাহলে কিছুটা সুফল পাবার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন সভাসমিতিও একাজে ভূমিকা নিতে পারে।

পণপ্রথার করুণ পরিণতিকে ঠেকাতে হলে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদেরও একটি ব্যাপারে সচেতন হওয়া বোধ হয় দরকার। সেটা হলো, বর ও কনে উভয় পরিবারের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং প্রতিপত্তিগত সমতাবিধান। কনের বাবা স্বভাবতই চান নিজের চেয়ে আরো বেশি স্বচ্ছল ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে। ফলে বরের ঘরের সঙ্গে নিজেকে ও মেয়েকে মানানসই করতে গিয়ে তাকে সামর্থের বাইরে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়; পাত্রপক্ষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে নিজেকে অন্যদিক থেকে ঋণের ভারে জর্জরিত করতে হয়। সে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিয়ে টিকতে না পারলেই পরিণতি হয় রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনার' নিরুপমার মত। কাজেই কন্যাপক্ষকেও অবদমিতলোভের কামনাকে একটু সংযত করা ভাল নয় কি? তাতে করে মেয়ের পক্ষেও খানিকটা সুবিধে হয় স্বামী বা শ্বশুরের ঘরে নিজেকে মানিয়ে নিতে।

আর একটা কথা। শুনতে কারো কারো কাছে শ্রুতিকটু হলেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অবাঞ্ছিত নয়। তাহলো প্রাপ্তবয়স্ক পাত্র-পাত্রীকে তাদের মনমত স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনের সুযোগ দেয়া। যাকে সারা জীবনের জন্য সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয়া হয়, তাকে উভয়ের ঐক্যমতের, চেনাজানার মধ্য দিয়ে, ভালবাসার মধ্য দিয়ে নির্বাচন করাই কি ভাল নয়? মানছি এই চেনা-জানার মধ্যেও ফাঁক থাকে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দেয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তবু নিজের মনের কাছে কিছু সান্ত্বনা থাকে। আর আমাদের যে মূল আলোচনার বিষয় পণপ্রথার ভয়াবহতা, তাকে অনেকাংশে হ্রাস করা যায়।

সবশেষে বলা যায়! কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার কন্যা সম্প্রদান করতে গিয়ে নিঃস্ব হওয়ার পেছনে তাঁদের নিজেদের বৈষম্যমূলক আচরণও কিছুটা পরোক্ষে দায়ী। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র-কন্যা সবার সমান অধিকার। একথা ভারতীয় সম্পত্তি অধিকার আইনেই স্বীকৃত। সম্পত্তির এই 'সমানাধিকার আইন'-র দ্বারা স্বীকৃত হলেও সমাজের বিশেষত পিতাদের দ্বারা সহজ-স্বীকৃত বা সমবণ্টন হয়নি আজও। এখনও পিতারা স্থাবর সম্পত্তি ভাগ করেন ছেলেদের সংখ্যাগুণে। বণ্টনও করেন এভাবেই, যেমন দু'ছেলে হলে দু'ভাগ, মেয়েকে সহজে হিসেবেই ধরতে চান না; ঐ মেয়ে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাভাবিক নিয়মে হতে পারছে না। আমাদের সমাজে তাই দেখা যায়, বাবার কাছ থেকেও একধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হচ্ছে মেয়েরা। নিজের আপন ঘর বলে কিছু থাকেনা এদের। ফলে অধিকাংশ নিম্ন-উচ্চ-মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা বিয়ের সময় বাবার অত্যধিক যৌতুক ও পণ দিতে দেখলে বিব্রত হন না, বরং মনে মনে খুশি হন এ ভেবে যে বিয়ের সময়ে যেটুকু পাওয়া গেল এটুকু যথার্থ পাওয়া, ওইটুকুই তার ভবিষ্যতের ভরসা। এর পরের পাওনা তো সব ফাঁকি। আর তাই বড় মেয়ের চেয়ে ছোট

মেয়েকে কম দিলে ছোট মেয়ে মনে মনে চটে যায়। ভাবে কেন বরপক্ষ আর একটু চাইতে পারলো না। পাত্রপক্ষও বোঝেন, একবার 'পণ' নিয়েই সারাজীবনের জন্য মেয়েটির সমস্ত খরচ বহন করতে হবে, কাজেই যতটা সম্ভব চাপ দিয়ে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কাজেই মেয়েকে সুখী, স্বনির্ভর দেখতে হলে মেয়ের বাবাকেও বিমাতাসুলভ মনোভাব পাল্টাতে হবে, মেয়েকে দিতে হবে সুসম বন্টনের আইনানুগ অধিকার।

পাদটীকা

১. রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ/আবুল কাশেম চৌধুরী সম্পাদিত, দেনা পাওনা, পৃ : ১৩।
২. ঐ। পৃ : ঐ।
৩. ঐ। পৃ : ঐ।
৪. ঐ। পৃ : ১৪।
৫. ঐ। পৃ : ১৫।
৬. ঐ। পৃ : ঐ।
৭. ঐ। পৃ : ঐ।
৮. ঐ। পৃ : ১৬।
৯. ঐ। পৃ : ১৬-১৭।
১০. ঐ। পৃ : ১৭।
১১. ঐ। পৃ : ১৮।
১২. ঐ। পৃ : ১৮।
১৩. হৈমন্তী, গল্পগুচ্ছ, দ্বিতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, আবুল কাশেম চৌধুরী সম্পাদিত, পৃ : ৬৪৮।
১৪. ঐ। পৃ : ৬৪৭।
১৫. ঐ। পৃ : ৬৫১।
১৬. ঐ। পৃ : ৬৫৭।
১৭. ঐ। পৃ : ঐ।
১৮. অপরিচিতা, গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, আবুল কাশেম চৌধুরী সম্পাদিত, পৃ : ৭০৭-৭০৮।
১৯. ঐ। পৃ : ৭১২।
২০. ঐ। পৃ : ঐ।
২১. ঐ। পৃ : ঐ।
২২. ঐ। পৃ : ঐ।

ভারতীয় উপমহাদেশে নারী আন্দোলন

নিত্যানন্দ মণ্ডল

ভারতীয় উপমহাদেশে নারী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। তবে আজকের যে এই বিশাল আন্দোলনের ফলপ্রসু রূপ লক্ষ্য করা যায়, তা নারীদের বহুদিনের কষ্টার্জিত শ্রমের ফল। কারণ নারীরা আজীবন পুরুষসমাজের ধনতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের দ্বারা শোষিত হয়ে এসেছে। শোষণ মুকনারীদের মুখে ভাষা ফুটিয়ে দিয়েছে। আজ সমাজশাসনে যে ঝড় উঠেছে, তা বহু দিনের আপামর নারীশ্রেণির কায়িক পরিশ্রমের ফলমাত্র। শোষণ, অত্যাচার, যৌননির্যাতন, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার হিংস্র কুটিল রূপ নারীদের বাধ্য করেছে আন্দোলনে সামিল হতে।

নারীরা যে আজীবন শোষিত হয়ে এসেছে, তার কারণ তাঁরা অধিকাংশই নিরক্ষর। আমাদের ব্রাহ্মণ্য সমাজ-ব্যবস্থায় নারীদের অশিক্ষার দ্বারা আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখার চেষ্টা চলছিল বহুদিন ধরে। আমাদের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কোনো অধিকার নেই বললেই চলে, নেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, নেই রাষ্ট্রিক মর্যাদা—এই না থাকার জন্যেই তাঁরা শোষিত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় নারীরা যুগ যুগ ধরে পুরুষের তুলনায় হীনতর জীবন কাটিয়ে আসছে। পুরুষেরা ধরে নিয়েছিল যে নারীরা চিরদিনই পরাধীন থাকবে। মধ্যযুগে কিছু কুলীন ব্রাহ্মণ কুলরক্ষার তাগিদে একাধিক কমবয়েসী মেয়েকে বিয়ে করে অর্থ উপার্জনের খেলায় মেতে ওঠে। শুধু তাই নয়, এটা তাঁদের নেশা ও পেশা হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু যুগ বদলের সাথে সাথে সমাজবিকাশও লক্ষ্য করা যায়। এই সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তরে যথা—দাসসমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রভৃতিতে নারীরা অবজ্ঞা আর অবহেলার শিকার হয়ে রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্র বিকাশের সময় যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের আলোকে নারীর অধিকার, তার মর্যাদা, তার স্বাধীকারের প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

ইউরোপে, তথা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেই নারীদের বহুদিনের আন্দোলনের পর পুরুষদের সঙ্গে তাঁদের সামাজিক ও আইনগত অধিকারের সঙ্গে ভোটাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে একথা মানতে অসুবিধা নেই যে, সমস্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে সর্বস্তরের নারীরা সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। আভিজাত্যপূর্ণ বা উচ্চ সম্প্রদায়ের নারীরা কিছুটা সুযোগ সুবিধা ভোগ করলেও নিম্ন সম্প্রদায়ের নারীরা অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হয়েছে চিরকাল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতেই নারীদের অবমাননা চরমে উঠে। সে যুগে নারীরা পুরুষদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিনত হয়েছে। সেইসাথে নারীদের দাসী বানিয়ে রাখার চেষ্টা চলত। নারীকে সেখানে—'নরকের দ্বার' বলে অভিহিত করা হত। তাঁদের অপরিসীম ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার এবং প্রতিক্রিয়াশীল রীতি-নীতির ভাবধারার শিকার হতে হত

প্রতি পদে পদে। এই যুগেই সতীদাহ, শিশুকন্যা হত্যা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, রক্ষিতা রাখার নিয়ম, কন্যা বিক্রয়, পণ যৌতুকের নিপীড়ন বেশি করে ঘটতে থাকে।

প্রাচীনকালে সমাজে নারীদের অধিকারের আধিক্য ছিল। তখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি সক্রিয় ছিল। নারীর কথাই ছিল সেখানে শেষকথা। বৈদিক যুগেও নারীর প্রাধান্য কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। তবে বৈদিক-পরবর্তী যুগে নারীদের অবস্থা ক্রমশ ক্ষীন থেকে ক্ষীনতর হতে থাকে। মধ্যযুগের একদিকে প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করে নারী-উপাসনা, নারী-বন্দনা তথা মাতৃ-বন্দনা আড়ম্বরে চলতে থাকে, এক দিকে, অন্যদিকে চলতে থাকে নারী-মেধযজ্ঞ।

ইংরেজরা আসার পূর্বে আমাদের অবস্থা যতই খারাপ থাকুক না কেন, তখন আমাদের দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইংরেজরা এসে সেই কৃষিব্যবস্থার ওপরে তাদের করাল ছায়া ফেলল, ফলে কৃষিব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কুটির শিল্প ধ্বংস হল। তাঁতী, জোলাদের ব্যবসা নষ্ট হল। ভারতবর্ষে কোনো নতুন শিল্প গড়ে উঠতে পারল না। ফলে ভারতবর্ষ কাঁচা মালের আড়তে পরিনত হল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দ্দৌলার পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা মুষড়ে পড়ে। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার আশ্রয়ে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পুষ্ট হতে আরম্ভ করে; ফলে ইংরেজরা তাদের আধিপত্য কায়েম করতে থাকে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ফলে ভারতীয় জনসাধারণের ওপর বিদেশী শাসন নিপীড়নের এক নব পন্থা আবিষ্কৃত হল।

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভগ্নস্তূপের ওপর ব্রিটেনের উপনিবেশিক শোষণ-লুণ্ঠনের ফলে ভারতীয় গ্রাম্যসমাজ ভেঙে পড়ল, সেই সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি বেড়ে চলল। নারী সমাজের ওপর শোষণ-নিপীড়ন যেন নবমাত্রা পেল। কুলীন পিতারা কুলরক্ষার নামে শিশুকন্যাকে মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দিয়ে নিজের পরলোকের পথ পরিষ্কার করতে লাগল। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের গোড়ার অর্থনৈতিক কারণের কথা বিদ্যাসাগর তাঁর রচনার মধ্যে তুলে ধরেছেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্তের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় :

'ঈশ্বর পিতা ঠাকুর মহাশয় আমাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহন করেন, তখন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার অভিভাবক ছিলেন। দারিদ্র্যবশতঃ আমাকে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৮টি বিবাহ করান। আমি বাল্যকাল হইতেই বহু বিবাহের প্রতি বিদ্বেষী ছিলাম। সুতরাং সম্বন্ধ নিয়ে ঘটক আসিলেই নানা স্থানে পালাইয়া যাইতাম। বহুবিবাহে সম্মতি থাকিলে আমার মনে হয় শতাধিক রমনীর পানি গ্রহণ করিতে হইত। অভিভাবক মহাশয় প্রতিকূল মতি দেখিয়া প্রায় তিনশত টাকা ঋণ অর্পণ পূর্বক আমাকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। তখন আমার বিদ্যা বুদ্ধি অথবা এরূপ কোন ক্ষমতা ছিল না। ঐ ঋণ পরিশোধ বা পরিজন সকলের ভরনপোষন করিতে পারি। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আরও ৬টি পরিনয় স্বীকার করিতে হইল।' এইভাবে একাধিক বিয়ের মধ্য দিয়ে কুল রক্ষার চেষ্টা চলত।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের নবজাগরণ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নবজাগরণের স্রষ্টারা অনুভব করেছেন বুর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার হাত থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা নারীদের হাতে সঞ্চারিত না হলে, নারীদের মুক্তি নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই সমাজের শ্রেণিশোষণের স্তর বলা যেতে পারে। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষদের পাশে নারীবাহিনী এসে যোগ দিল। ফলে কৃষকবিদ্রোহ ও শ্রমিক আন্দোলনে নারীরা যোগ দিতে শুরু করলো। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে রামমোহনের প্রচেষ্টায় সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ হল।

ভারতীয় নারী-জাগরণের জন্যে যে সমস্ত শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিন্দু কলেজ (১৮১৭), কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭), বিশফ কলেজ (১৮২০), কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), গৌড়ীয় সমাজ (১৮২৩), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৬), ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি (১৮২০), লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশন (১৮২৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে বহু ভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীর মধ্যে যোগাযোগ সাধন সম্ভব হল। নারীরা একে অপরের সমস্যার কথা জানিয়ে, সমাধানের পথ খুঁজতে থাকলো। সমাজশাসনের চাপে যখন বাংলার মানুষ বিপর্যস্ত, তখন সেই সমাধানসূত্র খুঁজতে আপামর জনসাধারনের নারীরা এগিয়ে এসে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। প্রথমদিকে পুরুষদের সঙ্গে নারীরা যোগ দিলেও, তাঁরা অনুভব করলেন, সামগ্রিকতার বিচারে তাঁদের জীবনের সংকটের সমাধানের পথ প্রশস্ত হচ্ছে না। তাই তাঁরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আন্দোলনগুলির বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে :

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নারী-সমাজ

বিশ শতকের প্রথম দশকে অশিক্ষা, পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ এবং অপরাপর হৃদয়হীন সামাজিক কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ বাংলার নারীসমাজ স্বদেশী আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৩ সালে সমগ্র বঙ্গদেশে শতকরা ১ জন মাত্র বালিকা স্কুলে যেত। ১৯০৭ সালে সেই সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে সেই সময় শিক্ষা ছিল মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ। কারণ তৎকালে পিতা মাতারা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিয়ে দিয়ে 'গৌরীদান'-এর তৃপ্তি অনুভব করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে মহিলা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর-এর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬ জন ও ৬ জন, এমত পরিস্থিতিতে স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গনারীর আন্দোলন এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

১৩১২ সালের 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'উদ্বোধন' শীর্ষক প্রবন্ধে নারীদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন। বঙ্গভঙ্গের প্রাক্‌কালে যখন সমগ্র দেশ টলটলায়মান, তখন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা বাংলার আপামর জনসাধারন তথা উপেক্ষিত

নারীসমাজকেও আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের আকুল আহ্বান '......বঙ্গের মাতা, বঙ্গের বধূ, বঙ্গের কুমারীগন, তোমরা দেশের নব প্রভাতের আরম্ভে শঙ্খধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষ যাত্রিগণকে বল, তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা পুষ্পবর্ষন করি!—বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষ কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বল—বন্দে মাতরম্।'

· ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই সরলাদেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকা এবং সরযূবালা সম্পাদিত 'ভারত-মহিলা' পত্রিকা নারীসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে আহ্বান জানান। ময়মনসিংহের মেয়েরা প্রথমে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেন। এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণে সংকল্প করেন। সরকারের হঠকারিতার প্রতিবাদে তাঁরা গৈরিকবস্ত্র ধারণ করে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেছিলেন। এই পোশাক পরে তাঁরা বাইরেও চলাফেরা করতেন। মহারানী গিরিবালা দেবীর আহ্বানে এবং শ্রীমতী অবল বসুর (জগদীশচন্দ্রের পত্নী) উদ্যোগে ১৩১২ সালের ৫ আশ্বিন কলকাতায় প্রথমে ১ হাজার মহিলা মেরিকার পেন্টার হলে সমবেত হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং 'স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশি দ্রব্য বর্জনের' শপথ গ্রহণ করেন।

শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও নারীরা আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন। প্রবাসী ও মডার্নরিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন এলাহাবাদে চাকরি করতেন। তাঁর মেয়ে সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, যে এলাহাবাদে অনেক বাঙালি কিশোরী ও বালিকা স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, বাংলা ১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন বাংলা দু'টুকরো হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধন' উৎসবের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

লাহোরে সরলা দেবী চৌধুরানী প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের জনজীবনে স্বদেশী আদর্শ প্রচারে সরলা দেবী ও সরোজিনী নাইডুর অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বদেশি ও বয়কটের আদর্শ সফল করতে বাংলার নারী-যুবতী-কিশোরীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচ বছরের নাতনিও বিদেশি জুতো পরতে অস্বীকার করে। ৬ বছরের মুমূর্ষু বালিকা মূর্ছার ঘোরেও বিদেশি ঔষধ খেতে অস্বীকার করে। ১৫ বছরের কিশোরীবধূ সুশীলার স্বামী দেশী কাপড় কিনতে অসমর্থ হলে সুশীলা আত্মহত্যা করেন, তবুও তিনি কম দামি বিলাতি বস্ত্র পড়েননি। ১৯০৬-৭ সালে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জের পতিতা নারীরা স্বদেশী আন্দোলনে সামিল হয়ে বিদেশি বর্জনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯০৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ভগিনী নিবেদিতা কংগ্রেস নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে লিখেছিলেন, 'সারা দেশে এমনকি মেয়ে মহলে এমনকি পুরোহিতদের মধ্যেও বিলেতি বর্জনের ধূম পড়ে গেছে।' বিশ শতকের প্রথম দশকে যখন নারীদের পক্ষে গৃহপ্রাকারের বাইরে যাওয়াই দুষ্কর ছিল, তখন বেশ কিছু মহিলা সভা, সমিতি, মিছিলে যোগদান করে নারীদের আহ্বান করে স্বদেশিআনায় উদ্বুদ্ধ করার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি,

ময়মনসিংহ, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি জায়গার মেয়েরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বরিশালের মনোরমা, ঢাকা বিক্রমপুরের নবশশী দেবী, সুশীলা সেন, কমলেকামিনী গুপ্তা, খুলনার ললিতমোহন চৌধুরীর পত্নী স্নেহশীলা দেবী এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কলকাতায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্নী লীলাবতী মিত্র, ডাঃ নীলরতন সরকারের পত্নী নির্মলা সরকার, ডাঃ রামকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী সুবালা আচার্য, ডাঃ সুন্দরী মোহন দামের পত্নী হেমাঙ্গিনী, দিনাজপুরের প্রমদাসুন্দরী, ২৪ পরগনার মজিলপুরের বসন্ত বালা হোম এবং গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী প্রমুখ ব্যক্তিত্বময়ী নারী স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি ঐ সমস্ত ব্যক্তিত্বময়ী নারীর ভেতরে চলতে থাকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ১৯০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় বেথুন কলেজের প্রাঙ্গনে মহিলা সভানেত্রী বরোদার মহারানী চিমনবাঈ বলেন, 'I know how the ladies of Bengal have helped and supported the Swadeshi movement which is now spreading fast over Northern India and the Punjab, over Gujrat and the Deccan, over Madras, Mysore and Travancore, every where over this continent.'

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯০৮ সালে গান্ধীজী ট্রান্সভালে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। কলিকাতায় মহিলা সমাজ 'ট্রান্সভাল ভারতীয় সভা' (Transval Indian Association) প্রতিষ্ঠা করেন। এর সভানেত্রী ছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তাছাড়া বিভিন্নভাবে নারীরা সংগ্রামে সহায়তা করেছেন। কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ সাহস দিয়ে, কেউ অন্যকে অনুপ্রেরণা দিয়ে, কেউ বা আবার নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেখিয়ে দিয়েছেন নারীরা কোনো অংশে কম নয়। বরং প্রতিটি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে নারীর ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বদেশি আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বিপ্লবী কর্মতৎপরতায় বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। একথা সত্য যে নারী সমাজের ঐকান্তিকতা, কর্মতৎপরতা ও নিষ্ঠা ব্যতীত স্বদেশি আন্দোলন সফল হতে পারত না।

ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে নারী

১৯১৪-১৮ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবে যখন অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক জীবন এক সংকটময় অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে, তখন ইতালি ও জার্মানীর যৌথ শক্তির প্রচেষ্টায় ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছিল। ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শুরু হয়েছিল, তেমনি মানুষের বৌদ্ধিক ও শিল্প-সংস্কৃতির জগতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই আন্দোলন।

১৯৩৬ সালে ইস্টারের ছুটিতে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পাশাপাশি মুন্সি প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'-এর প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মওলানা হজরত সোহানী, যশপাল, সুমিত্রানন্দন পন্থ, রশীদা জোঁহা, ফয়েজ আহম্মদ ফয়েজ, শাহাদ জহীর, আবুরী রামকৃষ্ণ রাও, হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ।

১৯৩৬ সালের ১৮ জুন ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনাবসান ঘটে। 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ'-এর উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালের ২৫ মে 'গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে জুলাই মাসে I. P. T. A.-এর কমিটি গঠিত হয়। এই সমস্ত ঐক্যবদ্ধ কমিটিতে যেমন শিল্প, সাহিত্য, প্রগতির আলোচনা হয় তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ফ্যাসিবিরোধী শক্তির প্রতিবাদের বীজও রোপন করা হয়। ১৯৪২ সালের মার্চে যে প্রগতি লেখক সংঘ গড়ে ওঠে তার শরিক হওয়ার জন্য আপামর জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হয়।

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে সংস্কৃতির ক্রিয়াকর্ম ছিল প্রধান। ফলে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মহিলারা রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।

১৯৪১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মস্কোতে মহিলাদের দ্বারা গঠিত হয় 'Soviet women's Anti Fascist Committee'। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪২ সালের ১৩ এপ্রিল কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা কর্মীদের উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে মহিলাদের একটি ফ্যাসিবিরোধী সভা ডাকা হয়। এই সভাতে দলমত নির্বিশেষে মহিলারা যোগদান করেন। এই সভা থেকেই 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতি' বা 'Calcutta Women's Self Defence League' গঠিত হয়। সংগঠনের আহ্বায়িকা ছিলেন এলা রিড। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, সাকিনা বেগম, রেণু চক্রবর্তী, সুধা রায় ও মণিকুন্তলা সেন।

শ্রীযুক্তা প্রণতি দে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ফ্যাসিবিরোধী বক্তৃতায় বলেন, চীন ও সোভিয়েত দেশের মহিলাদের মত ভারতবর্ষের মেয়েদেরও পুরুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী বলেন, স্বাধীনতা কখনো অপরের দান হিসাবে আসে না। ঐ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :

১. দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগানো দরকার।

২ জনস্বার্থ রক্ষার জন্য মেয়েদেরকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে অফিস কারখানার মত রণক্ষেত্রেও পুরুষের পাশে তাঁদের স্থান দিতে হবে।

৩. মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে হবে।

৪. ভারতের সৈন্যদের সঙ্গে জনসাধারণের সদ্ভাব স্থাপন করতে হবে।

এইভাবে জনমত গঠন ও নারীশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেই মুসোলিনি-জিওভানির ফ্যাসিবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে। দেশের মানুষজন বুঝতে পারেন যে, ফ্যাসিবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা আসবে না—কারণ ফ্যাসিবাদই হল সাম্রাজ্যবাদের করালতম রূপ। এই আত্মবিশ্বাসে নারী-পুরুষ সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন সমিতি গঠন করে ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র মেয়েরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিরক্ষর মহিলাদের বুঝিয়েছেন, তাঁদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা বলেছেন, তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। এই ভাবে সামন্ততন্ত্র বুর্জোয়া সমাজকে পিছনে ফেলে নারীরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন।

১৯৪৩ সালের ১৭ মার্চ কলকাতায় বিভিন্ন বস্তি ও গ্রামের মহিলারা সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতীয়

রাজনৈতিক ইতিহাসে ৪০-এর দশকে যে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে অংশগ্রহণ করেছেন প্রধানত লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবিরা, আর এদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন কলকাতার গণতান্ত্রিক মহিলারা।

এইভাবে কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলা শহর গ্রামের মহিলারা বিভিন্নভাবে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামকে একটা বৈপ্লবিক চিন্তা চেতনায় শক্তিশালী করে তুলেছিলেন, যা পরবর্তীকালে নারীদের স্বাধীনতা ও মুক্তির পথকে কিছুটা প্রশস্ত করেছিল বলে ধরা হয়।

তেভাগা আন্দোলনে কৃষক মেয়েরা

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার ৬০ লক্ষ ভাগচাষী তেভাগা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আন্দোলনে পুরুষদের সঙ্গে নারীরা সমানভাবে অংশ গ্রহণ করেন। পুলিশী আক্রমনে পুরুষরা যখন ঘর ছাড়া, ঠিক সেই সময়ে নারীরা এগিয়ে এসে পুলিশী আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন। নারীদের উপস্থিত বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার ফলে পুলিশ পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে কৃষকেরা ফসলের ভাগের ন্যায্য দাবীতে সরকারের কাছে দাবী জানালে তৎকালীন সরকার আন্দোলন দমনের জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী পাঠালেন। পুলিশী আক্রমণে বিপর্যস্ত হলে কৃষক ও কৃষক রমণীরা ২৪ পরগনা জেলার কৃষকদের সঙ্গে এগিয়ে এসে তা প্রতিহত করেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে হাওড়া-হুগলি জেলার মা-বোনেরা তেভাগা আন্দোলনে সামিল হন। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টীকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। 'স্বাধীনতা' ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পত্রিকা 'ঘরে-বাইরে' নিষিদ্ধ করে কংগ্রেস সরকার। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চন্দনপীড়ি গ্রামে 'নিজের গোলায় ফসল তোলার' আন্দোলনে সামিল হন খেত মজুর রমণীগণ। এই সময় পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করে। ফলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনে সামিল হলেন। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপরে বেপরোয়া গুলি চালালেন, ফলে শহিদ হলেন সরোজিনী, উত্তমা, বাতাসী, অহল্যা, সূর্যমণি প্রমুখ কৃষক-বধূরা। ১৯৪৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার মাশিলা গ্রামে পুলিশের গুলিতে নিহত হলেন দুজন কৃষক রমণী ও চার জন কৃষক ভাই। ১৯৪৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সাঁকরাইলের হাজল গ্রামের জমিদার পুলিশী প্রহরায় ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার সময় কৃষক মেয়েরা বাধা দেন। বাধা দিয়ে শহিদ হন ১৪ বছরের নববিবাহিতা কিশোরী মনোরমা, সেই সঙ্গে আরও ৮ জন নারীও। ১৯৪৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বড়া কমলাপুরের কাছের ডুবীর ঘেরীতে পুলিশী হামলার প্রতিবাদ করায় মৃত্যু বরণ করেন পুষ্প মাঝি, পাঁচু বালা ভৌমিক, পাখীবালা মাল, কালীবালা পাখিরা, মুক্তকেশী মাঝি। এইভাবে হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনা জেলায় তেভাগা লড়াইয়ে অমর হয়ে রইলেন পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী মা-বোনেরা। ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ডাক দিল রাজবন্দীদের মর্যাদা দিতে হবে, বিনা বিচারে আটকে রাখা যাবে না। বৌবাজারের ভারত সভা হলে সভা অনুষ্ঠিত হল, সভা শেষে সংগঠিত মিছিলের ওপর তৎকালীন কংগ্রেসী সরকার বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলেন গীতা, ললিতা, প্রতিভা, অমিয়া ও ছাত্র বিমান। এইভাবে মহিলা

আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের জীবনের বিনিময়ে রাজবন্দীরা পেলেন প্রথম শ্রেণীর বন্দীর রাজনৈতিক মর্যাদা। এইভাবে তেভাগা আন্দোলনের দিনগুলিতে অত্যাচারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক রমণীরা যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তা ভাবলে আজও আমাদের গর্ববোধ হয়।

কৃষক আন্দোলনে কৃষক-মেয়েদের ভূমিকা

লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)-এর ফলে বাংলা, বিহার, ওড়িশা, উত্তর মাদ্রাজের কিছু অংশের কৃষকদের ওপর নানান ধরনের অত্যাচার ও জুলুম নেমে আসে। ইংরেজ সরকার বিভিন্ন ধরনের আইনকানুন সৃষ্টি করে ভারতবর্ষের কৃষকদের অবস্থা দিন দিন সংকীর্ণ করে দেওয়ার পন্থা সৃষ্টি করল। সেই সময় কৃষকরা তাঁদের বাঁচার জন্য জনমত গঠনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে। কৃষকদের সাথে কৃষক রমণীরাও এই আন্দোলনে সামিল হয়ে আন্দোলনকে দৃঢ়তর করে। ইংরেজ শাসনে কৃষির দুরবস্থা ও অচল অবস্থার বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, মোপলা বিদ্রোহ, পাবনা বিদ্রোহ, বগুড়া কৃষক অভ্যুত্থান প্রভৃতি আন্দোলনে কৃষক আর কৃষক মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার ফলে দেশের নারীদের অধিকার থেকে যেমন বঞ্চিত করা হয়েছে, তেমনি তাঁদেরকে সমাজের অন্তরালে রেখে দেওয়ার কৌশলও সৃষ্টি করা হয়েছিল। তবু হৃত সম্পত্তি উদ্ধার ও সামন্ততান্ত্রিক বঞ্চনার প্রতিবাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নারীরা সামনে এগিয়ে এসে তাঁদের স্বাধীকারের প্রশ্নটি সর্বসমক্ষে জানিয়ে দিয়েছে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। বিদেশি শোষণের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের দেশের মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। এমনকি অনেকক্ষেত্রে তাঁদের মৃত্যুও ঘটেছে। স্বাধীনতার ৫৮ বছর পরেও আমাদের দেশের কৃষকরা যেমন অচ্ছুত থেকে গেছে, তেমনি কৃষক-রমণীরা থেকে গেছে পর্দার আড়ালে। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় কৃষকদের যে বঞ্চিত করা হচ্ছিল, তার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কৃষক-রমণীদের আন্দোলন স্মরণযোগ্য।

বামফ্রন্ট সরকার ও গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পর ১৯৭৭-এর জুন থেকে ১৯৮২-র জুন এই পাঁচটি বছরে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করেছে। বিগত কংগ্রেসী সরকার শ্রেণি-শোষণের যে অত্যাচার চালিয়েছে, তার ভয়াবহ রূপ ধরা পড়ে এই সময়ে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলমত নির্বিশেষে ১৭০০ নকশাল বন্দীকে মুক্ত করে এবং রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত প্রায় ১০ হাজার ফৌজদারী মামলা বামফ্রন্ট প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে মজবুত করার চেষ্টা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বামফ্রন্টের ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে বিগত পাঁচ বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সচেতন জনগণ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বামফ্রন্টকে সরকারে বসায়। পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক

মহিলা সমিতি পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার বামফ্রন্ট সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার ১৪-১৫ বছরের ব্যবধানে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে গ্রামের নির্যাতিত, শোষিত ও বঞ্চিত নারী-পুরুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শোষিত নির্যাতিত ও বঞ্চিত পরিবারের মা-বোনেরা বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিজয়ী করতে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এই নির্বাচনে পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরে মহিলা সমিতির দুই শতাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। উল্লেখ থাকে যে, এই নির্বাচনে ১৫টি জেলা পরিষদে ৩২৫টি ব্লক স্তরের পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং ৩২৪২টি অঞ্চল স্তরের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুজন করে মহিলা সদস্যাকে নিয়োগ করতে হয়। যে-সব ক্ষেত্রে দুজন মহিলা সদস্যা নির্বাচিত হননি, সেসব ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে দুজন মহিলাকে মনোনীত করা হয়েছে। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার ৭১৬৪ জন মহিলাকে পঞ্চায়েতের ত্রিস্তর নির্বাচনে নির্বাচিত ও মনোনীত করে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষরা, বন্যা প্রভৃতিতে এবং বন্যা-পরবর্তী বিধ্বস্ত গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজে মহিলা সমিতির কর্মীরা বামফ্রন্ট সরকারের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল উন্নয়নে গ্রামীণ নারীরা সমান ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সংগঠিতভাবে আন্দোলন করেছে। আদিবাসী এলাকায় ঝাড়খণ্ডীদের বিরুদ্ধে, উত্তরবঙ্গে উত্তরখণ্ডীদের বিরুদ্ধে, পাহাড় অঞ্চলে গোর্খাল্যান্ডের বিরুদ্ধে মহিলা সমিতি সংগ্রাম করেছে। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের 'গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালিয়েছে। এই সমস্ত এলাকার মহিলারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয়ে আদিবাসী শিশু ও নারীদের পুষ্টি, শিক্ষা এবং তাঁদের সচেতনতা ফেরানোর জন্য বয়স্কা বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ও জাতীয় সংহতি রক্ষার সপক্ষে ১৯৮০ সালের ১২ আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কনভেনশন হয়। এবং এই কনভেনশনে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, কোচবিহার প্রভৃতি এলাকার আদিবাসী নারীরা উদ্যোগী হয়ে সচেতনতা ফেরানোর প্রয়াসে গণকনভেনশন করেন।

১৯৮০ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচারের স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকে এবং বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন চক্রান্ত শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৮০ সালের ৩ এপ্রিল চক্রান্তের শিকার হয়ে ২১ জন শিশু ও নারী মারা যায়। ফলে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে ২ সহস্রাধিক মহিলা মৌন মিছিল করে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতি ধিক্কার জানায়। ১৯৮১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা, নাসা, এসমা বাতিল সহ সারা ভারতে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করার দাবীতে যে বন্‌ধ ডাকা হয়েছিল, তাতে কয়েক সহস্র মহিলা অংশগ্রহণ করে বন্‌ধকে সফল করেছিল।

১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি সারা ভারত শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে যে বন্‌ধ ডাকা হয়েছিল, তাতে অংশগ্রহণকারী নারীরা কংগ্রেস কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। বীরভূমের দুলু

মজুমদার, বসিরহাটের মিনতি সেনগুপ্ত, মালদার মায়া ব্যানার্জী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে নারীরা যে ব্যাপকভাবে সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল, তার ফলে নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি নারীরা বাইরে বেরিয়ে এসে মত প্রকাশ করতে পেরেছে সর্বসমক্ষে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৭৭-৭৮ সালের সভ্য সংগ্রহের হিসাব ১৩১৩৫৬ থেকে ১৯৮০-৮১তে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৭৬০১৭। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মহিলারা আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা

বামপন্থী আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতিতে যে পরিবর্তন এনেছে, তা নকশালপন্থী আন্দোলন নামে পরিচিত এবং এই আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে ধানকাটা নিয়ে ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে জোতদারদের যে বিরোধ ও সংঘর্ষ হয়, তার পরিণতিতে পুলিশের গুলি চালনায় অন্যান্যদের সঙ্গে কয়েকজন রমণীও মারা যান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে যে বিশেষ রাজনীতি জন্মলাভ করে, তাই জনপ্রিয়ভাবে নকশালপন্থী আন্দোলন নামে পরিচিত।

নকশালপন্থী আন্দোলনের সময় সারা দেশে বিদ্রোহের ঢেউ চলছিল। ভিয়েতনাম, কিউবার নাম তখন ঘরে ঘরে। ৬৮-তে ফ্রান্সে ছাত্র ও শ্রমিক বিদ্রোহ, আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের বিদ্রোহ সমগ্র দুনিয়া আলোড়িত করছে, চিনের সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ— এ সব নিয়েই সময়টা ছিল বিদ্রোহের যুগ। এবং এই অবস্থাতে নকশালপন্থী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষক ও শত শত যুবক ও যুবতী। CPI (ML) পার্টির নেতৃত্বে সমর্থন পেয়ে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী সমান্তরালভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং সেই সময় পার্টির নেতা চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জোতদার খতমে এগিয়ে এলো। ফলে দেশে এক সামগ্রিক বিপ্লবের রূপ ধারণ করল। এই বিদ্রোহে পুরুষের সঙ্গে নারীরা এক আসনে বসতে পেরেছে। হুগলী জেলার রমাদি নেতৃত্ব দিয়েছেন, বর্ধমান জেলার কৃষ্ণা নিয়মিত ছাত্র-যুবাদের সাথে মিটিং করেছেন, জয়শ্রী রানা মেদিনীপুরে বিপ্লবের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন।

নকশাল আন্দোলনে মহিলারা প্রধানত তিনদিক থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথমত, কমিউনিস্ট ছাত্রীরা রাজনীতি-আবর্তনের মধ্যে থেকে, দ্বিতীয়ত, নকশাল পুরুষকর্মীদের প্রভাবে তাঁদের বোন বা প্রেমিকেরা, তৃতীয়ত, গ্রামের কৃষক আন্দোলনের সারণী বেয়ে।

নকশাল আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে বহু নারীকে পুলিশী অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। জেলে বা লকআপে বন্দী অবস্থায় নারীদের বিশেষ প্রতঙ্গে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া পুলিশ অফিসারদের কাজের একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো কোনো মহিলার ওপর অত্যাচার এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তাদের নিম্ন অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। নকশাল সন্দেহে গ্রেফতার হওয়া অর্চনা গুহর ওপর অত্যাচার কিংবদন্তী হয়ে আছে। CPI (ML) কর্মীবৃন্দের

মধ্যে ঝুমা, মলিনা প্রমুখ নকশাল আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ১৪-১৫ বছর বয়সী ঝুমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তার দিদিকে না পেয়ে। তবে লর্ড সিনহা রোডেব মেয়েটির কাছে পুলিশ কোনো তথ্য না পেয়ে নাবালিকা বলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পুলিশী অত্যাচারে সে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। বার্ণপুরের এক মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তিনি অকথ্য পুলিশী অত্যাচারে পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফেরেন। ১৯৬৬ সালে কোরামিনের দাবীতে বিক্ষোভ জানানোর জন্য নিহত হন নুরুল ইসলাম ও আনন্দ হাইত; খাদ্য আন্দোলনে আশিস জব্বার-এর মৃত্যু ঘটে। এবং এই আন্দোলনের ঢেউ নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কলেজ-ছাত্রীরা এইভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হন।

নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনে যে সমস্ত নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করতে তাঁদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের যে পরিচয় রেখেছেন তা দুর্লভ। এই সমস্ত নারীর চোখে ছিল শোষণহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন, যে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তাঁদের আত্মত্যাগ নকশাল আন্দোলনকে সার্থক করেছে।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার নারীসমাজ

১৯৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় থেকেই স্বৈরশাসনের সূত্রপাত। রাজ্যপালের শাসনে পুলিশ, সি.আর.পি ও গুণ্ডাদের নৃশংস আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা নির্যাতিত হয়েছেন নানাভাবে। ১৯৭০ সালের ২২ মে তৎকালীন রাজনৈতিক গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হলেন সংগ্রামী গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ষীয়সী সভানেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তী। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ে সারা দেশ জুড়ে মেহনতী মানুষ তথা শ্রমিক কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে যে গণ-আন্দোলনের জোয়ার আসে, তা বাস্তবায়িত করতে নারী সমাজই এগিয়ে আসে সর্বাগ্রে। নারীরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাগ্রত শ্রেণিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তাঁদের মুক্তির জন্যই। এইভাবে নারীরা যখন তাঁদের মুক্তির পথ ও স্বাধীকারের রাস্তা খুঁজছে, ঠিক সেই সময়ে তৎকালীন সরকার উপলব্ধি করলেন যে, সংগ্রামী মানুষদের থামাতে গেলে আগে আঘাত হানতে হবে জাগ্রত নারী সমাজের ওপর। আবার যখন নারী সমাজের ওপর তাঁরা আঘাত হেনেছে, তখন তা বিদ্রোহের সুর নিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সারা ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর সত্তর দশকের শুরু থেকেই গণতান্ত্রিক জনগণের ওপর শাসক শ্রেণির যে বীভৎস নগ্ন অত্যাচার নেমে আসে এবং দেশব্যাপী আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়, তার মধ্য দিয়ে নারী-সমাজের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কংগ্রেসী সরকারের কদর্য রূপ। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পশ্চিমবাংলার মা-বোনেরা তাঁদের শত্রুকে চিনে নিতে শেখে; ফলে সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামে তাঁরা সামিল হন। নারীর অধিকার; নারীর মর্যাদা নিয়ে কংগ্রেসী সরকার যতই চেঁচামেচি করুক না-কেন, তা কেবল মুষ্টিমেয় কিছু নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমাজের সিংহভাগ থেকেছেন অবহেলিত; প্রতি পদে পদে তাঁরা শোষিত হয়েছেন; অপমানিত হয়েছেন, নির্যাতনের শেষ স্তরে তারা জীবনের কদর্যরূপ অনুভব করেছেন।

১৯৭০-৭২ সালে আধা-ফ্যাসিস্ত অত্যাচারের রথচক্র যখন পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক মানুষের ওপর নেমে এল, তখন তা প্রতিহত করতে এগিয়ে এলেন সংগ্রামী নারী সমাজ। পুরুষ যখন প্রতি পলে পলে বিপন্ন হচ্ছেন, তখন তা সমাধানের সূত্র খুঁজেছে নারীরাই। পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এগারোশো নেতা ও কর্মীকে খুন করেছিল কংগ্রেসী গুণ্ডারা। তারা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ১৭ জন নারী-কর্মীকে খুন করেছিল। পাঁচ হাজার নারী-কর্মীকে বাস্তুচ্যুত করে বিতাড়িত করেছিল। প্রায় শতাধিক নারী-কর্মীর ওপর তারা শারীরিক নির্যাতন করে। এবং কৌশলে সাজানো মামলায় জড়িয়ে শত শত নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেই সময় কংগ্রেসী গুণ্ডা, সি. আর. পি, পুলিশ বাহিনী পাগলা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসহায় মা-বোনেদের ওপর। মার কোল থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে। স্বামীর সামনে তার স্ত্রীর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। কুমারী মেয়েকে থানা হাজতে বন্দী করে বলাৎকার করা হয়েছে। এইভাবে অত্যাচারিত হতে হতে নারী-সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে।

১৯৭৫ সালে 'অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার' ফলে স্বৈরশাসনের ষোলকলা পূর্ণ হল। ইন্দিরা সরকার সমস্ত প্রকার গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে একটা শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি করল। ফলে সমাজসচেতন সংগ্রামী জনগণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে থাকল, যার পরিণতিতে কংগ্রেসের স্বৈরশাসনকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে জনগণ বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করল। এবং এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিল 'পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি'।

১৯৭৭ সালে লোকসভার সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসী সরকারের পতন ঘটল। এবং জনগণের রায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামপন্থী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটল।

বামফ্রন্ট সরকার মানুষের মন পেতে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করেছে, তাছাড়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নারীসমাজকে সামনে এনে তাঁদের দাবীর কথা শুনেছে ও তাঁদের মুক্তির প্রয়াস ঘটিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক পচাগলা ঘুণধরা মারাত্মক ঘুঁটিগুলি প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে। কায়েমী স্বার্থ, সুদখোর, জোতদার, ঠিকেদার, জমি চোর শোষক শ্রেণির ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসেছে। নিচের তলার মানুষের হাতে গ্রাম পুনর্গঠনের উদ্যোগ এসে গেছে। সেই সাথে নারীরা সামাজিক উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ করে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

৭০-দশকের নারী আন্দোলন

৭০-দশকের নারী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটতে থাকে ৬০-র দশক থেকে, ১৯৫৫-য় হিন্দু কোড বিল-এ বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ ও সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকারের কথা নথিভুক্ত থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। তাঁদের প্রতি একটা বৈষম্য থেকেই গেল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের প্রচণ্ড অভিঘাতে বাংলার সবকিছু যখন তছনছ হয়ে গেছে, তখন সেই আন্দোলনের ঢেউ জেগেছে নারী সমাজের মধ্যেও। ফলে বামপন্থী আন্দোলনে নারীদের

ব্যাপকভাবে জায়গা দেওয়া হয়। পার্টি প্রস্তাবিত কাজকর্মে নারীরা চার দেওয়ালের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দেওয়ার জন্য বাম রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তবু ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি ভারতের নারীদের জন্য আলাদা করে নতুন কোনো চিন্তা ভাবনা করেনি। ১৯৮৪ সালে কেশোরাম কটন মিলে নারী শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৫০ জন। ১৯৬১ সালে সমান কাজে, সমান মজুরী বলবৎ হওয়ায় নারী-কর্মী নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। নারী-কর্মী অবসর নিলে তার জায়গায় আসে পুরুষ-কর্মী, কর্মরত কোনো নারী-শ্রমিক মারা গেলে তার স্থানে আসে পুরুষ-কর্মী। এই ভাবে শিল্প ক্ষেত্রে নারী- শ্রমিকের সংখ্যা কমতে থাকে। এই ভাবে ১৯৮৪-তে যে কজন নারীকর্মী টিকে ছিল, তাদের প্রত্যেকের বয়স প্রায় ৫০-র ওপরে। প্রসূতিকালীন সুযোগসুবিধা বাধ্যতামূলক হওয়ায়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও শিল্পক্ষেত্রে নারী-কর্মী নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এই ভাবে নারীদের ওপর যখন অবিরাম অনিয়ম হচ্ছে, তা জেনেও তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলি নীরব থাকে। তবু নারী-কর্মীদের ওপর যে অবিচার হচ্ছে তা প্রথম স্বীকার করেন বি টি রণদিভে।

বঞ্চনার এই প্রেক্ষাপট থেকেই তৃতীয় ধারার নারী আন্দোলনের যাত্রা শুরু। সামন্ততান্ত্রিক কংগ্রেসী সরকারের কাছে রাজনীতিসচেতন নারীদের কোনো বিশেষ আশা ছিল না। বামপন্থী রাজনীতিতে সাম্যবাদের কথা স্বীকার করা হলে তা কার্যকর হয়নি। ফলে নারীরা তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ১৯৬৭ সালের ২৫ মে নকশাল আন্দোলনে ৯ জন নারী মারা যান। ১৯৭২-৭৪ সাল পর্যন্ত নারীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারীর মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীবাদী আন্দোলন প্রথম বিশ্ব তোলপাড় করে। সরকার বৈষম্যের শিকার থেকে নারীদের মুক্তি দিতে সমীক্ষা করল। দেখা গেল, তবুও নারীরা সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে। রাষ্ট্রসংঘ তৈরী করল বৈষম্যবিরোধী দলিল। C. E. D. A. W (১৯৭৯) নামে পরিচিত এই দলিলে কয়েকটি ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া আর সব সদস্যই স্বাক্ষর করেছেন।

১৯৮০ সালে মহারাষ্ট্রে পুলিশী হেফাজতে নাবালিকা মথুরার ধর্ষণের অভিযোগ সুপ্রীম কোর্ট খারিজ করে দিলে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় সর্বভারতীয় ধর্ষণবিরোধী মঞ্চে। মুম্বাই, দিল্লী, বাঙ্গালোরে ৮ মার্চ ধর্ষণ বিরোধী প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এবং তখন সর্বভারতীয় নারী সংগঠনের জোট গড়া হয়। ১৯৮৩-তে জন্ম নেয় 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ'। ১৯৮৪ সালে যুগান্তর পত্রিকার একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গণধর্ষণের শিকার মায়া বারুই নিরাপত্তার খাতিরে চার বছর ধরে জেলে পচছে। পরভীন খাতুন জেলখানা থেকে গণিকালয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এই সবই 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ' প্রচারের আলোকে নিয়ে আসে। সরকারের উদাসীনতা ও নির্মমতার চিত্র সবই তুলে ধরা হয় নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৫-তে সমস্ত নিরপরাধ বন্দির মুক্তি ও পুনর্বাসনের দাবী করা হয়। ১৯৭৪ সালে দমদমের অর্চনা গুহকে পুলিশ কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই থানায় নিয়ে যায়। পুলিশী অত্যাচারে অর্চনা পঙ্গু হয়ে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে পুলিশ অফিসার রুনু গুহ নিয়োগীর বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেন। অবশেষে ১৯৯৬ সালে জুন মাসে রুনু গুহ নিয়োগীর এক বছর শাস্তি হয়।

১৯৯০ সালের ৩০ মে বানতলায় পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মী অনিতা দেওয়ান খুন হন। সেখানে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। বানতলার পর সিঙ্গুরে কাকলি সাঁতরা ধর্ষিতা হন। পুলিশ ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

১৯৯২-এর সেপ্টেম্বরে পুলিশ কর্তৃক ফুটপাতবাসী নেহারবানু ধর্ষিতা হন। এইভাবে নারীরা প্রতি পলে পলে অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হতে থাকে।

আর বর্তমানে আমাদের দেশে নারীদের অত্যাচার ভিন্ন রূপ ধরে হাজির হচ্ছে। স্বাধীনতার ৫৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নারীরা স্বাধীনতাকে ঠিকভাবে ফেরত পায়নি। তাই একবিংশ শতাব্দীর দোর গড়ায় দাঁড়িয়ে আমাদের স্বীকার করতে অসুবিধা হয় না যে, আমাদের দেশে বর্তমানে ইমরানা বা পাকিস্তানে মুখতারান মাই-এর মত ঘটনা ঘটে। ইমরানার স্বামী থাকা সত্ত্বেও শ্বশুরের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে সে এখন মুসলিম সমাজ-শাসনের অত্যাচারে দিশেহারা, যেন সমস্ত দোষ তারই, তার শ্বশুরের কোনো দোষ নেই।

আর পাকিস্তানের মুখতারান মাই একটু এগিয়ে আছে যেন, সেখানে তার ধর্ষণকারীরা সাজা পেতে চলেছে।

মোল্লাতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র ত্র্যহস্পর্শ সত্ত্বেও মুখতারান মাই-এর প্রতি পাকিস্তান যে সহানুভূতি দেখিয়েছে, তা সত্যই মুসলিম নারীদের পক্ষে কল্যাণকর।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা, কনক মুখোপাধ্যায়।
২. নারীর অধিকার আইনে ও বাস্তবে, মঞ্জুরী গুপ্ত।
৩. এসো! মুক্ত কর, সম্পাদনা মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়।
৪. একসাথে, ২০ বৎসর পূর্তি স্মারক সংখ্যা, মে ১৯৮৮।
৫. একসাথে, রজত জয়ন্তী সংখ্যা, ১৪০০।
৬. স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নারী সমাজ, জীবন মুখোপাধ্যায়।
৭. স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী নারী সমাজ, কনক মুখোপাধ্যায়।
৮. একসাথে, শারদসংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৯৫।
৯. যুবমানস, জুলাই, ১৯৯৫।

মেহনতী মানুষের আন্দোলন ও নারীসমাজ

বিমলা রণদিভে

সম্প্রতি একটা শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক অংশের মানুষ শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের আন্দোলনে নারীসমাজের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন। নারীসমাজেব এই ভূমিকা ছাড়া কোনো গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই সফল হতে পারে না। আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনে হাজার হাজার মহিলা সৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করেছিলেন। অতীত ইতিহাসের এই সাক্ষ্যও প্রমাণ করে যে নারী-সমাজের গৌরবময় অবদান ছাড়া ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তি সম্ভব হত না। ১৯৪৬-৪৭ সালে তেলেঙ্গানা-সংগ্রামে নারীসমাজ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা গেরিলা-স্কোয়াড তৈরি করেছিলেন, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন এবং হায়দ্রাবাদের নিজামের সামরিক শাসনের মুখে দাঁড়িয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে ও জমির জন্য সংগ্রামরত তাঁদের ভাইদের রক্ষা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত শাসক কংগ্রেস দল সমাজ-বিরোধী, পুলিশ ইত্যাদির সহায়তায় যে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস চালায়, তাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে নারী-সমাজ যে বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করেছেন, তা কখনো ভোলা যাবে না। এই সন্ত্রাসের মুখে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে ১০০ জন মহিলা প্রাণ দিয়েছেন। বামফ্রন্টের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ কৃষক ও কৃষক-রমণীরা কৃষকের ঘরে ফসল না ওঠা পর্যন্ত সতর্ক প্রহরায় তাকে রক্ষা করে গেছেন। কৃষকের ফসল লুট করতে উদ্যত জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আদিবাসী মহিলারাও তীর-ধনুক নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কেরালায় কৃষি ও নারকেল-ছোবড়াশিল্পে নিযুক্ত মহিলারাই হলেন ট্রেড-ইউনিয়ন ও কিষাণ আন্দোলনের মেরুদণ্ডস্বরূপ, এঁদের বাদ দিয়ে ওখানে কোনো আন্দোলনই সংগঠিত করা সম্ভব নয়। বিহারের 'রাস্তা-রোকো' আন্দোলনে হাজার হাজার মহিলার গ্রেপ্তার-বরণ এবং মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা-ঘেরাও-এ হাজার হাজার মহিলার অংশগ্রহণ আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, সামন্ততান্ত্রিক ও অন্ধ-সংস্কারবাদী চিন্তাভাবনাকে পরিত্যাগ করে নারী-সমাজ ধীরে ধীরে তাদের পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠছে এবং সমস্বার্থের আন্দোলনগুলিতে যোগ দিচ্ছে।

খনি, বাগিচা, নারকেল-ছোবড়া, তামাক ইত্যাদি শিল্পে যে-সব ধর্মঘট হয়েছে, তাতে নারী-শ্রমিকদের অংশগ্রহণ মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তিমূলক ভূমিকা পালন করেছে।

মধ্যবিত্ত মহিলা-কর্মীদের মধ্যে জাগরণ এবং বিগত বছরগুলোতে ধর্না গ্রেপ্তার-বরণ,

বিক্ষোভ-সমাবেশ ইত্যাদি আন্দোলনে তাঁদের ব্যাপক অংশগ্রহণের উদ্যোগ একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বিমান-সেবিকা, নার্স এবং শিক্ষিকারাও তাঁদের ওপর প্রকট অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হয়েছেন।

সংসদে পণপ্রথা-নিরোধক আইনের সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপনের দাবিতে মধ্যবিত্ত গৃহবধূরা মহিলা-সংগঠনগুলির যৌথ পতাকাতলে ব্যাপক সংখ্যায় সামিল হয়েছেন, যার ফলে সরকার সিলেক্ট-কমিটি তৈরি করতে এবং দিল্লী-প্রশাসনের অধীনে পণপ্রথা সংক্রান্ত একটি সেল গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। এটাও একটা ঘটনা যে, ট্রেড-ইউনিয়নগুলির, বিশেষত 'সিটু'র চাপের ফলেই 'মহিলাদের জন্য চাকরি' এবং 'সমবেতন আইন' ইত্যাদির বিষয়ের ওপর কমিটি তৈরি করতে সরকার বাধ্য হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রামে শ্রমজীবী বা চাকুরিজীবী হিসাবে মহিলাদের ভূমিকা, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে এবং সমমর্যাদার জন্য সংগ্রামে গৃহবধূ হিসাবে বা সাধারণ নারীজাতি হিসাবে মহিলাদের ভূমিকা, এবং জনগণের অধিকার-অর্জনের সংগ্রামে নাগরিক হিসাবে মহিলাদের ভূমিকা—এই সবগুলি মিলে এক একত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। শ্রমজীবী হিসাবে, কিংবা নাগরিক হিসাবে, কিংবা সাধারণ নারীজাতি হিসাবে যখন তাঁরা সংগ্রাম করেন, তখনই কেবল তাঁরা আলাদা-আলাদা অবস্থান গ্রহণ করেন। নারী-সমাজের এই বিভিন্ন অংশের জাগরণ এবং বিভিন্ন সংগ্রামে অংশগ্রহণ সমসাময়িককালের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ট্রেড-ইউনিয়নগুলি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন যদি এর সদ্ব্যবহার করতে না পারে তাহলে নারীমুক্তি কিংবা গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনোক্ষেত্রেই আমাদের অগ্রগতি সম্ভব হবে না। আনন্দের কথা, ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন এবং প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলই এখন দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে নারী-সমাজের ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকার করছে এবং নারী-সমাজের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে আসছে। বিক্ষোভ-সমাবেশগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের সক্রিয় সমর্থন, পণের কারণে মৃত্যুর ক্রমবৃদ্ধিতে প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ, যাঁরা পণপ্রথার শিকার হয়েছেন তাঁদের সপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়—এসব থেকেই বোঝা যায় সাধারণ মানুষ ক্রমশই আরো বেশি সচেতন হয়ে উঠছে এবং তার ফলেই বধূহত্যা ও নারী ধর্ষণের নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে।

ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন ও নারী-শ্রমিক

ট্রেড-ইউনিয়ন হিসাবে সি. আই. টি. ইউ-ই আমাদের দেশে প্রথম বর্তমানের এই নারী-জাগরণের বিষয়টি লক্ষ্য করে এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমজীবী মহিলাদের কনভেনশন এবং সর্বশেষে 'সারা ভারত শ্রমজীবী মহিলা কনভেনশন' *(All India Convention Of Working Women)*-এর মাধ্যমে 'শ্রমজীবী' মহিলাদের সমন্বয় কমিটি' *(Co-ordination Committee Of Working Women)* গঠন করে।

শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামে নারী-শ্রমিকের ভূমিকা

সুতরাং সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির দাবি-পূরণের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে নারী-শ্রমিকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সংসার ও সন্তানের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি সবকিছু সত্ত্বেও নারী-শ্রমিকরা একবার যদি শ্রেণি-সংগ্রামে নামে তাহলে তাঁরা অতি দ্রুত শিখে নিতে পারে। এবং আত্মত্যাগ স্বীকার করেও শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখতে পারে। এইখানেই তাঁরা শত্রু-মিত্র চিনতে শেখে, রণকৌশল আয়ত্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সামিল হবার প্রস্তুতি অর্জন করে। এই চেতনাকে এবং সাধারণ কর্মী-স্তরে অংশগ্রহণের এই বোধকে সচেতনভাবে বিকশিত করার দায়িত্ব নিতে হবে ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে। যে মহিলারা ঘরের বাইরের চাকরির ওপর নির্ভরশীল তাঁরা তো বাইরের জগতে এক পা বাড়িয়েই আছেন, যদিও সংসার প্রতিনিয়তই তাঁদের পিছন দিকে টেনে রাখে। বড় ধরণের অর্থনৈতিক সংগ্রামে নামার প্রয়োজনের দ্বারা তাড়িত হয়ে এই অংশের মহিলারা সেই সমস্ত যৌথ শ্রেণি-সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়েন যা নারী-মুক্তি সংগ্রাম এবং সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং এর মাধ্যমেই তাঁরা প্রতিনিয়ত শিক্ষিত ও পুনর্শিক্ষিত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহস্থালী, সন্তানপালন এবং অর্থউপার্জন—এই ত্রিবিধ দায়িত্বে ভারাক্রান্ত নারী-শ্রমিকরা সুযোগ সত্ত্বেও শ্রেণি-সংগ্রাম ও নারী-আন্দোলনের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। স্বাভাবিকভাবেই, এর ফলে তাঁরা শ্রমিক-শ্রেণির সংগ্রাম ও ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। উপার্জনকারী স্বামীও একজন শ্রমিক কিংবা কর্মচারী, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন বলে তিনি গৃহস্থালী কাজে হাত লাগাতে চান না। এইখানেই সংগ্রামী মহিলাদের এগিয়ে আসতে সাহায্য করার ব্যাপারে ট্রেড-ইউনিয়নগুলির ভূমিকার প্রশ্নটা এসে পড়ে। ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকেই হতে হবে সংগ্রমে উদ্বুদ্ধ মহিলাদের, নারী-সমাজ ও শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থের, লালনকেন্দ্র। কিন্তু এ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। ট্রেড-ইউনিয়নগুলির ওপর বর্তমানে পুরুষদেরই আধিপত্য। মহিলা-নেত্রী গড়ে তোলার জরুরী প্রয়োজন তারা উপলব্ধি করতে পারেন না। কাজেই ট্রেড-ইউনিয়নগুলি কেবলমাত্র পুরুষ- শ্রমিকদের জন্যই সংরক্ষিত হয়ে আছে, যার ফলে নারী-শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট দাবিগুলি উপেক্ষিত হচ্ছে। এই দাবিগুলি নিয়ে, এমনকি আইনগতভাবে প্রাপ্য দাবিগুলি নিয়েও, তারা ক্বচিৎ-কদাচিৎ লড়াই করে। এর ফলে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা তাঁদের শ্রেণি-সংগঠন ট্রেড-ইউনিয়নগুলিতে হয় যোগ দেননা, নয়তো এ-ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকেন। এইভাবেই নারী-আন্দোলন এবং ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে।

নারী-মুক্তি প্রসঙ্গে লেনিন

লেনিন বারংবার বলেছেন, নারী-সমাজের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো বিপ্লবই সফল হতে পারে না।

'প্রকৃত নারী-মুক্তি সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। উৎপাদনের উপায়-সমূহের

ব্যক্তিগত মালিকানা এবং নারী-সমাজের মানবিক ও সামাজিক অবস্থানের মধ্যে যে অভিন্ন সম্পর্ক তার ওপর জোর দিতে হবে। একে ভিত্তি করেই সামাজিক ও শ্রমিক-শ্রেণির সংগ্রাম এবং বিপ্লবের অংশ হিসেবে নারী-সমাজের প্রশ্নটিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন আরো বলেছেন, 'নারীর পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না করে সর্বহারা শ্রেণি কখনো নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না।' এটা কি ঘটনা নয় যে জনসংখ্যায় ৫০ শতাংশ, যার মধ্যে শ্রমিক এবং কৃষকও রয়েছে, যদি কোনো গণ-আন্দোলনে অংশ না নেয় তাহলে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়? এই বিরাট শক্তিকে অবহেলা করার অর্থ শ্রমিক-শ্রেণির এবং সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কোনো দেশের সামাজিক উৎপাদনে, মূল শিল্পগুলিতে, নারী-সমাজের শতকরা কতভাগ নিয়োজিত তার ওপর সেই দেশের প্রগতি নির্ভর করে। স্তালিন তাঁর রাজনৈতিক জীবনীতে লিখেছেন, 'কর্মরত মহিলা, শ্রমিক এবং কৃষকরা শ্রমিক-শ্রেণির সবচেয়ে বড় মজুত-শক্তি,' এবং 'এই মজুত-শক্তি গোটা জনসংখ্যার অর্ধাংশ। মজুত নারী-শক্তি শ্রমিক-শ্রেণির পক্ষে থাকবে না বিপক্ষে যাবে, তার ওপর সর্বহারা-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, সর্বহারা-শক্তির জয়-পরাজয়, নির্ভর করে।' সুতরাং বুর্জোয়া-প্রভাব থেকে নারী, শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্ত করার চূড়ান্ত সংগ্রামে নারী-সমাজকে সামিল করার পক্ষে, তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে, তিনি জোর বক্তব্য রাখেন।

প্রসঙ্গত ১৯৭১ ও ১৯৮০ সালে আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন-দুটিতে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। আবার সেই মহিলারাই ১৯৭৭-এর নির্বাচনে বাধ্যতামূলক পরিবার-পরিকল্পনা এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ইত্যাদিতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কংগ্রেস (ই)-র বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। এই ঘটনাগুলিই আমাদের দেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে নারী-সমাজের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও চূড়ান্ত ভূমিকা প্রমাণ করে। এই বিষয়টি যদি লক্ষ্য না করা হয় তাহলে তা শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে।

নারী-আন্দোলন তথা প্রগতিশীল আন্দোলনের সামনে কর্তব্য

এই প্রসঙ্গে বিষয়টির দুটো দিক বিবেচনা করে দেখতে হবে। এক, নারী-আন্দোলনের সামনে কর্তব্য, এবং দুই, এই নারী-শক্তিকে বিপ্লবমুখী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যাপারে শ্রমিক-শ্রেণি ও গণতান্ত্রিক জনগণের সামনে কর্তব্য। নারী-আন্দেলন মনে করে, নারী-মুক্তির সংগ্রাম সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নারী-আন্দোলনের সামনে আজকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান হল সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফৎ খাদ্যশস্য বণ্টন ইত্যাদির সপক্ষে যৌথভাবে কিংবা আলাদাভাবে সংগ্রাম। শ্রমজীবী মহিলারা মিসা, এসমা ইত্যাদি প্রত্যাহারের দাবি যেমন জানাচ্ছে তেমনি কতকগুলি সাধারণ দাবি ও নিজস্ব দাবি নিয়েও সংগ্রাম চালাচ্ছে।

সুতরাং, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পুরুষ-সমাজের সহযোগে শ্রমজীবী

মহিলাদের সংগ্রাম; দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, রাজনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র-প্রসারের সপক্ষে নারী-সমাজের সংগ্রাম; এবং অবিচার, অসাম্য এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই তিনটি দিককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠন তাদের গঠনতান্ত্রিক নিয়মাবলীর ভিতরে থেকে নারী-আন্দোলন গড়ে তুলছে। নারী-সমাজ যে-পরিমাণে আন্দোলনমুখী হতে পারবে, সেই পরিমাণেই গৃহস্থালীর কড়া বাঁধন আলগা হবে। যখনই কোনো বিক্ষোভ-সমাবেশে কিংবা কোনো সভায় মহিলারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দেন, তখনই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন সংসদে পণপথা-সংক্রান্ত সংশোধনীতে কারা বাধা দিচ্ছে, দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধির জন্য দায়ী কারা, এবং এইভাবেই তাঁরা আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন।

নারীবাদী (*feminist*)-রা সম্মিলিত আন্দোলনে বিভেদ আনে

একই সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া ব্যবস্থার অংশ হিসেবে পুরুষ ও নারী উভয়কেই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান সমাজ পুরুষ-শাসিত বলে নারীকে প্রতি পদক্ষেপে পুরুষের আধিপত্য সইতে হয়। এই সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রগতিশীল পুরুষ-সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি নারীদের সঙ্গে যোগ না দেয় এবং তাঁদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত না করে, তাহলে নারী-আন্দোলনের দায়িত্ব অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। এইখানেই নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের, শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের, দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন এসে পড়ে। যখনই সক্রিয় মহিলারা সংগঠনে যোগ দেন, বক্তব্য রাখেন ও তার কার্যক্রমে অংশ নেন, যখনই ছেলেমেয়ে ও সংসার দেখার নাম করে তাঁদের স্বামীরা বা নেতারা নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসেন,—তখনই ঘরে, ইউনিয়নে, দলে বা কোনো সংগঠনেই হোক, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়।

এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি স্মরণে রাখা দরকার তা হল, বিভিন্ন নারীবাদী গোষ্ঠী এমনভাবে বিষয়গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন যেন পুরুষ ও নারী হল দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণি এবং মূল প্রশ্নটা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংগ্রামের। তাঁরা ভুলে যান যে সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উভয়ে যদি একসাথে সংগ্রাম না করে তাহলে উভয়েই শোষিত হবে এবং বর্তমান সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে তাঁরা যদি মুক্ত হন তাহলে পুরুষের সঙ্গে এক সাথেই হবেন। এই নারীবাদী গোষ্ঠীগুলি বামপন্থীভঙ্গি নিয়ে স্বামী ও ভাইদের মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন। মহিলারা যদি তাঁদের নিজেদের প্রতি অবিচার ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে সত্যিকারের ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে এবং সংসারের জাঁতাকল থেকে বেরিয়ে আসবার তাগিদে কখনো-কখনো এই নারীবাদী গোষ্ঠীগুলিতে যোগ দিয়ে ফেলেন, তবে তাঁদের দোষ দেওয়া চলেনা। বিশেষত মধ্যবিত্ত মহিলারা এইসব নারীবাদী গোষ্ঠীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁদের প্রচারে অভিভূত হয়ে পড়েন। শোনা যায় আমেরিকা ও ইংলন্ডের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অধীনে চাকরী, মজুরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীশ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি খোলাখুলি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তারই সুযোগ এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলি পুরুষদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে

তাদের বিরুদ্ধে নারীদের লাগিয়ে দিতে পারে—আসল যে মূল অপরাধী সেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং বুর্জোয়া সরকারগুলি কিন্তু পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে এইসব গোষ্ঠী বুর্জোয়া সরকারগুলির স্বার্থই সিদ্ধ করে। ট্রেড-ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন যদি গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি না দেখে তাহলে নারী-আন্দোলনে এই বিভেদ, এইসব গোষ্ঠীর সমর্থক মহিলারা, আন্দোলনের স্বার্থকে বিপন্ন করতে পারে। শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে পুরুষের আধিপত্যবাদী উগ্র মনোভাবের মোকাবিলার দায়িত্ব নিতে হবে ট্রেড-ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এখন পর্যন্ত এই বিচ্যুতিকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি, এবং নারীদের প্রতি পুরুষের সামন্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দূর করার জন্য শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার কাজটিও করে উঠতে পারেনি। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণির ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারীসমাজের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রত্যয় যতই বাড়বে, ততই তারা সম্মিলিত ানে নারীদের সামিল করার কাজে সাহয্য করতে পারবে, সচেতনভাবে এই লক্ষ্যে দর প্রয়াসকে পরিচালিত করে সম্মিলিত আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলতে পারবে।

আন্তর্জাতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করে যে শতকরা ৫০ ভাগ যে নারীসমাজ তার অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি সম্ভব নয়। রাশিয়ার বিপ্লবে নারীশ্রমিকরা গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে সর্বহারার বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মুক্তিও অর্জন করতে পেরেছিলেন। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের মাধ্যমে হিটলারের চূড়ান্ত পরাজয় সংঘটিত করার ব্যাপারেও মহিলাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভিয়েতনাম, কাম্পুচিয়া ও চীনে মহিলারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের ও নিজেদের মুক্তি অর্জন করেছেন। সমাজতন্ত্রে নারীদের মর্যাদা সমান, তাঁদের অবস্থান উচ্চে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার শান্তি-আন্দোলনগুলিতেও মহিলারা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে বোমা ও আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তে চাকরী ও সমানাধিকারের দাবি জানাচ্ছেন।

নারীর অধীনতা শ্রমিকের অধীনতারই অঙ্গ

নারীকে অধীনস্থ করে রাখা শ্রমজীবী মানুষকে মালিকশ্রেণির অধীনস্থ করে রাখারই অঙ্গবিশেষ। সুতরাং সম্পত্তির সম্পর্কের যখন অবসান ঘটবে, তখনই নারী-সাম্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে—যেমন হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে। যে কৃত্রিম শ্রমবিভাগের ফলে নারীসমাজ সামাজিক উৎপাদন-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গৃহস্থালীর চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, তার অবসান একমাত্র তখনই সম্ভব যখন সামাজিক শোষণের সাধারণ শর্তগুলির, উৎপাদনের উপায়-সমূহের মালিক যে শ্রেণি তার অবসান ঘটবে। বর্তমান সমাজের এবং নারী-সমাজের প্রতি বৈষম্যের পরিবর্তনসাধনের জন্য প্রয়োজন পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত সংগ্রাম। ভারতীয় পরিস্থিতিতে সমস্ত অংশের মহিলাদের সামন্ততান্ত্রিক বাধা-নিষেধ, প্রথা এবং সেই সঙ্গে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অসাম্যের জগদ্দল পাথর অপসারণের সংগ্রামে সামিল হতে হবে।

নারী-সমাজের উন্নতি সমাজের সাধারণ উন্নতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। বস্তুতপক্ষে, কোনো দেশের অর্থনীতিতে নারী-সমাজের অংশগ্রহণে কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তা দিয়েই দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়।

সুতরাং, শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামে নারী-শ্রমিকদের ভূমিকার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল জনগণের সংগ্রামে শোষিত নারী-সমাজের ভূমিকা, কেননা এই পথেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উচ্চতর স্তরে আরোহন করা সম্ভব। কাজেই ট্রেড-ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নারী-সমাজের অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং নারী-শ্রমিক ও কর্মচারীদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সমাজতন্ত্র অর্জনের পথে শ্রমিকশ্রেণির ও জনগণের আন্দোলনে তাঁরা তাঁদের ভূমিকা ঠিকমতো পালন করতে পারেন।

নারী আন্দোলন : দেশ-দেশান্তরে

সুপ্রিয় দাস

সভ্যতার আবরণ উন্মোচনই আধুনিকতা। আর সেই আধুনিক সভ্যতায় বিরাজ করেও একালের মানুষ এখনও অনাধুনিক। আজ বিশ্বের মানবসভ্যতা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। কিন্তু এই মৌখিক এবং লিখিত শব্দগুলিকে বাস্তবে এখনও কার্যকর করা যায়নি। অত্যাধুনিক বিশ্বনাগরিকতাবোধে (Cosmo political) উদ্বুদ্ধ হয়েও একালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রদীপের নীচে গাঢ় অন্ধকারের মতো নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় অপারগ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির মানবিক মূল্যকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে, আর সেই 'ট্রাডিশান সমানে চলেছে'। এ সত্য তুষাগ্নির মতো বিশ্বসমাজকে দগ্ধ করে চলেছে। নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানবিক স্বাধীনসত্তার জাগরণ শুধু ভারত বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কার সমস্যা নয়; তা দেশ থেকে দেশান্তরের।

আবহমান কালের প্রেক্ষাপটে পরিলক্ষিত হয় যে, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির স্টার্টগার্ড-এ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কেন এই নারী সম্মেলন? এখন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের লাগাম চলে আসে পুরুষশ্রেণীর হাতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তখন তাঁর কায়েমী স্বার্থ জিইয়ে রাখার জন্য নারী সমাজকে অন্ধকারপ্রদেশে শৃঙ্খলিত করে। ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাঁদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষার অধিকারকে। নারী হারিয়ে ফেলল তাঁর মানবিকসত্তাকে। তাঁদের বানানো হল ভোগের সামগ্রী, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। বর্তমান বিশ্বনারী সমাজের এই করুন পরিণতির কারণ যেন 'এ আমার এ তোমার পাপ'। যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরুষসমাজের আগ্রাসী নীতিই নারীসমাজকে অন্ধকারে, কর্দমাক্ত প্রদেশে নিমজ্জিত করেছে।

এ এক বিরাট পরিমাণ মানবসম্পদের অপব্যবহার। এর ফলে বিশ্বসমাজ পিছিয়ে পড়তে একান্তভাবে বাধ্য। সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন মানব-মানবীর উভয়ের হার্দিক সাহচর্য। তাই বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে :

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যানকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

তবে কেন নারী পাবে না তার সমানাধিকার? এ প্রশ্নই এখন বারবার উপস্থাপিত হয়। আমরা যতই বলিনা কেন নারীর স্বাধীন, সুরক্ষিত, তাঁরা সমানাধিকারিণী, কিন্তু এক্ষেত্রে যতটা আস্ফালন দেখা যায়, ততটা, কার্যকর নয়। আজ নারী তাঁর নিজের শক্তিতে বিশ্বের রাজনীতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত হলেও পুরুষের তুলনায় সে সংখ্যা নগন্য। আজ বিশ্বসমাজের সিংহভাগ নারী। কিন্তু তাঁরা ন্যূনতম অধিকার থেকেও বঞ্চিত। এখনও অনেক দেশে নেই তাঁর ভোটদানের অধিকার। নারীকে এখনও বলা হয়— 'Back

to the kitchen'. তাঁদের ছুঁড়ে ফেলা হল অমাবস্যার কারাগারে। যুগ যুগ ধরে নারীর নীরব কান্না ভারী করে তুলেছে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস। অন্ধ কুসংস্কারের জালে এখনও সে বন্দী। পুরুষ সমাজের সে লালসার শিকার। এ যেন বন্দিনী রোরুদ্যমানা সীতা।

আন্তর্জাতিক নারীর পূর্বাপর অবস্থান

আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলার আগে বিশ্বসমাজে নারীর পূর্বাপর অবস্থানটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের কথা। তার পশ্চিম তীরে জনবিস্ফোরণের দেশ চীন। এই দুই দেশের নারীরা এখনও তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত; সেখানে নারীরা এখনও নির্যাতিত। এই সভ্য জগতেও নারীর ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার, শোষণের রোলার, স্ত্রীর গায়ে স্বামীর জ্বলন্ত সিগারেটের ছেঁকা, ইলেক্টিক চাবুক। এর প্রতিবাদে নারীর বিদ্রোহের সুর শোনা গেলেও, তা ক্ষীণ হয়ে সমুদ্রতরঙ্গেই দ্রবীভূত।

এবার দেখা যাক ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি। ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা। এখানে জন্ম গ্রহণ করেছেন ব্রহ্মবাদিনী, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী প্রমূখ মহিয়সী মহিলারা। বৌদ্ধযুগের সুজাতা, সুপ্রিয়া, শঙ্ঘমিত্রা প্রমূখ নারীর কৃতিত্ব ভারতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে। এই আলোকিত ইতিহাসের অপরদিকে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যুগ-যুগান্তরের তমিস্রা। রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ নিবর্তন হলেও ভারতের মাটিতে নারীরা এখনও সতী হতে বাধ্য হন। ইমরানা, মনোরমা, জ্যোৎস্নারা হন ধর্ষিতা। ভারতীয় উপমহাদেশে পণপ্রথার নগ্নবর্বরতা এখনও চলমান। এই দুর্বিষহ জাঁতাকলে তাঁদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে বাঁচার স্বপ্ন। নেই তাঁদের মধ্যে নতুন ভোরের উন্মাদনা। তাঁরা নানাপ্রকার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। তাঁদের মানবী হওয়ার স্বপ্ন কালো কাপড়ের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, যেন চোখ বাঁধা কলুর জীবন। এই উপমহাদেশে নারী সমাজ নিশীথ অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাঁদের নেই শিক্ষা, নেই অধিকার। এখানে একচেটিয়া পুরুষদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে নারীরা পরনির্ভর পরজীবীর মত বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত।

দক্ষিণ এশিয়ায় নারীরা তাঁদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য বুঝে নিতে আজ তৎপর। শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা, কৃষিজীবী, শ্রমিক নারী থেকে শুরু করে লেখিকা, রাজনীতিজ্ঞ নারীরাও আজ বিশ্বব্যাপী তাঁদের অধিকার আদায়ে নারী আন্দোলনের সুরে সুর মিলিয়েছেন এবং এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রাম থেকে নগরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। আর এই সর্বহারা, শোষিত, যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত মূক নারীকে মুখর হয়ে ওঠার জন্য কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা।'

আজ ভারতীয় উপমহাদেশে নারী আন্দোলন তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে, নারী জাতির স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তার জাগরণে ১৯৮৮ সালে সার্ক (SAARC) সংস্থার অন্তর্ভুক্ত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও-মালদ্বীপের শিশুকন্যাদের শিক্ষাদীক্ষা ও উপযুক্ত মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইসলামাবাদ অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ পেশ করেন বেনজির ভুট্টো। কলম ধরলেন তসলিমা নাসরিন, মৈত্রেয়ীদেবী,

মহাশ্বেতাদেবীরা। কঠোর মৌলবাদীরা তা মেনে নিতে নারাজ। ক্ষয়িষ্ণু, ঘুনধরা সমাজের নগ্ন বাস্তব চিত্র প্রকাশিত হওয়ায় তসলিমা নাসরিনকে ত্যাগ করতে হল তার প্রিয় স্বদেশ।

এ যেন পুরুষতান্ত্রিক ও মৌলবাদের যূথবদ্ধ ষড়যন্ত্র। তসলিমা নাসরিন সমগ্র উপমহাদেশের নারী সমাজের প্রতিনিধি। তিনি ধর্ম বর্ণের উপরে উঠে মানবতার কথা বলতে চেয়েছেন, জীবন দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন নারীসমাজের অসহায় রূপকে। তিনি অন্ধপুরুষ বিরোধী নন, তিনি নারীর মুক্তি চান, সমান অধিকার চান, তবে একটু উচ্চকণ্ঠে, উগ্র এবং ব্যাঘ্রভাবে, এই তাঁর দোষ। কিন্তু তিনি যখন বলেন :

'... যদি চাই কোন শ্রেণী নেই, নারী ও
পুরুষে বৈষম্য নেই, ধর্ম নেই, দেবেন?
দেবেন তেমন একটি সুন্দর জগৎ
আমার চোখের সামনে?'

তখন তাঁর এই কবিভাবনায় ফুটে উঠে নারী আন্দোলনের এক ভিন্ন পাঠ।

এতদিন পর্যন্ত ভারতের মন্দিরগুলিকে পুরোহিত হিসাবে পুরুষদেরই কর্তৃত্ব প্রধান ছিল। সম্প্রতি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তামিলনাড়ু সরকার ঘোষণা করেছে যে, রাজ্যের মন্দিরগুলিতে মহিলা পুরোহিত নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বাধা রইল না। যে কোনো সম্প্রদায়ের মহিলাই এই পদের অধিকারিনী হতে পারেন। তবে নির্বাচিত মহিলাকে পুরোহিত পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এবং পুরোহিতকে ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে ধারণা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষিত হতে হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের ইতিহাসে হিন্দুধর্মের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। সমাজে একচেটিয়া পুরুষতান্ত্রিক অধিকারের অবলুপ্তি ঘটল। বিশ্বের ইতিহাসে এ এক নব দৃষ্টান্ত।

ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, এবং বাংলাদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে কোনো না কোনো সময়ে নারীদেরই দেশের দায়দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ আমরা আশ্বস্ত হই যে, নারী-অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন আইন বলবৎ করে নারীক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাও চলছে দেশে-দেশে। এছাড়া, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন দৃঢ়পদক্ষেপে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান আর্থসামাজিক পরিবেশে নারী সমাজের অধিকারবোধ ও মানবসম্পদে উন্নীত করার শুভ প্রচেষ্টা গ্রহন করা হয়েছে।

আমরা যদি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সেসব দেশে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এখনও দূরঅস্ত। তাঁদের সামাজিক জীব হিসাবে স্বীকৃতি দানেও পুরুষসমাজ কুণ্ঠিত। ইরাক, ইরান, সৌদিআরব, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ ইসলামধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত। এখানে মৌলবাদ সক্রিয়। মানবিকতার প্রশ্ন এসব দেশে নিছক তামাসা। সেখানে নারীর অধিকার, সংরক্ষণ, শিক্ষা, কিংবা ক্ষমতায়নের প্রশ্নই ওঠে না এসব দেশে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত মহিলাদের প্রতিনিয়ত হতে হয় ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির শিকার। পর্দার অন্তরালবর্তী এই নারীসমাজের চোখের জলের হিসাব কেউ রাখে না। মৌলবাদী শাসনব্যবস্থায় পুরুষতন্ত্রের ধর্ষকামী মনোভাবের প্রভাবে নারী হারিয়ে ফেলেছে তাঁর জীবনের

অর্থ। এখানে সামাজিক, মানসিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পুরুষতান্ত্রিক এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্ষকামী মনোভাব আজও অব্যাহত।

তবে সুখের কথা এসবের প্রতিবাদে সচেতন নারীদের বিশ্বজুড়ে আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তার ফলে বিভিন্ন দেশে নারীর অধিকার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলি ভিন্নমূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। নারীদের এই ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে তাঁরা কিছুটা অধিকার অন্তত ফিরে পেয়েছে। সম্প্রতি আফগানিস্তানে প্রথম মহিলা গভর্নর হলেন হাবিবা শরাবি। যে দেশে সবকিছু একচেটিয়া পুরুষসমাজেরই নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে গভর্নর হাবিবা ঘোষণা করেছেন 'সকলের জন্য সমান (নারী ও পুরুষ) সুযোগ।' এই মতবাদের রূপায়ন তাঁর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। হাবিবা শরাবি গভর্নর হওয়ায় আফগানিস্তানে পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত, বঞ্চিত, অনিকেত, নারীর কাছে সম্ভাবনার এক সিংহদুয়ার খুলে গেল। ফলে নারীরা সামাজিক অধিকার ভোগ ও পদমর্যাদা লাভ করে কাজের সুযোগ পাবেন। আর পুরুষসমাজের আরোপিত কৃত্রিম, নিয়মরেখার গণ্ডিটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। শুধু আফগানিস্তানে নয়, কুয়েতে ১২ জুন ২০০৫ আরিখে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মহিলা কেবিনেট মন্ত্রী নিয়োগের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। কুয়েত নারীর অধিকার আন্দোলনের কর্মী ও কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা মাসৌমা আলমোবারককে কুয়েতের পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এতে নারী আন্দোলনের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ঐতিহাসিকভাবে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। কুয়েত সরকারের আরও একটি ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত হল দেশের পুরুষপরিষদে দুজন মহিলা সদস্য নিয়োগ।

পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিশেষ করে ইউরোপীয় বলয়ে ভোগবাদী মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মধ্যেও কোথাও যেন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়ে গেছে। তাঁরা ভোগবাদ অর্থাৎ Pragmatisim-এ বিশ্বাসী। দিন দিন তাঁদের হৃদয় থেকে মানবতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি নামক শব্দগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নারী আন্দোলন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীমুক্তি এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নারী-নির্যাতন, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ক্রিয়াশীল। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে খ্রিস্টান ধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সেখানে নারীদের স্থান খুব একটা সুবিধাজনক নয়। পোপ দ্বিতীয় জনপলকে ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ উদার ব্যক্তিত্ব হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তিনি মহিলাদের যাযকবৃত্তিকে অনুমোদন দেননি। এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণ ব্যবস্থার ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার নিদর্শন।

মানবজাতির জন্মস্থান হিসাবে চিহ্নিত আফ্রিকা। সেই আদিতে ছিল না শোষক-শোষিত, মানব-মানবী ছিল স্বতন্ত্র, সঞ্চারঅধিকারী। ক্রমেক্রমে এই সংঘবদ্ধ জীব বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ায় জীবনের প্রয়োজনে তাঁদের মধ্যে শুরু হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পুরুষেরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিক থেকে প্রকৃতির নিয়মে কিছুটা সবল হওয়ায় দুর্বল শ্রেণির নারীকে করায়ত্ব করল। বেঁধে ফেলা হল নাগপাশে, আর পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ওপর নেকড়ের থাবা সেই থেকে অব্যাহত। পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলিতেও পুরুষসমাজের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুধর্মের শাশ্বত মহাকাব্য 'মহাভারতে' দেখা যায় দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের

কলঙ্কিত অধ্যায়। সেখানে অসমসাহসী বীর যোদ্ধারা উপস্থি থাকলেও নারীর সম্মান রক্ষার্থে কেউ সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। তাই নারীকে অদৃশ্য শক্তির কাছে সাহায্যের জন্য আকুল হতে দেখা যায়। উক্ত সভায় পিতৃতুল্য দ্রোণাচার্য, ভীষ্মদেবেরা উপস্থিত থাকলেও তাদের নিরব দর্শকের ভূমিকা জিজ্ঞাসা চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। পুরুষশাসিত সমাজে নারীজাতির মানবিক মূল্যবোধকে পদদলিত হতে দেখা যায়। বর্তমান সমাজেও তার প্রতিচ্ছবি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদাকালোর বর্ণবৈষম্য তাদেরকে অগ্রগতির পথ থেকে বহুযোজন দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এক সময় এই দেশের মানুষদের দাসপ্রথার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়েছিল। শুধু দাসপ্রথা নয়, তাদের অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাতে হ'ত। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল। শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়ে আজও এদেশের নারীসমাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের অন্ধকারে নিমজ্জিত। এ জন্যই আফ্রিকায় শিশুকন্যার বিবাহের হার অত্যন্ত বেশি। এরা নিরক্ষর ও অসচেতন হওয়ায় এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কারের প্রভাব দেখা যায়। বিশ্বের মধ্যে একমাত্র আফ্রিকার মানুষের মধ্যে মারণ রোগের প্রাদুর্ভাব প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। এইচ. আই. ভি-এর মতো সংক্রামক মারণ রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এদেশে সর্বাধিক।

১৯৪৪ সালে আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটে। আর মানবজাতির আদি অধিস্থান আফ্রিকায় নারীজাতি সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁদের অধিকার বুঝে নিতে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে নিপীড়িত, শোষিত, শ্রমজীবী নারীদের আন্দোলনকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে নারী সংগঠন এখন দৃঢ়, বদ্ধপরিকর। উদার মানবতার পূজারী বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ নারীজাতি সম্পর্কে বলেছেন : 'নারী জাতির উন্নয়ন ছাড়া দেশের বা জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।'

বিশ্ব মানবজাতির কর্তব্য নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। 'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী'। নারী মাতা রূপে জগৎসংসারে প্রাণের বার্তা বহন করে আনেন। আর পৃথিবী কালের আপন গতিতে প্রানচঞ্চল হয়ে ওঠে। নারী যদি আপন অধিকার ফিরে পায় এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে, তাহলে বিশ্বসমাজ কলনৃত্যের আনন্দধারায় বয়ে চলবে। সমাজের কলুষতা, মালিন্য দূর হয়ে যাবে। নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এখন বহন করে চলেছে। তাঁদের সমানাধিকারের দাবী ন্যায্য। সে অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বারেবারেই উঠে এসেছে। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে আপন স্বরূপে চিত্রাঙ্গদাকে বলতে শোনা যায় 'আমি চিত্রাঙ্গদা।/দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী, পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি।/যদি পার্শ্বে রাখ মোর সংকটের পথে দুরূহ চিন্তার যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী আমার পাইবে তব পরিচয়।'

উন্নয়নের, বিকাশের দিগ দিগন্তে এখন নারী তাদের ক্ষমতায়নের পরিচয় দিতে সক্ষম হচ্ছেন। নারী অবহেলার নয়, তাকে সমস্যা ভাবাও অনুচিত। নারী আমাদের কর্মসহচরী, সংকটের, সুখদুঃখের সহমর্মী। নারী আজ আপন গুণে অনন্যা। নারীকে কৃত্রিম মোড়ক ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। বুঝে নিতে হবে নিজের প্রাপ্য। বিশ্বনারীসমাজ সুশিক্ষিত হয়ে উঠলে

মুছে যাবে নিরক্ষরতার অন্ধকার। এ সম্পর্কে বহু ব্যবহৃত উক্তি সামান্য বদলে বলা যেতে পারে, 'মা যদি হয় সাক্ষর, সন্তান হবে না নিরক্ষর।' এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের বাস্তব চিত্র

নারী যেদিন থেকে নিজেকে বুঝতে শিখেছে, সেদিন থেকে তাঁর হৃদয়ে জন্ম নিয়েছে শৃঙ্খলমুক্তির বাসনা : 'দেখব এবার জগৎটাকে'। দিনে দিনে এই বৈপ্লবিক চেতনা বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত হয়েছে। ক্রমে তা উন্নীত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনে। নারী-পুরুষ এই নিসর্গের অমৃতের সন্তান। নারী-পুরুষের এখানে সমানাধিকার। কিন্তু শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থাই হল নারীজাতির পরাধীনতার মূল কারণ। নারীকে এই পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে চাই শ্রেণিহীন শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'-তে পুঁজিবাদী সমাজে নারীজাতির ওপর শোষণের চরম স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেখানো হয়। এবং দেখানো হয় যে, কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সর্বহারাশ্রেণিই সর্বপ্রথম নারীমুক্তির জন্য সংগ্রাম করে আসছে। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে আরো দেখানো হয়েছে যে, পুঁজিবাদের অবসানের সঙ্গেই শোষিত সর্বহারাশ্রেণির যেমন মুক্তি আসবে, তেমনি মুক্তি আসবে শোষিত নারীসমাজেরও। নারী আন্দোলন মুখ্যত যে যে দিকগুলি নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপকতা লাভ করেছে, সেগুলি হল : ক. সামাজিক খ. রাজনৈতিক গ. অর্থনৈতিক ঘ. ধর্মীয়।

ক. **সামাজিক অধিকার** : পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থবুদ্ধির বিভেদনীতির ফলে নারীরা সামাজিক অধিকার থেকে এতদিন বঞ্চিত হয়েছিল। বিভিন্ন সামাজিক অধিকার বর্তমানে তাঁরা ভোগ করে থাকলেও তা পূর্ণভাবে করায়ত্ব করতে পারেননি।

নারীদের সামাজিক সুরক্ষার কথা বলা হলেও তা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা লাঞ্ছিত। যেমন শিশুকন্যা, গৃহবধূ, ছাত্রী, অফিসে কর্মরত মহিলারাও শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের শিকার। মণিপুরের মনোরমা দেবীর মতো কতশত মনোরমা দেশের সুরক্ষাবাহিনী কর্তৃক প্রতিনিয়ত নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হচ্ছেন। এছাড়া বিশ্বসমাজে ইমরানাদের নীরব অত্যাচারের কাহিনি আজও বিরল নয়। বর্তমানে রাজনীতিক ভেকধারী চরিত্রহীন মহাপুরুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এর ফলে সমাজের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে পড়ছে। এর জন্য চাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন। এবং সরকারকে সামাজিক দিক দিয়ে নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থার এবং দেশের গণতান্ত্রিক চেতনায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজ করতে হবে।

নারী এবং পুরুষের সামাজিক সমানাধিকার থাকা উচিত। বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এই অধিকার মহিলাদের দিতে হবে। এই ব্যাপারে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে 'বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল'-এর মাধ্যমে সেদেশের নারীদের বিবাহ-বিচ্ছেদে সমান অধিকার দান স্বীকৃত হয়েছে।

সমাজের সকলপর্বে নারীদের অংশ গ্রহণের অধিকার দিতে হবে। নিজ সন্তানের প্রতি অধিকার তাঁদের ন্যায্য দাবী। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের অধিকার তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

সমাজের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে পতিতা নারীদের সামাজিক স্বীকৃতির অধিকার নিয়ে বহু কথা বলা হলেও পতিতা নারীরা আজও ব্রাত্য। তাঁদের দেশজোড়া আন্দোলনের ফলে

সামাজিক স্বীকৃতির দিক দিয়ে তাঁরা অনেকখানি সফল।

শিক্ষা মানবজাতির একটি সামাজিক অধিকার। শিক্ষা ছাড়া মানবাধিকার অসম্পূর্ণ। শিক্ষার অধিকার নারীর আবশ্যিক অধিকার। নারীসমাজকে অন্ধকারপ্রদেশ থেকে আলোকময় জগতে নিয়ে আসার প্রধান হাতিয়ার শিক্ষা। আর সেই শিক্ষার অধিকার তাঁদের ফিরিয়ে দিতে হবে। শিশুশ্রমিকের কলঙ্ক পৃথিবীর ইতিহাস থেকে মুছে দিতে হবে। তাঁদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে এসে সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় নারী পুরুষের আসন সংখ্যা সমান সংখ্যক করতে হবে এবং শিক্ষার সকল বিষয়ে নারীদের বিচরণের অধিকার দিতে হবে।

খ. **রাজনৈতিক** : সমাজ নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে যতটা উচ্চকণ্ঠ, ততটা বাস্তবমুখী নয়। পৃথিবীর সকল দেশে এখনও নারীদের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া যায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য ভোটাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দিন পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে বিশ্বের সমাজ, সংসার, মানসিকতা। আজ নারী তাঁর রাজনৈতিক অধিকারের জায়গাটাও ফিরে পাচ্ছে। আর এই ফিরে পাওয়ার পিছনে রয়েছে নারী-সমাজের বিপ্লব ও আন্দোলনের ইতিহাস। কিছুদিন পূর্বেও দেশের শীর্ষস্থানে নারীদের স্থান দেওয়া হত না। যোগ্যতা থাকলেও তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। বর্তমানে কিছু কিছু দেশ ছাড়া নারীর রাজনৈতিক অধিকার তথা ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

নারী বিপ্লব ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁদের ভোটাধিকার লাভ করেছে, কোন দেশে নারীরা কবে ভোটাধিকার অর্জন করেছে, তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :

সাল	দেশের নাম
১৮৯৩	নিউজিল্যান্ড
১৯০২	অস্ট্রেলিয়া
১৯০৬	ফিনল্যান্ড
১৯১৩	নরওয়ে
১৯১৫	ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ড
১৯১৭	ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক, বাইলোরুশিয়া, নেদারল্যান্ড, ইউক্রেন
১৯১৮	গ্রেটব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড
১৯১৯	অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া জার্মানি, পোল্যান্ড ওসার
১৯২০	সুইডেন
১৯২৪	মঙ্গোলিয়া জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

সাল	দেশের নাম
১৯২৯	ইকুয়াডোর
১৯৩০	ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা
১৯৩১	শ্রীলঙ্কা
১৯৩২	থাইল্যান্ড, উরুগুয়ে ও ব্রাজিল
১৯৩৪	কিউবা ও তুরস্ক
১৯৩৫	ভারতবর্ষ ও বার্মা
১৯৩৭	ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
১৯৪২	ডোমিনিকান রিপাবলিক
১৯৪৪	ফ্রান্স
১৯৪৫	ইটালী, সাইবেরিয়া, পর্তুগাল, মেনাকো ও গুয়াতেমালা
১৯৪৬	আলবানিয়া, সালভাদর, জাপান, পানামা, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া
১৯৪৭	আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, চীন,

সাল	দেশের নাম	সাল	দেশের নাম
	ভেনেজুয়েলা ও পাকিস্তান	১৯৫৪	কলম্বিয়া
১৯৪৮	ইসরাইল, কোরিয়া ও বেলজিয়াম	১৯৫৫	হন্ডুরাস, পেরু, ভিয়েতনাম, ইথিওপিয়া, কম্বোডিয়া ও লাওস
১৯৪৯	কোস্টারিকা, ইন্দোনেশিয়া ও চিলি		
১৯৫০	হাইতি ও সিরিয়া	১৯৫৬	নিকারাগুয়া
১৯৫২	বলিভিয়া, গ্রীস ও লেবানন	১৯৫৭	মিশর, তিউনিসিয়া
১৯৫৩	মেক্সিকো	২০০৫	কুয়েত

গ. **অর্থনৈতিক** : অর্থনৈতিক অধিকার নারীসমাজের হাত থেকে সরে যাওয়ার ফলে তাঁরা সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে এলেও সবদেশে তা এখনো স্বীকৃত হয়নি। অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে লেনিন মনে করেন : 'শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো থাকার দরুন, এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলিই সমাজের অর্থনৈতিক অনুকেন্দ্র হয়ে থাকার দরুন, ব্যাপকভাবে নারীদের সামাজিক উৎপাদনের কাজে যোগ দেবার কোনো সুযোগ সুবিধা থাকে না। তাঁরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও পেতে পারে না। তাই শ্রেণিবিভক্ত সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর সমানাধিকার বা পুরুষের সমান সামাজিক মর্যাদা কখনই সর্বসাধারণ নারীদের জন্য হতে পারে না। সেখানে নারীদের জন্য শিক্ষা, জীবিকা, আইনকানুনের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির জন্যই যা কিছু ব্যবস্থাই হয়ে থাক না কেন, ব্যাপক নারীসমাজের মাত্র একটা ক্ষুদ্র অংশই শুধু অত্যন্ত সীমিতভাবে তা ভোগ করতে পারে। একমাত্র শ্রেণিহীন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই সর্বসাধারণ নারীদের জন্য সমানাধিকারের পূর্ণ সুযোগ সুবিধা মিলতে পারে।'

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিবাহিত নারীদের সম্পত্তির অধিকার বিলের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক অধিকারের বুনিয়াদকে শক্ত করার চেষ্টা করা হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করতে হলে নারীদের বিভিন্ন কর্মে শ্রমের যথার্থ মূল্য প্রদান করতে হবে। সেখানে পুরুষ-নারীর বৈষম্য দূর করতে হবে। তাহলেই নারী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে। সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে নারীমুক্তি আন্দোলনের এক নতুন মাত্রা পেল ১৯১৮ সালের ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে'। সেদিন সোভিয়েত রাশিয়া শ্রমিক-নারীদের জমায়েতকে অভিনন্দন জানালেন। ক্রমে নারীরা যে অধিকার ফিরে পেতে চলেছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার নিগড় ছিন্ন করে শ্রমিকশ্রেণির এই জাগরণ লক্ষ্য করে লেনিন বলেছেন : 'দুনিয়ার সর্বত্রই বরফ গলছে।'

ঘ. **ধর্মীয় অধিকার** : নারীকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক কারণ দেখিয়ে ধর্মীয় পূর্ণ অধিকার থেকে বহু দিন ধরে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। নারীকে দেবীর আসনে বসালেও ধর্মীয় অধিকার ও ধর্মীয় বিধানের সকল ক্ষমতা মৌলবী, যাজক এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতেই বর্তমান। তাদের অঙ্গুলি হেলনেই এই সমাজসংসারের ধর্মীয় আচার, বিচার সম্পন্ন হয়ে থাকে। নারীসমাজের সেখানে অনধিকার প্রবেশ। তাই নারী আন্দোলন সঙ্গে ধর্মীয় অধিকার নিয়েও তাঁদের লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। কিছু দেশে নারীদের ধর্মের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হলেও বেশির ভাগ দেশে এখনও তাদের ধর্মীয় অধিকারকে স্বীকার করা হয় নি।

'Education is the key of new World.' তাই যদি হয়, তবে নারীজাতি কেন তাঁর জীবনের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে? শিক্ষার অধিকারকে প্রত্যেক মানুষের আবশ্যিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর নারীকে তাঁর আপন ভাগ্য পুরুষের হাতে সঁপে দিলে চলবে না, তাকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার অর্জন করতে হবে। কুসংস্কার, জীর্ণপ্রথা, ভয়, আত্মগ্লানি ত্যাগ করে দৃঢ় পদক্ষেপে নতুন জগতে প্রবেশের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। এটা সম্ভব হলে তবেই মানবীরা তখন দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারবে : 'আমি নারী, আমি মহিয়সী'।

আর এই ঐতিহাসিক জয় আসবে বিপ্লব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। শিক্ষাই নারীজাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে পারে। নারীজাতির পূর্ণক্ষমতায়নের একমাত্র হাতিয়ার হবে শিক্ষা। নারীর তিনটি মূল অধিকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারলে সে নিজেকে মুক্ত, পূর্ণাঙ্গ মানবী বলে ঘোষণা করতে পারবে।

আন্তর্জাতিকস্তরে যেকোনো দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নারীর রক্তঝরা বিপ্লবের কথা ইতিহাসের পাতায় খোদিত। নারীর এই মহান আত্মত্যাগের গৌরবগাথা সবদেশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্প্রাপ্য নয়। ১৯৭৫-৮৪ সাল পর্যন্ত সময় ধরে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে সারা বিশ্বে পালিত হয়েছে নারীদশক। 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে' নারী সমাজের প্রত্যাশা ছিল সুগভীর। কিন্তু তা বাস্তবে কার্যকর হয়ে ওঠে নি। তাই নারী দশকের লক্ষ্য হল, নারী সমাজ শিক্ষায়-দীক্ষায়, চাকরিতে, গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করবে। কিন্তু তা বিভিন্ন সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। এর জন্য চাই আরো বৃহৎ নারী আন্দোলন। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে হবে। বিশ্বসমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য চাই মুক্তচিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ। প্রত্যেক দেশের সরকারকে নারী কল্যাণের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের শৃঙ্খলমুক্তির জন্য, সর্বক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজনের হার্দিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। সমাজের সমস্ত দিক দিয়ে সার্বিক আন্দোলন সূচিত হলে নারী আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠতে বাধ্য। তখন নারী তাঁর পূর্ণ সত্তা নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে বলবে, আমি মানবী, আমি বিশ্বনাগরিক। এই উচ্চারণই হোক সার্থক নারী আন্দোলনের এবং নিরবচ্ছিন্ন বৃহৎ আন্দোলনের মূলমন্ত্র।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের ধারা, কনক মুখোপাধ্যায়।
২. দেশ, ৫ আগস্ট, ২০০০।
ঐ, ১৮ জুলাই, ২০০২।
ঐ, ২ জুলাই, ২০০৫।
ঐ, ১৭ জুলাই, ২০০৫।
৩. একসাথে, ২০ বর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা; মে, ১৯৮৮।

নারীরা আজো ভালো নেই

অরিজিৎ বসু

আজকের হাই-টেকের যুগে নারীরা ঘরে বাইরে সমান তালে এগিয়ে চলেছেন-এমন নারীবাদী কথা প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসলেও প্রকৃতচিত্রটা কী ঠিক তাই? মহিলাদের একাংশ আলোকবৃত্তের মধ্যে এলেও ছায়াবৃত্তের উল্টোদিকে এক বৃহৎ অংশের বঞ্চনার যে কাহিনি রয়েছে তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? লেখার শুরুতেই উল্লেখ করি পশ্চিমবঙ্গের বেলপাহাড়ীর মিনা সিংহ সর্দারের কথা। আনন্দবাজার পত্রিকার ৮ আগষ্ট সংখ্যার 'উন্নয়নের টোটকা পেতে ভাড়া করতে হয় ছাগলও' শীর্ষক খবরে মীনার জীবনের ট্রাজিক পরিনতি কি আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্নচিহ্ন রাখে না? খবরে প্রকাশ, ২০০১ সালে সুধীর সিংহ সর্দারকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহে পুলিশ ২৭ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে মীনাকে। সঙ্গে আনা হয় আরও নানা অভিযোগ। ঝাড়গ্রাম সাব-জেলে ও মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল ঘুরে বছর দুয়েক পর মীনা যখন জামিনে ছাড়া পায় তখন সে মানসিক ভারসাম্যহীন। পুলিশি হেফাজতে মেয়ের ওপর অত্যাচার নিয়ে তার মা রূপোলি সিংহ সর্দার মানবাধিকার কমিশন সহ নানা জায়গায় অভিযোগ জানায়। পরে, অপুষ্টিজনিত নানা রোগে ভুগে এ বছর ফেব্রুয়ারিতে মারা যায় মিনা। ঘটনাস্থলে গেলে আপনি শুনতে পাবেন মারা যাওয়ার আগে 'জলে ডোবা মিষ্টি' অর্থাৎ রসগোল্লা খেতে চাইত মীনা।

এমন বহু মীনা, বীনা, সালেমার জীবন শেষ হয়ে যায়। কজনের খবরই বা প্রকাশ পায়? ভারতে নারীদের অবস্থার বর্ণনা দিতে হলে বিতর্ক এড়িয়ে বলা যায়—চোখ রাখুন প্রত্যন্ত গ্রামের সেইসব মহিলার জীবনে, যারা প্রতিবছর হারিয়ে যায় আমজনতার 'মৃত্যু মিছিলে'।

জহরলাল নেহেরু একসময় বলেছিলেন—'You can tell the condition of a nation by looking at the status of its women' অর্থাৎ তুমি একটি জাতির অবস্থা বলতে পার সেই জাতির নারীর অবস্থান (status) দেখে।

চরম দারিদ্র্য, অপুষ্টি, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি ভারতীয় নারীর উন্নতির পথে বিশেষ বাধা। ভারতীয় মেয়েরা চরম অপুষ্টিতে ভোগে। গর্ভবতী অবস্থাতেও তারা ঠিকমত পুষ্টিকর খাবার খেতে পায় না। ফলে তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর জন্ম দিতেও অসমর্থ হয়। কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করলে ভারতে নারীদের অবস্থার একটি আপাতচিত্র পাওয়া যেতে পারে।

শারীরিক দুর্বলতা

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই জীবনবিস্তারে সঠিকভাবে জীবন অতিবাহিত করা ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শারীরিকভাবে অসুস্থ হলেও বাড়ির মেয়েরা অনেকসময় সঠিক চিকিৎসা পায় না। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারে ছেলে

এবং মেয়ে থাকলে মেয়ের তুলনায় ছেলের সুস্বাস্থ্যের দিকেই বেশি নজর দেয় অভিভাবকেরা। পাঞ্জাবের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের জন্য ২.৩ গুণ বেশি খরচ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে আমাদের রক্ষণশীল মনোভাব মেয়েদের শারীরিক অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মহিলা চিকিৎসক না থাকলে বহু গ্রামের মেয়েরাই 'পুরুষ' ডাক্তারদের তাঁদের গোপন রোগের কথা বলতে চায় না। ফলে প্রাথমিকভাবে রোগ ধরা না পড়লে পরে তা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সমীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে মেয়েরা গর্ভবতী অবস্থাতেও ঠিকমত পুষ্টিকর খাবার পায় না। ফলে তাদের শারীরিক অবনতি ঘটে। অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগা মা জন্ম দেয় রুগ্ন শিশুর। সন্তান প্রসবের পরেও যে পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তাও অনেকসময় মা পান না। সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েরা অনেকসময় স্থানীয় বিভিন্ন টোটকার (Home Remedies) সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। যথাযথ বৈজ্ঞানিকভাবে অনেকক্ষেত্রে প্রসবের ঘটনা ঘটে না। ফলে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করায় অনেকক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতায় ভোগের মা-রা। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রামে সমীক্ষা করে দেখা গেছে গ্রামের প্রায় ৯২% মহিলাই একটি বা ততোধিক স্ত্রীরোগে ভোগেন। সু-চিকিৎসার অভাবে তাদের রোগ প্রকট আকারও ধারণ করে। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, ভারতে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হয় না। ফলে, গর্ভপাতজনিত মৃত্যুর হারও রীতিমত উদ্বেগজনক।

ভারতের সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থায় বেশীর ভাগ পরিবারে একটি সাধারণ ঘটনা ঘটে থাকে। পরিবারের পুরুষ সদস্যদের খাওয়ার পর মহিলারা খেতে বসেন। খাদ্যের অভাবজনিত কারণে মহিলারা পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত হন। অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে তাঁদের শারীরিক অবনতি ঘটে।

বর্তমানে পরিবেশ দূষণের ফলেও নারীদের শারীরিক অবনতি ঘটছে। একটি সমীক্ষা বলছে, যে সব মেয়ে শিল্পাঞ্চলে কাজ করেন তাঁরা শ্বাসজনিত রোগে বেশী ভোগেন। কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাসের প্রভাবে তাঁরা বিভিন্ন রোগের শিকার হন। গর্ভবতী অবস্থাতে এই গ্যাস মাতৃগর্ভের সন্তানেরও ব্যাপক ক্ষতি করে।

ভারতীয় মহিলারা রক্তাল্পতা রোগেও ভোগেন। চরম দারিদ্র্যের কারণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) জনিত রোগে ভুগে তাঁদের শারীরিক অবনতি ঘটে।

অধিক পরিশ্রম

ভারতীয় মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় বেশী সময় পরিশ্রম করে—এমন অভিমত পোষণ করেছেন বিভিন্ন গবেষকেরা। তাঁরা জানিয়েছেন পরিবারের বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি কৃষিকাজেও তাদের অংশ গ্রহণ করতে হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষিকাজের সময়ে (agricultural season) মেয়েদের প্রায় ১৫ ঘন্টা কাজ করতে হয়। আবার হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকাজে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই বেশী সময় পরিশ্রম করেন। তাঁরা

প্রায় ৩,৪৮৫ ঘন্টা কাজ করে প্রতি বছর, সেখানে পুরুষেরা প্রতি বছরে কাজ করেন ১,২১২ ঘণ্টা।

আবার স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের অধীনে বর্তমানে মেয়েদের কার্যকারিতা বেশ উল্লেখযোগ্য। কৃষিকাজের পাশাপাশি বাড়িতে বসে তাঁরা বিভিন্ন জিনিস তৈরী করেন। সেগুলি বাজারে বিক্রী করে অর্থ উপার্জন করেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের পরিশ্রমের হারও নিতান্ত কম নয়।

বিভিন্ন শিল্প কারখানায় মহিলা-শ্রমিকদের হারও বেশ উদ্বেগজনক। তাঁরা পুরুষদের সম শ্রম দিলেও সঠিক মজুরি পান না অনেক ক্ষেত্রে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাঁরা অবহেলা, অনাদরের শিকার হন। অনেকক্ষেত্রে শিল্পক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও যন্ত্র আসার ফলে মহিলাদের আয়ের পথও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মেয়েরা বঞ্চনার শিকার

বর্তমানের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোতে ভারতীয় মেয়েরা অত্যধিক বঞ্চনার শিকার। মেয়েদের ওপরে পুরুষের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনি আজ আর গোপন নেই। মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে নানাক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হন। সম্ভবত প্রতি ৩৪ মিনিটে একটি ধর্ষনের ঘটনা ঘটছে ভারতে। প্রতি ৪২ মিনিটে একটি যৌননিগ্রহের ঘটনাও ঘটছে। প্রতি ৪৩ মিনিটে অপহৃত হচ্ছেন একজন ভারতীয় মহিলা, এবং প্রতি ৯৩ মিনিটে পণের জন্য পুড়িয়ে মারা হচ্ছে একজন নারীকে।

দক্ষিণ ভারতের তুলনায় উত্তর ভারতে নারীদের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। পণপ্রথার বলি হতে হচ্ছে বহু নারীকে। কম বয়েসে নারীদের বিবাহ দেওয়া হলে নতুন সংসারে শ্বশুর-শাশুড়ী কিংবা স্বামীর চাপে তাঁদের জীবন শেষ হয়ে যায় অচিরেই। বয়স কম হওয়ায় তাঁরা ঠিকমত প্রতিবাদও করতে পারেন না। ১৯৯৮ সালের মে মাসে 'New York Times'-এ প্রকাশ পায় :

'Child marriages contribute to virtually every social malaise that keeps India behind in women's right. The problems include soaring birth rates, grinding poverty and malnutrition, high illiteracy and infant mortality and low life expectancy, especially among rural woman.'

প্রতি বছর কম বয়েসী মহিলাদের বিয়ে বন্ধ করার জন্য সরকারী প্রচার চললেও সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রভাব খুবই কম। প্রতি বছর প্রায় ৬০০০ মেয়ে বলি হয় পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা থাকলেও তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। Pocily Think Tank (A Institute of Development and communication) বলেছে, 'the quantum of dowry exchange may still be greater among the upper classes, but 80 percent of dowry deaths and 80 percent of dowry harassment occurs in the middle and lower strates.'

আইন থাকা সত্ত্বেও পণপ্রথা বিয়ের সাথে অতি সম্পর্কিত ঘটনা হয়ে পড়েছে। রেনুকা ভাগার বলেন, 'It is taken as a normative custom and dowry harassment as a part of family life.'

মেয়েদের বঞ্চনার আরেকটি দিক ডিভোর্সের ঘটনা। স্বামী পরিতক্তা নারীদের আমাদের সমাজ কখনোই ঠিক মতো নেয়নি। বাপের বাড়িতেও সে বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে। চাকুরীরতা মহিলাদের ক্ষেত্রে অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও গ্রাম্য, অশিক্ষিত মহিলাদের দুরবস্থার শেষ থাকে না।

ভ্রূণহত্যাজনিত সমস্যা

বর্তমানে সরকারী তরফে ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা তৈরী হলেও ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে মেয়ে-ভ্রূণ হত্যার ঘটনা কি একেবারে বন্ধ করা গেছে? একসময় বম্বের (অধুনা মুম্বাই) একটা বিজ্ঞাপন সংস্থা বিজ্ঞাপনে লিখেছিল, 'It is better to pay 500 Rs. now than 50,000 Rs. (in dowry) later.' ভাবা যায়! আমরা কোন সভ্যতায় বাস করি? পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তান বেশী গ্রহনীয় হয়ে পড়ে। কেননা মেয়ে হলে পরবর্তী সময়ে খরচের প্রশ্ন থেকে যায়। এখনও অনেকে মনে করেন মেয়ে হল বাবার মাথার বোঝাস্বরূপ। নারীবাদী সংগঠনগুলি এ বিষয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তবুও কন্যা-ভ্রূণ হত্যার ঘটনা একেবারেই নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

নারী-পাচার চক্র

চরম দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে কিছু দুরভিসন্ধি মানুষ গ্রামের মেয়েদের চাকরির লোভ দেখিয়ে পাচার করে দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই নিরূপায় মেয়েদের ঠিকানা হয় পতিতাপল্লীতে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের শারীরিকভাবে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। মেয়ে পাচার চক্রের সাথে চলছে মোটা অঙ্কের টাকার খেলা। দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতার বিভিন্ন পতিতাপল্লীতে গিয়ে মেয়েদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন লেখক সাংবাদিকরা। কাজ করছেন বহু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তবুও মেয়েদের ক্ষেত্রে শরীরই যেন শেষ কথা। কাম লোভে মত্ত পুরুষেরা হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। তাদের দুঃখের ঘটনা চাপা পড়ে 'কালো' রাত্রির 'কালো' টাকায়। কোনো কোনো মেয়ে পতিতাপল্লী থেকে পালিয়ে আসতে পারলেও বাড়িতে এসেও তার নিস্তার নেই। সমাজ কি তাকে আড়চোখে দেখে না? তার ওপর চলে পতিতাপল্লীর 'দাদা'দের হুমকি। আমরা কোন সভ্যতায় বাস করছি?

শেষের কথায়

আপনি দেখেছেন অগনতি মানুষের ভিড়ে হেঁটে যাওয়া কোনো এক মেয়েকে। এখনও হয়তো দেখছেন, ভবিষ্যতেও দেখবেন। এভাবেই তারা সমাজের ভিড়ে, সংস্কৃতির ভিড়ে, জীবনবৃত্তের ভিড়ে হেঁটে চলে। ক্লান্ত হয়, ঘাম মুছে আবার হাঁটে। উঠে আসে সানিয়া মির্জা, মেধা পাটেকর, ইন্দিরা গান্ধী, কল্পনা চাওলা, বৃন্দা কারাট, আশাপূর্ণা দেবীর মতো কিছু উজ্জ্বল মুখ। তবুও সে উজ্জ্বলতা, উচ্ছলতা নেভাতে পারে না এক বিরাট অংশের মেয়েদের কান্না। নারী আন্দোলনে যারা সামিল তারা চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রশ্ন, ভারতে নারীদের সুদিন আসবে তো? দারিদ্র্যের সংকট, চরম অপুষ্টি, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি সমস্যাগুলি কাটিয়ে

কবে জেগে উঠবে ভারতের গ্রামীণ নারীসমাজ? ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর বহু বছর অতিক্রান্ত। এ সময়ে দাঁড়িয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন চায় নারীরা। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কে দেবে তাদের আশ্বাস, যে আশ্বাসের খোঁজ দেবে জীবনযাত্রার নয়া ইঙ্গিত। তাই সার্বিকভাবে নারী কল্যানের পথে শুধু আইন নয়, এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। নইলে 'বিশ্ব নারী দিবস', নিছকই দিবস হিসেবেই থেকে যাবে ক্যালেন্ডারের পাতায়।

তথ্যসূত্র

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, New York Times এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, Internate.

নারীবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি

বীথিকা বালা • শিপ্রা বিশ্বাস

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা এক দীর্ঘ লড়াই-এর ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের নিয়ে তেমন কোনো লেখালেখি হয়নি। সে-সময় রক্ষণশীল সমাজপতিরা নারীকে অন্দর মহলেই ধরে রাখতেন। বাগান বাড়িতে বাঈজী রাখার রেওয়াজ ছিল। পায়রা ওড়ানোর অহমিকায় অন্তরের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেত। পরপুরুষে মুখ দেখবে বলে এই সেদিন পর্যন্ত গঙ্গায় পাল্কিসুদ্ধ ডুবিয়ে আনা হত নারীদের। মানদাদেবীর মত দু-চার জন সেই অন্তঃপুরের যন্ত্রণার কথা, অসহায়তার কথা তাঁদের আত্মজীবনীতে লিখেছেন। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পরে নারীমুক্তির একটি আবহ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। তার ঢেউ এসে লাগে ভারতের নারীসমাজেও। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সাহিত্য-সংস্কৃতি, পোষাক-আশাক এবং জীবন যাপনে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটান। শিক্ষার আলোয় মেয়েরা ধীরে ধীরে আলোকিত হতে শুরু করেন। কিন্তু অর্থনীতিহীন পুরুষনির্ভরতার কারণে এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটার সুযোগ না থাকায় ভারত তথা বাংলার মেয়েদের মধ্যেও স্থবিরতা দৃঢ় হয়েই থাকে। মেয়েদের সমস্যার কথা নিয়ে লেখার জন্যে বামাবোধি পত্রিকা প্রকাশিত হলেও তার বেশিরভাগ লেখকই ছিলেন পুরুষ। বিশ শতকের শুরু থেকে একবিংশ শতক পর্যন্ত মেয়েরা তাঁদের নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজেদের অধিকার ফিরে পাবার জন্যে বহু আন্দোলন করেছেন, কিন্তু সে আন্দোলন ছিল মুষ্টিমেয় উচ্চবংশীয় ও শিক্ষিত নারীকূলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইউনেসকো নারীদের সমতার দলিল ঘোষণা করার পরে পৃথিবী জুড়ে নারীদের অধিকার এবং মুক্তির জন্যে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। দেশে বিদেশে ওম্যান স্টাডিজ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু যে পরিমাণে ইংরাজী গ্রন্থ লেখা হয়েছে, সেই পরিমাণে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবুও ইংরাজী বই-এর পাশাপাশি বাংলাভাষাতেও বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যাঁরা নারীদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন, তাঁদের অধিকার আদায় এবং মুক্তির জন্যে আন্দোলন করতে চান, তাঁদের স্বার্থে নারীবিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ এবং গবেষণা গ্রন্থের একটি তালিকা নির্মাণ করা যেতে পারে। মূল তালিকাটিকে বাংলা এবং ইংরাজী এই দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে বর্ণনানুক্রমিকতার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে : বই-এর নাম, লেখকের নাম, প্রকাশনার ঠিকানা, প্রকাশের স্থান, প্রথম প্রকাশের তারিখ ইত্যাদি যথাযথ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য না পাওয়ার কারণে কিছু ব্যত্যয় ঘটতে পারে। তবু এই তালিকা থেকে বোধগম্য হবে যে, নারীমুক্তির বিষয়ে পুরুষ ও নারী লেখক ও আন্দোলনকারীরা, সমর্থকেরা কম হলেও অন্তত ভাবতে শুরু করেছেন, এটাই আশার কথা।

বাংলা :

১. অর্ধেক অর্থনীতি : নারীর শ্রম, বৈষম্য ও অর্থনীতির তত্ত্ব; শাশ্বতী ঘোষ, আনন্দ. কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৭।

২. অন্তঃপুর ; ড. চিত্তব্রত পালিত ও ড. পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

৩. অন্তঃপুরের আত্মকথা : চিত্রা দেব, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৮৪।

৪. অবরোধ-বাসিনী : বেগম রোকেয়া, মোর্শেদ সফিউল হাসান সম্পাদিত, ৩৮/২ ক, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৫. অন্দরে অন্তরে : সম্ভুদ্ধ চক্রবর্তী, ইউ. পি. এল, ঢাকা।

৬. অধিকার আন্দোলনে নারী সমাজ : অধ্যাপিকা হামিদা রহমান, নওরোজ কিতাবিস্থান, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৭. আমি নারী : আমি মুক্তিযোদ্ধা : সেলিনা হোসেন সম্পাদিত অন্য প্রকাশ, ৬৯/এফ, গ্রীন রোড, পান্থপথ, ঢাকা।

৮. আমি নারী : মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, ইউ. পি. এল., ঢাকা।

৯. আইনে নারীর অধিকার, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা, প্র. প্র. ২১ এপ্রিল, ১৯৮৪।

১০. আদিবাসী নারী : সঞ্জীব দ্রং, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, প্র. প্র. ১৯৯৭।

১১. আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের ধারা : ঐ, ঐ, প্র. প্র. ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫, পৃ.-৫৫।

১২. ইতিহাসে নারী : শিক্ষা, সম্পাদনা সুপর্ণা গুপ্তু, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

১৩. ইসলামে নারীর অধিকার : সাইয়্যোদা কানিজ মুস্তাফা, ঢাকা।

১৪. ইকো ফেমিনিজম : পরমাপ্রকৃতিবাদ, সমীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত, হাওয়া ৪৯, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৭।

১৫. উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিতে নারী : আনিসুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, প্র. প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১৯।

১৬. ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সংস্কৃতিতে বঙ্গ মহিলা : ড. মঞ্জুশ্রী সিংহ, গ্রন্থ সম্পুট, কোলকাতা,

১৭. ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর; কনক মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা।

১৮.ক. এস মুক্ত কর : মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পিপলস বুক সোসাইটি, ১২ বঙ্কিম ব্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কোলকাতা ৭৩। প্র. প্র. ২০০১, পৃ. ২০৬।

১৮.খ. ৭১এর গণহত্যা ও নারী নির্যাতন : আসাদুজ্জামান আসাদ, সময় প্রকাশন, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৯. কেয়াবৎ মেয়ে : শ্রীপান্থ, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৮৮।

২০. কর্তার সংসার, নারীবাদী রচনা সংকলন : সায়দিয়া গুলরুখ এবং মানস চৌধুরী সম্পাদিত।

২১. জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী : যোগেশচন্দ্র বাগল, কোলকাতা।

২২. তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী : পিটার্স কাসটার্স, অনুবাদ : কৃষ্ণ নিয়োগী, কোলকাতা।

২৩. দ্বিতীয় লিঙ্গ . শিমোন দ্য বোভোয়ার, অনুবাদ : হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী,

৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা,

২৪. ধর্ম ও নারী : সেকাল ও একাল : কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিশার্স, কোলকাতা ৭২, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ. ২৪৮।

২৫. ধর্মীয় মৌলবাদ নারীমুক্তির অন্তরায় : কনক মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্টীট, কোলকাতা-১৬, প্র. প্র. এপ্রিল ২০০৩, পৃ, ৩৯।

২৬. ধর্ম ও নারীর অধিকার : মমতাজ দৌলতানা, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী ঢাকা।

২৭. নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা : মেজর রফিকুল ইসলাম, অনন্য, ৩৮/২, বাংলা বাজার ঢাকা।

২৮. নারী সমাজের উন্নয়ন কল্পে বামফ্রন্ট সরকার : রেখা বেরা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৮৯।

২৯. নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা, সংকলন ও সম্পাদনা : ভারতী রায়, আনন্দ, কোলকাতা, প্র. প্র. জানুয়ারী ২০০২, পৃ. ৩০০।

৩০. নারী : আরতি মজুমদার। নবজাতক প্রকাশন, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কোলকাতা।

৩০. নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা : কনক মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬।

৩২. নারী নরকের দ্বার : পুষণ গুপ্ত সম্পাদিত, সোনার বাংলা, দ্বি. সং, ১৯৮৫, পৃ. ৬৪।

৩৩. নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে : বদরুদ্দিন উমর সম্পাদিত, শ্রাবণ, আজিজ সুপার মার্কেট ঢাকা।

৩৪. নারী আন্দোলনের কয়েকটি কথা : ঐ, ঐ, প্র. প্র. ১৯৭৫, পৃ, ৩১।

৩৫. নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান : কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, প্র. সং জানুয়ারী ২০০০।

৩৬. নারী, নগরী : কেতকী কুশারী ডাইসন, আনন্দ, দ্বি. সং. ১৯৮৩, পৃ. ১১৪।

৩৭. নারীর অধিকার আইনে ও বাস্তবে : মঞ্জুরী গুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬, প্র. প্র. আগস্ট ১৯৮৭, পৃ. ১২৭।

৩৮. নারী ও ম্যাডোনা : হাসনা বেগম, ঢাকা।

৩৯. নারী ও সমাজ : ভি আই লেনিন, অনুবাদ : কনক মুখোপাধ্যায়, একসাথে, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬, প্র. প্র. ১৯৪৮; পৃ. ৭১।

৪০. নারী : অতীত বর্তমান ভবিষ্যত : আগস্ট বেবেল, অনুবাদ : কনক মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬।

৪১. নারীমুক্তির প্রশ্নে : মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন, অনুবাদ : কনক মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬।

৪২. নারী আন্দোলন ও আমাদের কাজ · ঐ, ঐ।

৪৩. নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য : ড. জ্ঞানেশ মৈত্র, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, প্র. সং ১৯৮৭, পৃ. ২৮০।

৪৪. নারী ও নগরী : ভারতী সাহা, পাত্রজ, কোলকাতা, প্র. সং ১৯৮৬, পৃ. ১৪২।

৪৫. নারী : অস্তিত্ব ও সংস্কার : ডা: ভবানীপ্রসাদ শাহু, দীপ প্রকাশন, কোলকাতা, প্র. সং ১৯৯৭, পৃ. ১১২।

৪৬. নারী : হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী; ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ৪০৮।

৪৭. নারীবাদ : শাহাবুদ্দীন নাগরী, পরমা, ধানমণ্ডি, ঢাকা, প্র. প্র. ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃ. ৬৩।
৪৮. নারীর অধিকার ও আইন : নিশীথ অধিকারী, ক্রান্তিক, প্র. সং ১৯৮৮, পৃ. ১২৮।
৪৯. নারীর শ্রম : ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট : পিটার কাসটার্ম, অনুবাদ : পৃথ্বীশ সাহা, পিপলস বুক সোসাইটি, কোলকাতা।
৫০. নারীর চোখে বিশ্ব : মালেকা বেগম, সাহিত্য প্রকাশ, পুরাণা পল্টন, ঢাকা।
৫১. নারীর ক্ষমতায়ন : রাজনীতি ও আন্দোলন : সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০৩।
৫২. নারীর অধিকার ও অন্যান্য : পথিকৃৎ নারীবাদী, খায়রেন্নেসা খাতুন, সৈয়দ আবুল মকসুদ, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৫৩. নারী ও নারী সমস্যা : যশোধরা বাগচী, অনুষ্টুপ, কোলকাতা, প্র. প্র. ২০০২।
৫৪. নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট; রাশিদা আখতার খানম, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্র. প্র. ২০০০।
৫৫. নারীর জীবন যৌবন বার্ধক্য : মীনা ফারহা, অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা।
৫৬. নারী, পুরুষ ও সমাজ : আনু মহম্মদ, সন্দেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা।
৫৭. নারী ভাবনা : পূরবী বসু, অবসর, ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৫৮. নারী আন্দোলনে পাঁচ দশক : মালেকা বেগম, অন্য প্রকাশ, ৬৯/এফ গ্রীণ রোড, পান্থপথ ঢাকা।
৫৯. নারী অর্থনীতি : সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০৫।
৬০. নারী : ইতিহাসে উপেক্ষিতা : মাহমুদা ইসলাম, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৬১. নারীর কথা : আবুল হাসনাত সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৬২. নৈতিকতা, নারী ও সমাজ : হাসনা বেগম, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
৬৩. মেয়েদের ক্ষমতায়ন ও নারী শিশু পাচার : বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংলাপ, সন্তোষপুর, কোলকাতা ৭৫, প্র. প্র. জানুয়ারী ২০০২, পৃ. ১৩৭।
৬৪. পঞ্চায়েতে মেয়েরা : পঞ্চায়েত সদস্যার ইতিহাস; মেয়েরা এলো পঞ্চায়েতে; জোট বাঁধার গপ্পো; নারী ও শিশু উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।
৬৫. পথে বিপথে : মেয়েদের নিরাপত্তা : ভাস্বতী চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন, ১০ রেনি পার্ক, কোলকাতা-১৯, প্র. প্র. ২০০৪, পৃ. ১১৪।
৬৬. পিতৃতন্ত্র কাকে বলে? : কমলা ভাসীন; দেবারতি সেনগুপ্ত ও পারমিতা ব্যানার্জ্জী অনূদিত, স্ত্রী, ১৬ সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কোলকাতা-২৬, প্র. প্র. সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৪৪।
৬৭. প্রসঙ্গ : প্রমীলা; সুমনা ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।
৬৮. প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য : সুকুমারী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, দ্বি. সং মাঘ ১৩৯৬।
৬৯. পাশ্চাত্যে নারী আন্দোলন : পূরবী রহমান, সাহিত্য প্রকাশ, পুরাণা পল্টন, ঢাকা।
৭০. প্রান্তিক সমাজ ও একটি কালো মেয়ে : কৃষ্ণা লোধ, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটরস্, কোলকাতা, প্র. প্র. জানুয়ারী ২০০১।
৭১. প্রসঙ্গ নারী : মিজান রহমান, সন্দেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা।

৭২. বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারী সমাজ : ড. সুতপা মুখোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা।
৭৩. বৈদিক নারী : ড. ক্ষিতিমোহন সেন, কোলকাতা।
৭৪. বাঙ্গালার নারী নিগ্রহ : পণ্ডিত শ্রী শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী সম্পাদিত, মডেল পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, প্র. মু. ১৩৪৩, দ্বি. সং ১৯৯৪, পৃ. ১৫২।
৭৫. বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন : সোনিয়া নিশাদ আমিন, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৭৬. বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি : জীবনের দামে কেনা জীবিকা, কুর্‌রাতুর-আইন-তাহমিনা ও শিশির মোড়ল, শেড, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০০।
৭৭. বাংলাদেশে নারী নির্যাতন : বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জারিনা রহমান সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্র. প্র. ১৯৯৩।
৭৮. বাংলার নারী আন্দোলন : মালেকা বেগম, ইউ. পি. এল., ঢাকা, দ্বি. সং. ২০০২।
৭৯. বঙ্গের মহিলা কবি : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এ মুখার্জ্জী এ্যান্ড কোং লিঃ, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৩৬০।
৮০. বাংলাদেশের নারী ও সমাজ : সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্র. প্র. মে ২০০৪, পৃ. ৩১০।
৮১. বামফ্রন্ট সরকার ও নারী সমাজ : কনক মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬।
৮২. বিশ্বায়ন ও নারী : শ্যামলী গুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য, ঈষিতা মুখার্জ্জী সম্পাদিত, এন. বি. এ, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, প্র. প্র. ২০০৪, পৃ. ৯৭।
৮৩. বহুকৌণিক দৃষ্টিপাতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নারী : সম্পাদনা : রত্না গুপ্তা, কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯০, পৃ. ১৭৫।
৮৪. বাংলাদেশের মেয়ে শিশু : সেলিনা হোসেন, মাওলাব্রাদার্স, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০২, পৃ. ২৯৯।
৮৫. বাংলা নাটকে নারী, পুরুষ ও সমাজ : সাজেদুল আউয়াল, অনন্ত প্রকাশন, ঢাকা, প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৯৯, পৃ. ১৬০।
৮৬. বাংলাদেশের নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ : কে মমতাজ ও এফ শহীদ, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র : ঢাকা, প্র. প্র. ১৯৮৯।
৮৭. বাংলার ইতিহাসে নারীর ভূমিকা ও সংগ্রাম : আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, গণ উন্নয়ন পর্ষৎ, কোলকাতা, প্র. মু. এপ্রিল ১৯৯২।
৮৮. বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে : আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৮৯. বাংলাদেশের নারী : বেবি মওদুদ, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০১।
৯০. বাঙালী জীবনে রমণী : নীরদ সি চৌধুরী, মিত্র, ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা।
৯১. বাংলা কাব্যধারা : নারী মনীষা : পরিমল চক্রবর্তী, প্যাপিরাস, ২ গগনেন্দ্র মিত্র লেন, কোলকাতা-৪।
৯২. বাঙালী নারী : মাহমুদ শামসুর হক। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০০।
৯৩. বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক : রমেন চৌধুরী, কোলকাতা।
৯৪. বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী মহিলা কর্মী : সুনীলময় ঘোষ। সাহিত্যম, কোলকাতা।
৯৫. বিপন্ন নারী : হাসিনা আখতার, সন্দেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা।

৯৬. বিবি থেকে বেগম : আকিমুন রহমান, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০১।

৯৭. বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ; আল মাসুদ হাসানুজ্জামান। ইউ. পি. এল, ঢাকা।

৯৮. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য, মোতাহার হোসেন সূফী, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৯৯. ভারতীয় সমাজে প্রান্তবাসিনী : বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে বারাঙ্গনা : সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও রমলা দেবী; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৩৯২।

১০০. ভারত ইতিহাসে নারী : সম্পাদনা-রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৮৯।

১০১. ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা : ১৯৪০-১৯৫০, রেণু চক্রবর্তী, মনীষা, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৮০।

১০২. ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা : ঐ, ঐ, প্র. প্র. ১৯৮৫, পৃ. ৪০।

১০৩. মধ্যপ্রাচ্য : নারী নির্যাতন : আজার তাবারী, ম্যাক্সিম মলিনিউ, নিরা যুভাল-ডেভিস, অনুবাদ : রেহনুমা আহমেদ, মিলু সামসুন নাহার, সুরাইয়া হোসেন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১১০১ কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্র. প্র. ১৯৮৪, পৃ. ৬১।

১০৪. মেয়েলি পাঠ : সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপনী, প্র. প্র. জানুয়ারী ২০০০।

১০৫. মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয় : প্রফেসর গুলাম আযম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, তৃ. সং, মে ১৯৯৩।

১০৬. মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি : কনক মুখোপাধ্যায়, ঐ, প্র. প্র. জুন ১৯৭৫, পৃ. ৩২।

১০৭. মেয়েদের আইন : মৃদুল শ্রীমানী, পত্রলেখা, কোলকাতা।

১০৮. মানবী চেতনা : বিশ্বায়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রদীপ দাশগুপ্ত, অমৃতলোক, মেদিনীপুর।

১০৯. মহিলাদের আইন ও আইনী অধিকার : রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, পুনশ্চ, কোলকাতা।

১১০. মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী : মহ: শফিককুল্লাহ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

১১১. মুক্তিযুদ্ধ ও নারী : ড. শওকত আরা হোসেন, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০১।

১১২. মধ্য বয়সের সঙ্কট : মীনা ফারাহ, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০৩।

১১৩. মুক্তিমঞ্চে নারী : নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১১৪. মহাভারতের দর্পণে ভারতীয় নারী : শংকর শীল, নবজাতক প্রকাশন, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৭।

১১৫. মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে নারীচরিত্র : ড. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পুঁথি, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯১, পৃ. ১৩৪।

১১৬. যুগবিবর্তনের নারীত্বের অবমূল্যায়ন : সত্যাচরণ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দময়ী প্রকাশনী, গুড়াপ, হুগলী, প্র. প্র. ১৯৯৬, পৃ. ১৭৫।

১১৭. রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর, গোলাম মুর্শিদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্র. প্র. মে ১৯৯৩, পৃ. ১৭৫।

১১৮. রাজনীতি ও নারীশক্তি : ক্ষমতায়নের দিগন্ত, কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, প্র. সং. ২০০২, পৃ. ২০৮।

১১৯. রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয় : রিটাকেলি ও মেরি বুটিলিয়ার, অনুবাদ : নূরুল ইসলাম খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্র. প্র. ১৯৯১।
১২০. রোকেয়া : কালে ও কালোত্তরে : মোর্শেদ শফিউল হাসান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
১২১. লীলা রায় ও বাঙলার নারী জাগরণ : দীপঙ্কর মোহান্ত, সাহিত্য প্রকাশ, পুরাণা পল্টন, ঢাকা।
১২২. শ্রমিক নেত্রী সন্তোষ কুমারী : মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, কোলকাতা।
১২৩. শত বিদুষী নারী : ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।
১২৪. সংরক্ষিত মহিলা আসন : সরাসরি নির্বাচন : মালেকা বেগম, অন্য প্রকাশ, ৬৯/এফ গ্রীণ রোড, পান্থপথ, ঢাকা।
১২৫. সতী : স্বপন বসু, পুস্তক বিপনী, কোলকাতা, প্র. প্র, মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ২০৪।
১২৬. সংকোচের বিহ্বলতা : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া : ১৮৪৯-১৯০৫; গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্র. প্র. ১৯৮৫।
১২৭. সমতার দিকে আন্দোলনে নারী : প্রথম পর্ব : শাশ্বতী ঘোষ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, প্র. প্র. জুন ১৯৯৯, পৃ. ১২১।
১২৮. সমাজতন্ত্রই নারীমুক্তির একমাত্র পথ : কনক মুখোপাধ্যায়, গীতা মুখোপাধ্যায়, গীতা সেনগুপ্ত, অপরাজিতা গোপ্পী, মালিনী ভট্টাচার্য, বৃন্দা কারাত, মঞ্জুরী গুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ৩১ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কোলকাতা-১৬, প্র. প্র. ১৯৯৫, পৃ. ৪৮।
১২৯. স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী . কমলা দাশগুপ্ত, কোলকাতা।
১৩০. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী : মতাদর্শ ও বাস্তবতার মধ্যে দূরত্ব, মিনু সামসুন নাহার, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা, প্র. প্র. ১৯৮৮।
১৩১. স্পন্দিত অন্তর্লোক : গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা।
১৩২. স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ : মল্লিকা সেনগুপ্ত, আনন্দ, কোলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৯।
১৩৩. সাহিত্য সংস্কৃতি ও নারী সমাজ : অনুশীলা দাশগুপ্ত, নবজাতক প্রকাশন, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কোলকাতা।
১৩৪. হিন্দুনারীর অধিকার ও পারিবারিক আইন : নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইংরেজী :

1. A Study of Women in Administration : A Situational Analysis : Shanta Kohli Chandra, 1997, xiii, P-231.
2. A Study of Women of Bengal : Sankar Sengupta, Indian Publications, Kolkata.
3. Arguing with the Crocodile : Gender and Class in Bangladesh : Sarah C White, U.P.L. Matijhil, Dhaka.
4. Against our will : Men, Women and Rape : Susan Brownmiller. New Yourk, Bantam, 1976.
5. Atrocities on Indian Women : Dipangshu Chakraborty, 1999, xiii, P-197.
6. Awareness of Women's Rights : Projection in Mass Media : P. K. Kar and P. P. Panda. New Delhi, Dominant, 2005, ix, P-346.
7. Balancing the Load : Women, Gender Focus (2nd ed.) : Raana Haider, U.P.L. Matijhil, Dhaka.
8. Belonging to Others : Cultural Construction of Womanhood Among

Muslims in a Village of Bangladesh: Kotalova, Uppsala: Uppsaia University.
9. Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society: Fatima Mernissi, Indian University Press, Bloomington.
10. Between Conformity and Resistance: Women Garment Workers in Bangladesh; Petra Dannecker, U.P.L., Matijhil, Dhaka.
12. Bangladeshi Women Workers and Labour Market Decisions: The Power to choose: Naila Kabeer. New Delhi, Vistaar, 2001, xvi, P-464.
13. Behind closed Doors: Domestic Violence in India: Rinki Bhattacharya (ed.), New Delhi, Sage, 2004, P-234.
14. Beyond the Courtyard: A Sequel to Unveilling India: Anees Jung, New Delhi, Viking, 2003, xiv, P-160.
15. Beyond the Veil: India Women in the Raj: Pran Nevile, New Delhi, Nevile Books, 2000, P-143.
16. Changing Family Roles and Feminism: Man Singh Das and Vijay Kumar Gupta (ed.), 1996, P-145.
17. Concepts In Feminist Theory, Consensus and Controversy: Amrita Chhachhi,
18. Communism in the Indian Women's Movement, 1940-1950: Renu Chakravorty, New Delhi, 1980.
19. Challange to women: Rajkumari Amrit Kaur. Allahabad, 1946.
20. Crime Against Women: Socio Legal Aspects: Suman Nalva, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
21. Challenges To The Fair Sex: Indian Woman Problems. Plights and Progresses: J. L. Gupta, B. P. Garg for Gyan Books, Delhi.
22. Canadian Women Studies: Ratnabali Chatterjee.
23. Changing Status of Women in India: Sangeeta Nagaich, 1997, xv, P-238.
24. Communication and Empowerment of Women: Strategies and Policy Insights from India: Kiran Prasad (ed.), Delhi, Women Press, 2004, 2 Vols, xxxviii P-678.
25. Conditioning and Empowerment of Women: A Multidimensional Approach: Asha Mukherjee and Kumkum Bhattacharya (ed.), New Delhi, Gyan Pub. 2003, P-242.
26. Contemporary Feminist Perspectives: Meghna Guhathakurta (ed.), Dhaka, University Press Limited, 1997, P-64.
27. Communism and Women: Vimala Farooqi and Renu Chakravarty, Communist Party Publication. New Delhi, August 1973, P-48.
28. Coping with Role Conflicts: Employed Married Women: Sandhya Narang, 1996. P-156.
29. Crossing the Sacred Line: Women's Search for Political Power: Abhilasha Kumari and Sabina Kidwai, 1998, P-226.
30. Crime Against Women: R. K. Dutta, New Delhi, Reference Press, 2003, viii, P-304.
31. Crimes Against Women and Protective Laws: Shobha Saxena, 1995, xxvii, P-448.

32. Crime Against Women ; Udai Veer, New Delhi, Anmol, 2004; ix, P-350.
33. Dalit Women : Issues and Perspective : P. G. Jogdand, Gautam Book Centre, Delhi.
34. Dalit Women : S. K. and Shukla Ghosh, Gautam Book Centre, Delhi.
35. Dalit Women in India : Issues And Perspectives : P. G. Jogdand, B. P. Garg for Gyan Books, Delhi.
36. Devdasi Cult : Jogan Shanker, Gautam Book Centre, Delhi.
37. Dalit Women : Fear and Discrimination : Meena Anand, Delhi, Isha Books, 2005, ix, P-381.
38. Dowry and Inheritance : Issues in Contemporary India : Srimati Basu (ed.) New Delhi Women Unlimited 2005, iii, P-318.
39. Development of Women In Modern India : S Vats and Shakuntala Mudgal (ed.), 1998, 3 vols, P-675.
40. Diserepant Dislocations : Feminism, Theory and Postcolonial Histories : Mary E John, 1996, P-198.
41. Dimentions of Women Exploitation : Meenakshi Malhotra, Delhi, Isha Books, 2004, viii, P-304.
42. Education of Women of S. C. and S. T. : S Ram Sharma, Gautam Book Centre, Delhi.
43. Emancipation and Empowerment of Women : V. Mohini Giri. B. P. Garg for Gyan Books, Delhi.
44. Empowerment of Women : Strategies and Systems for Gender Justice : M. Razia Parvin, New Delhi, Dominent, 2005.
45. Empowerment of Women and Ecological Development : A. Ranga Reddy, Foreward : C. H. Hanumantha Rao, New Delhi, Serials Publications, 2002, P-545.
46. Empowerment of Women and Girl Child : Anupama Bishnoi, Manju Dahiya and Indu Grover, New Delhi, Anmol, 2005, ix, P-110.
47. Empowerment of Women and Politics of Reservation : S. R. Banshi, Jaipur. Book Enclave, 2002, viii, P-264.
48. Encyclopaedia of Gender Equality Through Women Empowerment : Maya Majumder, New Delhi, Sarup and Sons, 2005, 2 vols, xiv, P-572.
49. Encyclopaedia of Indian Women : Anuradha Sharma, 1998, 3 vols, P-796.
50. Encyclopaedia of Indian Women Through the Ages : Simmi Jain, Delhi, Kalpaz, 2003, 4 vols, P-1228.
51. Encyclopaedia of Violence Against Women and Dowry Death in India : Kalpana Roy, 1999, 3 vols, P-904.
52. Encyclopaedia of Women as Human Resource in 21 Century and Beyond : S. Wal and Shruti Banerji, Delhi, Sarup, 2001, 4 vols, P-1118.
53. Feminist Politics and Human Nature : Alison Jagger. New Jersey, Rowman and Allanheld, 1993.
54. Female Exploitation and Women's Emancipation : Latika Menon, Reprint, New Delhi, Kanishka, 2004, vii, P-326.
55. Feminism : An Essential Reading : R. C. Gettel and W A. Dunning, New Delhi, Cosmo, 2004, vi, P-338.

82. History of Feminism : Joan Wallach Scott, Oxford University Press.
83. Harijan Women In Independent India : P. Nirmala Bhai, Gautam Book Centre, Delhi.
84. Human Rights of Women : Ashine Roy, New Delhi, Rajat Publications, 2003, vi, P-302.
85. Indian Feminisms : Jasbir Jain and Avadhesh Kumar Singh, New Delhi, Creative Books, 2001, P-234.
86. Indian Women from Darkness to Lights : Stories of Oppression, Exploitation, Reaction, Resistance and Choice : Shoma A. Chatterji, Kolkata, Parumita Publications : 2000, P-226.
87. Indian Women : From Pardah to Moderanity : B. K. Nanda, Ed., Radiant Publications, New Delhi, 1995.
88. Indian Women's Battle for Freedom : Kamala Devi Chattopadhyay, Abinav Publications, 1983.
89. In the Name of Justice : Women and Law in Society : Swapna Mukhopadhyay (ed.) U.P.L., Matijhil, Dhaka.
90. Israeli Women : The Reality Beyond the Myth : Lesley Hazleton, Jerusalem, Indanim Publication, 1978.
91. Introducing Post Feminism : Sophia and Rebecca, UK and USA, leon Books, Totem Books.
92. Indian Women : Society and Law, Educational and Empowerment, Work and Development : Anita Arya, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
93. International Womens Year and Ourselves : Kanak Mukharjee. NBA. Kolkata-73.
94. Islam and Women : Raj Pruthi and Bela Rani Sharma, 1995, P-256.
95. Islam, Women and Gender Justice : Asghar Ali Engineer, New Delhi, Gyan, 2001, P-370.
96. Issues on Enpowerment of Women : Utpal Kumar De and Bhola Nath Ghosh, New Delhi, Mohit Pub. 2004, xix, P-407.
97. Kanya : Exploitation of Little Angels : V. Mohini Giri, B. P. Garg fas Gyan Books. Belhi.
98. Kali's Yug : Empowerment, Law and Dowry Deaths : Rani Jethmalani, 1995, P-158.
99. Liberation of Muslim Women : Naseem Ahmad, Delhi, Kalpaz, 2001, P-330.
100. Literacy and Empowerment : Venkatesh B. Athreya and Sheela Rani Chunkath, 1996, P-229.
101. Muslim Women : Emergins Identity : Saukath Azim, 1997, P-232.
102. Muslim Women's Straggle For Freedom in Colonial Bengal. 1873—1940 : Anowar Hossain, Progressive Publication, 37A College Street, Kolkata-73.
103. Muslim Women in North India : Shahida Lateef, New Delhi.
104. Muslim Women and Law : Archna Chaturvedi, New Delhi, Commonwealth,
105. Muslim Women From Tradition to Modernity : Archna Chaturvedi, New

Delhi, Commonwealth, 2004, v, P-261.
106. Nationalism, Social Reform and Indian Women: 1921—1937: Radha Krishna Sharama, Janaki Prakashan. Patna, New Delhi, 1981, P-198.
107. Psychology of Woman: Juanita H Williams, W W Norton and Company, New York, 1977.
108. Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in Bangladeshi Village: Shanti Rozario, London, Zed Books Ltd.
109. Position of women in Hindu Civilization: A. S. Altekar, Motilal Banarsidass, Delhi.
110. Problems and Potentials of Women Professionals: Anima Sen, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
111. Political Participation of Women in West Bengal—A Case Study: Dr. Jayasri Ghosh. Progressive Publishers. 37A College Street. Kolkata-73.
112. Participation of Women in the Panchayati Raj System: G. S. Mehta, New Delhi, Kanishka Pub., 2002, viii, P-205.
113. Patterns of Gender Violence: Sushma Yadav and Anil Dutta Mishra, New Delhi, Radha Publications, 2002, vii, P-236.
114. Political Empowerment of Women: Snehalata Panda, Delhi, Raj Publications, 2002, vi, P-250.
115. Problems of Women's Marriage and Violence: Veena Pani Pandey, New Delhi, Mohit, 2002, viii, P-252.
116. Professional Women: Family Conflicts and Stress: Poonam Arora, New Delhi, Manak, 2003, x, P-283.
117. Progressive Women and Political Identity: Arati Mehta, Reprint, New Delhi, Kanishka, 2004, viii, P-354.
118. Purdah: An Anthology: Eunice De Souza, New Delhi, Oxford University Press, 2004, xxi, P-552.
119. Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in a Bangladeshi Village: Santi Rozario, Dhaka, The University Press, 2001, xxvii, P-200.
120. Raising the Status of Women through Law: The Case of Israel: Prenia Lahar, 1977.
121. Rape: An Historical and Cultural Enquiry: Tomaselli Sylvana and Ray Porter, Basil, Blackwell, New York, 1986.
122. Roll and Status of Women in India: Renuka Ray and others, Firma KLM Private Ltd, Kolkata, 1978, P-167.
123. Recasting Women: Partha Chatterjee
124. Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization 1849-1905: Golam Murshid, Sahitya Samsad, Rajshahi, 1983.
125. Social Mobility among S. C. Women: Dr. Leela Vishavanath, Gautam Book Centre, Delhi.
126. Sati: Saga of a Glory Practice: A. K. Biswas, Gautam Book Centre, Delhi.
127. S. C. Girls: Educational Backward And Prospects: Lalita Kabra. Gautam Book Centre, Delhi.

128. Scheduled Caste Women : P. C. Jain. Gautam Book Centre, Delhi.
129. Sexual Behaviour in the Human Female : Kinsey, A C, Pomeruy, W. B. and Marti, CE, WB Saunders : Phildelphia, Kolodny, Annette.
130. Sexual Politics : Kate Millet, Abacus; London.
131. Speaking Out : Women's Economic Empowerment in South Asia : Marilyn Carr et al (ed.), U.P.L., Matijhil, Dhaka.
132. Sexual Textual Politics : Feminist Literary Theory : Toril Moi, Routledge, 1985.
133. Socio-Psychological Dimentions of Women Education : S. S. Mathur, Anju Mathur, B. P. Garg for Gyan. Books, Delhi.
134. Scheduled Caste Women : P. C. Jain, Shashi Jain and Sudha Bhatnagar, 1997, vi, P-268.
135. Sexuality, Obscenity, Community : Women, Muslims, and the Hindu Public in Colonial India : Charu Gupta, Delhi, Permanent Black, 2001, xv, P-388.
136. Shadow Lives : Writings on Widowhood : Uma Chakravarti and Preeti Gill, New Delhi, Kali for Women, 2001, xii, P-489.
137. She Comes to Take Her Rights : Indian Women, Property, and Propriety : Srimati Basu, New Delhi, Kali for Women, 2001, xiv, P-305.
138. Shifting Sands : Women's Lives and Globalization, Kolkata, Stree, 2000, xv, P-326.
139. Social Status of Women in India : Maya Majumdar, New Delhi, Dominant, 2004, xii, P-316.
140. Status of Girl Child and Women in India : Niranjan Pant, 1995, xxxiii, P-175.
141. Status of Muslim Women in India : Hajira Kumar, Delhi, Aakar Books, 2002, P-127.
142. Status of Tribal Women : Work Participation and Decision-Making Role in Tribal Society : Neeta Lodha, Jaipur, Mangal Deep, 2003, xii, P-420.
143. Status of Women in Islam : Muniruddin Qureshi, New Delhi, Reference Press, 2003, x, P-366.
144. Status of Women in Islamic Society : Afsar Bano, New Delhi, Anmol, 2003, 2 vols, P-911.
145. Suppressed Womanhood : A Cry for Rights : Nilaufer John, New Delhi, Dominant Pub. 2003, viii, P-286.
146. Some Questions on Feminism and its Relevance in South Asia : Kamla Bhasin and Nighat Said Khan. New Delhi, Kali for Women, 1986.
147. Terror, Counter-Terror : Women Speak Out : Ammu Joseph and Kalpana Sharma, New Delhi, Kali for Women, 2003, xxiii, P-284.
148. The Struggle to be Human : Women's Human Rights : Saroj Iyer, Bangalore, Books for Change, 1999, xviii, P-107.
149. The Political Economy of Dowry : Institutionalization and Expansion in North India : Ranjana Sheel, 1999, P-229.
150. The Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000 : The Challenge Ahead : Jasodhara Bagchi (ed.), New Delhi, Sage, 2005, P-264.

151. The Changing Half: A Study of Indian Muslim Woman: Sabina Sussain, 1998, P-165.
152. The Better Half: Mothers, Sisters, Wives and Homemakers: Sumita Karmakar, New Delhi, Dominant 2001, vi, P-309.
153. The Development of Women's Education in India: A Collection of Dacuments 1850-1920; Sabyasachi Bhattacharya, Joseph Bara, Chinna Rao. Yagati and B.M. Sankhdher, New Delhi, Kanishka 2001, xxvi, P-562.
154. Towards Equality: Report of Committee on the Status of Women in India, Govt of India, Ministry of Education and Social Welfare, 1974.
155. The National Perspective Plan for Women 1988-2000: Report of the core group set up by the Department of Women and Child Development, New Delhi, 1988.
156. The Creation of Partriarchy: Gerda Lerner, Oxford and New Yourk, Oxford University Press, 1986.
157. Theorising Partriarchy: Sylvia Walley, Oxford, Basil Blackwell, 1990.
158. The Elusive Agenda: Mainstreaming Women in Development: Rounaq Jahan, U.P.L. Matijhil, Dhaka.
159. The Working Women and Papular Movements in Bengal: Sunil Sen, K. P. Bagchi, Kolkata, 1985.
160. The Socio-legal Status of Bangali Women in Bangladeshi Implications for Development: Saira Rahman Khan, U.P.L., Matijhil, Dhaka.
161. The History of Doing: An Illustrated Account of Movement for Women Rights and Feminism in India, 1800-1990: Radha Kumar, Kali for Women, New Delhi, 1993.
162. The Fifty Percent: Women in Development and Policy in Bangladesh: Salma Khan, U.P.L. Matijhil, Dhaka.
163. The Power to Choose: Bangladeshi Women Workers and Labour Market Decisional: Naila Kabeer, U.P.L. Matijhil, Dhaka.
164. Theories of Feminist Criticism: Josephim Donovan, Exploration in Theory, Lexington.
165. The Harim and the Purdah: Studies on Oriental Women: Elizabeth Cooper, Bimda Publishing House, New Delhi, 1915.
166. The Women, Gender and Development Reader: Nalini Visvanathan et al. U.P.L. Matijhil, Dhaka.
167. The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature and theory: Elaine Showalter, Pantheon Books, New York, 1985.
168. The Subjection of Women: John Stuart Mill.
169. The rights and Wrongs of Women: Mitchell, Juliet and oakley, Penguin Books.
170. The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905, Princeton 1984: Meredith Borthwich.
171. Tribal Woman Labourers: Aspects of Economic and Physical Exploitation: Sushama Sahay Parsad. B.P. Garg for Gyan Books, Delhi.
172. The Poverty-Purdah Trap in Rural Bangladesh: Implications for Women's Roles in the Family: Sajeda Amin, New York. The Population Council.

173. The Descent of Women: Elaine Morgan, The classical Study of Evolution. London, Souvener Press.
174. The Position of Indian Women in the Light of Legal Reform: Almenas-Lipowsky. J. Angeles, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden.
175. The Changing Role of Women in Bengal: Meredith Borthwick. Princeton University Press. Princeton, M. J.
176. The Second Sex: Simone de Beauvoir, Penguin Books.
177. The Indian Women: Myth and Reality: J. P. Singh. B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
178. The Encyclopaedia of Women's Studies: Giriraj Shah. B. P. Garg for Gyan Books, Delhi.
179. Towards a Feminist Poetics: Elaine Showalter. Women writting about women. Jacobus.
180. Unfolding Colours: Embroidery Work, Women and Patriarchy in Eastern Uttar Pradesh: Sayantani Jafa. Progressive Publishers, 37A College Street, Kolkata-73.
181. Unorganised Women Labour in India: S. N. Tripathy, 1996, P-148.
182. Violence Against Women: M. K. Roy, Delhi, Commonwealth, 2000, P-333.
183. Violence Against Women: Ram Ahuja, 1998, P-310.
184. Violence Against Women: Yudhistar Kahol, New Delhi, Reference Press, 2003, x, P-334.
185. Violence Against Women: Ashine Roy, New Delhi, Rajat Pub, 2003, viii, P-301.
186. Violence Against Women: Human Rights Perspective: K. Uma Devi, New Delhi, Serials, 2005, viii, P-207.
187. Violence Against Women: A Popular Intervention: Edited by Ishita Mukhopadhyay. Progressive Publishers. 37A College Street. Kolkata-73.
188. Violence and Protective Measures for Women Development and Empowerment: Aruna Goel, New Delhi, Deep and Deep, 2004, xviii, P-396.
189. Violence Against Women: Dynamics of Conjugal Relations: Madhurima, B.P. Garg for Gyan Books, Delhi.
190. Vindication of the Rights of Woman: Mary wollstonecraft, Penguin Books, 1792.
191. Women, Gender Equality and the State: Sadhna Arya, Delhi, Deep and Deep, 2000, P-324.
192. Women: Human Rights, Religion and Violence: Reicha Tanwar, 1998, P-241.
193. Women, Law and Public Opinion: Krishna Gupta, Delhi, Rawat, 2001, P-228.
194. Women, Law and Free Legal Aid in India: Roma Mukherjee, 1998, xix, P-359.
195. Women Legislators in Indian Politics: Pitam Singh, New Delhi, Concept Pub, 2003, xvi, P-195.

196. Women Parliamentarians of India: Shanta Bhatt, 1995, P-225.
197. Women Police in India: Om Raj Singh Vishnoi, 1999, P-208.
198. Women Power in India: Premlata Pujari and Vijoy Kumari Kaushik, 1994, 3 vols, P-1201.
199. Women, Social Justice and Human Rights: V. V. Devasia and Leelamma Devasia, 1998, xviii, P-297.
200. Women Through Ages: S. Ram, New Delhi, Commonwealth, 2004, vii, P-544.
203. Women Under Primitive Buddhism: Laywomen and Almswomen: I. B. Horner, Reprint, 1999, P-391.
204. Women and Depressed Caste Population in India: B. B. Mathur, 1994, xx, P-304.
205. Women and Human Rights in India: Rachana Kaushal, 2000, x, P-150.
206. Women and Law in India: An Omnibus Compresing: Introduction by Flavia Agnes, New Delhi, Oxford University Press, 2004, P-676.
207. Women and Law: Muslim Personal Law Perspective: Khan Noor Ephroz, New Delhi, Rawat, 2003, P-390.
208. Women and Politics in India: Impact of Family and Education on Women Political Activists: Bhawana Jharta, 1996, xiv, P-242.
209. Women and Problems of Gender Discrimination: H. C. Upreti and Nandini Upreti, Jaipur, Pointer, 2000, xii, P-216.
210. Women as Devadisis: Origin and Growth of the Devadasi Profession: Kakalee Chakraborthy, Delhi, Deep & Deep, 2000, xi, P-104.
211. Women as Educators: Digumarti Bhaskara Rao, Digumarti Pushpa Latha and Digumarti Harshitha, New Delhi, Discovery, 2001, xvi, P-93.
212. Women in Advertising: Sanjay Kaptan and V. P. Subramanian, Jaipur, Book Enclave, 2001, P-233.
213. Women in Agricultural Development: Indu Grover and Deepak Grover, Udaipur, Agrotech Pub., 2004, P-416.
214. Women in Ancient India: Vedas to Vatsyayana: S. N. Sinha and N. K. Basu, Delhi, Khama, 2002, xix, P-288.
215. Women in Colonial India: Essays on Politics. Medicine and Historiography: Geraldine Forbes, New Delhi, D C Pub, 2005, v, P-214.
216. Women in Contemporary Indian Society: Ashok Kumar, 1993, 2v, P-248.
217. Women in Hindu Social System (1206—1707 A.D.): Kamala Gupta, New Delhi, Inter-India Pub, 2003, P-306.
218. Women in Indian History: Social, Economic, Political and Cultural Perspectives: Kiran Pawar, xv, P-299.
219. Women in Indian National Congress: 1921—1931: Rajan Mahan, Jaipur, 1999, P-352.
220. Women in Indian Politics: Empowerment of Women through Political Participation: Niroj Sinha, New Delhi, 2000, P-302.
221. Women in Indian Religions: Arvind Sharma, New Delhi, Oxford University Press, 2002, vi, P-270.

222. Women in Islam : Naseem Ahmad, New Delhi, A. P. H., 2003, 2 Vols, xxviii, P-987.
223. Women in Islamic Culture and Society : A Study of Family, Feminism and Franchise : Rehana Sikri, 1999, v, P-328.
224. Women in Leading Professions in Middle East : Dolly Sunny, New Delhi, Serials, 2003, xii, P-120.
225. Women's Equality : A Struggle for Survival : Jaya Arunchalam, New Delhi, Gyan Pub, 2005, P-373.
226. Women's Equality in India : A Myth or Reality : K. Uma Devi, Delhi, Deiscovery, 2000, P-179.
227. Women's Health, Public Policy and Community Action : Swapna Mukhopadhyay, Reprint, New Delhi, Manohar, 2001, P-192.
228. Women's Liberation and Human Rights : Asima Sahu, Jaipur, Pointer, 2000, vi, P-216.
229. Women's Movement and Freedom Struggle : Raj Kumar, Rameshwari Devi and Romila Pruthi, Jaipur, Pointer, 2000, P-261.
230. Women's Rights : M. J. Anthony, Gautam Book Centre, Delhi.
231. Women in Crisis : Justice Hari Swarup, B. P, Garg for Gyan Books, Delhi.
232. Women Employees and Rural Development : Problems of Employed Women in Rural Areas : Anuradha Bhoite, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
233. Women and Work : Human Resourse Manageme.ıı Perspective : Anuradha Sharma, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
234. Women and the Wind of Change : Vinita Kaul, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
235. Women : A Feminist Perspective : Jo Freeman, Mayfield Publishing Company, California.
236. Women in the Muslim Uncoscios : Fatia Mernissi, London.
237. Women and Islam : Azizah Al-Hibri, Pergamon Press : Oxford.
238. Women in Pakistan : Tow Steps Forward one Step Back ? : Khawar Mumtaz and Faria Shaheed. London. Zed Books Ltd.
239. Women in India's Freedom Struggle : Manmohan Kaur, New Delhi.
240. Women in Indian Folklore : Sankar Sengupta, Indian Publication.
241. Women's Dialect in Bengali, Jijnasa : Sukumar Sen, Kolkata.
242. Women Through The Ages : V. Janapathy, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
243. Women and Human Rights : Jyotsna Mishra, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
244. Women and Empowerment : Jaya Kothai Pillai, B. P. Garg for Gyan Books, Delhi.
245. Women And Education : R. K. Rao, B. P. Garg for Gyan Books. Delhi.
246. Women of Pakistan : Kishwar Momtaz and Farida Shahid, Zed Books, London.
247. Working with Feminist Criticism : Mary Fagleton. Blackwell Publishers, Oxford.

248. Women in Management Champions of Change : Khair Jahan Sogra (ed.), U. P. L. Matijhil, Dhaka.
249. Women at the Center : Grameen Bank Borrowers after One Decade : Helen Todd, U. P. L. Motijhil, Dhaka.
250. Women Development Workers : Implementing Rural Credit Programmes In Bangladesh : Anne Marie Goetz, U. P. L. Matijhil, Dhaka.
251. Women and Politics : France. India and Russia : Bharati Ray (ed.), K. P. Bagchi and Co, Kolkata, 2000.
252. Women Parliamentarians of India : Shanta Bhatt Shiva Publishers. Distribution, Udaipur, 1995.
253. Women in Panchayati Raj : Susheela Kaushik, New Delhi, 1993.
254. Women in Politics : Forms and Processes : Friedrich Elbert, Stifting, Har Anand Publication, New Delhi, 1993.
255. Women in Peasant Movements : Tebhaga, Naxalite and after : Debal Sinha Roy, Manohar, New Delhi, 1992.
256. We were Making History : Life Stories of Women in the Telengana People's Struggle, Stree Shakti Sangathan, New Delhi, Kali for Women, 1989.
257. Women and Indian Nationalism : Leela Kasturi and Vina Majumder Ed., Vikas, 1984.
258. Women Revolutionaries of Bengal, 1905—1939 : Tirtha Mondal, Minerva, Kolkata, 1991.
259. Women and the Welfare State : Elizabeth Wilson, Tavistock Publications, London, 1977.
260. Women in India's Freedom Struggle : Nawaz B. Mody Ed. Allied Publishers Ltd., Mumbai, 2000.
261. Women in the Tebhagha Uprishing : Rural Poor Women and Revolutionary Leadership, 1946-47 : Peter Custers, Kolkata, 1987.
262. Women in Modern India : Geraldine Forbes, Cambridge University Press, 1996.
263. Women's Health, Public Policy and Community Action : Swapna Mukhopadhyay (ed.), U. P. L. Matijhil, Dhaka.
264. Why Women Count : Essays on Women in Development in Bangladesh : Shamim Hamid, U. P. L., Matijhil, Dhaka.
265. Women : Victims of an Exploitative Economic System and Unjust Social Order : Vimala Farooqui, National Federation of Indian Women Publication. P-45.
266. Women's Emancipation Movement in India : Kanak Mukherjee, N. B. A. Kolkata.
267. Women and Socio-cultural changes : Swati Shirwadkar. B. P. Garg for Gyan Books, Delhi.
268. Women and Politics : Kiran Saxena, B. P. Garg for Gyan Books, Delhi.

রচনার উৎস

১. নারীভাবনার ইতিহাস : কালি ও কলম, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, চৈত্র ১৪১১, মার্চ ২০০৫। মূল প্রবন্ধের শিরোনাম : নারী-ভাবনা : ইতিহাস ও সমীক্ষণ।

২. বঙ্গদেশে নারীভাবনা : উনিশ শতকের দর্পণ, আনিসুজ্জামান, নাজমা জেসমিন চৌধুরী তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১-১৯। মূল প্রবন্ধের শিরোনাম : উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিতে নারী।

৩. ধর্ম ও নারী : জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্‌গীতা, এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ. ১২৮-১৪১। মূল আলোচনার শিরোনাম : ধর্মে নারীর স্থান।

৪. নারী ও প্রতিবিপ্লব : বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার। সপ্তম খণ্ড, অধ্যায় ১৩। পৃ. ২৮২-২৮৯। ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন, ভারত সরকার। বাংলা সংস্করণ। অধ্যাপক আশিস সান্যাল সম্পাদিত।

৫. নারী ও সংস্কৃতি : নির্ভয় করো হে, সেলিনা হোসেন, বইমেলা ১৯৯৮, পৃ. ৩৩-৪৯। মূল প্রবন্ধের শিরোনাম : সংস্কৃতি ও নারী।

৬. নারী নির্যাতন, গণতন্ত্র ও সুশীল সমাজ : বাংলাদেশের নারী ও সমাজ : সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত, মে ২০০৪, পৃ. ৩৯-৪৬।

৭. নারী নির্যাতন : এর শেকড়ের সন্ধানে, সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা, জানুয়ারি ১৯৯১, পৃ. ৭৩-৭৭। এবং শাস্ত্র, সমাজ ও নারীমুক্তি, শাস্ত্র সমাজ ও নারীমুক্তি, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ৪৪-৫৬। দুটি প্রবন্ধের যৌগিকরূপ।

৮. নারী নির্যাতনের ফন্দি-ফিকির : এই সংকলনের জন্য রচিত।

৯. নারী নির্যাতনের সেকাল-একাল : এই সংকলনের জন্য রচিত।

১০. মধ্যপ্রাচ্যের নারীসমাজ ও নারী নির্যাতন : এই সংকলনের জন্য রচিত।

১১. জাতিভিত্তিক নিপীড়ন : নিম্নবর্গের নারী : এই সংকলনের জন্য রচিত।

১২. নারীমুক্তি আন্দোলনের গোড়ার কথা : বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ বিজ্ঞাপন ক্রোড়পত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ মার্চ, ১৯৯৮। পৃ. ১ এবং ২।

১৩. নারীমুক্তি আন্দোলন : একসাথে, শারদ সংখ্যা, ১৩৯১, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ ১৬-২৪। মূল প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল : নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে।

১৪. মার্কসবাদ ও নারীমুক্তি : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, জুন ১৯৭৫, ১-৩২।

১৫. বাংলার নারী প্রগতির ধারা : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর। ভূমিকা, বাংলা একাডেমী, মে ১৯৯৩। পৃ. ৯-৩৬। এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নারীপ্রগতি, জিজ্ঞাসা, ত্রয়োদশ বর্ষ, মাঘ-চৈত্র, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৯৯, পৃ. ৪৫৪-৪৬২। দুটি প্রবন্ধের যৌগিকরূপ।

১৬. নারীর অধিকার ও আইন : এই সংকলনের জন্য রচিত।

১৭. নারীর জন্য আইন : মুক্তি না বন্ধন? অমৃতলোক, নারীবিশ্ব বিশেষ সংখ্যা, ১০৪; জুন ২০০৫, পৃ. ১০৩-১০৯।

১৮. নারী ও তাঁর ক্ষমতায়ন : এই সংকলনের জন্য রচিত।

১৯. **নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন** : নারীর অধিকার আইনে ও বাস্তবে, মঞ্জুরী গুপ্ত, আগস্ট ১৯৮৭, পৃ. ৬১-৬৭। মূল প্রবন্ধের নাম : নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন : আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

২০. **বধূ নির্যাতন, পণপ্রথা ও পণপ্রথাবিরোধী রবীন্দ্রচেতনা** : সম্প্রতিকালের সমাজ রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ, চিত্ত মণ্ডল সম্পাদিত, কলকাতা; মূল শিরোনাম : পণপ্রথা ও পণপ্রথা বিরোধী রবীন্দ্রনাথ।

২১. **ভারতীয় উপমহাদেশে নারী আন্দোলন** : এই সংকলনের জন্য রচিত।

২২. **মেহনতী মানুষের আন্দোলন ও নারীসমাজ**, নতুন চিঠি, শারদ সংখ্যা, বর্ধমান। মূল প্রবন্ধের শিরোনামা : শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের আন্দোলন : নারীসমাজের ভূমিকা।

২৩. **নারী আন্দোলন : দেশ-দেশান্তরে** : এ সংকলনের জন্য রচিত।

২৪. **নারীরা আজো ভালো নেই** : এই সংকলনের জন্য রচিত।

২৫. **নারীবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি** : এই সংকলনের জন্য সংকলিত।

২৬. **পরিশিষ্ট**

দলিল-১, নারী আন্দোলনের সালতামামি, দেশ, ২০ শ্রাবণ ১৪০৭, ৫ আগস্ট ২০০০, পৃ. ৩৭-৩৯।

দলিল-২, বঙ্গদেশে নারীপ্রগতি : একশোটি সোপান, দেশ।

দলিল-৩, আইনে নারীর অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, ২১.৪.১৯৮৪।

দলিল-৪, নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের সনদ, রাষ্ট্রসংঘের ইংরেজি দলিল থেকে সরাসরি অনুবাদ, এই সংকলনের জন্য।

লেখক পরিচিতি

১. রাশিদ আসকারী : গবেষক, প্রাবন্ধিক, লেখক, কলামিস্ট এবং অধ্যাপক।

২. আনিসুজ্জামান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর। বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

৩. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় : জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং শূদ্রমুক্তি, নারীমুক্তি ও আন্তর্জাতিকতার প্রবক্তা। প্রাক্তন কূটনীতিক, গবেষক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর।

৪. ভীম রাও আম্বেদকর : আধুনিক ভারতের এক বিস্ময়কর সমাজ-সংস্কারক ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন ভারতের প্রথম আইন মন্ত্রী ও বিশিষ্ট প্রগতিশীল দলিত বুদ্ধিজীবী।

৫. সেলিনা হোসেন : বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক।

৬. আলি আনোয়ার : লেখক, গবেষক, অনুবাদক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

৭. আহমদ শরীফ : প্রাবন্ধিক, গবেষক, নির্মোহ চিন্তক ও দার্শনিক, পণ্ডিত এবং স্বঘোষিত নাস্তিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও প্রফেসর। প্রয়াত।

৮. চিত্ত মণ্ডল : প্রাক্তন সাংবাদিক, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প আধিকারিক।

৯. সুমনা ঘোষাল : প্রবন্ধকার ও তরুণ গবেষক।

১০. সোমা বসুবিশ্বাস : প্রবন্ধকার।

১১. বঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডল : প্রবন্ধকাব, গবেষক, বুদ্ধিজীবী এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

১২. শ্যামাপ্রসাদ সরকার : বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও প্রবন্ধকার।

১৩. অনিলা দেবী : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং লেখক, বুদ্ধিজীবী। প্রয়াত।

১৪. কনক মুখোপাধ্যায় : বিশিষ্ট মহিলা রাজনীতিবিদ, বাম বুদ্ধিজীবী, লেখক ও প্রবন্ধকার। প্রয়াত।

১৫. গোলাম মুরশিদ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। বিশিষ্ট লেখক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

১৬. রণজিৎ সাহা : প্রবন্ধকার ও বিশিষ্ট আইনজীবী।

১৭. মালিনী ভট্টাচার্য : বিশিষ্ট প্রবন্ধকার, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, প্রাক্তন সাংসদ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা।

১৮. উত্তম বিশ্বাস : লেখক ও গবেষক।

১৯. মঞ্জুরী গুপ্ত : বিশিষ্ট নেত্রী, আইনজীবী, প্রবন্ধকার এবং রাজনীতিবিদ।

২০. প্রথমা রায়মণ্ডল : বুদ্ধিজীবী, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনের বাংলা বিভাগের প্রধান।

২১. নিত্যানন্দ মণ্ডল : প্রবন্ধকার ও গবেষক।

২২. বিমলা রণদিভে : বিশিষ্ট মহিলা রাজনীতিবিদ। প্রয়াত।

২৩. সুপ্রিয় দাস : লেখক ও প্রবন্ধকার।

২৪. অরিজিৎ বসু : তরুণ লেখক ও সাংবাদিক।

২৫. বীথিকা বালা : তরুণ সংকলক।

২৬. শিপ্রা বিশ্বাস : খণ্ডকালীন অধ্যাপক ও সংকলক।

পরিশিষ্ট : কিছু নথি

দলিল-১ নারী আন্দোলনের সালতামামি ● দলিল-২ বঙ্গদেশে নারীপ্রগতি : একশোটি সোপান ● দলিল-৩ আইনে নারীর অধিকার ● নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের সনদ



'রাষ্ট্র নারীদের বিরুদ্ধে সবরকমের বৈষম্যকে অপরাধমূলক কাজ হিসেবে গণ্য করেছেন এবং অবিলম্বে নারীদের বিরুদ্ধে সকল বৈষম্য দূর করার জন্য সর্বপ্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণ করতে স্বীকার করেছেন।'

দলিল-১

নারী আন্দোলনের সালতামামি

নারীর অধিকার, সমাজে তার সম্মানজনক অবস্থান আজ স্বীকৃত সত্য। কিন্তু এই স্বীকৃতি তাকে অর্জন করতে হয়েছে অনেক পথ পেরিয়ে। প্রথমে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে কয়েকজনের কণ্ঠে। সেই স্ফুলিঙ্গ ক্রমে ক্রমে আগুনের আকার নিয়েছে। শতকণ্ঠে গর্জে উঠেছে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ। নারীর প্রতি অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্যের বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ। সম্মিলিত এই গর্জনকে উপেক্ষা করা যায়নি। নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার দিতেই হয়েছে। দুই শতকেরও বেশি সময় জুড়ে এই আন্দোলন নারীর স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করল। সংগ্রামের পুরোভাগে যেমন ছিলেন বিশিষ্টজনেরা তেমনই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে তাকে সমর্থন জানিয়েছেন নাম না জানা বহু মানুষ। ভারতবর্ষে 'সতীদাহ বিলোপ', 'বিধবাবিবাহ' বা 'নারীশিক্ষা' প্রসারের কাজ শুরু হয় ঊনবিংশ শতকে—রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা বেথুনের মতো মহাপুরুষের হাত ধরে। পশ্চিমে এই আন্দোলনের সূচনা হয় আরও আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। সময় যাই হোক না কেন, কী পাশ্চাত্যে, কী প্রাচ্যে সে-কাজ থেমে থাকেনি। বলা যায় আজও চলছে। এই সংকলন নারী আন্দোলনের এই দীর্ঘ ইতিহাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার রূপরেখা।

ভারতবর্ষের ঘটনাবলী

১৮১৮ : রামমোহন রায়ের সহমরণ বিষয়ক 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশিত।

১৮১৯ : কলকাতার গৌরীবাড়িতে বাঙালি মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। একই সালে রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশিত হয়।

১৮২৯ : ৪ ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা রদবিধিতে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সতীদাহ নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

১৮৪৯ বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারীশিক্ষার সূচনা। মে মাসে জে. ই. ডি. বেথুন কলকাতায় স্থাপন করলেন ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল, পরে যেটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৫৫ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক) প্রকাশিত।

১৮৫৬ : ২৬ জুলাই, বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়। বঙ্গমহিলা রচিত সর্বপ্রথম পুস্তক কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশিত। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হিসাবে পুত্রের সঙ্গে কন্যার স্বীকৃতি লাভ।

১৮৬৩ : 'বামাবোধিনী' পত্রিকার প্রকাশ। প্রধান উদ্যোক্তা ও সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত। উদ্দেশ্য ছিল অন্তঃপুরের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

১৮৬৮ রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন', বাঙালি মহিলার লেখা প্রথম আত্মজীবনী। (মতান্তরে ১৮৭৬)

১৮৮২ মহারাষ্ট্রীয় নারীবাদী পণ্ডিতা রমাবাঈ কর্তৃক 'আর্য মহিলা সমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা। (মতান্তরে ১৮৮১)

১৮৮৩ : বাংলার প্রথম দুই মহিলা স্নাতক। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখী বসু।

১৮৮৬ : স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখী সমিতি' স্থাপিত হয়। এটিই বাংলার প্রথম মহিলা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।

১৮৯১ : সহবাস সম্মতিসূচক আইন (Age of Consent bill) পাশ।

১৯০৪ : বেগম রোকেয়ার বিপ্লবী প্রবন্ধ 'আমাদের অবনতি' প্রকাশিত হয় নবনূর পত্রিকায়।

১৯১০ : ভারতে পর্দানশিন মহিলাদের শিক্ষার জন্য সরলা দেবী 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' স্থাপন করেন।

১৯১৩ : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হয়।

১৯২০ : ভারতীয় নারীদের প্রথম ভোটাধিকার লাভ মাদ্রাজ প্রদেশে। ১৯২১-এ বম্বেতে এবং বাংলায় ১৯২৫-এ।

১৯২৭ : অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স (AIWC)-এর প্রতিষ্ঠা, যার প্রথম অধিবেশনটি হয় পুনেতে।

১৯২৯ : বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন (সরদা আইন) পাশ হয় যার ফলে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৪ এবং ছেলেদের ১৮ ধার্য হয়।

১৯৪৩ : ৭-৮ মে, কলকাতার ওভারটুন হলে প্রথম প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রী ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

১৯৫৫ : হিন্দু বিবাহ আইন পাশ।

১৯৬১ : পণ প্রতিষেধ আইন (Dowry Prohibition Act) বলবত হয় যাকে পরবর্তীকালে ১৯৮৪ এবং ১৯৮৬ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে আরও কার্যকরী ক[illegible] তোলা হয়েছে। অবশ্য বেশ কয়েকটি রাজ্যে পণপ্রথা এখনও ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে।

১৯৭১ : মেডিক্যাল টারমিনেশন অব প্রেগন্যান্সি আইন বলবত। শারীরিক প্রয়োজনে এবং অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ হয়।

১৯৭৪ : স্টেটাস কমিটির রিপোর্ট 'Towards Equality'-র প্রকাশ। 'মথুরা রেপ কেস' (১৯৭২) সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিবাদে দেশব্যাপী নারী আন্দোলন।

১৯৭৬ : নারী শ্রমিকের পুরুষের সমান মজুরি পাওয়ার দাবি স্বীকৃত হয়েছে।

১৯৮৩ : রেপ বিল সংশোধন করা হয়। বিচার হবে বদ্ধ ঘরে এবং নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করা হবে না।

১৯৮৬ : ঐতিহাসিক শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক ও প্রতিরোধের সৃষ্টি হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'মুসলমান মহিলাদের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা'— 'The Muslim Women (Protection of rights on divorce) Bill' নামক বিলটি পাশ হয়। ১৯৮৫ সালের ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় ভূপাল হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে শাহবানুকে প্রতিমাসে ২৫ টাকার পরিবর্তে ১৭৯.১০ টাকা খোরপোষ পাবার অধিকার দান করে। এর বিরুদ্ধে মৌলবাদীরা যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তার কাছে তৎকালীন সরকার এমনকি শাহবানু পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং নতি স্বীকারেরই ফল হল উপরোক্ত আইনটি।

১৯৮৭ : ৪ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের দেওরালায় ১৮ বছরের রূপ কানোয়ার 'সতী' হলেন। এরপর প্রবল জনমতের চাপে পড়ে ভারত সরকার ১৯৮৭ সালেই সতীদাহ প্রতিযেধ আইন পাশ করে। 'সতী' হওয়ার চেষ্টা করা কিংবা এই প্রথা চালু রাখার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ

নেওয়া, দুই-ই এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়।

১৯৯১ . জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হল।

১৯৯৭ : ১৩ আগস্ট। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রায় দান করে।

১৯৯৯ : ১৮ ফেব্রুয়ারি, নাবালক সন্তানের ওপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকারকে স্বীকৃতি দিল সুপ্রিম কোর্ট।

২০০০ : কলকাতা হাইকোর্ট বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মুসলমান মহিলাদের পুনর্বিবাহ না করা পর্যন্ত খোরপোষ পাবার অধিকারের পক্ষে রায় দান করে। এই রায়ের ফলে পরবর্তী বিবাহ-বিচ্ছেদপ্রাপ্ত মুসলমান মহিলারা, 'The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Bill', বলবৎ থাকা সত্ত্বেও, 'ইদ্দৎকাল'-এর পরেও খোরপোষ পেতে পারেন।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী

১৭৯২ : মেরী উলস্টোনক্রাফটের 'A Vindication of the Rights of Women' নামক গ্রন্থের প্রকাশ। বইটির প্রকাশের পর যথেষ্ট সমালোচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রায় দেড়শো বছরের ব্যবধানে এটিই নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।

১৮৩৭ : আমেরিকায় প্রথম দাসপ্রথাবিরোধী নারীসম্মেলন।

১৮৪৮ : ১৯-২০ জুলাই, 'সেনেকা ফল্‌স কন্‌ভেনশন' নামে খ্যাত নারী অধিকার আন্দোলনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্কের সেনেকা ফল্‌স-এ।

১৮৫৭ : ৮ মার্চ, আমেরিকায় বস্ত্রশিল্পের মহিলা শ্রমিকদের দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটের ডাক।

১৮৯৩ : দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সাফ্রাজেট (Suffragette) আন্দোলন সাফল্য লাভ করল। মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার পেলেন নিউজিল্যান্ডে।

১৯১০ : ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে গৃহীত হয় আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব।

১৯১৪ : ৮ মার্চ, প্রথম আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালিত হয়।

১৯১৮ : ব্রিটেনে মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ।

১৯২০ : আমেরিকায় মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ।

১৯২১ : মারী স্টোপস ব্রিটেনে প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে চালু করেন।

১৯২৯ : ভার্জিনিয়া উলফের 'A Room of One's Own' প্রকাশিত। এই প্রখ্যাত গ্রন্থে লেখিকা দাবি করেন যে, নারীদের যদি নিজস্ব পরিসর দেওয়া হয়, তাদের সৃজনও সমান উৎকর্ষ অর্জন করবে।

১৯৪৯ : পরবর্তী সমস্ত নারীবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের অগ্রদূত সিমোন দ্য বোভোয়ারের 'The Second Sex' প্রকাশিত হল। বইটিতে লেখিকা বললেন, সমাজ পুরুষকে তৈরি করেছে সদর্থক রূপে এবং নারীকে নঞর্থক রূপে, 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' বা পুরুষের 'অপর' হিসাবে। ফলে, অস্বীকার করা হয়েছে নারীর স্বকীয়তা ও তার দায়িত্ববহনের অধিকারকে। এই বইতে লেখিকার বিখ্যাত উক্তি হল, 'কন্যাসন্তান নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে নারী করে তোলে।'

১৯৬৩ : আমেরিকান নয়া-নারীবাদ প্রচারক প্রথম বই বেটি ফ্রিডানের 'The Feminine Mystique'-এর প্রকাশ। বইটিতে সিমোন দ্য বোভোয়ারের ধারণাটিকেই গ্রহণ করেন ফ্রিডান। নারী পুরুষের 'অন্য' অংশ হিসাবেই সমাজে ও ইতিহাসে চিহ্নিত। আমেরিকান নারীদের একটি প্রাঞ্জল পর্যালোচনাও আমরা এখানে দেখি।

১৯৭০ : কেট মিলেট-এর 'Sexual Politics' প্রকাশিত হল। পাশ্চাত্যে নারীবাদী চিন্তাচেতনায় 'পিতৃতন্ত্র' সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট আকার ধারণ করে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর। কেট মিলেট-ই সর্বপ্রথম নারী-পুরুষের সম্পর্ককে 'রাজনৈতিক' সম্পর্ক বলে চিহ্নিত করেন এবং জনন ও যৌনতা সম্পর্কিত এই নতুন ধরনের চিন্তাভাবনাই দ্বিতীয় ধারার নারীবাদী চিন্তার পথ প্রস্তুত করে।

১৯৭২ : প্যাট কারবাইন, গ্লোরিয়া স্টিনেম প্রমুখ Ms. পত্রিকার প্রকাশ করলেন। Ms.-ই প্রথম পত্রিকা যা আমেরিকায় প্রথম নারীবাদের কথা সকলের সামনে তুলে ধরল।

১৯৭৫ : আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে এই বছরটিকে চিহ্নিত করল রাষ্ট্রসংঘ। সাম্য, উন্নয়ন এবং শান্তির স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ পালিত হল। আন্তর্জাতিক নারীদশকের শুরু। মেক্সিকোতে ১৯ জুন—২ জুলাই, রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারীসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৯ : মেয়েদের ক্ষেত্রে সকলপ্রকার বৈষম্যবিলোপের জন্য দাবিসনদ রাষ্ট্রপুঞ্জে গৃহীত।

১৯৮০ : কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন।

১৯৮৫ : নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন।

১৯৯৪ : কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

১৯৯৫ : সাম্য, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন।

সংকলন : *শ্রাবণী মজুমদার ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী*

দলিল-২

বঙ্গদেশে নারীপ্রগতি : একশোটি সোপানচিহ্ন

১৮৪৯ : 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' : ওরফে বেথুন স্কুলের পত্তন ৭ মে ১৮৪৮। জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বীটনই আসল নাম) বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য হয়ে এদেশে আসেন এবং আইন সচিবের পদাধিকারবলে শিক্ষা সমাজের (The Council of Education) সভাপতি হন।

১৮৫৬ : 'বিধবাবিবাহ আইন' : বিধবা বিবাহকে আইনত সিদ্ধ করার জন্য সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের আর্জি ও আইন পাস।

১৮৫৬ : চিত্তবিলাসিনী : সম্ভবত এই বছরই মহিলার লেখা প্রথম বই 'চিত্তবিলাসিনী' প্রকাশিত হয়। লেখিকার নাম কৃষ্ণকামিনী।

১৮৬৩ : 'বামাবোধিনী' পত্রিকা : উমেশচন্দ্র দত্তর উদ্যমে প্রথম নারীবিষয়ক সাময়িকী : বামাবোধিনী পত্রিকা।

১৮৬৪ : 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা' : উত্তরপাড়ার জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি মহিলা কল্যাণকামী সংঘ।

১৮৬৫ : 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' : কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে ব্রাহ্ম মহিলাদের এই সভা প্রতিষ্ঠা।

১৮৭০ : 'বঙ্গমহিলা' : বঙ্গমহিলা প্রথম পাক্ষিক সংবাদপত্র 'মহিলাদের দ্বারা'।

১৮৭১ : 'বামা হিতৈষিণী সভা' : কেশব সেনের প্রচেষ্টাতে মহিলাদের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সভা গঠন।

১৮৭৩ : 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' : ১৮৭৩ সালের ১৮ নভেম্বর অ্যানেট অক্রয়ডের পৃষ্ঠপোষকতায় মেয়েদের জন্য তৈরি হয় আবাসিক বিদ্যালয়।

১৮৭৭ : 'ভারতী' : ১৮৮৪ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশের পর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী। পরবর্তীকালে হিরণ্ময়ী এবং সরলা দেবী।

১৮৮২ : 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' : ১ মে ভিক্টোরিয়া কলেজের পত্তন হয়। কেশবচন্দ্র সেনের নারী-শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তার অনুসারী।

১৮৮৩ : 'স্নাতক সম্মান' : এ বছরই চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়) স্নাতক সম্মান লাভ করেন। ওই বছরেই কাদম্বিনী ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন এবং ১৮৮৮ সালে লর্ড ডাফরিন উইমেনস্ হসপিটালে ডাক্তার নিযুক্ত হন।

১৮৮৯ : 'মহিলা প্রতিনিধি' : ১৮৮৯ সালের কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এবং স্বর্ণকুমারী ঘোষাল সর্বপ্রথম মহিলা প্রতিন্ধি হিসেবে যোগদান করেন।

১৮৯৩ : 'মহাকাল পাঠশালা' : শিক্ষার মাধ্যমে ঐতিহ্য সম্পর্কে মেয়েদের সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়।

১৮৯৮ : 'মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্' : মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ বা ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে কর্মজীবন শুরু করেন।

১৯১০ : 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' : সরলা চৌধুরানীর উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'। ১৯১০-এর ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনের সূত্রে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলন।

১৯১৭ : 'ভোটাধিকার' : ১৯১৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে মহিলাদের একটি দল মন্টেগু ও চেম্‌সফোর্ডের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের দাবি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বশাসিত রাজ্যে মেয়েদের পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা।

১৯২১ : 'নারী কর্মমন্দির' : দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় উর্মিলা দেবী কর্তৃক 'নারী কর্মমন্দির' গঠন।

১৯২৪ : 'দীপালী সঙ্ঘ' : লীলা নাগ (রায়)-এর উদ্যোগে ঢাকায় দীপালী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত।

১৯২৭ : 'বেঙ্গল উইমেন্‌স্ এডুকেশনাল লীগ' : বাংলার নারীশিক্ষা সম্মিলনী জন্ম দেয় বেঙ্গল উইমেন্‌স্ এডুকেশনাল লিগের।

১৯২৭ : 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্‌স্ কনফারেন্স' : জানুয়ারি মাসে মেয়েদের এই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনটির গোড়াপত্তন হয়। মার্গারেট কাজিন ছিলেন এই সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা।

১৯২৮ : 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ' : মেয়েদের দেশপ্রেম এবং বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য লতিকা ঘোষ এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র বসুর মা প্রভাবতী বসু।

১৯৩০ : 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' : ১৩ মার্চ, কয়েকজন প্রবীণা কংগ্রেসী মহিলা মেয়েদের পক্ষ থেকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফল করে তোলার জন্য এই সমিতি গঠন করেন। সভাপতি হন উর্মিলা দেবী এবং সম্পাদিকা শান্তি দাস।

১৯৩২ : 'অল বেঙ্গল উইমেন্‌স্ ইউনিয়ন' : অনৈতিক ব্যবসা নিরোধক আইনের সপক্ষে জনমত গঠন করার জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল এই উপসমিতিটি গঠন করে।

১৯৪৩ : 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' : অগাস্ট বিপ্লবের বছরই বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। শিশু এবং মহিলাদের কল্যাণার্থে গঠিত হয় এই সমিতি।

১৯৫১ : নূতন সংবিধানে নারী পুরুষের পূর্ণ সাম্য সমাজের লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেল।

১৯৫২ : পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিতদের মন্ত্রিসভায় শ্রীমতী রেণুকা রায় মন্ত্রী ও শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় উপমন্ত্রী হন।

নির্মাণ : সীমন্তী সেন

আইনে নারীর অধিকার

পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার এমন অবস্থা যে দু'মুঠো ভাতের জন্য বেশির ভাগ নারীকেই পুরুষের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীকে মুখ বুজে নানারকম অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে। পণপ্রথার কুফল সারা ভারত ছেয়ে গেছে—কত নিরীহ বৌকে হত্যা করা হচ্ছে, কত নিরীহ বৌ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষেরা নিজেদের স্বার্থ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নারীর প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করছে। এই অবস্থা চলতে দেওয়া যেতে পারে না। এটা সমাজের কলঙ্ক। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লিগেল এড অ্যান্ড অ্যাডভাইসরি কমিটি আইনে নারীর কি কি অধিকার আছে তা সংক্ষেপে প্রচারের জন্য এই বই বের করেছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে দুঃস্থ বা নিঃস্ব নারী মামলা করা বা লড়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লিগেল এড অ্যান্ড অ্যাডভাইসরি কমিটিগুলোর কাছ থেকে সাহায্য পাবে।

সংবিধানে নারীর অধিকার

স্ত্রী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রে আইন সমানভাবে প্রযোজ্য। আইনের সাহায্য তারা একই রকম পাবে।

জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য যে সব কূয়া, পুকুর, স্নানের ঘাট, রাস্তা, বিশ্রামাগার, রেস্তোরাঁ, হোটেল, সিনেমা ও আমোদপ্রমোদের স্থান রাখা আছে সে সব জায়গাতেই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নারী ব্যবহার করতে বা যেতে পারবে।

সরকারের অধীনে কাজ করার এবং কাজের জন্য আবেদন করার অধিকার নারীকে দেওয়া হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা হয়নি, এ অধিকার তাদেরও আছে।

নারীর বাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করবার অধিকার আছে। তাদেরও শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হবার, সংগঠন তৈরি করার, ভারতের যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করার সংবিধান স্বীকৃত অধিকার আছে। জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে সরকার যদি কোনো বিধি-নিষেধ রেখে থাকে সেগুলো বাদ দিয়ে নারী যে কোনো পেশা ও কাজ নিতে বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে।

আইনবিরুদ্ধ কাজ না করে থাকলে নারীকে কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। কোনো অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট সাজার বেশি সাজা দেওয়া যাবে না। একই অপরাধের জন্য কোনো নারীকে একবারের বেশি অভিযুক্ত করা বা শাস্তি দেওয়া যাবে না। অভিযুক্ত নারীকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

আইন মোতাবেক ছাড়া কোনো নারীর প্রাণ বা দৈহিক স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না।

গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে নারীকে হাজতে আটকে রাখা যাবে না, তাকে উকিলের পরামর্শ ও সাহায্য নেয়া থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। গ্রেপ্তার করা হলে নারীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া এই সময়ের বেশি তাকে হাজতে আটকে রাখা যাবে না। অবশ্য নিবারণমূলক আইনে এবং বিদেশী শত্রু হিসাবে যে নারীকে গ্রেপ্তার করা হবে তার ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রযোজ্য হবে না। নিবারণমূলক গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে নারীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে জানাতে হবে এবং গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে লিখিত বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।

কোনো লোক যদি নারীকে জোর করে পতিতাবৃত্তি বা ভিক্ষা বা ওই জাতীয় অসামাজিক কাজ

করতে বাধ্য করে তাহলে ওই সমাজবিরোধী লোককে সাজা দেওয়া হবে।

১৪ বছর বয়সের কম বয়সী মেয়েদের কারখানা, খনি ও বিপজ্জনক কাজে লাগান আইনবিরুদ্ধ কাজ।

নারীর নিজের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবার অধিকার আছে। তবে দেখতে হবে যে তা করতে গিয়ে কেউ যেন আইন-শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ না ভাঙে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি সৃষ্টি না করে। কোনো মানুষ তথা নারীকে এমন কোনো কর দিতে বাধ্য করা যাবে না যা কোনো বিশেষ ধর্ম পোষণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

নারী তার মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন বোধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারে।

এসব গেল নারীর মৌলিক অধিকারের কথা যা সংবিধানে বলা আছে। এখন কয়েকটি বিশেষ আইন দ্বারা নারীকে কি কি অধিকার দেওয়া হয়েছে দেখা যাক।

ফৌজদারি আইন

আসামী নারীকে দিনের পর দিন আদালতে হাজির হওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং তার জামিন পাবার কঠোরতা শিথিল করা হয়েছে।

নারীকে খোরপোষের জন্য মামলা করার অধিকার দেওয়া আছে। কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রী বা বৈধ বা অবৈধ নাবালক সন্তান বা বৈধ বা অবৈধ সন্তান—যে সাবালক কিন্তু শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার জন্য নিজেকে ভরণ-পোষণ করতে পারে না—বা তার পিতা বা মাতাকে ভরণ-পোষণ করতে অস্বীকার বা অবহেলা করে তাহলে সেই স্ত্রী বা সন্তান বা পিতা বা মাতা আইনের সাহায্য নিয়ে খোরপোষ পেতে পারে। অবশ্য সেই পুরুষের খোরপোষ দেবার ক্ষমতা থাকা চাই এবং কেবলমাত্র তারাই খোরপোষ পাবে যারা নিজেদেরকে ভরণ-পোষণ করতে পারে না।

কোন নারী যদি প্রথমবার অপরাধ করে ও আগে কোন অপরাধ করেছে বলে প্রমাণিত না হয় এবং তার প্রথম অপরাধের সাজা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হয় তাহলে সেই নারী আদালতের আদেশে—শান্তি বজায় রেখে ভালভাবে থাকার লিখিত অঙ্গীকার দিয়ে—প্রথম অপরাধের সাজা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

নারীকে ধর্ষণ বা তার শ্লীলতাহানি বা তার সঙ্গে অশ্লীল ব্যবহার করলে পুরুষ কঠোর সাজা পাবে।

প্রতারণা করে পুরুষ যদি কোন নারীর মনে এই ধারণা জন্মায় যে সে তার স্বামী এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ওই নারী যদি সেই পুরুষের সাথে একত্রে বসবাস বা যৌন সংসর্গ করে তাহলে ওই কাজের জন্য পুরুষকে আইন অনুযায়ী সাজা পেতে হবে।

স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন তার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বামী যদি আরেকটা বিয়ে করে তাহলে সে আইনত সাজা পাবে। তবে কয়েকটা অবস্থায় তাকে সাজা দেওয়া হবে না।

আইনে বিয়ে হচ্ছে না জেনেও যদি কোনো পুরুষ বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিয়ে যায় যাতে করে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে ঠিকমত বিয়ে হচ্ছে তাহলে সেই পুরুষ আইনত সাজা পাবে।

দেওয়ানি আইন

প্রতিটি নারীর তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান, বন্ধক, বিক্রি বা আইনসম্মত উপায়ে যেভাবে খুশি বিলি ব্যবস্থা করার এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য মামলা করা বা লড়ার অধিকার আছে।

নাবালিকা বা মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ অক্ষম নারী তার নিকট বন্ধু বা অভিভাবক দ্বারা সম্পত্তি রক্ষার জন্য মামলা করতে বা লড়তে পারে।

সামাজিক নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী যেসব নারী পর্দানশীন তারা আদালতে উপস্থিত থাকা থেকে অব্যাহতি পাবে।

ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে না করে নারী ও পুরুষ বিশেষ বিবাহ আইন অনুযায়ী তাদের বিয়ে সম্পন্ন করতে পারে। এমনকি যারা ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে করেছে তারাও তাদের সেই বিয়ে এই আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করতে পারে। নারী ও পুরুষের পক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে করার অসুবিধা থাকলে এই আইনের সাহায্যে বিয়ে করা সম্ভব।

অভিভাবক সম্বন্ধীয় আইন অনুযায়ী নাবালকের অভিভাবক হতে চেয়ে নারী আদালতে আবেদন করতে পারে—এক্ষেত্রে তাকে নাবালকের আত্মীয়া বা মিত্র হতে হবে।

এবার বিশেষ বিশেষ ধর্মের নারীর অধিকারের কথা সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

হিন্দু আইন

হিন্দু আইনে নারী তার পিতা ও মাতার সম্পত্তি ওয়ারিশসূত্রে পাবার অধিকারিণী। কোনো হিন্দু পুরুষ উইল না করে মারা গেলে তার কন্যা, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী, মৃত পুত্রের মৃত পুত্রের কন্যা ও বিধবা স্ত্রী, মৃত পুত্রের কন্যা, মৃত কন্যার কন্যা, স্ত্রী, মাতা অন্যান্য পুরুষ ওয়ারিশগণের সাথে সমান অংশে সেই পুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। তবে ওই ব্যক্তি মারা যাবার সময় এরা কেউ জীবিত না থাকলে পর্যায়ক্রমে অন্য শ্রেণীর নারী ও পুরুষ ওয়ারিশ হয়।

কোনো হিন্দু নারী উইল না করে মারা গেলে প্রথমত তার কন্যা এবং মৃত পুত্র ও কন্যার কন্যা পুরুষ ওয়ারিশগণের সাথে সমানভাবে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। এরা কেউ ওই নারীর মৃত্যুর সময় বেঁচে না থাকলে স্বামীর ওয়ারিশগণ এবং তারাও বেঁচে না থাকলে মাতা, পিতার সাথে উত্তরাধিকারিণী হয়।

নাবালকের পিতা বেঁচে না থাকলে মাতাই হবে তাব স্বাভাবিক অভিভাবক। পাঁচ বছর পর্যন্ত নাবালক তার মাতার কাছে থাকতে পারবে।

মাতাই হচ্ছে অবৈধ পুত্র বা অবৈধ অবিবাহিত কন্যার অভিভাবক।

পিতা বেঁচে না থাকলে নাবালক দত্তক পুত্রের অভিভাবক হবে তার মাতা।

হিন্দু নারী কোনো কোনো ক্ষেত্রে দত্তক নিতে বা দিতে পারে।

হিন্দু নারীর স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পাবার অধিকার আছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিন্দু নারী স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে যদিও খোরপোষ পাবার অধিকার তার থাকবে।

বৃদ্ধা বা অশক্ত মাতা যদি নিজের ভরণ-পোষণ চালাতে অক্ষম হয় তাহলে সন্তানের কাছ থেকে খোরপোষ পাবার অধিকারিণী হবে।

অবৈধ বা বৈধ অবিবাহিত কন্যার যদি নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে পিতামাতার কাছ থেকে তা পাবার অধিকার আছে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে হিন্দু নারী তার স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরের কাছ থেকে খোরপোষ পাবার অধিকারিণী।

উপযুক্ত কারণ ছাড়া স্বামী যদি আলাদা থাকে বা স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাহলে স্ত্রী দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে।

স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ মোতাবেক আলাদা থাকার বা বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা নিচে লেখা যে কোনো একটা কারণে করতে পারবে :

(১) বিয়ের পর স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের সাথে যদি স্বেচ্ছায় যৌনসংসর্গ করে।

(২) বিয়ের পর যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ বা তার ওপর অত্যাচার করে।
(৩) স্বামী স্ত্রীকে যদি ২ বছর বা বেশি সময় ধরে ত্যাগ করে থাকে।
(৪) স্বামী হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে যদি অন্য ধর্ম নেয়।
(৫) স্বামী পুরোপুরি পাগল হলে বা সবসময় বা সময় সময় এমনভাবে মানসিক রোগগ্রস্ত হলে যাতে করে স্ত্রী তার সাথে স্বাভাবিক ভাবে বসবাস করতে পারে না।
(৬) স্বামীর এমন কুষ্ঠরোগ যদি হয় বা সারে না এবং অত্যন্ত উগ্র।
(৭) স্বামী যদি যৌনরোগে ভোগে যা সংক্রামিত হয়।
(৮) স্বামী যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে।
(৯) স্বামী জীবিত থাকার খবর যদি ৭ বছর বা বেশি সময় ধরে না পাওয়া যায়।
(১০) হিন্দু বিবাহ আইন কার্যকরী হবার আগে যদি এই বিয়ে হয়ে থাকে এবং স্বামী আরেকটা বিয়ে করে, বা এই বিয়ে হবার সময় যদি কোনো স্ত্রী জীবিত থাকে যাকে ওই আইন কার্যকরী হবার আগে বিয়ে করেছিল।
(১১) বিয়ে হবার পর স্বামী ধর্ষণ, অস্বাভাবিক যৌন সংসর্গ বা পাশবিকতার অপরাধে দোষী যদি সাব্যস্ত হয়।
(১২) হিন্দু দত্তক ও খোরপোষ আইন অনুযায়ী আদালতের আদেশে স্ত্রী যদি আলাদা বসবাস করে বা ফৌজদারি আইন অনুযায়ী ভরণ-পোষণ পায় সেক্ষেত্রে আদেশের থেকে ১ বছর বা বেশি সময় যদি তাদের সহবাস না হয়।
(১৩) স্ত্রীর ১৫ বছর বয়সের আগে বিয়ে যদি হয়ে থাকে এবং স্ত্রী যদি সেই বিয়ে তার ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে অস্বীকার করে।
(১৪) স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে আদালত থেকে আদেশ পায় যাতে করে আলাদাভাবে থাকতে পারে এবং সেই আদেশ থেকে ১ বছর বা বেশি সময় স্বামীর সাথে সহবাস না করে।
(১৫) দাম্পত্য জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদেশ আদালত থেকে পাবার পর ১ বছর বা বেশি সময় সেই আদেশ কার্যকরী যদি না হয়।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে মামলা চলাকালীন স্ত্রী মামলার খরচ ও খোরপোষ আদালতের আদেশে পেতে পারে এবং মামলা শেষ হবার পর পাকাপাকিভাবে খোরপোষ পেতে পারে। তবে আবার বিয়ে করলে বা চরিত্রহীন হলে খোরপোষ পাবে না।

হিন্দু আইন আদালতের আদেশ অনুযায়ী পাকাপাকিভাবে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারে।

বিয়েতে পণ দেওয়া বা নেওয়া একটা জঘন্য অপরাধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

বিধবা হিন্দু নারীর আবার বিয়ে করার অধিকার আছে। নাবালিকার ক্ষেত্রে পিতার অনুমতি দরকার।

মুসলমান আইন

কোনো মুসলমান নারী বা পুরুষ উইল না করে মারা গেলে মুসলমান নারী ওয়ারিশসূত্রে তার সম্পত্তি পাবার অধিকারিণী হয়। তবে কতটা অংশ এবং কোন্ কোন্ নারী পাবে তা নির্ভর করে ওয়ারিশ কে কে জীবিত আছে তার ওপর। সাধারণত মুসলমান নারী একটা নির্দিষ্ট অংশে ওয়ারিশসূত্রে সম্পত্তি পায়। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে।

ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে দেখা যায় যে মুসলমান নারী ছেলেকে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত এবং মেয়েকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের কাছে আইনত রাখতে পারে তবে তাদের

অভিভাবকত্ব সব সময় পিতার ওপর থাকবে। অবৈধ সন্তান মায়ের কাছেই থাকবে।

মুসলমান আইনে স্ত্রীকে স্বামীর কাছে থেকে, নাবালিকা অবিবাহিতা কন্যাকে পিতার কাছ থেকে এবং মাতাকে সন্তানের কাছ থেকে খোরপোষ পাবার অধিকার দেওয়া আছে।

১৫ বছর বয়স হয়ে গেলে মুসলমান নারী সাধারণত তার পছন্দ মত পুরুষকে বিয়ে করতে পারে। তবে সেই পুরুষ তার সমান অবস্থার মানুষ হওয়া চাই।

১৫ বছরের কম বয়সী মুসলমান নারীর আইন সম্মত বিয়ে হতে পারে যদি তার অভিভাবক সেই বিয়ে দেয়।

কোনো মুসলমান নারীর ১৫ বছর বয়সের আগে বিয়ে হলে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে সেই বিয়ে অস্বীকার করার অধিকার তার আছে।

বিয়ে হবার সাথে সাথে মুসলমান নারী স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর ও খোরপোষ পাবার এবং তার সাথে থাকার অধিকার লাভ করে।

বিবাহ বিচ্ছেদ হবার পর ইদ্দৎকালীন সময়ে মুসলমান নারীর খোরপোষ পাবার অধিকার আছে। ইদ্দৎকালীন সময়ের পরেও যদি বিচ্ছেদের কথা তাকে জানানো না হয় তা হলে যতদিন না পর্যন্ত তাকে জানানো হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তার খোরপোষ পাবার অধিকার আছে। অন্তবর্তিকালীন সময়ের খোরপোষের জন্য স্ত্রী মামলা করতে পারে।

মুসলমান স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর বা তার অংশ বিশেষ নেবার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারে।

যদি দেনমোহর দেওয়া না হয় তাহলে মুসলমান নারী জীবিত কালে বা তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ সেটা পাবার জন্য মামলা করতে পারে।

যে পর্যন্ত স্বামী তাৎক্ষণিক দেনমোহর না দিচ্ছে সে পর্যন্ত স্ত্রীর তার সাথে একত্রে বসবাস ও যৌনসংসর্গ না করার অধিকার আছে।

সমস্ত দেনমোহর না পাওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর যে সম্পত্তি নিজের দখলে আছে তা তার দখলে রেখে দিতে পারে। এই অধিকার স্ত্রী কেবলমাত্র বিবাহবিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুতে পায়। অন্যায়ভাবে এই সম্পত্তি থেকে বেদখল হলে স্ত্রী পুনর্দখলের জন্য মামলা করতে পারে।

স্ত্রী কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। সেগুলো হচ্ছে— (১) যদি স্বামী তাতে সম্মতি দেয়, বা (২) মামলা করে আদালতের ডিক্রি পায়, বা (৩) বিয়ের আগে বা পরে স্বামীর সাথে করা কোন চুক্তি থাকে।

নিচে লেখা যে কোনো একটি কারণে মুসলমান স্ত্রী আদালতে মামলা করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পেতে পারে :

(১) ৪ বছর ধরে স্বামীর কোনো হদিশ জানা যায়নি।
(২) স্বামী ২ বছর ধরে স্ত্রীর ভরণপোষণ করেনি।
(৩) স্বামীর যদি ৭ বছর বা বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ড হয়।
(৪) ৩ বছর ধরে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামী দাম্পত্য দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ হয়েছে।
(৫) বিয়ের সময় থেকে স্বামী যৌনসংসর্গ করতে অক্ষম রয়েছে।
(৬) ২ বছর ধরে স্বামী উন্মাদ হয়ে আছে বা কুষ্ঠ বা কঠিন যৌনরোগে ভুগছে।
(৭) ১৫ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়ে থাকলে স্ত্রী যদি ১৮ বছর বয়সের আগে কিন্তু ১৫ বছর বয়সের পরে সেই বিয়ে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে অবশ্য বিয়ে যৌনসংসর্গের দ্বারা যদি সম্পূর্ণতা লাভ না করে।
(৮) স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি মানসিক বা শারীরিক অত্যাচার বা নিষ্ঠুর আচরণ করে।

(৯) মুসলমান আইনে স্বীকৃত অন্য কোনো কারণ থাকলে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হলে স্ত্রী পরে দেয় দেনমোহর পাবার এবং অন্য বিয়ে করার অধিকার পায়।

তিন তালাকের বিবাহ বিচ্ছেদের পর মুসলমান স্ত্রী সেই স্বামীকে আবার বিয়ে করতে পারে যদি ইতিমধ্যে অন্য কারোকে বিয়ে করে এবং সেই বিয়ে যৌনসংসর্গ দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করার পর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় বা দ্বিতীয় স্বামী মারা যায়। অন্য ক্ষেত্রে ইদ্দৎকালীন সময়ে বা তার পরে আবার বিয়ে করতে পারে।

খ্রিস্টান আইন

আইনে খ্রিস্টান নারীর ওয়ারিশসূত্রে সম্পত্তি পাবার অধিকার আছে। উইল না করে কোনো খ্রিস্টান মারা গেলে ওয়ারিশসূত্রে তার সম্পত্তি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশে খ্রিস্টান নারীর অর্থাৎ মাতা, স্ত্রী, ভূগিনী, কন্যা ইত্যাদির পাবার অধিকার আছে। তবে কতটা অংশ এবং কোন্ কোন্ নারী পাবে তা নির্ভর করে মৃত্যুর সময় কোন্ কোন্ ওয়ারিশ জীবিত থাকে তার ওপর।

নিচে লেখা যে কোনো একটি কারণে খ্রিস্টান স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য মামলা করতে পারে :

(১) স্বামী যদি খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে এবং অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করে।

(২) নিকট আত্মীয়ের সাথে যৌনসংসর্গ করার অপরাধে স্বামী যদি দোষী সাব্যস্ত হয়।

(৩) স্ত্রী জীবিত থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে এবং তার সঙ্গে যৌনসংসর্গ করে এবং সেই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়।

(৪) অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিয়ে এবং যৌনসংসর্গ করার অপরাধে স্বামী যদি দোষী সাব্যস্ত হয়।

(৫) ধর্ষণ, অস্বাভাবিক বা পাশবিকতার অপরাধে স্বামী যদি দোষী সাব্যস্ত হয়।

(৬) অন্য স্ত্রীলোকের সাথে যৌনসংসর্গ এবং স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করার অপরাধে স্বামী যদি দোষী সাব্যস্ত হয়।

(৭) অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনসংসর্গ এবং ২ বছর বা বেশি সময় ধরে স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়ার অপরাধে স্বামী যদি দোষী সাব্যস্ত হয়।

কয়েকটি কারণে বিয়ে অসিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করার জন্য খ্রিস্টান নারী মামলা করতে পারে। যথা—(১) স্বামী বিয়ে এবং এই মামলা করার সময় যৌনসংসর্গে অক্ষম ছিল, বা (২) স্ত্রী ও স্বামী নিষিদ্ধ আত্মীয়তার মধ্যে ছিল, বা (৩) স্বামী বিয়ের সময় পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল, বা (৪) বিয়ের সময়ে স্বামীর আগের স্ত্রী জীবিত ছিল এবং তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বজায় ছিল।

অন্য স্ত্রীলোকের সাথে যৌনসংসর্গ করার বা অত্যাচার করার বা ২ বছর বা বেশি সময় ধরে ছেড়ে দেওয়ার কারণে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে আলাদা থাকার আদেশের জন্য আদালতে মামলা করতে পারে।

ছেড়ে চলে যাবার অভিযোগে স্ত্রীর বিরুদ্ধে আলাদা থাকার আদেশ হলে স্ত্রী তা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারে এই কারণ দেখিয়ে যে সেই আদেশ তার অনুপস্থিতিতে হয়েছিল এবং ছেড়ে যাবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই স্বামী যদি সম্বন্ধ ত্যাগ করে থাকে তাহলে খ্রিস্টান স্ত্রী দাম্পত্য জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করতে পারে।

মামলা চলাকালীন স্ত্রী অন্তবর্তিকালীন খোরপোষ চাইতে পারে। আদালতের রায়ে স্ত্রী-স্বামীর কাছ থেকে স্থায়ী খোরপোষ পেতে পারে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দিষ্ট সময় পরে স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারে।

স্বামী পরিত্যাগ করে গেছে এমন কোনো খ্রিস্টান স্ত্রী নিজের অর্জিত বা দখল করা বা অর্জন বা

দখল করতে পারে এমন সম্পত্তি স্বামী বা তার পাওনাদারের হাত থেকে রক্ষার জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে।

পার্শী আইন

কোনো পার্শী উইল না করে মারা গেলে ওয়ারিশসূত্রে তার সম্পত্তি পাবার অধিকার পার্শী নারীর আছে। তবে কতটা অংশ এবং কোন্ কোন্ নারী পাবে তা নির্ভর করে মৃত্যুর সময় কে কে ওয়ারিশ জীবিত থাকে তার ওপর।

পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে পার্শী নারী ২১ বছর বয়সের আগে আইনত বিয়ে করতে পারে।

অভিভাবক যদি নাবালিকার হয়ে তার উপকারের জন্য বিয়ের কোন চুক্তি করে থাকে তাহলে পার্শী নাবালিকা যার বয়স ১৮ বছরের ওপর এবং ২১ বছরের নিচে সেই চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য মামলা চালাতে পারে।

যেখানে স্বাভাবিক কারণে যৌনসংসর্গ দ্বারা বিয়ের সম্পূর্ণতা লাভ করা অসম্ভব হয় সেখানে পার্শী নারী বিয়ে বাতিল বলে গণ্য করার জন্য মামলা করতে পারে।

এক নাগারে স্বামী ৭ বছর ধরে স্ত্রীর কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকলে পার্শী স্ত্রী বিয়ে নাকচ করার জন্য মামলা করতে পারে।

নিচে লেখা এক বা একাধিক কারণে পার্শী নারী বিবাহ-বিচ্ছেদ বা আদালত কর্তৃক আলাদা থাকার আদেশের জন্যে মামলা করতে পারে :

(১) স্বামীর স্বেচ্ছাকৃত অস্বীকারের জন্য ১ বছরের মধ্যে বিয়ে যৌনসংসর্গের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়নি।
(২) বিয়ে এবং মামলা করার সময় পর্যন্ত স্বামী পাগল ছিল।
(৩) বিয়ের পরে স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের সাথে যৌনসংসর্গ বা দ্বিতীয় বিয়ে বা ধর্ষণ বা অস্বাভাবিক অপরাধ বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের সাথে যৌনসংসর্গ করেছে।
(৪) বিয়ের পর স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে গুরুতরভাবে আহত বা তার মধ্যে যৌনরোগ সংক্রমণ বা তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য করেছে।
(৫) ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের কোনো অপরাধের জন্য স্বামী ৭ বছর বা বেশি সময় ধরে কারাদণ্ড ভোগ করছে।
(৬) অন্তত ৩ বছর ধরে স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে।
(৭) স্বামীর বিরুদ্ধে আদালত আলাদা থাকার আদেশ দিয়েছে বা স্ত্রীকে আলাদা ভরণপোষণ দেবার আদেশ হয়েছে এবং ওই আদেশের পর থেকে তারা ৩ বছর বা বেশি সময় স্বামী-স্ত্রী রূপে যৌনসংসর্গ করেনি।
(৮) স্বামী দাম্পত্যজীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আদেশ ১ বছর বা বেশি সময় ধরে কার্যকরী করেনি।
(৯) স্বামী পার্শীধর্ম ত্যাগ করেছে।

এ ছাড়া তার বা তার সন্তানের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ বা অত্যাচার বা বলপ্রয়োগের অভিযোগে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে আলাদা থাকার আদেশের জন্য মামলা করতে পারে।

আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করলে বা তার সাথে যৌনসংসর্গ না করলে স্ত্রী দাম্পত্যজীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মামলা করতে পারে।

জীবন ধারণের জন্য নিজের যথেষ্ট আয় না থাকলে স্ত্রী মামলা চলাকালীন স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পাবার জন্য আদালতে আবেদন করতে পারে।

আদালতের রায়ে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে স্থায়ী খোরপোষ পেতে পারে।

আদালতের রায়ে বিবাহ বিচ্ছেদের একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পার্শী স্ত্রী আবার বিয়ে করতে পারে।

এখানে যেসব অধিকারের কথা বলা হল তা ছাড়া সম্প্রদায় বিশেষে নারীর অন্য সব অধিকারের কথা জানতে হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকটতম লিগেল এড্ কমিটির সাথে যোগাযোগ করলে জানা যাবে।

ভারতীয় সংবিধানে নারীদের জন্য সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের নির্দেশ বা নীতির মধ্যে রাজ্যগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নরনারী সবার জন্যই যেন পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জন করার এবং সমান কাজে সমান মজুরী পাবার অধিকার থাকে। রাজগুলোকে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন দেখে যে নারীদের কাজ করার মত পরিবেশ ও পরিস্থিতির ব্যবস্থা হয় এবং প্রসূতিদের জন্য ছুটি ও ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধানের এই সব নির্দেশকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কতকগুলো আইন তৈরী করা হয়েছে। যেমন ১৯৫২ সালের খনি আইন, ১৯৬১ সালের বাগিচা শ্রমিক আইন, ১৯৬১ সালের প্রসূতি ভাতা আইন এবং ১৯৬৬ সালের সমান মজুরী আইন। এ ছাড়া ১৯৪৮ সালের কারখানা আইন আগে থেকেই বলবৎ ছিল। এইসব আইনেরই মূল কথা মেয়েদের কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রাখা, কাজ করতে গিয়ে যাতে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে অসুবিধা না হয় তা দেখা। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইনের বলে সন্তান প্রসবের আগে ও পরে শ্রমিক কর্মচারী মায়েদের ছয় সপ্তাহ করে সবেতন ছুটি দিতে হবে। একটা প্রসূতি-ভাতাও দিতে হবে। ছোট বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য মা শ্রমিককে মাঝে মাঝে ছুটি দিতে হবে। আলো হাওয়াযুক্ত বড় ঘরে শিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী থাকবে এবং বাচ্চাদের দুধ ও জলখাবার ব্যবস্থা থাকবে। ৬ থেকে ১২ বছরের বাচ্চাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে।

নারী শ্রমিকদের জন্য সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কাজ নিষিদ্ধ করা আছে। তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্যও কতকগুলো বিধি আছে। এইসব আইন ও বিধিগুলো ঠিকমতো মানা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য পরিদর্শকও আছেন। তিনি প্রয়োজনমত মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

১৯৭৬ সালে সমান মজুরী আইন পাশ হয়। তাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরিবৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা রয়েছে। একই রকমের দক্ষতা, প্রচেষ্টা ও দায়িত্বের প্রয়োজন হয় যে সব কাজে. সেইসব কাজের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী শ্রমিককে একই রকমের বেতন হার ও একই রকমের ভাতা ইত্যাদি দিতে হবে।

কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না। এই আইনে একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। এই উপদেষ্টা কমিটি একটি শিল্পসংস্থায় কতজন নারী শ্রমিক আছেন, সেখানকার কাজের প্রকৃতি, সময়, নারীদের পক্ষে তার উপযুক্ততা, নারীদের জন্য বেশি করে কাজের সুযোগ করে দেওয়া, নারীদের জন্য আংশিক কাজের ব্যবস্থা করা যায় কিনা ইত্যাদি সব কিছুই খতিয়ে দেখবেন। সংশ্লিষ্ট সরকার উপদেষ্টা কমিটির উপদেশ অনুধাবন করে নারীদের কাজের বিষয়ে ঐ সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। উপদেষ্টা কমিটিতে কমপক্ষে ১০ জন সভ্য থাকবেন এবং তার অর্ধেক হবে নারী।

কারখানা বা কোনও শিল্প সংস্থায় কাজে নিযুক্ত কোনও শ্রমিক কোনও দুর্ঘটনার জন্য মারা গেলে তার জন্য মালিক যে ক্ষতিপূরণ দেয়, তা তার ওপর নির্ভরশীল বিধবা স্ত্রী, মা ও মেয়ে ইত্যাদি পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে ২১/৪/৮৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রচাবিত বুকলেট।

দলিল—৪

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের সনদ

প্রথম অধ্যায়

১ম অনুচ্ছেদ

নারী বৈষম্য বা 'নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক মনোভাব'-এর অর্থ হলো লিঙ্গভিত্তিক সৃষ্ট বিভেদ, বর্জন অথবা বাধা, যার ফল বা উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং অপর অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকারের ভিত্তিতে এবং মানবিক অধিকারের ভিত্তিতে নারীর অর্জিত বিভিন্ন অধিকারকে দুর্বল ও খর্ব বা অকেজো করে দেওয়া।

২য় অনুচ্ছেদ

রাষ্ট্র নারীদের বিরুদ্ধে সবরকমের বৈষম্যকে অপরাধমূলক কাজ হিসাবে গণ্য করেছেন এবং অবিলম্বে নারীদের বিরুদ্ধে সকল বৈষম্য দূর করার জন্য সর্বপ্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণ করতে অঙ্গীকার করেছেন।

ক. রাষ্ট্র নারী-পুরুষের সমানঅধিকার নীতি তাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে এবং প্রয়োজনে আইন সৃষ্টি করেও নারী-পুরুষের সমানঅধিকারকে বাস্তবায়িত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

খ. এই নীতি কার্যকর করতে উপযুক্ত আইন তৈরি এবং প্রয়োজনে অন্যান্য বিধি অনুমোদন করার জন্য রাষ্ট্রগুলি যত্নবান হয়েছেন।

গ. পুরুষের সাথে সমানভাবে নারীদের আইনগত সুরক্ষা প্রদানে এবং উপযুক্ত জাতীয় বিচারালয় বা কোনো পাবলিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর প্রতি যে কোন বৈষম্যমূলক কার্যের বিরুদ্ধে নারীকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রগুলি বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

ঘ. নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক কাজকে নিবৃত্ত করতে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এবং সংস্থাগুলি রাষ্ট্রের এই নীতির এবং দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করছেন কিনা তা তত্ত্বাবধান করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হয়েছেন।

ঙ. যাতে কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা সংস্থা এই বৈষম্যমূলক কাজ না করে বা বৈষম্যমূলক কাজে সহায়তা করতে না পারে, সেজন্য সর্বপ্রকার উপযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাষ্ট্রগুলি রাজী হয়েছেন।

চ. রাষ্ট্রগুলি নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন, নিয়ম, প্রথা, প্রচলিত বিধিগুলিকে নাকচ করার উদ্দেশ্যে আইন তৈরী ও বিভিন্ন উপযুক্ত উপায় গ্রহণ করবেন।

ছ. নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক প্রচলিত সকল শাস্তিমূলক আইনগুলি রাষ্ট্র বর্জন করবেন।

৩য় অনুচ্ছেদ

রাষ্ট্রগুলি সর্ব ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আইন তৈরী এবং সমস্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যাতে নারীদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তাঁরা এগিয়ে চলতে পারেন, যাতে নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করবার অধিকারের নিশ্চয়তা পায়।

৪র্থ অনুচ্ছেদ

১। নারী ও পুরুষের মধ্যে কার্যত দ্রুত সমান অধিকার আনতে গিয়ে রাষ্ট্র যে সমস্ত অস্থায়ী বিশেষ আইনগুলি বলবৎ করবেন, সেগুলিকে অসম বা আলাদা মান (standard) হিসাবে গণ্য করা হবেনা। এই সকল আইন নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য অর্জিত হলেই তুলে নেওয়া হবে।
২। মাতৃত্ব বা Maternity সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র নারীদের জন্য যে সকল বিশেষ আইন বা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সেগুলিকে অসম আইন বলে গণ্য করা হবে না।

৫ম অনুচ্ছেদ

ক. নারী ও পুরুষকে ছোট বা বড় ভেবে যে সমস্ত কুসংস্কার এবং প্রথা বা অভ্যাস প্রচলিত আছে সেগুলিকে দূর করার জন্য নারী ও পুরুষের সামাজিক ও সংস্কৃতিগত চারিত্রিক পরিবর্তন করতে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে, রাষ্ট্র সেগুলি গ্রহণ করবেন।

খ. পারিবারিক শিক্ষার মধ্যে মাতৃত্ব বা সন্তানধারণকে সামাজিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে এবং পুরুষ বা নারীর কাছে তাঁদের সন্তানদের প্রতিপালন ও বৃদ্ধিকে তাঁদের যৌথ দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে। সর্বক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ

নারীকে ব্যবসার শুল্ক হিসাবে ব্যবহার করা এবং যৌনকর্মী হিসাবে ব্যবহারের প্রথা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ম অনুচ্ছেদ

রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও জনসাধারণের কাজে নারীর যোগ দেওয়ার ব্যাপারে যে সকল বাধা নিষেধ আছে, তা দূর করার জন্য রাষ্ট্র যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ক. নারীর ভোট দেওয়ার অধিকার এবং ভোটে দাঁড়াবার অধিকার থাকবে।

খ সরকারী নীতি নির্ধারণে এবং সেই নীতির সার্থক প্রয়োগে নারীকে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে। নারীকে সরকারী অফিসে এবং সমস্ত সরকারী কাজে যোগ দেওয়ার অধিকার দিতে হবে।

গ. বেসরকারী সংগঠন ও সংস্থাগুলিতে অংশগ্রহণ করার অধিকার এবং রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার নারীর অবশ্যই থাকবে।

৮ম অনুচ্ছেদ

পুরুষের সঙ্গে সমান তালে নারীরা যাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সে ব্যাপারে রাষ্ট্র যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯ম অনুচ্ছেদ

১। নারীকে পুরুষের মত নাগরিকত্ব (Nationality) গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার রাষ্ট্র মঞ্জুর করবেন।

বিদেশীকে বিবাহ করা বা বিবাহের সময় স্বামী Nationality বদলালেও স্ত্রীর নাগরিকত্ব

পাল্টাবেনা। এক্ষেত্রে কোনোক্রমেই স্বামীর State or Nationality স্ত্রীর ওপর জোর করে চাপানো হবে না।

২। তাদের সন্তানগণের নাগরিকত্ব নির্ধারণে রাষ্ট্র নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দান করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১০ম অনুচ্ছেদ

রাষ্ট্র শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা আনার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইনগুলি দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ক. শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ, শিক্ষাগ্রহণ, ডিপ্লোমা গ্রহণ, সাধারণ শিক্ষা, প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা, উচ্চস্তরের প্রযুক্তি বিদ্যা এবং সমস্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে গ্রামের ও শহরের নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেবেন।

গ. সকল শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সম্পর্কে ঐতিহ্যগত বা চিরাচরিত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে সহশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রবর্তন করা হবে। বিশেষকরে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন এবং শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্তন করা হবে।

ছ. পুরুষদের মতো নারীদেরও খেলাধূলা এবং শরীর শিক্ষায় সমান সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

১১তম অনুচ্ছেদ

১। চাকরীর ক্ষেত্রে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করার জন্য রাষ্ট্র সর্বপ্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে চাকরীর ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হবেন।

বিশেষত

ক. প্রত্যেক মানুষের কাজের অধিকার অবশ্যই থাকবে এবং কাজের অধিকার হবে প্রতিটি মানুষেব অবিচ্ছেদ্য অধিকার।

খ. চাকুরী লাভের সুযোগ, পছন্দ মত চাকুরী গ্রহণের অধিকার, চাকুরীতে পদোন্নতির অধিকার, চাকুরীতে নিরাপত্তা, চাকুরীতে সুবিধা প্রাপ্তি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবিশী পাওয়ার অধিকার থাকবে।

গ. নারী-পুরুষের একই চাকুরীতে সমান পারিশ্রমিক, সমান ব্যবহার, সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার থাকবে। সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষত অবসর গ্রহণকালে বেকারির ক্ষেত্রে অসুস্থতা ও প্রতিবন্ধী অবস্থায় কাজের অক্ষমতায় এবং বার্ধ্যকে সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকার থাকবে।

ঘ. চাকুরীর শর্তের মধ্যে নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা অধিকারের মধ্যে থাকবে।

২। বিবাহের বিরুদ্ধে এবং মাতৃত্বের বিরুদ্ধে নারীদের বৈষম্যমূলক নীতিগুলি দূর করে রাষ্ট্র এই ব্যাপারে নারীদের স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

ক. গর্ভাবস্থায় বা মাতৃত্বের ছুটি দেওয়ার সময় নারীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যাবে না।

খ. বেতনসমেত মাতৃত্বের ছুটি দিতে হবে। সমস্ত সামাজিক সুবিধা থাকবে। এই ছুটি নিলে চাকুরীর seniority ও অন্যান্য সুযোগগুলি বজায় ও অক্ষুন্ন থাকবে।

গ. যদি কোনো চাকুরী কোনো নারীর গর্ভবতী অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিক্ষর হয়, তাহলে সেই গর্ভবতী মহিলাকে বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। এই সকল আইনের পুনর্বিবেচনা বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করে জনকল্যাণমুখী করে তুলতে হবে।

১২তম অনুচ্ছেদ

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করে রাষ্ট্র নারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের গর্ভবতী অবস্থায় এবং সন্তান ধারণকালে এবং সন্তান প্রসবের পর দৈহিক পুষ্টি সাদনের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সাহায্য করবেন, প্রয়োজনে বিনা খরচায় চিকিৎসার সুযোগ দেবেন।

১৩তম অনুচ্ছেদ

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে তাঁদের পুরুষের মত সাংসারিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র অবশ্যই করবেন।

ক. নারীদের পারিবারিক সুযোগ-সুবিধাগুলি দিতে হবে।

খ. নারীদের ব্যাঙ্ক ঋণ গ্রহণের অধিকার, সম্পত্তি প্রভৃতি বন্ধক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে।

গ. খেলাধূলো, অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে বিনোদনের সুযোগ যাতে নারীগণ লাভ করতে পারে, রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা নেবেন।

১৪তম অনুচ্ছেদ

১. গ্রামীণ নারীরা যে সমস্ত বিশেষ অনুবিধার সম্মুখীন হন, তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিক রাখার জন্য গ্রামীণ নারীরা যেসমস্ত ভূমিকা পালন করেন, সেগুলিতে বর্তমান সম্মেলনে গৃহীত সুযোগ-সুবিধার প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

২. গ্রামীণ পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করার সময় নারীরা যাতে তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন সেদিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য দেবেন।

ক. নারীরা সকল ধরনের উন্নতিমূলক পরিকল্পনা রূপায়নে অংশ নেবেন।

খ. পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে নারীরা যাতে উপযুক্ত সুযোগ, পরামর্শ, উপদেশ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

গ. সামাজিক নিরাপত্তার সকল প্রকার সুযোগ নারীকে দিতে হবে।

ঘ. নারীরা যাতে সর্বপ্রকার প্রশিক্ষণ এবং বিধিবহির্ভূত শিক্ষা পায় সে দিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য দেবেন।

ঙ. সমবায় প্রভৃতি ঐ ধরণের সংস্থা গঠন করে তার মাধ্যমে নারীরা যাতে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা পায় সেই সকল ব্যবস্থার রূপায়ন করতে হবে।

চ. নারীকে সকল সমাজসেবামূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

ছ. নারীরা যাতে পুরুষের মত কৃষিঋণ, কেনাবেচার সুযোগ, প্রযুক্তির সহযোগিতা এবং সর্ববিধ কৃষি সংস্কার এবং কৃষিজীবনের অবসরকালীন সকল সুযোগ পায়, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

জ. নারীরা যাতে থাকার মত প্রয়োজনীয় উপযুক্ত বাসস্থান, বাড়ী, বৈদ্যুতিক সুযোগ, পয়ঃপ্রণালী, জল সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

১৫তম অনুচ্ছেদ

১. রাষ্ট্র আইনের চক্ষে নারী-পুরুষদের সমান অধিকার দান করবেন।

২. রাষ্ট্র পুরুষদের মত নারীদেরও সমান আইনী সুযোগ-সুবিধা দান করবেন এবং সেই সুযোগ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ দেবেন।

নারীরা যাতে পুরুষের মত চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার পায় এবং আদালত এবং ট্রাইবুনাল প্রভৃতি বিচারালয়ে যাতে নারীরা তাঁদের আইনী দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করবেন।

৩. যে সকল প্রচলিত আইন নারীর আইনের সুযোগের প্রতিবন্ধক বলে মনে হবে, সেগুলিকে অকেজো করা বা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে।

৪. রাষ্ট্র নারী ও পুরুষকে তাঁদের বাসস্থান ও ডমিচাইল নির্ধারণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করবেন।

১৬তম অনুচ্ছেদ

রাষ্ট্র নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব দূর করে পুরুষদের মত তাঁদের বিবাহসংক্রান্ত এবং পারিবারিক ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার দেবেন।

ক. ইচ্ছামত বিয়ে করার অধিকার নারীকে দিতে হবে।

খ. স্বাধীনভাবে স্বামী নির্বাচন করার অধিকার এবং তাদের স্বাধীন ও পূর্ণ মতামতের ওপর নির্ভর করে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার নারীকে দিতে হবে।

গ. বিবাহ করার অধিকার ও দায়িত্ব যেমন থাকবে তেমনি বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার ও দায়িত্বও নারীর থাকবে।

ঘ. বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর সন্তান সম্পর্কিত ব্যাপারে সমান অধিকার থাকবে। এক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততিদের স্বার্থই অগ্রাধিকার পাবে।

ঙ. তাদের সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণ, সন্তাদের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে সঠিক পথ গ্রহণের জন্য নারীদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে।

চ. প্রধানত সন্তান-সন্ততির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সন্তানদের সুখ-সুবিধার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নারীরা যাতে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে বা তত্ত্বাবধায়কের কাজ করতে পারে অথবা জাতীয় আইন স্বীকৃত এই একই মনোভাবসম্পন্ন যেমন কোনো সংস্থা থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ. স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে তাঁদের ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে সন্তানদের নামকরণে এবং জীবিকা বা কর্মনির্ধারণ।

জ. স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অধিকার থাকবে যাতে তাঁরা সমানভাবে জমির স্বত্ব বা মালিকানা পান, জমি অর্জন করার, জমি তদারক করার, জমি দান বা বিক্রয় করার অধিকার পান।

ঝ. সন্তানদের বিবাহ সম্পর্কে বাগদান এবং সন্তানদের বিবাহ-ব্যাপারে আইনগত পদ্ধতি গ্রহণ করে বিবাহের নিম্নতম বয়স অনুযায়ী সরকারী-আইন সঙ্গতভাবে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

১৭তম অনুচ্ছেদ

১. বর্তমান সম্মেলনের কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটিতে প্রথমে ১৮টি রাষ্ট্র এবং তারপর অনুমোদন ক্রমে পরে ৩৫টি রাষ্ট্র ও যোগ্যতাসম্পন্ন এবং চারিত্রিক ও নৈতিক মানসম্পন্ন ২৩ জন বিশেষজ্ঞ

নেওয়া হবে। এই বিশেষজ্ঞগণ রাষ্ট্রকর্তৃক সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের থেকে নির্বাচিত হবেন। এরা ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবেন। এই বিশেষজ্ঞগণকে সম-ভৌগলিক বিভাগ এবং বিভিন্ন ঐতিহ্য ও প্রথার মানুষদের মধ্য থেকে নিতে হবে।

২. কমিটির সভ্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলির দ্বারা মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবেন।

৩. অন্ততঃপক্ষে প্রত্যেকটি নির্ধারণের ৩ মাস আগে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব রাষ্ট্রগুলিকে চিঠি দিয়ে ২ মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।

মহাসচিব রাষ্ট্রগুলির নাম উল্লেখ করে alphabetical order-এ অর্থাৎ বর্ণনানুক্রমিক সকল মনোনীত ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে প্রদান করবেন।

৪. কমিটির সভ্যদের নির্বাচন রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যালয়ে বা মহাসচিব কর্তৃক ডাকা রাষ্ট্রগুলির একটি সভায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় রাষ্ট্রগুলির ⅔ ভাগ উপস্থিত থেকে কোরাম গঠন করবেন। যারা কমিটিতে নির্ধারিত হবেন, তারা অবশ্যই সর্বাধিক ভোট লাভ করবেন।

৫. কমিটির সভ্যগণ চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত ৯ জন সভ্যের মেয়াদ ২ বছর পরেই শেষ হয়ে যাবে। প্রথম নির্বাচনের পরেই এই নয়জন সভ্যের নাম কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করবেন।

৬. ৩৫তম সংশোধন—অনুচ্ছেদ-১৭ অর্থাৎ এই অনুচ্ছেদ অনুসারে ২, ৩, ৪ প্যারাগ্রাফ-এর শর্ত অনুযায়ী কমিটির অতিরিক্ত ৫জন সভ্যেব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রসঙ্গে নির্বাচিত দুই জন অতিরিক্ত সদস্যের মেয়াদ ২ বছরের পরেই শেষ হয়ে যাবে। এই ২ জন অতিরিক্ত সভ্যের নাম কমিটির চেয়ারম্যান মনোনয়ন করবেন।

৭. যদি কোনো রাষ্ট্রের সভ্য হঠাৎ অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে সেই রাষ্ট্র তাদের রাষ্ট্রের অন্য একজন ব্যক্তিকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিযুক্ত করবেন।

৮. অধিবেশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে কমিটির সদস্যগণ সাধারণ অধিবেশন-এর অনুমোদন ক্রমে রাষ্ট্রসংঘ থেকে পারিশ্রমিক পেতে পারেন।

৯. রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কমিটির কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নর করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন।

১৮তম অনুচ্ছেদ

১. বর্তমান convention-এর কার্যাবলীর সমাধান এবং এই সমাধানের ব্যাপারে রাষ্ট্রগুলি কি কি আইন, বিচার ও প্রাশাসনিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ কমিটি কর্তৃক বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে পেশ করবেন।

ক. সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে এই প্রক্রিয়ায় প্রবেশের এক বছরের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

খ. অতঃপর অন্তত প্রতি চার বছরে, এবং তারপর যখন কমিটির প্রয়োজন হবে, তখন এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

১৯তম অনুচ্ছেদ

১. কমিটি তার কার্যপ্রণালী এবং কার্যসম্পাদনের নিয়মগুলি তৈরী করবেন।

২. কমিটি তার কার্য নির্বাহের জন্য ২ বছরের জন্য তার কর্মচারীদের নির্বাচন করবেন।

২০তম অনুচ্ছেদ

১. রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক ১৮নং ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত রিপোর্ট UNO-তে পাঠানো হয়েছে তা বিবেচনা করার জন্য কমিটি সাধারণত বছরে দুই সপ্তাহ বসবেন।

২. কমিটির সভাগুলি সাধারণত রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। অথবা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সুবিধাজনক জায়গাতেও সভা হতে পারে।

২১তম অনুচ্ছেদ

১. কমিটি তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনুষদের মাধ্যমে তার কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রতিবছর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে রিপোর্ট পাঠাবে। রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট ও তথ্যাদি পরীক্ষা করে তার ওপর কমিটির সুপারিশ ও পরামর্শ সাধারণ অধিবেশনে পাঠাবেন। এবং রাষ্ট্রগুলির যদি কোনো বক্তব্য থাকে, তাও কমিটি তার রিপোর্টে পাঠাবেন।

২. রাষ্ট্রসংঘের সচিব এই রিপোর্টটি Status of Women সংক্রান্ত যে কমিশন আছে, সেখানে তাদের জানার জন্য পাঠিয়ে দেবেন।

২২তম অনুচ্ছেদ

যে এলাকায় কনভেনশন হচ্ছে সেখানকার বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলিকে কনভেনশনের কার্যাবলী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটি অনুরোধ করতে পারেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

২৩তম অনুচ্ছেদ

নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য ও বৈষম্য দূর করার জন্য গঠিত কোনো আইনের বিরোধিতা এইসব convention-এ অবশ্যই ঘটবে না।

ক. কোনো রাষ্ট্রের আইনেও বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে বিরোধিতা থাকবে না।

খ. কোনো আন্তর্জাতিক convention-এও এই বিরোধিতা থাকবে না।

২৪তম অনুচ্ছেদ

নারীদের সবধরণে অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্র জাতীয় পর্যায়ে সবধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৫তম অনুচ্ছেদ

১. বর্তমান কনভেনশন সকল রাষ্ট্র স্বাক্ষর করতে পারে।

২. বর্তমান কনভেনশনে রাষ্ট্রসংঘর সচিব-এর পদ হবে বর্তমান কনভেনশন বা অধিবেশনের 'depository.'

৩. বর্তমান কনভেনশন-এর Ratification হতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘকে জানাতে হবে।

৪. কনভেনশনে সকল রাষ্ট্র যোগ দিতে পারে। এব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে জানাতে হবে।

২৬তম অনুচ্ছেদ

১. রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে লিখিত নোটিশ দিয়ে যে কোনো রাষ্ট্র যে কোনো সময় বর্তমান কনভেনশন-এর রিভিশন বা পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন।

২. রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশন রাষ্ট্রের এই অনুরোধের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা স্থির করবেন।

২৭তম অনুচ্ছেদ

১. রাষ্ট্রসংঘের সচিবের কাছে সমর্থনের জন্য জমা দেওয়ার ৩০ দিন পর বর্তমান কনভেনশন চালু হবে।

২৮তম অনুচ্ছেদ

১. মূল্যায়ন করার জন্য মহাসচিব রাষ্ট্রের দেওয়া আপত্তি বা সংযোজনের পাঠগুলি প্রত্যেক রাষ্ট্রের কাছে নোটিশ দিয়ে প্রচার করবেন।

২. বর্তমান কনভেনশন-এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি বা বক্তব্য গৃহীত হবে না।

৩. আপত্তিসমূহ যে কোনো সময় প্রত্যাহার বা ফিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের এবং মহাসচিবকে লিখে জানাতে হবে। মহাসচিব তখন সকল রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দেবেন। প্রত্যাহারের নোটিশ যে দিন মহাসচিব পাবেন, সেদিন থেকেই তা কার্যকর হবে।

২৯তম অনুচ্ছেদ

১. বর্তমান কনভেনশনের কোনো বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ সম্পর্কে যদি ২টি রাষ্ট্রের মধ্যে বা অনেকগুলি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ বা মতভেদ দেখা দেয় এবং যদি তা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে বিবাদীদের যে কোনো একজনের অনুরোধে ব্যাপারটিকে arbitration অথবা শালিসী বা সংস্থার জন্য দেওয়া যেতে পারে। যদি দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বিবাদকারীরা arbitration বা সালিশী সংস্থার সঙ্গে একমত না হন, তাহলে বিবাদকারীদের যে কোনো একজন আন্তর্জাতিক আদালতের statute-এর নিয়মকে স্বীকার করে বা statute-এর নিয়ম মাফিক বিচারালয়ে এই বিবাদের বিষয়টি পাঠিয়ে বিচারের জন্য প্রার্থনা জানাতে পারেন।

২. প্রতিটি রাষ্ট্র বর্তমান কনভেনশনে যোগ দেওয়ার সময় বলতে পারে যে, সে এই ধারার ১নং প্যারাগ্রাফ মানতে বাধ্য নয়।

৩. যে কোনো রাষ্ট্র যিনি এই অনুচ্ছেদের প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে আপত্তি করেছেন, তিনি যে কোনো সময় রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে নোটিশ দিয়ে সেই আপত্তি বা বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

৩০তম অনুচ্ছেদ

আরবী, চীনা, ইংরাজী, ফরাসী, রাশিয়ান এবং স্পেনীয় ভাষায় রচিত বর্তমান কনভেনশনের বক্তব্যের প্রামাণ্য পুস্তকগুলি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে গচ্ছিত থাকবে।

অনুবাদ : শ্রাবন্তি হালদার
